# সহাস্য বিবেকানন্দ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

নবভারত  পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

# উৎসর্গ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে আত্মনিবেদিত

শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে

# সূচীপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| নিবেদন | [৫] |
| বিবেকানন্দের হাসির উপরে বিতর্ক | ১ |
| 'আমরা আনন্দের অমৃতের সন্তান' | ৮ |
| খোলা মাঠের মানুষটি | ১০ |
| পিতার হাসি | ২৭ |
| উচ্ছল দিনগুলি | ৩১ |
| পরম রসিক | ৩৬ |
| নামরহস্য | ৭২ |
| হাসি-খুশি-গাল-গল্প | ৭৯ |
| রসনার রসকথা | ১০০ |
| খরশান ব্যঙ্গ | ১২৪ |
| ছুরির অপর মুখ | ১৪৫ |
| ধর্মরহস্য | ১৫৭ |
| বিচিত্র জীবন বিচিত্র পৃথিবী | ১৬৯ |
| কিছু সরস রচনা | ১৮১ |
| সেরা সরস রীতি | ২০২ |
| ভ্রাতা ও ভগিনী-কথা | ২১১ |
| 'জো বলে—কি মজা! কি মজা!' | ২৩০ |
| বন্ধুসঙ্গে—রসরঙ্গে | ২৩৮ |
| আত্মপরিহাস | ৩০৪ |
| গ্রন্থপঞ্জী | ৩১৯ |

# বিবেকানন্দের হাসির উপরে বিতর্ক

আশ্চর্য। স্বামী বিবেকানন্দ যে যথার্থ রসিক-পুরুষ—একথা এক শিক্ষিত ব্যক্তিকে বলে বোঝাতে হয়েছিল আমাকে।

আমার বিস্ময়ের বিশেষ কারণ—উক্ত ব্যক্তি কৃতবিদ্য ও সুরসিক; তিনি স্বামীজীর জীবনী পড়েছেন এবং তাঁর অনুরাগী।

আমি ভদ্রলোককে কথাপ্রসঙ্গে যখন বললুম—স্বামীজী অত্যন্ত রসিক-মানুষ ছিলেন, তখন তিনি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। যখন যোগ করে দিলুম—অমন রসিক-মানুষ এদেশে অল্পই মিলবে—তখন তিনি আপত্তি না জানিয়ে পারলেন না।

ঈষৎ বিদ্রূপের সঙ্গে ভদ্রলোক বললেন—এটা কি ভক্তির বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? তাঁর কি ঐশ্বর্যের অভাব যে, নতুন অলঙ্কার চাপিয়ে তাঁর সজ্জা বাড়াতে হবে?

আমি চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

তিনি বললেন—যিনি পৃথিবীবিখ্যাত বাগ্মী, লেখক, গায়ক, সঙ্গীতশাস্ত্রী, ইতিহাসবিৎ—

আমি বললুম—সমাজতাত্ত্বিক, দার্শনিক, শিল্পরসিক, শিক্ষাবিৎ, ধর্মবেত্তা—

তিনি বললেন—দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক, এক কথায় যিনি একালের প্রফেট—

আমি বললুম—তিনি হাসতে পারেন কখনো?

আমার প্রতিবিদ্রূপে ভদ্রলোক চটলেন। বললেন—হ্যাঁ, হাসলে কেউ তাঁকে ঠেকাতে পারে না। কিন্তু তিনি অত্যন্ত হেসেছেন, শুধু তাই নয়, একেবারে সেরা হাসি হেসেছেন, তার প্রমাণ কি?

আমি বললুম—প্রমাণ তো আপনার জানার মধ্যে।

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন—হ্যাঁ, জানা প্রমাণগুলো গোপন করার অপকর্ম আমি করছি; এখন সেগুলি ওপন্ করবার সৎকর্ম আপনি করুন।

আমি ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বললুম—না না, তা বলছি না। কেবল আপনি যে-বিবেকানন্দ-জীবনীটি পড়েছেন, তার কতকগুলি গল্প ও কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেব।

স্বামীজীর কিছু কথা, গল্প ও জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে আমি প্রশ্ন করলুম—এগুলোকে আপনি সরস ব্যাপার মনে করেন?

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে শেষে বললেন—ওগুলো হাসির এবং বেশ ভালো-রকম হাসির, তা মানছি। তাই বলে তিনি বাংলার সেরা রসিক-মানুষের একজন, একথা মানি কি করে?

আমি বললুম—আপনি মানবেন যদি বিশেষ দিক দিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করেন। প্রথমেই রসিক-মানুষ এবং রস-সাহিত্যিকের মধ্যে তফাত করতে হবে।

আমি এখানে রসিক-মানুষের কথাই বলতে চাইছি। ব্যক্তিগত কথাবার্তায় যিনি রসসৃষ্টি করতে পারেন, তিনিই রসিক-মানুষ। হাস্যরসের লেখকেরা ব্যক্তিজীবনে রসিক হলে তবে আমাদের হিসাবের মধ্যে আসবেন।

তিনি বললেন—বুঝেছি। কিন্তু কেউ ব্যক্তিজীবনে কতখানি এবং কি প্রকারের রসিক, তা নির্ণয় করবেন কি করে ?

আমি বললুম—এখানে একমাত্র বিচারের উপায় মুদ্রিত সাক্ষ্য। মুদ্রিত সাক্ষ্য বলতে আমি মুদ্রিত দিনলিপি, স্মৃতিকথা, সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রের বিবরণ ইত্যাদি বুঝছি। ঐসব মুদ্রিত সাক্ষ্যে যদি কারো বিষয়ে বলা হয়, তিনি অত্যন্ত রসিক ছিলেন, তাতেই চলবে না—কি ধরনের রসিকতা করতেন তাও যেন বুঝতে পারা যায়। যেমন—

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলেন।

আমি বললুম—যেমন দীনবন্ধু। দীনবন্ধু বাংলার এক সেরা হাস্যরসের সাহিত্যিক। বঙ্কিমচন্দ্রের বা নবীন সেনের সাক্ষ্য-অনুযায়ী তিনি ব্যক্তিগত আলাপেও অতুলনীয় রসিক। অথচ দীনবন্ধুর বিষয়ে স্মৃতিকথা থেকে ( সামান্য যা পাওয়া গেছে ) তাঁর মৌখিক রসিকতার বিবরণ অতি অল্পই মেলে।

ভদ্রলোক ভাবতে লাগলেন। আমি সেই সুযোগে যোগ করে দিলুম—উল্টোদিকে দেখুন, রামকৃষ্ণ পরমহংসকে কেউ কোনদিন লেখক বলে দাবি করবেন না, কিন্তু তিনি পূর্বোক্ত ধরনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বাংলার সেরা রসিক-মানুষ।

ভদ্রলোকের চোখ প্রশ্নে প্রখর হয়ে উঠল। তারপর তা কোমল হল। তারপর তিনি হাসলেন। তারপর ধীরে-ধীরে মাথা নাড়াতে লাগলেন।

আমি বললুম—হ্যাঁ। বুঝতেই পারছেন, 'রামকৃষ্ণ-কথামৃত' রামকৃষ্ণের লেখা নয়, তা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ( শ্রীম'র ) দিনলিপির মুদ্রিত রূপ। এই গ্রন্থে যত রসিকতা আছে, যতরকমের এবং যে-উচ্চমানের রসিকতা আছে, তার তুল্য অনুরূপ কোনো গ্রন্থে নেই। রামকৃষ্ণের চেয়ে রসিক বাংলায় জন্মান নি—একথা আমি বলতে চাই না। যতদিন না সেই অজ্ঞাত রসিকের রসিকতা-সংবাদ মুদ্রিত হয়ে লোকলোচনে আসছে, ততদিন পর্যন্ত রামকৃষ্ণই বাংলাদেশে রসিকোত্তম। আমরা অবশ্য নব রসিকের অভ্যুদয়ের জন্য অপেক্ষা করতে পারি—

—হ্যাঁ, অনন্তকাল—বলেই ভদ্রলোক হেসে ফেললেন।

তারপর বললেন—শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে কথাটা স্বীকার্য, কিন্তু বিবেকানন্দ ? তাঁর তো শ্রীম ছিল না।

আমি বললুম—একেবারে ছিল না, তা ঠিক নয়, তবে শ্রীরামকৃষ্ণের মতো নয়। বিবেকানন্দের উপরে লেখা অনেক স্মৃতিকথাই মেলে। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর দিনলিপি

থেকে সংকলিত 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' আছে, নিবেদিতার দিনলিপি ও স্মৃতিকথা আছে, সিস্টার ক্রিস্টিন, মিস ম্যাকলাউড, আইডা অ্যানসেল, হরিপদ মিত্র, প্রিয়নাথ সিংহ প্রভৃতির স্মৃতিকথা আছে, সর্বোপরি আছে মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিগ্রন্থগুলি, যা বর্তমান বিষয়ে রত্নখনি। এই সমস্ত থেকে বিবেকানন্দের মত ও আদর্শের বিষয়ে যেমন জানতে পারি, তেমনি তাঁর ব্যক্তিরূপের সাক্ষাৎও পাই, জানতে পারি, তিনি কত-খানি রসিক-মানুষ ছিলেন।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—বাংলাদেশের অন্য রসিক-মানুষদের বিষয়ে আপনি সন্ধান নিয়েছেন?

—অল্পবিস্তর নিয়েছি। তার থেকে এই সিদ্ধান্তই করতে হয়েছে—আমরা আমাদের সম্পদের সংরক্ষণের ব্যাপারে কত উদাসীন এবং দায়িত্বহীন। আমাদের বড় মানুষগুলির উপরে কতকগুলি বিশেষণ চাপিয়েই আমরা ক্ষান্ত, কিন্তু ঐসকল মানুষকে খুঁটিয়ে দেখতে এবং সর্বাত্মকভাবে তুলে ধরতে আমরা উৎসাহী নই। তারপর আমাদের বিচিত্র মূল্যবোধ মানুষের হাসির দিকটিকে মূল্য দেয় নি—ওটা নাকি অশালীন ব্যাপার। মহাপুরুষদের বিমর্ষতা মাপতেই আমাদের ভক্তির ফিতে ফুরিয়ে যায়। হাসি-টাসি তো মহত্তের বদ বায়ুর উদ্গার।

আমি যোগ করে দিলুম—এই উদাসীনতার মধ্যেও দু'জন ব্যক্তির রসিকতার অধিক সংবাদ আমরা পেয়ে গেছি—তাঁরা হলেন বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধেও কিছু পেয়েছি, গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধেও। সব জড়িয়ে কিন্তু পরিমাণ বেশী দাঁড়াবে না।

আমি দম ফেললুম। ভদ্রলোক দম নিলেন। তির্যকভাবে বললেন—তাহলে আপনি বিবেকানন্দের রসিকতার ভাল সংকলন করে ফেলেছেন বলুন।

ছদ্ম দুঃখে বলতে হল—ভাল আর কোথায়? যৎসামান্য বলতে পারেন।

—যৎসামান্যের পরিমাণ?

—মোটামুটি একটা বই দাঁড় করানো যাবে।

—অ্যাঁ—বলেন কি? সবই দিনলিপি, স্মৃতিকথা থেকে?

—না, স্বামীজীর রচনাবলীর সাহায্যও নিয়েছি।

ভদ্রলোক এতক্ষণে বাগে পেলেন। বললেন—সে কি মশাই, দুটো মাপকাটি হয়ে যাচ্ছে নাকি? একটু আগে বললেন, সাহিত্যিকদের রস-রচনাকে হিসেব থেকে বাদ দিচ্ছেন, তাহলে এখন বিবেকানন্দের বেলায় তার ব্যতিক্রম কেন? অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ভক্তি আপনার, মশাই।

ভদ্রলোক জমিয়ে হাসলেন।

হাসি থিতোতে দিলুম। তারপর বললুম—আর একটু সময় দেবেন?

—সময় কি কম নিচ্ছেন ?

—তা বটে—তবে—স্বামীজীর রচনাবলীর প্রকৃতি সম্বন্ধে যদি একটু সচেতন হতেন—

—মানে ?

—মানে, বিবেকানন্দের রচনাবলী নামে পরিচিত বস্তুর দুই-তৃতীয়াংশ তাঁর কলমে লেখা নয়—মুখে বলা জিনিস। অধিকাংশই বক্তৃতা, বড বা ছোট সভায়। বক্তৃতার নোট থেকেই বিবেকানন্দ-সাহিত্যের বড অংশ তৈরী হয়েছে। সুতরাং এগুলো মৌখিক ব্যাপার, কি বলেন ?

ভদ্রলোক চমকিত।—তা বটে! তা বটে!

আমি বলতে লাগলুম—বাকি যা রইল, তার বড অংশ আবার তাঁর পত্রাবলী। আর বিবেকানন্দের চিঠি কলমের ডগায় তাঁর সাক্ষাৎ মুখের কথা। তাঁর একটা চিঠিও বোধ হয় পাওয়া যাবে না, যা পড়ে তিনি সামনে দাঁড়িয়ে নেই, এমন মনে হবে।

ভদ্রলোকের অ-বাক অবস্থা দেখে আমি উৎসাহে মুখর।—চিঠির আসল গুণ বিবেকানন্দের চিঠিতে যতখানি আছে, বাংলা পত্রসাহিত্যের অন্যত্র তা দুর্লভ। পত্রকে 'পত্রসাহিত্য' হতে হলে পত্র থেকেই তা হতে হবে—একথা সকল সাহিত্য-শাস্ত্রীই বলেন। আদিতে সম্বোধন এবং অন্তে স্বাক্ষরযুক্ত যে-কোনো রচনাকে পত্র বলা চলে না। চিঠি একেবারে ব্যক্তিগত—উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জন্যই লিখিত। খোলা চিঠি চিঠি নয়—খামের মুখ আঁটা থাকলেও। বিশ্ববিখ্যাত হবার পরেও চিঠিতে বাপান্ত করতে বিবেকানন্দের বাধত না। তিনি মনে করতেন না, ওসব চিঠি প্রকাশিত হয়ে পড়লে তাঁর বিশ্বমানবত্ব কলঙ্কিত হবে।

ভদ্রলোক চুপ করে আছেন দেখেও আমার উৎসাহ মন্দীভূত হল না। সতেজে বললুম—অপরের সাক্ষ্যে বিবেকানন্দ অত্যন্ত রসিক প্রমাণিত হবার পরে তাঁর রসিক-স্বভাব দেখাতে তাঁর লেখা ( একেবারে নিজের হাতে লেখা। ) দু'একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে পারি, কি বলেন ?

ভদ্রলোক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—আমার বলবার মতো আর-কিছু যখন বাকি রাখেন নি তখন আপনিই বলে যান।

—না না, আপনি বলুন।

—না, আপনি বলুন।

আরো খানিক ভদ্রতা প্রতিযোগিতার পরে আমিই বললুম—বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' বা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে' তাঁর 'পত্রাবলী'র চরিত্র-লক্ষণ রয়েছে। পরিব্রাজকের আদি নাম তো 'বিলাত-যাত্রীর পত্র।' ও-দুটি বই পড়লেই মনে হয়,

লেখক পাঠকের কাঁধে হাত রেখে কথা বলছেন—সে হাত অবশ্য কখনো-কখনো কাণে উঠেছে। সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-কথা বলেছেন, স্বামীজীর রচনা সম্বন্ধেও তা সত্য—সে কথাগুলি শোনবার ধৈর্য আছে?

ভদ্রলোক বললেন—অনেকক্ষণ ধৈর্যরক্ষা করে আছি।

আমি তাড়াতাড়ি রবীন্দ্রনাথের কথাগুলো শুনিয়ে দিলুম—

'যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয় ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সে লেখাগুলি কথা কহার অজস্র আনন্দবেগেই লিখিত—ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া। ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে; তাহার পরে সেই মুখে বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরও কম লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।'

ভদ্রলোক উঠবেন। জিজ্ঞাসা করলেন—স্বামীজীর রসিকতা সংগ্রহ করার বাসনা হল কেন?

—আপনাদের চমকে দেবার জন্য।

—বেশ, তারপর?

—আপনাদের হাসাবার জন্য!

—বেশ, তারপর?

—আসল কথাটা কি জানেন—স্বামীজীর কাছে হাজির হওয়া দরকার। না-হলে জীবনের ধন হারাবো। জীবন কত বিচিত্র ব্যাপক ও গভীর হতে পারে, ও-জীবন না জানলে তা বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর অগাধ ঐশ্বর্য যেন আমাদের সন্ত্রস্ত করে দূরে ঠেলে সরিয়ে দেয়। অথচ মানুষটি বড় সহজ। সর্বদা স্বমুখে থাকেন, কদাপি মুখোশে নয়। তাই তিনি রাজা-মহারাজা থেকে মুচি-মেথর, সর্ব সঙ্গে স্বচ্ছন্দ। এই জীবন্ত মানুষটিকে চেনা চাই। বিবেকানন্দ যদি জীবন্ত না হন, তিনি আর কিছু নন। যখন তিনি গাম্ভীর্যের মেঘ-তুষারের মধ্যে সমাহিত, তখন কার সাধ্য সেদিকে এগোয়। শিখরে হাসির ঝলক দেখলে তবে ভরসা হয়। তাই বিবেকানন্দের হাসির চেহারাটা দেখতে ও দেখাতে এত ইচ্ছা। বিবেকানন্দের হাসি—আমাদের জন্য বিবেকানন্দের উচ্ছল আহ্বান।

ভদ্রলোক হেসে চলে গেলেন।

ভদ্রলোকের প্রশংসা করতে হয়। শেষপর্যন্ত তিনি ধৈর্যরক্ষা করেছিলেন। যখন বিদায় নিলেন, তখনও কিন্তু আমার কথা শেষ হয় নি। পাঠককে তাই আর একটু ধৈর্যধারণ করতে হবে। আরও দু'চারটি কথা বলে নিই।

বিবেকানন্দের রসিকতার হিসেব নিতে গিয়ে মনে হয়েছে—এ এক অপূর্ব বিচিত্র

সংগ্রহশালা। হেন রসিকতা নেই যা তিনি করেন নি। ঠাট্টা-তামাশা, মজা-মশকরা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, হাসি-হুল্লোড়, গাল-গল্প, ফিচলেমি-ফাজলামি, স্ফূর্তি-ইয়ার্কি, আমোদ-কৌতুক, শ্লেষ-বিদ্রূপ, উপহাস-পরিহাস, রস-রহস্য—কী নেই সেখানে? ইংরেজি হাস্যরসের আওতায় যা-কিছু এসে যায়—উইট, স্যাটায়ার, আয়রনি, ফান, হিউমার—প্রায় সবই তাঁতে পাওয়া যায়। উইট বা বাকচাতুরীতে তিনি পারদর্শী; কথার পিঠে কথা বলতে, দ্রুত চোখা উত্তরে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে তাঁর তুল্য ক্ষমতা অল্পই দেখা যায়। কিন্তু উইটের তরবারি-ঝলক দেখানোর চেয়ে তাঁর বেশী আগ্রহ ছিল স্যাটায়ারের কোপ বসাতে—অনাচারের বুকে যা কেটে বসবে। কিন্তু আঘাত নয়, প্রেমই বিবেকানন্দের প্রধান অস্ত্র। মানুষের প্রতি তাঁর অসীম ভালবাসা। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ নির্মোহ দৃষ্টিতে জীবনের অসঙ্গতির রূপ দেখতেন, কঠিন হাসিতে তাঁর মুখ ভরে উঠত, কিন্তু অবিলম্বে সে হাসি কোমল হয়ে যেত, যখন এই মানব-প্রেমিক দেখতেন—ব্যক্তিজীবনের অসঙ্গতি আসলে সামগ্রিক মানবজীবনের অসঙ্গতির অংশ। তখন জন্ম নিত গভীর হিউমার। তখন যে হাসি হাসতেন, তার লক্ষ্য অন্যের মতো তিনিও। আত্মপরিহাসের উদারতা সর্বদাই তাঁর মধ্যে দেখা গেছে। কিন্তু কিছু পরেই তিনি সেই গভীর হাসির জগৎ ছেড়ে মজার হাসিতে ছটফট করতেন, যেহেতু আদি দুষ্ট বালকটি এই মহাপুরুষকে কখনো ত্যাগ করেনি।

হিউমারের কথায় ফিরে আসি। হাস্যরস-বিষয়ে ইংরেজি বাংলা গ্রন্থাদি পড়ে নানা তত্ত্বকথা আমরা শিখে ফেলেছি। হিউমার সম্বন্ধে কার্লাইল যা বলেছেন, বিবেকানন্দের হিউমার সম্বন্ধে তা বহুলাংশে সত্য—'ঘৃণা নয়, প্রেমই তার সারাৎসার; মস্তিষ্ক নয়, হৃদয় থেকে তার জন্ম।' 'তার সর্বাঙ্গে,' থ্যাকারের উক্তি অনুযায়ী বলা যায়, 'কোমলতা ও সহৃদয়তার সৌগন্ধ্য।' এবং অধ্যাপক পেরী হিউমার-লক্ষণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যা বলেছেন, তার মধ্যে বিবেকানন্দের হিউমারের প্রাণরূপ পেয়ে যাই। উক্ত অধ্যাপক বলতে চেয়েছেন: সমাজ-জীবনের নানা অদ্ভুত রূপের চিত্রণেই সেরা হাসি আসে না, তাকে পাওয়া যায় মানবজীবনের চূড়ান্ত অসঙ্গতির মধ্যে। যে-মানুষ 'আমি অমৃতের পুত্র'—এই দাবি করে, সে কিন্তু একই সঙ্গে একটি ক্ষয়িষ্ণু শরীরে বাঁধা। শীল, সত্য ও সুন্দরকে পাওয়ার জন্য সে তীর্থযাত্রা ক'রে থাকে—পাঁচটি অপরিণত ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে!! মানুষ যখন তার এই উদ্ভট অবস্থার রূপ দেখে, তখন সে হেসে ফেলে—হায়, ভাগ্য তাকে কি অদ্ভুত পরিস্থিতিতেই না স্থাপন করেছে!—তখনই সেরা হাসির জন্ম হয়।

ঐ হাসি বিবেকানন্দের মধ্যে আছে। আবার অধ্যাপক পেরী যার কথা বলেননি,

বা ভাবেন নি, সে হাসিও তাঁর মধ্যে আছে। হাস্যরসের ইউরোপীয় আলোচকদের ধারণায় ধার্মিক মানুষেরা পাপ-শয়তানের ভয়ে সর্বদা আড়ষ্ট। সুতরাং তাঁরা আবার হাসবেন কি? পাশ্চাত্ত্য-ধর্মে লীলাবাদের স্থান সংকুচিত। ওটা প্রধানতঃ প্রাচ্য, বিশেষভাবে ভারতীয় ব্যাপার। ইউরোপীয় রসতাত্ত্বিকেরা তাই প্রসন্ন উদার জীবনদৃষ্টির দৃষ্টান্ত সন্ধান করতে গিয়ে প্রায়শঃ সাহিত্যিকদেরই দ্বারস্থ হয়েছেন—ধর্মের মানুষদের বিশ্বমজা উপভোগের ব্যাপারটি তাঁদের বিবেচনার মধ্যে আসেনি। ভারতবর্ষে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের খেলার সম্পর্ক। ভক্ত, ঈশ্বরকে বালক করে তাঁর হাত ধরে খেলেছে, প্রেমিক করে নৃত্যালিঙ্গনে দুলেছে, জননী করে কোলে বসে হেসেছে। সে বলেছে—কী মজা! কী মজা—এই সৃষ্টি, যাকে প্রভু খেলার রসে ডুবিয়েছেন, লীলার রঙে রাঙিয়েছেন। 'মা তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি—হাসিব কি কাঁদিব তাই বসে ভাবতেছি!' মোহিত হয়ে ভক্ত বলেছে—'বিচিত্র এই ভবের খেলা, ভাঙো গড়ো দুটি বেলা—মা-গো—।'

এই শেষ? না। বিবেকানন্দ লীলাবাদী, অবশ্যই, কিন্তু মূলে অদ্বৈতবাদী! মায়ের কোলে বসে ছেলের হাসি তিনি হাসেন, আবার এক সময়ে দেখেন—জগতের ভাঙা-গড়াব খেলা কেবল তাঁব মা-ই খেলেছেন না, একই কাজ তিনি নিজেও করছেন। তখন নিজেব কীর্তিতে তাঁর হাসির সীমা থাকে না।

এই বিবেকানন্দকে যখন দেখি তখন বুঝতে পারি—বিবেকানন্দ আনন্দ-সমুদ্রের তরঙ্গমাত্র নন—তিনিই আনন্দসমুদ্র।

## 'আমরা আনন্দের অমৃতের সন্তান'

"স্বামীজী। আপনি এত হাসেন কেন? আপনি না আধ্যাত্মিক মানুষ।"

এই বিমর্ষ ধর্মীয় প্রশ্ন ও তিরস্কার শুনে স্বামীজী হাসিতে আরো উচ্ছল হয়ে উঠলেন।—আরে, আধ্যাত্মিক বলেই তো হাসি। আমরা তো পাপী নই—আমরা আনন্দের অমৃতের সন্তান।

স্বামী বিবেকানন্দের হাসি-খুশি ভারী চেহারার দিকে তাকিয়ে পাশ্চাত্ত্যদেশের অনেকের চোখে ও মনে একটা অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা জেগে থাকত—কোথায় এঁর সেই আধ্যাত্মিক মানুষের যোগ্য ছুঁচলো মুখ, কোথায় এঁর পাকানো শীর্ণ চেহারা? এতখানি সহাস্য মেদ !! স্বামীজী উত্তরে বললেন—'আধ্যাত্মিক মানুষেরা আনন্দে মোটা হয়—আমি মোটা মানুষ—সুতরাং আমি আধ্যাত্মিক মানুষ।' একথা বলবার সময়ে কৌতুকে ঝিকিয়ে উঠল তাঁর দুই চোখ।

দুটোই স্বামীজীর উত্তর। যখন তিনি বলেছেন—আমরা আনন্দের অমৃতের সন্তান—তখন সে উত্তর এসেছে সত্তার গভীর থেকে। আর যখন আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে স্থূলত্বের আবশ্যিক সম্পর্কের বিচিত্র লজিক উপস্থিত করেছেন—তখন সে কথাগুলির উৎস চতুর ও মধুর বুদ্ধি।

বিবেকানন্দ হাসছেন, বলছেন—তোমরা সবাই হাসো! আবার নিজে কেঁদে বলছেন—তোমরা কাঁদো—তোমরা জাগো—'জাগো মহাপ্রাণ! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে?'

"কাঁদতে ভয় পাও কেন—কাঁদো! কেঁদে-কেঁদে তবে চোখ সাফ হয়।...ক্ষীর ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলে, কে কবে বড় হয়েছে—কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছে?"

ব্রহ্ম যখন বিকশিত হয় তখন তা মানুষকে কাঁদায়।

সুতরাং মহিলাটি কাঁদছিলেন। এক সন্ধ্যায় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ শুনেছেন। সেদিন কথা বলতে-বলতে স্বামীজীর স্বর মৃদু থেকে মৃদুতর, মৃদুতম হয়ে এসেছিল—যেন এক অতি দূর অপরিচিত স্বর অজ্ঞাত বেদনার চেতনায় শ্রোতাদের অভিভূত ক'রে ফেলেছিল—বক্তৃতা-শেষে চলে যাবার আগে বক্তাকে বিদায়সম্ভাষণ জানাতেও তারা ভুলে গিয়েছিল—পাশের ঘরে গিয়ে কাঁদছিলেন অজ্ঞেয়বাদী

মহিলাটি, তাঁর বুদ্ধির পরাজয়ের লজ্জায়, তাঁর বোধির উদ্বোধনের যাতনায়—

"That man has given me eternal life. I never wish to hear him again."

—অনন্ত জীবনে তুলে দিয়েছে ঐ মানুষটি আমাকে; ও'র কথা আর আমি শুনতে চাই না।

ব্রহ্ম বিকশিত হলে মানুষ শুধু কাঁদে না, হাসেও।

লোকটি সিঁড়ি দিয়ে পাঁচিলের উপরে উঠছিল। যত উঠছে—কী যেন পাচ্ছে —পাঁচিলের ওপারে কী যেন আছে। অবশেষে পাঁচিলের উপরে উঠে পড়ল। এবার সে বলবে—ওপারে কি আছে—ওদিকেই তো সে দেখছে! হা-হা-হা-হা!—লোকটি দেখল—আর পৃথিবী-কাঁপানো হাসিতে ফেটে পড়ল—হা-হা-হা-হা—তারপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ওধারে।

এই গল্পটি শ্রীরামকৃষ্ণের।

পাঁচিলের ওপার থেকে খুব কম মানুষই উঠে আবার এপারে আসতে পারেন। যাঁরা পেরেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের একজন। বিবেকানন্দও তেমনি একজন। হাসির আগ্নেয়গিরির গহ্বর থেকে তাঁরা উঠে এসেছিলেন—সেই হাসির আগুন আলো হয়ে তাঁদের সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝরে পড়েছিল।

# খোলা মাঠের মানুষটি

বিবেকানন্দকে গোড়াতে ধরা যাক তাঁর খেলাস্থলে—কোনো রূপক-অর্থে নয়—একেবারে খাঁটি খোলা মাঠে।

গোড়াতেই একটা চমকপ্রদ ছবি—

ঝড় উঠেছে কালবৈশাখীর। কালো আকাশ ছিঁড়ে বজ্র-বিদ্যুতে মাতামাতি। পাক-খাওয়া পাগল জলের সঙ্গে হালের দাঁড়ের লড়াই। ছেলেটা হা-হা করে হাসছে, দাঁড়-ধরা হাতের পেশী ফুলে উঠছে আবেগে, ঘন চুলের রাশি এলোমেলো হয়ে উড়ছে বাতাসে, আকাশের বিদ্যুৎ নেমে জ্বলছে বিশাল চোখে, অন্য সকলে ভয়ে জড়োসড়ো, শুধু সেই ছেলেটির গলায় ঝড়ের গান।

বিশ্বনাথ দত্ত গম্ভীর হয়ে পুত্রকে বললেন, 'দক্ষিণেশ্বরে যাবার অন্য রাস্তাও আছে, ঝড়ের সময়ে নৌকায় না গেলেও চলে। রাম তো গাড়িভাড়া করেই যায়।'

পুত্র নরেন্দ্রনাথ চুপ ক'রে শুনে চলে এলেন। রাম দত্ত গাড়ি করে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস মশায়ের কাছে যায় ঠিকই—সেটাই রাম দত্তের পথ—কিন্তু আমার—

আহিরীটোলার ঘাটে আবার ঝড়ো সন্ধ্যার মুখে নরেন্দ্র দত্ত উঠে পড়লেন নৌকায়—পরমহংসের কাছে যাবেন। এমনই বহু ঝঞ্ঝা এড়িয়ে পরমহংসকে অধিকার করতে হবে তাঁকে। তা ছাড়া—ঐ অ্যাডভেঞ্চার। সিমলার ডানপিটে ছেলে নরেন্দ্র দত্ত যে-গান রচিত হয়নি তখনও, সে গান হয়ত গাইলেন অন্য ভাষায়—'আজি ঝড়ের রাতে আমার অভিসার।'

সিমলার ডানপিটে ছেলে নরেন্দ্রনাথ দত্ত। 'বন্ধুদের প্রাণ, সামাজিক সম্মেলনের মধ্যমণি, নিঃসন্দেহে প্রতিভা-ঝলকিত, প্রেরণাদিব্য বোহেমিয়ান'—বললেন বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। জীবনটা নরেন্দ্রনাথের কাছে সজীব গভীর কিছু—অনন্ত প্রশ্নে আকুল সমুদ্রবিশেষ—তাঁর হাসি, তাঁর খুশি, তাঁর খেলা, সে সকলই ঐ সাগরের রৌদ্রচুম্বিত উর্ধ্বতরঙ্গ।

আবার বলছি—স্বামী বিবেকানন্দের যে-মূর্তি আজ আমাদের সামনে ধরা আছে, তাতে কিন্তু মাঠের খেলার চিহ্ন নেই। যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষ তিনি—তিনিও খেলার মাঠে নেমেছিলেন, সে মাঠকে ছাড়েননি জীবনের শেষ অবধি—এ কথাগুলো তাঁর সম্বন্ধে বিস্ময়কর মনে হতে পারে অবশ্যই। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে কলকাতার সংবর্ধনাসভায় স্বামীজী বলেছিলেন—'আমি কলকাতারই ছেলে; এখানকার যে-ধুলোয় বসে খেলেছি আমি, তার উপর বসেই তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই—' স্বামীজীর সে কথাগুলিকে আমরা মনে করেছি সুন্দর ভাষণ, কিন্তু

গভীরভাবে বিশ্বাস করিনি। যাঁর দিকে তাকালে অপার বিস্ময় আসে, তিনিও আমাদের মতো খেলেছিলেন—ছিলেন লঘুতায়, চপলতায়!

বিস্ময়টা কেবল আমাদেরই নয়। বিবেকানন্দের বিদেশী জীবনীকার শ্রীমতী লুই বার্ক লিখেছেন—

"স্বামীজীর বক্তৃতারাজির কথা যখন আমরা স্মরণ করি—পাদরী-প্রভৃতিকে কি রকম কঠোর ধাক্কা তিনি দিতে পারেন, তা যখন মনে পড়ে—প্রচণ্ড বাধা ও ঈর্ষাতাড়িত বিরোধিতার মধ্য দিয়ে কী অদম্য তেজে ও রাজকীয় মহিমায় আমেরিকায় তিনি বিচরণ করেছেন, তা যখন চিন্তা করি—যখন ভাবি ধ্যানের নীরব অসীমে তিনি কিভাবে তলিয়ে যেতেন ক্ষণে-ক্ষণে—তখন ভুলে যাই, সকলেই ভুলে যায়—তিনি কত তরুণ ছিলেন—সমুদ্রে হাঁসের মতো ডুব দিতে বা প্রিয়পাত্রদের মধ্যে প্রাণ খুলে হাসতে তিনি কত ভালবাসতেন। তিরিশের কোঠার একেবারে তলার দিকে তাঁর বয়স ছিল বলেই যে তিনি এমন করতেন তা নয়, আরও কারণ, তিনি অসীমের সীমায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, যেখানে জগজ্জননীর নিত্য উৎসব। স্বামীজী গভীরভাবে নিত্যভাবে তরুণ।"

কাহিনীকে বল্গামুক্ত করলেই অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা যায়। প্রথমেই হাজির হন অশ্বারোহী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের প্রিয় সম্রাট আকবরের পা ঘোড়ায় চড়ে বেঁকে গিয়েছিল; আর এক প্রিয় দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান ঘোড়ার পিঠেই ঘুমোতেন। সুতরাং বিবেকানন্দকেও ঘোড়ায় চড়তে হয়েছে। কবে, কখন? আজীবন। টগ্‌বগিয়ে চলেছেন প্রথম থেকেই। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, বিলে, তুই বড় হয়ে হবি কি? বিলে সগর্বে জানাল, কোচোয়ান। শ্রীমান বীরেশ্বরের চোখে তখন রঙিন ছবি—বাড়ির কোচম্যান কোলে বসিয়ে তাকে বড় লোভনীয় গল্প বলেছে—

"দেখ বিলুবাবু, তোমায় ঘোড়ায় বসিয়ে এমন ঘোড়া চালিয়ে দেব যে, ঘোড়া ঐ ছাদের উপর গিয়ে উঠবে, হাওয়া দিয়ে চলে যাবে, আর টগ্‌বগ্ শব্দ করবে। আর পক্ষীরাজ যে ঘোড়া আছে, তাতে চড়লে মেঘের উপর পর্যন্ত যাওয়া যায়।"

বিলুবাবু অল্প বয়স থেকেই কল্পনা-সমৃদ্ধ। সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন নিয়ে তিনি মোটে ব্যস্ত ছিলেন না। সুতরাং ভবিষ্যতে 'পক্ষীরাজ ঘোড়া কিনবার' প্রতিজ্ঞা করতে তাঁর বাধেনি। বিলুবাবু যখন তাঁর পিতার কাছে পছন্দসই কেরিয়াররূপে কোচোয়ানিকেই নির্বাচন করলেন, তখন একথা না বললেও চলে, তিনি পক্ষীরাজের কোচোয়ানি করতেই চেয়েছিলেন।

পক্ষীরাজ না জুটুক, কয়েক বছরের মধ্যে একটা সাদা বর্মী-ঘোড়া তার বরাতে জুটে গেল। সেটাকে নিয়ে বালক নরেন্দ্র হই-হই ক'রে কলকাতার রাস্তায় ছুটছে, সেই দেবভোগ্য দৃশ্যের উল্লেখ সবিশেষ না পাওয়া গেলেও ( কিছু উল্লেখ মহেন্দ্রনাথ দত্তের রচনায় পাওয়া যায় ) ঐ বালক যখন বিশ্ববীর, তাঁর তখনকার সওয়ারী-ছবির কিছু বর্ণনা পেয়েছি একজন বিখ্যাত বাঙালীর কাছ থেকে, তাঁর নাম অশ্বিনীকুমার দত্ত।

১৮৯৭ সালের মে কি জুন মাস। অশ্বিনীকুমার আলমোড়ায় গিয়েছেন। এক-দিন পাচকের মুখে শুনলেন, 'এক অদ্ভুত বাঙালী সাধু এসেছে, যে ইংরেজী বলে, ঘোড়ায় চড়ে এবং রাজার মতো ঘুরে বেড়ায়।' সাধুটি অবশ্য কে, তা অশ্বিনীকুমার তখনই বুঝলেন, এবং 'সৈনিক সন্ন্যাসীর' সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে পথে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন।—স্বামী বিবেকানন্দ ? কে তিনি ? চিনি না তো।—ওহো! ঘোড়সওয়ার সাধু ? ঐ তো তিনি—ঘোড়ার পিঠে!

অশ্বিনীকুমার দেখলেন—দূরে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে উড্ডীন গৈরিক। একটি বাড়ির গেটে ঘোড়া থামল—এক ইউরোপীয় গেট খুলে ঘোড়ার মুখ ধরে বাড়ির সামনে নিয়ে গেলেন—সন্ন্যাসী নেমে পড়লেন।

কাব্যের মত শোনাচ্ছে কথাগুলো ? কিন্তু বাস্তবাধিক বাস্তব। অনেকগুলি চিঠিতে স্বামীজী পরিণত বয়সে তাঁর ঘোড়াচড়ার উল্লেখ করেছেন।—

"তুমি যদি আমাকে পার্বত্য হরিণের মতো পাহাড়ে লাফিয়ে বেড়াতে দেখতে, অথবা উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ে রাস্তায় চড়াই-উৎরাই করতে দেখতে, তা হলে খুবই আশ্চর্য হয়ে যেতে।" ( দার্জিলিঙ, ২৮ এপ্রিল ১৮৯৭ )।

"এখানে আমার নিত্যকর্ম—যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়াম করা, পাহাড়ে ওঠা, বহু দূর পর্যন্ত ঘোড়ায় দৌড়ান।...এর পর যখন দেখা হবে, দেখবে আমার চেহারা কুস্তিগীরের মতো"। (আলমোড়া, ৩ জুন )।

"ঘোড়া চড়াটা বেজায় রপ্ত হচ্ছে—কুড়ি ত্রিশ মাইল একনাগাড়ে দৌড়ে গিয়েও কিছুমাত্র বেদনা বা exhaustion হয় না।" ( আলমোড়া, ২০ জুন )।

আমেরিকা ও ইউরোপে কয়েক বছরের পরিশ্রম তাঁর 'বিশ বছরের আয়ু হরণ করে নিয়েছিল।' তারপরেই ভারতে পদার্পণমাত্রে গোটা দেশের আহ্বান ; কলম্বো থেকে কলকাতা পর্যন্ত রথে দাঁড়িয়ে বিজয়ী বীরের ঘোষণা : 'আমরা চাই জ্বালাময়ী বাণী, তারও চেয়ে জ্বালাময় কর্ম ; হে মহাপ্রাণ। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত!'—যখন একথা বলছেন তখন তাঁর নিজের দেহ ভিতরে জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে। তিনি তখনও হাসছেন আর বলছেন—'আর বড় জোর চার পাঁচ বছর আছি—I shall not live to see forty!'

আলমোড়ায় ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাঁচার আনন্দ কিভাবে ফিরে পেয়েছেন, তার কথা ডাক্তারকে জানাচ্ছেন—

"আমি সকাল বিকাল ঘোড়ায় চড়ে যথেষ্ট ব্যায়াম করতে শুরু করেছি, এবং তার ফলে সত্যই আমি অনেকটা ভাল বোধ করছি। ব্যায়াম শুরু করে প্রথম সপ্তাহে শরীর এতই ভাল বোধ করছিলাম যে, ছেলেবেলায় যখন কুস্তি করতাম, তারপর এমনটি আর কখনও বোধ করিনি। সত্যি মনে হচ্ছিল, শরীর থাকা একটা আনন্দের বিষয়। আগে শরীরের প্রতিটি কাজে শক্তির পরিচয় পেতাম, প্রত্যেক পেশীর নড়াচড়া আনন্দ দিত।...শক্তির পরীক্ষায় জি জি এবং নিরঞ্জন উভয়কেই মুহূর্তে ভূমিসাৎ করতে পারতাম।"

অসীম শক্তি ছিল তাঁর দেহে। 'চলায় ফেরায় বাঁচায় আনন্দ।' সে আনন্দ শুষে নিয়েছিল মানবতার প্রয়োজন। হিমালয়ে ফিরে গিয়ে বিবেকানন্দ আবার হৃতশক্তি ফিরে পেয়েছিলেন, জেগে উঠেছিল তাঁর নিত্য মূর্তি।—

"ডাক্তার, আমি যখন আজকাল তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গের সামনে ধ্যানে বসে আবৃত্তি করি—'ন তস্য রোগো ন জরা, ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য হি যোগাগ্নিময়ং শরীরম্'—তখন যদি তুমি আমাকে একবার দেখতে পেতে!" (২৯ মে)।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের যা প্রধান ত্রুটি—যে ত্রুটি সাইক্লোনের বা অ্যাভালেঞ্চের —তা অচিরে ফলপ্রসব করল। পঁচিশ-তিরিশ মাইল রোজ ঘোড়ায় চড়া সুস্থ শরীরের পক্ষেই মারাত্মক, আর তিনি তো সুস্থতা-প্রত্যাশী! শরীর অনিবার্যভাবে খারাপ হলই।—'আমার শরীর এই ঘোড়ার পিঠে রৌদ্রে উর্ধ্বশ্বাস দৌড়ের দরুন আজ একটু খারাপ আছে।' (১৩ জুলাই)। 'একটু খারাপ' রীতিমত খারাপ হয়ে উঠল। পরের বছর যখন আবার আলমোড়া যাবার কথা উঠল, তখন এই ঐশ্বরিক নাইট সভয়ে চিঠি লিখলেন, নাঃ, আর আলমোড়া নয়—'অশ্বারোহণের ফলে রোগের আক্রমণ হবে নিশ্চিত।' (১৮ এপ্রিল ১৮৯৮)।

কিন্তু একটা সহজ সমাধান কি নেই? ঘোড়ায় না উঠলেই তো হয়! হায়! আত্মা যেখানে ব্যস্ত সেখানে দেহের বাধা? এবং বিবেকানন্দ যে আত্মবান!! নিজেকে উন্মোচন করেছেন স্বামীজী—

"আমার শরীর দৃঢ়বদ্ধ বলে আমি যেমন শীঘ্র আরোগ্যলাভ করতে পারি, তেমনি আবার অতিরিক্ত শক্তি আমার দেহে রোগ আনয়ন করে। সর্ব বিষয়েই আমি চরম-পন্থী—এমনকি স্বাস্থ্য সম্পর্কেও তাই। হয় আমি লৌহদৃঢ় বৃষের মতো অসীম বল-শালী, নতুবা একেবারে ভগ্নদেহ—মৃত্যুসৈকতশায়ী।" (৩ জুন ১৮৯৭)।

সুতরাং স্বামীজী ঘোড়ায় চড়বেনই, শুধু নিজে চড়বেন তাই নয়, যারা চড়তে ভয় পায় তাদের জোর করে ঘোড়ায় পিঠে তুলে দিয়ে চাবকে দেবেন ঘোড়াটাকে, যখন

দেখবেন, কাতর আরোহীকে পিঠে নিয়ে ঘোড়া ছুটেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে, তখন ফেটে পড়বেন অট্টহাস্যে। ঘটনাটা বানানো নয়—স্বামী বিরজানন্দের এমন দুর্গতি তিনি ঘটিয়েছিলেন। তাঁদের দুর্গতি আর স্বামীজীর স্ফূর্তি—তারপরেই তৃপ্তিময় চিন্তা—আমার শিষ্যেরা বীর হবে।

ঘোড়ায় চড়া প্রসঙ্গেই স্বামীজী তাঁর একটি পূর্বতন খোলা মাঠের বীরত্বকাহিনীর উল্লেখ করেছিলেন এক পত্রে—

"আমি খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পাহাড়ী ঘোড়া ছুটিয়েই সন্তুষ্ট আছি। তোমার বাইসাইকেলের চেয়ে এটা নিশ্চয় বেশী উন্মাদনাপূর্ণ! অবশ্য উইম্বলডনে আমার সে অভিজ্ঞতাও হয়ে গেছে। এখানে মাইলের পর মাইল চড়াই, মাইলের পর মাইল উৎরাই, রাস্তাটা কয়েক ফুট মাত্র চওড়া, খাড়া পাহাড়ের গায়ে যেন ঝুলে আছে, আর বহু সহস্র ফুট নীচে খাদ।"

হিমালয়ের ভয়াবহ পথে ঘোড়া ছোটানো হয়ত উইম্বলডনে সাইকেল চড়ার অভিজ্ঞতার চেয়ে 'কিছু বেশী উন্মাদনাপূর্ণ', কিন্তু সাইকেল ব্যাপারটাও 'খুব কম উন্মাদনাপূর্ণ' নিশ্চয় ছিল না। স্বামীজীর এক সাইকেল-অ্যাডভেঞ্চারের বিবরণ দিয়েছেন তাঁর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি তখন ইংলণ্ডেই ছিলেন।—

"একদিন স্বামীজী খুব প্রফুল্ল; বেলা ১২টার সময় বলিলেন, 'চ, সকলে মিলে সুমুখের মাঠে গিয়ে বাইক চড়ি।' মিস্ মূলারের আর্থার নামে একটা মালী ছিল। সে মিস্ মূলারের গ্রীন হাউস থেকে একটা বাইক মাঠে পৌঁছিয়া দিয়া আসিল। সারদানন্দ-স্বামী বাইকটি ধরিলেন, আর স্বামীজী বর্তমান লেখকের কাঁধে হাত দিয়া বাইকে উঠিয়া বসিলেন। অনভ্যস্ত, সেইজন্য দুইজনে দুই দিক থেকে বাইকটি সামলাইতে লাগিলাম। তারপর স্বামীজী সারদানন্দ-স্বামীকে বলিলেন, 'তুই চড়্, শেখ্ না, দিনকতক চেষ্টা করলে অভ্যাস হয়ে যাবে।' সারদানন্দ-স্বামী অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাতিরে বাইকের উপর একবার চড়িয়া বসিলেন। মোটা মানুষ, বড় ভয় করিতে লাগিল, সেইজন্য দুইজনে দু'পাশ থেকে তাঁহাকে আটকাইতে লাগিলাম। আর্থার মালী-ছোঁড়া একটু দূরে বেড়াতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিয়া খুব হাসিতেছিল। স্বামীজী মালী-ছোঁড়াকে হাসিতে দেখিয়া কৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ওরে, আমাদের চড়া দেখে মালী-ছোঁড়া হাস্ করছে। আরে হাস্ করছিস্ ক্যান?'…সারদানন্দ-স্বামী একটু পরে নামিয়া পড়িলেন। স্বামীজী আবার বাইকে উঠিলেন। সেদিন মনটা খুব প্রফুল্ল ছিল, মৃদু স্বরে বাংলায় গান গাহিতে লাগিলেন—'সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে। ভাসল তরী সকাল-বেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা, মধুর বহিবে সমীর, ভেসে যাব রঙ্গে।'"

অত্যন্ত মধুর একটি ছবি, পরম অন্তরঙ্গ। কিন্তু ছবিটা দেখার পক্ষে এমন নিরাপদ

থাকে না যদি মধুর সমীরে ঐ ভেসে যাওয়াটা নদীতে না হয়ে শূন্যে হয়। শূন্যে? হ্যাঁ, শূন্যে। স্বামীজী বিমানের যুগের মানুষ নন, কিন্তু তখন বেলুনে ওড়া আরম্ভ হয়ে গেছে। স্বামীজী ইউরোপে আছেন। তাঁর বেলুনে চড়ার বাসনা হল। বাল্যের পক্ষীরাজের শখটা একেবারে যায়নি। তা ছাড়া আকাশ তাঁর স্বস্থান। সুতরাং কাহিনী এই—

"স্বামীজী লণ্ডন হইতে যাত্রা করিয়া জেনেভা নগরীতে উপনীত হইলেন। তখন জেনেভা নগরীতে একটি শিল্পপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছিল। স্বামীজী সুইজারল্যাণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। উৎসাহভরে সমস্ত দিবস প্রদর্শিত দ্রব্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে একটি বেলুন দেখিয়া তিনি বেলুনে উঠিবার জন্য অধীরভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সূর্যাস্তের পূর্বে বেলুন উড়িবে না শুনিয়া স্বামীজী বালকের ন্যায় অধীরভাবে সঙ্গিগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এখনও কি সময় হয় নাই? মিসেস সেভিয়ার আকাশ-ভ্রমণটা নিরাপদ নয় মনে করিয়া আপত্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাঁহার কোনো প্রকার আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না, বরং তাঁহাকে পর্যন্ত বেলুনে উঠিতে বাধ্য করিলেন। সেদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। ঊর্ধ্ব হইতে সূর্যাস্তের মনোহর শোভা দর্শন করিয়া স্বামীজী অতীব আনন্দিত হইলেন। বেলুন হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহারা সকলে ফটো তুলিয়া প্রফুল্লচিত্তে হোটেলে প্রত্যাগমন করিলেন।"

স্বামীজী অবশ্যই দাবি করতে পারেন, তিনিই প্রথম ভারতীয় সন্ন্যাসী যিনি যোগবলে নয়, বেলুন-বলে আকাশবিহার করেছিলেন।

দেখা যাচ্ছে, সর্বাত্মক খেলোয়াড় বলতে যা বোঝায় স্বামীজী তাই ছিলেন। খেলার ব্যাপারে পঞ্চভূতের কাউকেই বাদ দেননি—সব কটি ভূতের উপরই নৃত্য করেছেন। ক্ষিতির উপর তাঁর সর্বাধিক অত্যাচার; অপ্ অর্থাৎ জলে তাঁর বিপুল আনন্দ; মরুৎ ও ব্যোমের ব্যাপারটা বেলুনে চড়ে সেরেছেন; (ছোট বয়সের ঘুড়ি-ওড়ানো হিসাব থেকে বাদ যায় কেন?), আর তেজ বা আগুন? তাঁর গোটা জীবনটাই তো আগুন নিয়ে খেলা।

জলক্রীড়ার কথা বোধহয় বেশী বলা হয়নি; শুধু বলেছি ঝড়ের খেয়ায় দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার কথা। বলে নেওয়া ভাল, তিনি রীতিমতো ভাল সাঁতার জানতেন, শুধু বাংলার পুকুরে-নদীতেই সাঁতার কাটেননি, সমুদ্রেও কেটেছিলেন, যে-সমুদ্রলঙ্ঘনের পাপ তাঁর অনেক ধর্মপ্রাণ দেশবাসী কখনো ক্ষমা করতে পারেননি।

আলঙ্কারিক সমুদ্রসন্তরণের কথা বাদ দিয়ে বাস্তব সমুদ্রস্নানের কথায় যখন আসি, দেখি যে, কোরা স্টকহ্যাম তাঁর জন্য স্নানের পোষাক তৈরী করে দিয়েছেন এবং তিনি 'ঠিক হাঁসের মতো জলে নেমে স্নান করে মজা' করছেন, যে-ব্যাপারটা 'জলকাদার জীবদের পক্ষেও পরম উপাদেয় ঠেকবে।' (জুলাই ১৮৯৪—পত্র)।

দরিয়ায় ডোবা চমৎকার ব্যাপার, দরিয়ায় ভাসাই বা কি কম ? স্বামীজী যে-রকম অনুরাগের সঙ্গে ইয়াট-নৌকার বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি ঐ সাধের তরণীতে পাল তোলেননি, বিশ্বাস হয় না।—'এ দেশে গরমীর দিনে সকলে দরিয়ার কিনারায় যায় —আমিও গিয়েছিলাম, অবশ্য পরের স্কন্ধে। এদের নৌকা আর জাহাজ চালাবার বড়ই বাতিক। ইয়াট বলে ছোট-ছোট জাহাজ ছেলে বুড়ো যাব পয়সা আছে তারই একটা আছে। তাইতে পাল তুলে দরিয়ায় যায় আর ঘুরে আসে, খায়-দায় নাচে-কোঁদে—গান-বাজনা তো দিবারাত্র।' (২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪)।

নৌকা চড়ার স্ফূর্তি স্বামীজী ছেড়ে দিতে পারেন না। সে সম্বন্ধে একটি আমেরিকান বালকের স্মৃতিকথা ঃ "আ-হা! স্বামীজী ? তাঁকে খুব মনে পড়ে।... তিনি একদিন নৌকা বাইছিলেন, একবার এমন দাঁড় ফসকালেন, নৌকা উল্টে যায় আর কি! কিন্তু জাত খেলোয়াড়, মাথায় চোট লাগল, তবু কি মজার হাসি!"

শেষ পর্যন্ত স্বামীজীকে ডুবতে হয়েছিলই। তেমন এক নৌকাডুবির প্রসঙ্গে বীরের মতো ভগিনী ইসাবেলা ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে লিখেছেন—'কিছু চমৎকার নৌকাভ্রমণ হয়েছে—এক সন্ধ্যায় নৌকা উল্টে জামাকাপড-সুদ্ধ ডুব।' (২০ আগস্ট, ১৮৯৪)।

নৌ-প্রসঙ্গ এখনও অসমাপ্ত। জাতীয় তরণীর কর্ণধার যাঁকে হতে হবে, তাঁর পক্ষে নৌকাডুবির কাঁচা গল্পে থেমে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং এক বছর পরে এক পত্রে লিখছেন—

"পার্সিতে রীতিমত নৌকা চালানো গেছে। নৌ-চালনের দু-চারটে জিনিস শিখে নিয়েছি।" (৮ জুলাই ১৮৯৫)।

আমার বিশ্বাস, এত সব লেখার পরেও স্বামী বিবেকানন্দ বাঙালীর কাছে খুব জনপ্রিয় ক্রীড়াতারকা হবেন না। ফুটবল না খেলে বাঙালীকে খেলার মাঠে জয় করা যায় না। ইদানীং তার সঙ্গে জুটেছে ক্রিকেট। স্বামীজী ফুটবল খেলেছেন এমন কোনো তথ্য আমি পাইনি। কিন্তু খেলেননি, এ তথ্যও যখন পাচ্ছি না, তখন খেলেছিলেন বিশ্বাস করা ভাল, বিশেষতঃ যখন তাঁর বাণীই তাঁর জীবন। ফুটবলের পক্ষে সবচেয়ে বড় স্লোগান বিবেকানন্দই দিয়েছেন। স্বাধীনতাপূর্বকালে কোন্ দেশপ্রেমিক বাঙালী না স্বামীজীর এই ফুটবল-সমর্থনবাক্য উচ্চারণ করে উদ্দীপ্ত হয়েছেন—'গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের অধিকতর নিকটবর্তী

হইবে।' কথাটা মুখে-মুখে ফিরত মন্ত্রের মতো। বিশেষ করে কথাটা তাঁরা বলতেন, যাঁরা মাঠের ফুটবলের চেয়ে জীবনের ফুটবলে বেশী বিশ্বাস করতেন ; যেমন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। ঐ কথাটার কথা যখন ভাবি, চমকে শিউরে উঠি স্বামীজীর ধর্মদ্রোহী দুঃসাহসে। বিবেকানন্দ হিন্দুসন্ন্যাসী, গীতা হিন্দুর বাইবেল—তাকে ফুটবলের নীচে ফেলা কি ধর্মের লাইবেল নয়? অথচ ঐ কথার জন্য কোনো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি। বিবেকানন্দের চরিত্রের মহিমা এখানে—তিনি মানুষকে ধরিয়ে দিতে পারতেন কোন্ অর্থে তিনি কী বলছেন। যারা পানাপুকুরে স্নান ক'রে, প্রাতঃকালে গীতাপাঠ ক'রে বাকি সময় নিষ্কাম নিদ্রায় ডুবে থাকে, তাদের জাগাতে গেলে প্রাভাতিক গীতার নামতা ছাড়িয়ে মাঠের সংঘর্ষে নামিয়ে দেওয়া দরকার, তবেই তারা গীতার যথার্থ অর্থ বুঝবে—স্বামীজী তা জানতেন। বিবেকানন্দ গীতা-পুরুত ছিলেন না—ছিলেন গীতামূর্তি। বিবেকানন্দের ঐ উগ্র আঘাত থেকে একদিকে সত্যকার গীতার সন্তান এসেছে, অন্যদিকে এসেছে ফুটবলের নিষ্কাম কর্মীরা। ১৯১১ সালের বিজয়ী মোহনবাগান দল ফুটবল খেলে দেশকে যে স্বর্গের দিকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল, তা কে না জানে?

ফুটবলে পদাঘাত যদি নাও করেন (?), স্বামীজী ক্রিকেট বলে-ব্যাটাঘাত যে করেছেন, তা তাঁর জীবনীতেই পাওয়া যায়। অদ্বৈত আশ্রমের সুবিখ্যাত ইংরেজী জীবনীতে স্বামীজীর ক্রিকেট খেলার উল্লেখ মিলবে। এ বিষয়ে আরও কিছু তথ্য দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত। আর বলাই বাহুল্য, দেশে ক্রিকেট থাকলে বিবেকানন্দ ক্রিকেট না খেলে পারেন না। কারণ ক্রিকেট সেই খেলা যাতে উঁচু হয়ে আছে ব্যাটের রাজদণ্ড, যার থেকে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে লাল বলের বল্লাল কৌলীন্য। আনন্দবাজার পত্রিকায় একদা একটি চিত্তাকর্ষক বিতর্ক হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথ কি ক্রিকেট খেলতেন? প্রায় প্রমাণিত হয়ে গেছে, রবীন্দ্রনাথ ক্রিকেট খেলেছেন। বিস্ময়ে কৌতুকে সকলে ভেবেছে, তাহলে কবিগুরুও ধরা দিয়েছিলেন। এবং এমন কি, অন্য কেউ নন, মহাত্মাজীও ক্রিকেট খেলেছেন। এঁদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ক্রিকেটের সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু বিবেকানন্দের? ক্রিকেট রাজার খেলা, আর বিবেকানন্দকে সবাই মনে করত মহারাজা। তাঁর প্রথম বয়সের ক্রিকেট খেলার বিবরণ এই রকম—

"এখন যাহাকে ক্রিকেট খেলা বলা হয়, তখন ব্যাটবল, চলিত কথায় ব্যাটম্বল। ...এই ব্যাটম্বল খেলা বেশ চারিদিকে নজর রাখিয়া সতর্ক হইয়া খেলিতে হইত। মোটামুটি বেশ খেলা। বীরেশ্বরের এই খেলাতে বেশ উৎসাহ ছিল। সে বল ঠিক মারিত। বীরেশ্বর ব্যাটম্বল বেশ ভালরকম খেলিতে পারিত। পাড়ার অনেক ছেলে বাহিরের উঠানে জড়ো হইত এবং বৈকালে ব্যাটম্বল খেলা খুব চলিত।

বীরেশ্বর এই খেলার সর্দার বা মোড়ল হইয়া সব হুকুম-হাকাম করিত। বাল্যকালে বেশ দেখা যাইত যে, সর্দারগিরির জন্যই যেন বালকটি জন্মিয়াছে। বীরেশ্বর বা বিলে হুকুম করিবে আর সকল ছেলে শুনিবে। ঝগড়া হইলে বীরেশ্বর মিটাইয়া দিবে। অপর কেহ হইলে ঝগড়া বাড়িয়া যাইত। এইজন্য বীরেশ্বর যতক্ষণ খেলায় না নামিত খেলা জমিত না।"

দুঃখের বিষয়, খুব বেশী কিছু তথ্য পাচ্ছি না। শোনা যায়, তিনি নাকি কলকাতার টাউন ক্লাবে ক্রিকেট খেলতেন। আরও কিছু সংবাদ পেলেই আমি গোটা ক্রিকেট-সাহিত্য তাঁর উপর উজাড় করে দিতে পারতাম। বিবেকানন্দ ক্রিকেট খেলছেন—ছবিটা মনে আনা যাক—তা কি হ্যামণ্ডের মতো ? নিতে হলে হ্যামণ্ডের মর্যাদার ভাবটাই শুধু নিতে হয়, নচেৎ বিবেকানন্দ আরও ডায়ন্যামিক। ও বস্তুটা নেওয়া যাক ব্রাডম্যানের কাছ থেকে। তবে ঐ গতিশীলতা পর্যন্তই, নইলে ব্রাডম্যানের সুদীর্ঘ যান্ত্রিকতা বিবেকানন্দের পছন্দসই হবে না। খেলোয়াড়রূপে বিবেকানন্দের মধ্যে কিছু চতুর দুষ্টুমিও ছিল। এক্ষেত্রে ডবলিউ জি-র স্থূলতা বাদ দিয়ে এবং দুষ্টুমিটা আহরণ করেও ক্রিকেটার বিবেকানন্দ অসম্পূর্ণ—বিবেকানন্দের সুগভীর রহস্য ? সেখানে আসেন ভারতীয় রনজি। এই সকলকে জড়িয়ে একজন ক্রিকেটার-বিবেকানন্দ তৈরি হতে পারেন হয়তো, কিন্তু হায়, ভারতীয় লেখকেরা বিবেকানন্দের জীবৎকালে তাঁকে শুধু রনজির সঙ্গে তুলনা করেই ক্ষান্ত ছিলেন।

১৮৯৫-৯৬ সালে স্বামীজী লণ্ডনে ছিলেন। লণ্ডনের ইতিহাসে সেটি নাকি ভারতীয় বছর। এ-বিষয়ে 'লণ্ডন হিন্দু অ্যাসোসিয়েশনের' সম্পাদক টি জে দেশাই লিখেছেন—

"স্বামীজী ইংরেজ-সমাজকে যখন তাঁর বাগ্মিতার দ্বারা মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন, সেই সময়ে, আমি যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, প্রকাশ্যে ঘোষিত হয়েছিল—রণজিৎ সিংজী অস্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ইংলণ্ডের সম্মানরক্ষা করেছেন। তিনি ১৫৪ রান করেও নটআউট! পরদিন লণ্ডন টাইমস পত্রিকায় 'ইংলণ্ডে ভারতীয়গণের কীর্তি' বিষয়ে একটি বৃহৎ মুখ্য-সম্পাদকীয় রচনা বেরুল। মিঃ ( অতুল ) চ্যাটার্জি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন এবং রণজিৎ সিংজী প্রথম হয়েছেন ক্রিকেট-অ্যাভারেজে।"

একটি জিনিস খুব ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি আমরা—স্বামীজী লণ্ডনে ছিলেন অথচ ক্রিকেট খেলা দেখতে যাননি, যদিও তাঁর 'বিশ্বস্ত' অনুচর গুডউইন সারদানন্দ-স্বামীকে জোর করে ক্রিকেট-মাঠে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিচিত্র বছর। ইংলণ্ডের ক্রিকেট-মাঠে ভারতীয় যাদু, আর ইংলণ্ডের পার্লারে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় যোগী। ব্যাপারটা বিখ্যাত ব্যারিস্টার, শিক্ষাবিদ, লেখক ও সম্পাদক এন এন ঘোষকে এমনই

উদ্দীপ্ত করে তুলল যে, তিনি ২৪শে আগস্ট, ১৮৯৫, তাঁর 'ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রিকার সম্পাদকীয় টীকায় লিখলেন—

"এখন ইংলণ্ডে অবস্থিত ভারতীয়গণের মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টি-আকর্ষণকারী মানুষ দুইজন—স্বামী বিবেকানন্দ ও মিঃ কে এস রণজিৎ সিংজী। এক বিশেষ অর্থে তাঁরা চরম দুই জিনিসের প্রতিভূ। কিন্তু একই সঙ্গে সে চরমতা গুণোৎকর্ষের। বিবেকানন্দ আত্মার উর্ধ্বাকাশে উড্ডীয়মান; আর মিঃ রণজিৎ সিংজী এক ধরনের শারীরিক কৌশলের নিখুঁত রূপকার। নিজের জগতে স্বামীজী অনন্য, মৌলিক এবং জ্যোতির্ময়। আকার-মহিমা, বাণী-মহিমা এবং আত্মার চৌম্বকশক্তির দ্বারা ইংলণ্ডের বহুসংখ্যক নরনারীকে তিনি প্রভাবিত করেছেন। হিন্দুধর্মকে তিনি যে কেবল স্থূল পাথুরে পৌত্তলিকতার দুর্নাম থেকে রক্ষা করেছেন তাই নয়—তাকে এমন শিখরে ও আলোকে স্থাপন করেছেন যা মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করে পারেনি। অপরদিকে তরুণ রাজপুত রাজকুমার নিজক্ষেত্রে সগৌরবে প্রথম স্থানাধিকারী;—মেকলে যেকথা বলেছেন—জীবনীকার হিসাবে বসওয়েল অপর সকলের থেকে বহু ব্যবধানে অবস্থিত—তেমনি ইনিও। যে-ইংলণ্ড ক্রিকেট-নৈপুণ্যের জন্য বিখ্যাত, সেখানে ইনি শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসাবে স্বীকৃত। ক্রিকেট ছাড়া অন্য অনেক খেলাতেও এঁকে পরাভূত করার মতো খেলোয়াড় কম আছেন। এইভাবে ইনি দেশবাসীর উপরে বিরল উজ্জ্বল আলোকপাত করেছেন, কারণ তিনি সেইরকম নৈপুণ্য দেখিয়েছেন ইংরেজরা যার অতি উচ্চমূল্য দেয়, এবং তিনি এমন গুণপনা দেখিয়েছেন যার জন্য তারা ঈর্ষাকাতর না হয়ে পারে না।"

বিবেকানন্দ প্রায় সর্বপ্রকার খেলাই খেলেছেন, এমনকি গলফ্ পর্যন্ত—হ্যাঁ, নিতান্ত বিদেশী গলফ্ও।—'এখানে একদিন গলফ্ খেলার চেষ্টা করেছি। খেলাটা আমার কাছে খুব কঠিন মনে হল না—শুধু কিছু অভ্যাস চাই'—১৮৯৯ নভেম্বর মাসে স্বামীজী তাঁর শেষ আমেরিকা-ভ্রমণের সময়ে লিখেছিলেন। চিঠিটা লেখেন 'স্নেহের বোন' মেরী হেলকে, যে মেরী হেলকে বা হেলপরিবারকে বিবেকানন্দের বহু খেয়ালের ঝঞ্ঝাট অবিরত পোয়াতে হত। যেমন, বরফের উপর স্কেটিং দেখে এই সদানন্দ বালকের বাসনা হল, স্কেটিং শিখবেন, কিন্তু কিছু প্র্যাকটিস তো চাই—আর হেলদের দামী কার্পেট-পাতা সদরঘরের চেয়ে ভাল অনুশীলনক্ষেত্র কোথায় পাওয়া যাবে? সুতরাং কার্পেট ছিঁড়ে আসবাবপত্র ভেঙে শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্কেটিং অভ্যাস করতে থাকেন।

গলফ্ খেলার মজাটা আর একটু জেনে নেওয়া যায়। স্বামী বিজয়ানন্দ মিস ম্যাকলাউডের কিছু স্মৃতিকথা এই প্রসঙ্গে আমাকে শুনিয়েছিলেন।—

স্বামীজী তখন আমেরিকায় মিঃ লেগেটের বাড়িতে আছেন। লেগেট ধনী ব্যক্তি। তাঁর নিজস্ব একটি গলফ্-কোর্স আছে। মাঝারি আকারের, নয় গর্তের

কোর্স, পরিপাটি সুন্দর। লেগেটের আমন্ত্রণে অনেক বড়-বড় খেলোয়াড় সেখানে খেলে যান।

স্বামীজী একদিন গলফ্-মাঠটিতে বেড়াচ্ছেন, সঙ্গে আছে বালক হলিস্টার (মিসেস লেগেটের প্রথম পক্ষের পুত্র)। স্বামীজী বেড়াতে-বেড়াতে হলিস্টারকে শুধোলেন—আচ্ছা ওখানে পত্‌পত্‌ করছে—ওটা কি? ঐ যে পোঁতা আছে?

হল সুযোগ পেয়ে গেল। স্বামীজীকে এবার জ্ঞানদান করা যাবে। গলফ্ খেলা ব্যাপারটি কি, যৎপরোনাস্তি বোঝাল। মোটমাট জানা গেল, ক্লাব অর্থাৎ গল্‌ফের লাঠি দিয়ে মেরে বলকে গর্তে ফেলতে হয়। গর্তে বল পড়লে পয়েন্ট লাভ। গর্তের কাছে একটা পতাকা পোঁতা থাকে।

হল উৎসাহে ছুটে গিয়ে একটা ক্লাব জোগাড় করে এনে আরও জ্ঞানদান করতে লাগল।

স্বামীজী ক্লাবটি হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কত মারে গর্তে বল পডতে পারে তোমার মনে হয়?

হল—সাত-আট বার তো লাগে।

স্বামীজী—মাস্টার হল, আমি কিন্তু এক মারে গর্তে বল ফেলতে পারি।

হল—এক মারে? হুঁ, এক মারে! বললেই হল?

স্বামীজী—বাজি ধরবে? আমি এক মারেই ফেলব।

হল—হি হি হি। হুঁ, উনি আনাড়ি, উনি এক মারে পারবেন! তাহলেই হয়েছে—

স্বামীজী—অত কথা কি বাপু—বাজি রাখো। পকেটে কত আছে?

হল—এক্‌খুনি। (শ্রীমান হলের বিশেষ সম্পদ একটি হাফ ডলার, সেটি পকেট থেকে বের ক'রে—) এই বাজি রাখলাম।

স্বামীজী পকেট থেকে এক ডলার বের করে বললেন—আমার এই বাজি।

এই সময়ে মিঃ লেগেটের অকুস্থলে প্রবেশ। দুজনকে পরামর্শ করতে দেখে তিনি হেসে এগিয়ে এলেন।

মিঃ লেগেট—কি ব্যাপার?

স্বামীজী—ব্যাপার আমার ও হলের মধ্যে।

মিঃ লেগেট—প্রাচ্য ঋষি ও আমেরিকান বালকের মধ্যে কোন্ গুরুতর ব্যাপার ঘটছে জানতে পারি কি?

স্বামীজী (সহাস্যে)—আমি হলের কাছ থেকে হাফ ডলার হরণ করার ইচ্ছা করেছি।

হল (লাফ মেরে, তালি দিয়ে)—স্বামীজী হেরে যাবেন! স্বামীজী হেরে যাবেন!

মিঃ লেগেট (সবিস্ময়ে)—তার মানে বাজি। বাজিটা কি নিয়ে?

স্বামীজী—জানতে গেলে আপনাকেও বাজির পয়সা বের করতে হবে। আমি হলকে বলেছি, এক মারে ঐ গর্তে বলটা ফেলব।

মিঃ লেগেট—অসম্ভব স্বামীজী, অসম্ভব। খুব পাকা খেলেয়াড়দের এখানে আমি নেমন্তন্ন করে আনি। তারাও চার মারের কমে ও-কাজ পারে না। আপনি চাইছেন এক মারে ফেলতে! হিপ্‌নটিজম্‌, মেসমেরিজমের খেলা নাকি?

স্বামীজী (হেসে)—অত কথার দরকার কি, আপনার বাজি কত বলুন?

মিঃ লেগেট (মনিব্যাগ বার করে)—এই দশ ডলার আমার বাজি।

স্বামীজী—বাহবা! আপনার দশ ডলার, আর হলের হাফ ডলার—আমারই হচ্ছে—

মিঃ লেগেট—দেখা যাক।

স্বামীজী এবার ক্লাবটি হাতে নিয়ে স্থির চোখে খানিকক্ষণ পতাকাটির দিকে তাকালেন। তারপর বললেন—হল, তুমি গর্তটার কাছে গিয়ে দাঁড়াও। আমি যখন বলব তখন তুমি গর্তটা দেখিয়ে দিয়ে সেখান থেকে সরে যাবে। আমাব বল শূন্য পথে ওখানে গিয়ে পড়বে।

মিঃ লেগেট খুব আমোদেব সঙ্গে লক্ষ্য কবতে লাগলেন।

হল গর্তের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। স্বামীজী কোটের হাতা গুটিয়ে নিলেন। এক-দৃষ্টে গর্তের দিকে তাকালেন—গলফ্‌-ক্লাব দোলালেন কয়েকবার—হলকে বললেন—এবার ঠিক কবে দেখিয়ে দাও গর্তটা কোথায়—

হল গর্ত দেখালো। স্বামীজী বললেন—সরে যাও। হল সরে গেল। তারপর—

স্বামীজী আবাব ক্লাবটি দোলালেন—বলে আঘাত করলেন—বলটি তীব্রবেগে অর্ধচন্দ্রাকারে শূন্য দিয়ে ছুটে চলল—এবং ঠিক গর্তে গিয়ে পড়ল !!!

হায় হায় করে উঠল হল। হাউমাউ করে বলল—আমার হাফ ডলার! আমার হাফ ডলার!

হতভম্ব মিঃ লেগেট বিডবিড করে বললেন—ভারতীয় যোগীর অলৌকিক খেলা।

স্বামীজী হেসে বললেন—আরে না না! যৌগিক শক্তি এসব তুচ্ছ ব্যাপারে খরচ করি না। কি কবেছি দু' কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমি চোখ দিয়ে দূরত্বটা মেপে নিলাম; আমার হাতের পেশীর শক্তি কতখানি, তা সঠিক আমার জানা আছে। এখন মনকে বললাম, ঐ সাড়ে দশ ডলার সম্পদটি আমার চাই। আমার ইচ্ছা মন থেকে পেশীতে গেল—হাত চালালাম—এবং যা চাইছিলাম পেয়ে গেলাম।

অপূর্ব মানুষ—তাঁর মজাও থামে না, হাসিও থামে না। গুরুভাইদের সঙ্গে কম্বলের চার খুঁট ধরে অখণ্ডানন্দকে লোফালুফি করছেন—পরিব্রাজককালে দুই হাতের মধ্য দিয়ে শরীর গলানোর খেলা দেখিয়ে খুশি করছেন এক বালককে—তিন স্থূলোদর

সন্ন্যাসী মিলে ওয়ালট্‌জ্‌ নাচের মহড়া নিচ্ছেন বেলুড়ে—একই মজা, একই হাসি। নৃত্যানন্দের এই নিত্যানন্দ জানাচ্ছেন—

"ভাল কথা, আমরা এখানে আবার নাচের ব্যাপার আরম্ভ করেছি। হরি, সারদা [-প্রসন্ন] ও আমাকে ওয়ালট্‌জ্‌ নৃত্য করতে দেখলে তুমি আনন্দে ভরপুর হয়ে যেতে। আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই যে, আমরা কিরূপে টাল সামলে রাখি।" (২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮)।

আমরা জেনেছি—বিবেকানন্দের এ খেলা শুরু হয়েছিল জন্ম থেকেই। তাঁর দুরন্তপনায় সবাই অস্থির। দুষ্টের শিরোমণি। ক্লাসে কোনোদিন নাকি সম্পূর্ণ বসেন নি—আধ-বসা আধ-দাঁড়ানো অবস্থায় কাটত। নিজের মাথা ফাটিয়ে, বিপুল রক্তপাত ঘটিয়ে, উৎসাহের মূল্য দিয়েছেন। তাঁর কপালের কাটা দাগ—ক্রীড়াচিহ্ন-অলঙ্কার। মার্বেল, লাটিম, ঘুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, লুকোচুরি, চোর-পুলিশ, কপাটি—শুধু খেলেছেন নয়, খেলায় সর্দারি করেছেন। গান, অভিনয়, নাচ, চিত্রাঙ্কন—তার সঙ্গে যন্ত্রপাতি নিয়ে বিজ্ঞান-খেলা।

দুটি যুবক—নরেন্দ্রনাথ ও রাখালচন্দ্র—একদা মধ্যরাত্রে হঠাৎ বাজি ফেলে বসলেন—কেন?—ঘটনাটা শোনা যাক মহেন্দ্রনাথের মুখে—

"১৮৮৪ বা ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ, গ্রীষ্মকাল, আমাদের পড়িবার ঘরে নরেন্দ্রনাথ ও রাখাল রাত্রে পাশাপাশি শুইয়া আছে। খানিক রাত্রে দুইজনের ভিতর তর্ক উঠিল। রাখাল বলিল যে, নরেন্দ্রনাথ অনেকদিন জিম্‌ন্যাসটিক করা ছাড়িয়া দিয়াছে, সে এখন peacock march বা ঊর্ধ্বপদে ভ্রমণ করিতে পারিবে না। এই তর্ক উঠিলে এক টাকা বাজি ধরা হইল। অর্ধেক রাত্রে তখন দুইজন উঠিয়া সম্মুখের দালানে জিম্‌ন্যাসটিক শুরু করিল। নরেন্দ্রনাথ মালকোঁচা মারিয়া দালানটাতে ঊর্ধ্বপদে ভ্রমণ করিতে লাগিল আর রাখাল সঙ্গে-সঙ্গে চলিতে লাগিল। পাশের ঘরে যাহারা শুইয়াছিল তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিলে বকাবকি শুরু করিল—কি উৎপেতে ছেলে, আদ্দেক রাতে উঠে জিম্‌ন্যাস্টিক শুরু করেছে! ছোঁড়াদুটো মাথাপাগলা, একটু বিবেচনা নেই যে, লোক ঘুমুচ্ছে।"

ছোঁড়াদুটো সত্যই মাথাপাগলা। জো দশ বছর পরেও এঁদের একজনকে দেখে আরও জোরে হাততালি দিয়ে, চেঁচিয়ে বলেছেন, "ভারি মজা! ভারি মজা!"

ঘটনাটা ছিল এইরকম—জো অর্থাৎ মিস ম্যাকলাউডের স্মৃতি অনুযায়ী—

লেগেট-ভবনে সাধারণ ড্রইংরুম ছাড়াও পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা ড্রইংরুম; জানান্‌ না দিয়ে একের অন্যের ড্রইংরুমে ঢোকার রীতি নেই। একদিন দুপুরবেলা মিস ম্যাকলাউড পুরুষদের ড্রইংরুমের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন—দরজাটা আধ-ভেজানো, এ সময়ে সেখানে কারো থাকার কথা নয়, তবু দরজা খোলা নয় কেন? সন্দিগ্ধ হয়ে

মিস ম্যাকলাউড দরজাটা ঠেলে খুললেন—আর তখনি আবছা আলোয় দেখলেন অদ্ভুত দৃশ্য—মিঃ লেগেট শূন্যে ভাসছেন! তারপরেই ধপ্ করে একটা আওয়াজ—সেইসঙ্গে উঃ হু হু—তারপরে স্বামীজীর কড়া গলার স্বর—'দরজায় টোকা না দিয়ে কি আক্কেলে ঢুকলে ?'

ইতিমধ্যে মিস ম্যাকলাউডের চোখ ও মন ধাতস্থ হয়েছে। তিনি ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছেন। দুপুরবেলা নির্জন বাড়িতে স্বামীজী মিঃ লেগেটকে জিমন্যাসটিকের খেলা দেখাচ্ছিলেন। তিনি ঊর্ধ্বপদে ভ্রমণ করছিলেন; শুধু তাই নয়—ঊর্ধ্বপদের উপরে চেয়ার রেখে তার উপরে মিঃ লেগেটকে বসিয়েছিলেন! ঠিক এই সময়ে ঘটনাস্থলে মিস ম্যাকলাউডের প্রবেশ। মহিলার সামনে ঐ অবস্থাটা, বিশেষতঃ প্যান্ট যখন হাঁটুর কাছে নেমে এসেছে, নিতান্তই বেআদবি কাণ্ড। স্বামীজী কি করেন, মিঃ লেগেটকে পা থেকে ছুঁড়ে দিলেন। তারপব উঠে দাঁড়িয়ে মিস ম্যাকলাউডকে তিরস্কার কবলেন। তারপর ভূপাতিত প্রৌঢ় মিঃ লেগেটের দিকে তাকিয়ে মিস ম্যাকলাউডের উদ্দেশ্যে গম্ভীরস্বরে বললেন—'এখন এসো, দেখা যাক, মিঃ লেগেটের কী অবশিষ্ট আছে ?' Now let us see what is left of Mr. Leggett ?

আচার্য বিবেকানন্দকে দেখতে চাইছি খেলার জগতে। তাঁর অনেক খেলার কথা বললাম, কিন্তু ভালো করে বলা হয়নি কোন্ মূর্তিতে, কোন্ রূপে তিনি খেলেছিলেন। সে রূপ প্রায় একবাক্যে ফোটাতে পেরেছেন রোমা রোলাঁ—'সকল ছদ্মবেশ সত্ত্বেও তিনি যে ছিলেন রাজপুত্র।' তবে আমরা, বাঙালীরা, রাজপুত্র বলতে যা বুঝি (আমাদের কার্ত্তিক মূর্তিতেই তার নমুনা), বিবেকানন্দ তা ছিলেন না। 'মল্লযোদ্ধার মত শরীব, সুদৃঢ় ও শক্তিশালী।' দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। 'প্রশস্ত গ্রীবা, বিস্তৃত বক্ষ, বিশাল গঠন, কর্মিষ্ঠ পেশল বাহু, শ্যামল চিক্কন ত্বক, পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, সুবিস্তৃত ললাট, কঠিন চোয়াল।' স্বয়ং গর্ব করে বলতেন, 'আমার তাতারী চোয়াল।' 'তাঁর দেহে সিংহের সৌন্দর্য ও মৃগের চাঞ্চল্য।'

বিবেকানন্দের 'চমকপ্রদ সুন্দর' চেহারার বর্ণনায় আমেরিকা-ইংলণ্ডের সংবাদপত্র পূর্ণ হয়ে আছে। তাঁর চেহারার সুছাঁদ মহিমা, এবং মহান রাজকীয়তা না দেখার মতো অন্ধ কেউ ছিল না। সে চেহারায় ছিল 'প্রচণ্ড আদেশের নির্ঘোষ', 'বশীভূতকর সৌন্দর্যের উদ্দীপনা।' এক কথায়—'ঐশ্বর্যময় দৃশ্য।' সেই বীরমূর্তি বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে সম্ভ্রমে ও আতঙ্কে বাক্যহারা করে দিত মানুষকে। বুকের উপর দুহাত রেখে বিবেকানন্দ যখন দাঁড়াতেন, সেই মহাবীর মহিমাকে ভূমিকায় আনা জগতের শ্রেষ্ঠতম অভিনেতারও অসাধ্য। ঐ ভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত হত তাঁর রক্তোচ্ছ্বসিত 'জ্বলন্ত তাম্র বর্ণ', 'প্রাচ্য রীতিতে অসামান্য সুন্দর মুখ', 'মধ্যরাত্রির মতো নীলদ্যুতিময়

চক্ষু', এবং মন্দিরাভ্যন্তরের ঘণ্টাধ্বনির মতো গভীর-গম্ভীর অনুরণিত কণ্ঠস্বর। বিবেকানন্দকে হিমালয়ের পথে দেখে এক সন্ন্যাসী সবিস্ময়ে বলেছিলেন—'শিব!' জাপানে পথচারী স্তম্ভিত হয়ে বলেছে—'স্বয়ং বুদ্ধ!' আর আমেরিকার বৈদগ্ধ্য উচ্চারণ করেছিল শিহরিত শ্রদ্ধায়—'ক্লাসিক গড্!'

যদিও বিবেকানন্দ জন্মসূত্রে সুন্দর ছিলেন কিন্তু সে সৌন্দর্যে শক্তিসঞ্চার করেছেন সযত্ন সাধনায়। তিনি ব্যায়াম ও শরীরচর্চা করে গেছেন আজীবন। 'আজীবন' কথাটা আক্ষরিকভাবে সত্য। আমেরিকা থেকে ফেরার পরেও পাহাড়ে রাস্তায় মাইলের পর মাইল তাঁর অশ্বারোহণের কথা বলেছি আগে। দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত ডাম্বেল কষতেন, তৎসহ ডন বৈঠক। বিচিত্র নয়কি? আমেরিকা থেকে ফিরে মঠের সন্ন্যাসীদের মধ্যে ব্যায়ামচর্চা বাধ্যতামূলক করতে চেয়েছিলেন। মঠে 'ডেলসার্ট' ব্যায়ামের ধূম পড়ে গিয়েছিল। আর, সকলের মধ্যে তিনি 'কর্মপরিণত আদর্শ'-রূপে বিরাজ করতেন।

১লা জুন ১৮৯৭—স্বামী শুদ্ধানন্দকে তিনি আলমোড়া থেকে লিখছেন—'যথেষ্ট ব্যায়ামের ফলে শরীর বিশেষ সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য হয়েছে।' ১১ নভেম্বর ১৮৯৭, লাহোর থেকে লিখছেন স্বামী ব্রহ্মানন্দকে—'শরীর regular exercise না করিলে কখনও ভাল থাকে না।' ১৮৯৮ সালে বেলুড়ে শিষ্যকে বলছেন—'দেখছিসনে, এখনও রোজ আমি ডাম্বেল কষি।' তুরীয়ানন্দকে প্যারিস থেকে লেখা ১লা সেপ্টেম্বর ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের পত্রে পাচ্ছি—'প্রাতঃকালে খুব ডন-বৈঠক করি, তারপর কালা জলে একদম ডুব।'

অর্থাৎ সর্ব সময়ে, সর্বাবস্থায়—লাহোর, আলমোড়া, বেলুড়, প্যারিস—ব্যায়াম চাইই, নইলে শরীর সুস্থ থাকে না। শরীরকে এতখানি প্রয়োজনীয় গৌরব আর কোনো মহাপুরুষ দিয়েছেন বলে জানা নেই।

বিবেকানন্দের ঐ 'অ্যাথলেটের শরীর' কোন্ সাধনায় তৈরী হয়েছিল তার বিষয়ে কিছু বিক্ষিপ্ত তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত, এবং গুরুভাই সারদানন্দ সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। সারদানন্দ লিখেছেন—'তিনি অশ্বচালনায় সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন জিম্ন্যাসটিক্, কুস্তি, মুদ্গরহেলন, যষ্টিক্রীড়া, অসিচালনা, সন্তরণ প্রভৃতি যে-সকল বিদ্যা শারীরিক বলের ও শক্তি-প্রয়োগকৌশলের উৎকর্ষ সাধন করে, প্রায় সেই সকলেই তিনি অল্প-বিস্তর পারদর্শী হইয়াছিলেন।'

অর্থাৎ বাকি কিছু ছিল না। কেবল একটি জিনিস নেই ঐ তালিকায়—বক্সিং—যা নরেন্দ্রনাথ রীতিমত জানতেন এবং বন্ধুদের বিবাদে মধ্যস্থ হবার কালে শান্তির অস্ত্ররূপে তাকে প্রয়োগ করতেন।

নরেন্দ্রনাথ ব্যায়ামচর্চা করেছিলেন এক বিখ্যাত ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানে। হিন্দুমেলার নবগোপাল মিত্রের ব্যায়ামের আখড়ায় তিনি যোগ দিয়েছিলেন। তার আগে

বাড়ীতেই ব্যায়াম করতেন। কিন্তু খুড়তুতো ভাইয়ের হাত ভেঙে যাওয়ায় বাড়ীর লোকে গোটা আখড়াটাকেই ভেঙে দেয়। তখন তাঁর ব্যায়াম কোন্ আখড়ার সন্ধানে ধাবিত হল, তার চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ—

"কলিকাতায় তখন ব্যায়ামের তিনটি বড় আখড়া ছিল। হোগলকুঁড়েতে অম্বু গুহর (অম্বিকাচরণ গুহ) আখড়া ছিল। দাদা ও রাখাল ঐ আখড়ায় কুস্তি লড়িত। এখন যেখানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে, সেখানে পূর্বে ঘোষেদের পুকুর ছিল। পুকুর ভরাট হইয়া মাঠ হইলে ন্যাশনাল মিত্তির (নবগোপাল মিত্র) সেখানে জিম্‌ন্যাসটিকের আখড়া গড়েন। দাদা এই আখড়ায় বার-এর খেলা শিখিত।... শিমলায় যোগেন পালের আখড়া ছিল।...দাদা যোগেন পালের আখড়াতেও কখনও-কখনও কুস্তি লড়িত।

"একবার হিন্দু-মেলায় ব্যায়াম দেখাইবার জন্য নবগোপাল মিত্তির তাঁহার নিজের জিম্‌ন্যাসটিক দলকে লইয়া গিয়াছিলেন। দাদা ছিল একজন বড় খেলোয়াড়। সেইজন্য সে দলের সঙ্গে গিয়াছিল। রামদাদা (ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত) দাদাকে দেখিবা-মাত্র ধমকাইয়া বলিলেন, বিলে, খবরদার, খেলবিনি। রামদাদার আদেশ—এইজন্য দাদা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু যখন অপর খেলোয়াড়রা বার-এর খেলা দেখাইতে লাগিল, তখন সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, দৌড়িয়া বার-এর কাছে গেল এবং খেলা দেখাইতে লাগিল। রামদাদা তখন কিছুই বলিতে পারিলেন না। হিন্দু-মেলার এই বার-এর খেলায় দাদা প্রথম শ্রেণীর পুরস্কার পায়।"

এই ইতিহাস পড়ছি, তার পরেই দেখছি পর-পর কতকগুলি দৃশ্য। কলকাতার রাস্তায় ঘোড়া ক্ষেপে গিয়ে ছুটছে—গাড়ীতে ভয়ার্ত মহিলা—কিশোর নরেন্দ্রনাথ ঘোড়ার মুখের বল্গা ধরে ঝুলে পড়ে, গাড়ী থামিয়ে, আরোহিণীর প্রাণ বাঁচাচ্ছেন; উন্মত্ত ষাঁড় সগর্জনে তেড়ে আসছে—শিশু ও নারীকে রক্ষা করতে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন; পুলিশ কর্মচারী শাসাতে এসেছিল, তাকে উল্টে ধমকে উঠছেন—তাঁর ব্যায়ামপুষ্ট শরীরের দিকে সে সভয়ে তাকিয়ে আছে; অভদ্র পাদরীর ঘাড় ধরে বলছেন—'আর যদি একটু অসভ্যতা করো তাহলে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবো'; অসভ্য দুই ষণ্ডামার্কা ইংরেজকে মুখের উপর জানিয়ে দিচ্ছেন—'তোমাদের মতো নির্বোধের সঙ্গে তো এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ নয়'—তাঁর মূর্তি দেখে তারা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে। এরকম আরও অজস্র ঘটনা। শক্তি ছিল অসাধারণ। আগেই বলেছি, শক্তিধর নিরঞ্জনানন্দ ও জি জি অর্থাৎ নরসিংহচারিয়াকে মুহূর্তে ভূমিসাৎ করতে পারতেন। সুন্দরম আয়ারকে বললেন, 'এসো পাঞ্জা কষি।' হেরে গিয়ে আয়ার তাঁর নাম দিলেন—'পালোয়ান স্বামী।'

এই শক্তির ঐশ্বর্য বিবেকানন্দের প্রাণে আনন্দের চেয়ে বোধ হয় বেদনাই বেশী

এনেছিল। সত্যই তিনি 'ক্লাসিক গড্।'—সেই সর্বাবয়ব সৌন্দর্য, সেই পূর্ণ স্বাস্থ্য, সেই ক্রীড়ামুখর শক্তি। খেলার মধ্যে তিনি বিশেষ করে ভালবাসতেন মল্লযুদ্ধ, অসিক্রীড়া, মুষ্টিযুদ্ধ, সন্তরণ, অশ্বারোহণ—ব্যক্তিদেহের স্ফূর্তির পক্ষে উপযোগী এই খেলাগুলিও ক্লাসিক। হোমারের কিংবা মহাভারতের যুগ থেকে তিনি নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল এই মহাক্ষত্রিয়ের। নিজের মধ্যে যতই শক্তি পেয়েছেন, ততই অস্থির হয়েছেন শক্তিহীন পরিবেশের দৈন্যে। শক্তি চাই, শক্তি চাই। হে সূর্য, শক্তি দাও! হে রুদ্র, শক্তি দাও! আর্য ক্ষত্রিয় বিবেকানন্দ হাহাকার করে বললেন—উপনিষদে শুধু আছে শক্তির কথা, আর তোমরা—প্রাচীন ঋষির বংশধর তোমরা—পাঁকের কীট হয়ে গিয়েছ! তূরী বাজাও, ভেরী বাজাও, মার্চ করো—এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও!

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বন্দুক তুলে নিলেন—লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টানলেন—লাফিয়ে উঠেই হরিণটা লুটিয়ে পড়ল। The Swamiji was a dead shot.

প্রয়োজন যখন হবে, বন্দুক ধরবে। বোমা নেবে। বোমা বন্দুক যে হাতে ধরবে—ব্যায়াম করে সেই হাতের শক্তি বাড়াবে। 'লোহার দিল চাই, তবে লঙ্কা ডিঙুবি। বজ্র-বাঁটুলের মতো হতে হবে, যাতে পাহাড়-পর্বত ভেদ হয়ে যায়।' শরীর বজ্রবাঁটুলের মতো না হলে লোহার দিল হয় না—স্বামীজী জানতেন। শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেকানন্দের মতো করে আর কোনো মহাপুরুষ বলেননি—হাতের ডাম্বেল ও বন্দুক ধরে তার মূল্যও এমন করে কেউ দেখিয়ে দেননি।

খোলা মাঠে—খেলার মাঠে—বিবেকানন্দের মূর্তি দেখতে আমি অনেকখানি স্থান নিয়েছি। শুরু যখন করেছিলাম আশঙ্কা ছিল, স্বামীজীর এ রূপ হয়ত অনেকের জানা নেই, কিন্তু কিছু এগিয়েই বুঝেছি, স্বামীজীর এ বড় স্বাভাবিক মূর্তি, একটু পরিচয়েই সকলে একে চিনে নেবে। বিবেকানন্দ জীবন নিয়ে খেলেছেন, মরণ নিয়েও। ছোট বয়সে রাজা সেজে খেলবার সময়ে ভবিষ্যতে রাজা হবার কল্পনা তিনি করতেন—বড় হয়ে ইহজগতের সাম্রাজ্যের উপরে গৈরিক বিছিয়ে দিলেন। ভারতবাসীকে তিনি জীবনপ্রেমিক করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বললেন, মৃত্যুকে ভালোবাসো, তবেই জীবনকে পূর্ণভাবে পাবে। মৃত্যুর রক্ত-ওষ্ঠে চুম্বন করে তিনি হেসে বলেছেন—প্রিয়তম! তারপরে পরিব্রাজকের দণ্ড নিয়ে ভারতের প্রান্তরে হেঁটে গেছেন দরিদ্রের মধ্যে নবজীবনের সন্ধানে।

আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ পরিব্রাজক বিবেকানন্দের চেয়ে খোলা মাঠের খেলার মানুষ আর কে?

# পিতার হাসি

খেলার হাসি থেকে হাসির খেলার জগতে এবার চলে আসব। বংশ পরিচয়, অন্ততঃ পিতৃপরিচয় দিতেই হয় সূচনায়, আমাদের দেশে। সুতরাং নরেন্দ্রনাথ দত্তের পিতা বিশ্বনাথ দত্তের কথা এখানে কিছু বলতে হচ্ছে। তাঁর উল্লেখ অবশ্য আগেই করেছি। তাতে কিন্তু তাঁকে সাধারণ সাবধানী পিতা বলে মনে হয়েছে, যা তিনি মোটেই ছিলেন না।

নরেন্দ্রনাথ তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে যেসব জিনিস পেয়েছিলেন, তার মধ্যে বিরাট একটি জিনিস ছিল—জীবনবোধ। হাসি ঐ জীবনবোধেরই অন্যতম প্রকাশ।

বিশ্বনাথ দত্তের কথা কিন্তু আমাদের অল্পে শেষ করতে হবে, উপাদানের অভাবের জন্যই, নচেৎ অল্পে সেরে দেবার মানুষ তিনি ছিলেন না। তিনি রূপবান। শরীরের রূপের চতুর্দিকে ছিল গরিমার দ্যুতি। বেহিসেবী-রকম উদার মানুষ। রোজগার যথেষ্ট করতেন। সেগুলো খরচ করতে এত ব্যস্ত থাকতেন যে, বলা যায়, তিনি কখনো টাকার স্তূপে বসেননি, তরী বেয়েছেন রূপোর নদীতে। বিশ্বনাথ সন্ন্যাসী ছিলেন না, রীতিমত ভোগী গৃহস্থ, কিন্তু তিনি সন্ন্যাসীর পুত্র (এবং সন্ন্যাসীর পিতা), তাই তাঁর অর্জনের গার্হস্থ্যকে কম্পমান করে রেখেছিল বিলিয়ে দেবার এবং হারিয়ে যাবার পৈতৃক বৈরাগ্য। বিশ্বনাথের মন ছিল রাজকীয়—সেই রাজসভাতলে সমবেত হয়েছিল দেশ বিদেশের সংস্কৃতি। অনেকগুলি ভাষা জানতেন। হিন্দু তিনি, কিন্তু মুসলমানী আচারের বড় ভক্ত। ভাগবতে তাঁর ভক্তি ছিল, কিন্তু বাইবেলকে কম ভালবাসতেন না, এবং হাফেজের কবিতার রসে ডুবে থাকত মন, গানের রসেও। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার পথে ধর্মসমন্বয়ের যে-সত্যে উপনীত হয়েছিলেন, উদার মানবিক সংস্কৃতির ঔদার্যে বিশ্বনাথ তাকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত ছিলেন।

এমনই এক মানুষ—পালতোলা জীবনের বজরায় সুখাসীন—তিনি কিন্তু কান পেতে শুনতে চেয়েছিলেন প্রত্যেকটি আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের গুমরানো কান্নাকে। বিচার না করে অযোগ্য পাত্রে, নেশাখোর প্রভৃতিকেও, যথেচ্ছ দান করতেন বলে পুত্র নরেন্দ্রনাথ একদা তীব্র আপত্তি তুলেছিল। তখন তিনি উত্তরে যা বলেছিলেন তা তাঁর সমস্ত হাসির পিছনকার জমাট কান্নাকে উন্মোচন করে দিয়েছিল—'জীবন কত দুঃখের তা তুই এখন কী বুঝবি? তা যখন বুঝতে পারবি, তখন এই দুঃখের হাত থেকে ক্ষণিক নিস্তারের জন্য যারা নেশা-ভাঙ করে, তাদের পর্যন্ত দয়ার চোখে দেখবি।'

স্বামী বিবেকানন্দ পিতার কাছ থেকে যা-কিছু পেয়েছিলেন, তার বিবরণদানে

এখানে আমরা ব্যাপৃত নই, কিন্তু একটি ক্ষেত্রে যে-শিক্ষা নিয়েছিলেন, তার বিষয় বলতেই হচ্ছে। বিশ্বনাথ অ্যাটর্নী, মক্কেলের জন্য তাঁর সদরঘরে সাজানো থাকত অনেকগুলি হুঁকা এবং সেই হুঁকাগুলির মধ্যে জাতিভেদ যথেষ্ট ছিল—তারা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, মুসলমান ইত্যাদি। বিশ্বনাথের ঘর মক্কেলে পূর্ণ থাকত বলে হুঁকা-গুলিও ধূম-বহ্নিমান্ সর্বদা। শ্রীমান্ বিলে অবশ্যই হুঁকা-নামক বিচিত্র যন্ত্র থেকে ধূমোৎপাদনের অপূর্ব কৌশল দর্শন করে (এতটুকু যন্ত্র থেকে এত ধোঁয়া হয়!) মোহিত হয়েছিলেন এবং ঐ বৈজ্ঞানিক কারিগরি স্বয়ং দেখাবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর ধূমপান-অভ্যাসের সূচনা বাল্যেই। পরবর্তীকালে চুরুটকে তিনি তাঁর একমাত্র 'ইংরেজী দোষ' বলেছেন, কিন্তু ও-দোষ সহসা-কিছু নয়—পূর্বেই ভারতীয় হুঁকা-দোষ আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই 'দোষ'-সূত্রেই শ্রীমান্ বিলে জাত-হারানো বিশ্বনাগরিক হয়েছিলেন পিতার প্রসন্নহাস্যের সমর্থনে। বিলুবাবু শুনেছিলেন, একের হুঁকো অন্যে টানলে জাত যায়। শুনেই তিনি সিদ্ধান্ত করলেন—এক, পরীক্ষা করে দেখতে হবে জাত যায় কি-না ; দুই, জাত গেলে কী হয়? অতএব একদিন তিনি মক্কেলগণ প্রস্থান করা মাত্র সব-কটি হুঁকায় টান দিয়ে জাতের প্রস্থান ও পরবর্তী প্রলয়ের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন উৎসুক চিত্তে। সমাজনীতি ও ধর্মনীতি সম্বন্ধে এহেন গুরুতর গবেষণায় যখন বালক ব্যাপৃত, অকুস্থলে পিতার আবির্ভাব। কাণ্ড দেখে পিতার সবিস্ময় প্রশ্ন—'কি করছিস্ রে?' তাতে পুত্রের স্বচ্ছন্দ উত্তর—'দেখছি জাত যায় কি না!' অতঃপর "পিতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন এবং 'বটে রে দুষ্টু' বলিয়া ধীরে-ধীরে নিজ পাঠগৃহে প্রবেশ করিলেন।"

বিশ্বনাথ দত্ত অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই চমৎকৃত হয়ে দেখবেন—তাঁর পুত্র ধূমপান সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর পার হয়ে গেছেন। মেট্রোপলিটান স্কুলে-পড়াকালেই নরেন্দ্রের ধূমপানের অভ্যাসের সূচনা। পুত্রের অকালে ধর্মের প্রতি আসক্তির কথা পিতা ইতিমধ্যে জেনেছেন। এখন এই আর একটি অকাল-আসক্তির কথা জানলেন। না, পুত্রের মাথায় পিতা মোহমুদ্গর বসালেন না, তিনি হাসলেন। তাঁর হাসির দৌত্য পুত্রের দুই আসক্তিকে চিরবন্ধনে বেঁধে দিল। পড়ার ঘর বন্ধ করে পুত্র ধূমপান করে থাকেন। পিতা বললেন, 'বাবাজি ঠাকুরকে ধূপ-ধূনা দিচ্ছেন, তাই ঘর বন্ধ।'

*বীরেশ্বরের দুষ্টুমি সকলকে হাসিয়ে কাঁদিয়ে অস্থির করত। শৈশবে এই ফুটন্ত* **আগ্নেয়গিরির মাথায় ঘড়া-ঘড়া জল ঢেলে মাতা ভুবনেশ্বরী ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করতেন, আর আর্তনাদ করতেন—ত্রাহি ত্রাহি! শিব শিব! 'শিবের কাছে ছেলে চেয়েছিলুম, তিনি পাঠালেন ভূত!'—বড় দুঃখে (কিংবা সুখে!) তাঁকে ওকথা বলতে হয়েছিল। তাঁকে বা তাঁর কন্যাকে এই শিশুর চৈতন্যলীলাও দেখতে হয়েছিল।**

বালক নিমাইয়ের মতো কিছু বাল্যকীর্তি দেখিয়ে শ্রীমান্ বীরেশ্বর প্রমাণ করেছিলেন, বাল্যবজ্জাতির একটা সর্বজনীন মহাপুরুষ-চরিত্র আছে। 'জ্যেষ্ঠা ভগ্নীদ্বয়ের সঙ্গে নরেন্দ্রের মোটে বনিত না। তিনি যখন তখন তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতেন এবং তাঁহারা তাড়া করিলে ছুটিয়া পলাইয়া নর্দমা বা আঁস্তাকুড়ে গিয়া দাঁড়াইতেন ও সেখান হইতে মনের সাধে নানাপ্রকার মুখবিকৃতি করিতেন। আঁস্তাকুড়ে কেহ তাঁহাকে ছুঁইতে পারিত না ; এবং তিনিও মৃদু-মৃদু হাসিতেন আর মুখ ভেংচাইতে-ভেংচাইতে বলিতেন—ধর্ না, ধর্ না !'

এইরকম স্ফূর্তি সর্বক্ষণ। ঘরের জিনিসপত্র টেনে বাইরে ফেলে দিয়ে বা দান করে 'আনন্দে আটখানা নৃত্য' ; খেলার রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রাজকর্মচারীদের সুষ্ঠু দায়িত্বপালন দেখে স্মিত আনন্দ ; কিংবা বিদ্রূপের বাঁকা হাসি সাহেবের চাপরাশিকে ঠকিয়ে। শেষের ঘটনাটি এই—

কলকাতায় বিলিতি যুদ্ধজাহাজ এসেছে ; অনুমতিপত্র পেলে তবে তার ভিতরে ঢোকা যায় ; চৌরঙ্গীতে বড়সাহেবের কাছে দরখাস্ত নিয়ে নরেন্দ্র গিয়েছেন ; বাচ্চা ছেলের আস্পর্ধা দেখে চাপরাশি হাঁকিয়ে দিয়েছে ; নরেন্দ্র পিছনের ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে গোপনে উঠে সাহেবের কাছ থেকে অনুমতি জোগাড় করে সদর-পথ দিয়ে ফেরবার সময়ে অনুমতিপত্রটি চাপরাশির নাকের সামনে বেশ করে নাড়িয়েছেন, সে তাজ্জব হয়ে শুধিয়েছে, 'তুম ক্যায়সে উপর মে গিয়া থা ?' আর নরেন্দ্র মুখভঙ্গি করে উত্তর দিয়েছেন, 'হাম জাদু জানতা।'

এবং বৃদ্ধকে বুদ্ধির যুদ্ধে পরাস্ত করে বালকের কী হাসি। বন্ধুগণের সঙ্গে প্রতিবেশীর চাঁপার গাছে দোল খেয়ে ডাল ভাঙা, ফুল ছেঁড়া ইত্যাদি নরেন্দ্রের বাল্যবিলাস। সে বাড়ির বৃদ্ধ ঠাকুর্দা অন্য উপায় না দেখে ব্রহ্মদত্যির গল্প ফাঁদলেন—কিভাবে ব্রহ্মদত্যিটি ঐ চাঁপা গাছটিকে ব্রহ্মত্র করেছেন, কিভাবে সম্পত্তিহানির ক্ষেত্রে তিনি ঘাড় মটকে শোধ তোলেন—সেইসব কথা। গম্ভীর হয়ে বালক সবই শুনেছিল, ও বৃদ্ধের প্রস্থানের পরে যথারীতি দোললীলা শুরু করেছিল। সখাগণ যখন সভয়ে সাবধান করল—'ওকাজ আর করিস্নে ভাই, 'তিনি' তোর ঘাড় মটকাবেন' —তখন দোদুল দোলের সঙ্গে উচ্চহাস্য মিশিয়ে সে বলেছিল, 'তোরা কি আহাম্মক ! ব্রহ্মদত্যি থাকলে সে কি এতক্ষণ ঘাড় মটকে দিত না !'

বিশ্বনাথ দত্তের এহেন পুত্র—ভালবাসা এবং প্রশ্রয়ে লালিত। কিন্তু পিতার শাসনও ছিল, যা মুগুরের মতো চূর্ণ না ক'রে অসির মতো ভেদ ক'রে যেত। বাড়িতে বজ্জাতির সময়ে নরেন্দ্র প্রায়ই সীমা লঙ্ঘন করতেন, এমন সব বাক্য জননীকে শোনাতেন, যা মোটেই শ্রুতিসুখকর নয়। কথাগুলো বিশ্বনাথ দত্তের কানেও

গিয়েছিল। তিনি আর কিছু করলেন না—ঐ কথাগুলি কেবল নরেন্দ্রনাথের ঘরের সামনে লিখে রাখলেন, যাতে সেগুলি সহজে পুত্রবন্ধুগণের দৃষ্টিগোচর হয়। শিরোনামা ছিল—'শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ অদ্য এই সকল বাক্যে তাঁহার গর্ভধারিণীকে সম্মানিত করিয়াছেন।'

বিশ্বনাথ দত্তের হাসি—সভ্য মানুষের দেওয়া শাস্তি। পিতার সে হাসি বিচিত্র পরিহাসে বর্ণময় হয়ে উঠেছিল একবার। বেহিসেবী পিতার সামনে দাঁড়িয়ে পুত্র ক্ষোভে জিজ্ঞাসা করেছিল—'আপনি আমাদের জন্য কী রেখে গেলেন?' পিতা বলেছিলেন—'তোমাকে কী দিয়ে গেলুম? যাও, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দ্যাখো।'

আমরা জানি, বিশ্বনাথ দত্তের সুন্দর চেহারার উপরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের আত্মা স্থাপিত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দের সৃষ্টি হয়েছিল।

# উচ্ছল দিনগুলি

হাসির প্রতিযোগিতায় বিবেকানন্দ একটি লোকের কাছে হেরে গিয়েছিলেন, যাঁর কাছে পরাজয় অনিবার্য, কারণ তিনি সাধারণ রসিক নন—একেবারে পরম রসিক—স্বয়ং রামকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের যৌথ হাসির বিবরণে আসার আগে কিশোর নরেন্দ্রনাথের ঐকালের আরও দু'একটি ছবি দেখে নেওয়া যেতে পারে। এখানে আমরা বলাবাহুল্য অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু নরেন্দ্রনাথকে দেখতে চাই না, অন্য মানুষটিকে চাই, যিনি উপস্থিত না থাকলে 'বন্ধুদের উৎসবসভার অঙ্গহানি হত।'

আমরা জেনেছি—'তাঁহার মতো আনন্দ-তুফান তুলিতে কেহই পারিত না। তাঁহার সংস্পর্শমাত্রে স্থানটি যেন চঞ্চল ও প্রাণময় হইয়া উঠিত ; সভামধ্যে একটা হর্ষের হিল্লোল বহিয়া যাইত।' নরেন্দ্রকে না দেখলে সবাই ব্যস্ত—'নরেন কোথা ?' —নরেন্দ্র এলেই—'এই যে নরেন! এই যে নরেন!' 'ছাত্রদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় রসিক কেহ ছিল না। কোনো ঘটনার কৌতুকের দিকটা সর্বাগ্রে তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইত।...এমন অনেকদিন গিয়াছে যেদিন একখানা গাড়ি ভাড়া করিয়া তাহার মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া সকলে কলিকাতার পথে গান গাহিয়া বেড়াইয়াছেন। রবিবার বা অন্য ছুটির দিনে সকলে একত্রে গঙ্গাস্নানে যাইতেন। গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ, লম্ফঝম্ফ, জলক্রীড়া হইত, ও সঙ্গে সঙ্গে হাসি-তামাসা গল্পের বান ডাকিত। পূজা-পার্বণ উপলক্ষে রাজপথসমূহ আলোকমালায় বিভূষিত হইলে এইসব যুবকদল ভ্রমণে বহির্গত হইতেন ও উচ্ছ্বসিত আনন্দের রোলে গগন বিদীর্ণ করিতেন।'

সহপাঠী-বন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ ছাত্র-নরেন্দ্রনাথের অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন। তার মধ্যে প্রতিভাবান, বন্ধুবৎসল, নির্মল, আনন্দময় এক তরুণের সাক্ষাৎ পেয়েছি। নরেন্দ্রের বন্ধুপ্রীতির একটি কৌতুকজনক কাহিনীও সেখানে আছে। সেটি এইরকম—

জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ্ ইনষ্টিটিউশন থেকে নরেন্দ্ররা বি-এ পরীক্ষা দেবেন। হরিদাস চট্টোপাধ্যায় নামক দরিদ্র এক বন্ধু কলেজে নিয়মিত মাইনে দিতে পারেননি, কোনোক্রমে ফি-র টাকা জোগাড় করেছেন। নরেন্দ্র তাঁকে ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন—কেরানী রাজকুমারবাবুকে ধরে মাইনে মকুব করে দেবেন। মধ্যবয়সী রাজকুমার কিছু নেশা-ভাঙ করেন, কিন্তু মানুষ খারাপ নন, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মাইনে মকুব করেন। কিন্তু সেদিন বোধহয় তাঁর মেজাজ ভালো ছিল না। নরেন্দ্র যখন ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'মশায়, হরিদাস দেখছি মাইনেটা দিতে পারবে না, তাকে অনুগ্রহ করে মাপ করে দিন ; তাকে পাঠালে সে ভালরকম পাস করবে—' সেকথা শুনেই রাজকুমার দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'তোকে জ্যাঠামি করে

সুপারিশ করতে হবে না ; তুই নিজের চরকায় তেল দিগে যা ; মাইনে না দিলে ওকে পাঠাবো না।' নরেন্দ্র হতভম্ব এবং অপদস্থ, বন্ধুর অবস্থা শোচনীয়। সামলে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ বন্ধুকে বললেন, 'তোকে ভাবতে হবে না, ব্যবস্থা আমি করব।'

সেদিন সন্ধ্যার সময়ে সিমলা-বাজারের পশ্চিমে একটা গলির কাছে নরেন্দ্রনাথকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল ; মাঝে মাঝে গলিতে ঢুকে কাদের সঙ্গে যেন ফিস্‌ফিস্ করে কথাও বলে এলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘন হয়েছে, সহজেই আড়াল দিয়ে গলিতে ঢোকা যায়—এমন সময় গুটিগুটি গা-ঢাকা দিয়ে একজনকে গলিতে ঢুকতে দেখা গেল। আর ঠিক তখনি আর একজন তার সামনে আবির্ভূত হয়ে পথরোধ করে দাঁড়াল। রাজকুমার গুলির আড্ডায় ঢুকছিলেন—নরেন্দ্রনাথ তাঁকে আসল জায়গায় আটকেছেন। ভয়ে রাজকুমারের মুখ শুকিয়ে গেল। এমন জায়গায় ছোঁড়াটার সঙ্গে দেখা!

বলাবাহুল্য অতঃপর আপস-নিষ্পত্তি হয়েছিল। গুলির আড্ডার স্ক্যাণ্ডাল কলেজে ছড়াক, রাজকুমার নিশ্চয় তা চাইতে পারেন না, সুতরাং হরিদাসের মাইনে মকুব ক'রে দেবেন—এ প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন। কার্যোদ্ধার ক'রে নরেন্দ্রনাথের ঈশ্বরভক্তি নিশ্চয় খুব বেড়ে গিয়েছিল। পরদিন প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের আগেই তিনি বন্ধুর বাড়িতে হাজির—দ্বারে করাঘাত—কণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত—'অনুপম-মহিম-পূর্ণ ব্রহ্ম কর ধ্যান।...চল সবে ভক্তিভাবে ভগবত-নিকেতনে। প্রেম-উপহার লয়ে হৃদয়-থালে॥' বন্ধু দরজা খুলবার পরে ঈশ্বরভক্তি সামলে নরেন্দ্রনাথ, কিভাবে রাজকুমার এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফস্ করে গুলির আড্ডায় ঢুকেছিলেন, কিভাবে তিনি রাজকুমারকে ভয় দেখিয়েছিলেন, ভয়ে তাঁর কী মুখবিকৃতি হয়েছিল, তার অভিনয়াত্মক বিবৃতি দিয়ে হাসিয়ে অস্থির করলেন।

বন্ধুরা নরেন্দ্রকে কতখানি দিয়েছেন সন্দেহজনক, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ অকাতরে তাঁদের দিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছেন। নিজেদের পড়া শেষ করে বন্ধুরা নরেন্দ্রের পড়ার সময় তাঁর কাছে হাজির হয়েছেন, এবং গান শুনতে চেয়েছেন। আর গানের কাছে পড়া? ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান হয়েছে অতঃপর। গান সময় নষ্ট করলেও নরেন্দ্রনাথ অপরদিকে গান বা স্ফূর্তিকে পড়াশোনার পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। পরীক্ষার দিন সকালে যখন গান গেয়ে বেড়িয়েছেন, তখন বন্ধুরা অনুযোগ করে বলেছেন, 'নরেন, তোমার সব উল্টো ; এগজামিনের দিন কোথায় খুঁত-খাঁতগুলি সেরে নেবে, তা নয় ফূর্তি করে বেড়াচ্ছ'—নরেন্দ্র উত্তরে বলেছেন—'আরে মাথা সাফ রাখছি ; এগজামিনের সকালবেলাটা ফূর্তি করে শরীর মনকে একটু শান্তি দিতে হয় ; ঘোড়াটা খেটে এলে তাকে ডলাই-মালাই করে যেমন তাজা করে নিতে হয়, মনকেও তাই করতে হয়।'

রসসাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে একদিনের আলাপের মনোহারী বিবরণ দিয়েছেন। কেদারনাথের বাড়ি দক্ষিণেশ্বরে। তাঁর বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বি-এ পড়েন, তিনি কেদারনাথকে একদিন নিজের বাড়িতে টেনে নিয়ে চললেন তাঁর এক সহপাঠী-বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য। হরিদাসকে এ ব্যাপারে বেশি উদ্‌গ্রীব দেখে কেদারনাথ কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হরিদাস বললেন, 'বিশেষ কিছু নয়; এই তুমি যেমন আমাদের দলের প্রধান বক্তা ও রহস্যপটু আনন্দদাতা, তিনিও তেমনি কলেজে আমাদের গল্পে ও কথায় রসমুগ্ধ করে রাখেন। তাঁর সঙ্গ সকলেই খোঁজে। তাঁর মতো রসমধুর বক্তা বিরল।'

হরিদাস তাঁর কলেজী বন্ধু নরেন্দ্র দত্তকে মুড়ির থালা ধরিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। কেদারনাথকে সঙ্গে করে বাড়িতে পোঁছতেই নরেন্দ্রনাথ মুড়ির থালা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'লেগে যান।'

কেদারনাথ—'কি, মাজতে নাকি? সে-কাজ এই সদরঘরে কেন? হরিদাস বড় সৌখিন লোক।'

নরেন্দ্রনাথ—'কেন, হরিদাসের মুড়ি ফুরিয়ে গেছে নাকি? Haridas a damn thrift.'

হাসির মধ্যে আলাপের সূচনা হয়ে গেল।

হরিদাস পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি কলিকাতার সিমলা-নিবাসী শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত। আমাদের সহপাঠী হলেও দুনিয়ার কি, বা কোন্ বিষয় যে জানেন না, সেইটিই জানিনা।'

নরেন্দ্রনাথ—'কেন ম্যাথামেটিক্স! বিদ্যাসাগর মশাই এখনো বেঁচে আছেন—সদা সত্য কথা কহিবে।'

খানিক কথাবার্তার পরে কেদারনাথ দেখলেন, "যেমন সুপুরুষ, তেমনি সুবক্তা। তাঁকে দেখলে বা তাঁর কথা শুনলে মুগ্ধ না হয়ে কেউ থাকতে পারবে না। তাঁর রহস্য-মাখা ভাষা ছিল শোনবার জিনিস, কিন্তু বস্তু থাকত 'ভাবে।' শ্রোতা অবাক হয়ে ভাবত, বয়সের অনুপাতে এতখানি জ্ঞান হয় কি করে? এ যে বড়-বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের কাছেও চমকপ্রদ। কিন্তু তাঁর মুখে সে-সব হাসি-রহস্যচ্ছলেই প্রকাশ পেত। এমন অদ্ভুত যুবা দেখিনি।"

এই দিনই নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে যান।

নরেন্দ্রনাথ—'না হয় ঠকাই যাবে। শুনেছি [পরমহংস] নিরক্ষর ব্রাহ্মণ, ইতিপূর্বে মা-কালীর পূজারী ছিলেন, এখন সহসা সিদ্ধপুরুষ, আমাদের দেশে যা সহজেই হওয়া যায়। তাঁকে দেখা হবে। আমাদের দেশে লোকে পয়সা দিয়েও ভেলকি দেখে। শুনেছি এখানে পয়সাও লাগে না।'

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ এমন চোট-পাট কথাবার্তা বললেন যে, কেদার-নাথের ভাল লাগল না।

"বাইরে বেরিয়ে নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমার কথাগুলো বড় বিশ্রী লাগছিল, না বাঁড়ুজ্জে ?' বললুম, সেটা নিজেই বুঝতে পারছেন। 'না, আমি ভাল বুঝতে পারিনি। [ শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি নরেন্দ্রনাথ দেখেছিলেন ]। তাই দ্বিতীয়বারের জন্য একটু কড়া ভূমিকা ছেড়ে চললুম। এর পরের সাক্ষাতে খোলসা হতে পারে। সেবার আর হরিদাসের মুড়ি নষ্ট করব না, সোজা একাই চলে আসব।' আর দাঁড়ালেন না।"

কেদারনাথের মনে হল, "সমবয়সী হলেও এরূপ ছেলে পূর্বে দেখিনি—যেমন নির্ভীক, কথাবার্তাতেও তেমনি বহুদর্শী জ্ঞানীর মতো। এ ছেলে কারো মুখ চেয়ে কথা কবার নয়, লীডার হবার জন্যই জন্মেছে। দেখলুম, ঠাকুরও এঁকে চান। এ ছেলে কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্—সোলজার নয়।"

বাইরের মানুষ হুল্লোড়ের, স্ফূর্তির ছোকরাকেই দেখেছিল—ঘনিষ্ঠজনেরা তারই মধ্যে দেখেছিলেন অন্য একটি রূপকে। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের রচনাতে দেখেছি—নরেন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত হাসি আনন্দ তর্কের মধ্যেও কতখানি যাতনাকে বহন করতেন। প্রথম দর্শনে কিন্তু ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকতই। নরেন্দ্রের পড়ার ঘরের ছবি এঁকেছেন প্রিয়নাথ সিংহ: "( মাতামহীর বাড়িতে ) যে-ঘরটিতে নরেন থাকেন, তাহা বারবাড়ির দোতলায়। ঘরের সম্মুখেই উঠিবার সিঁড়ি, অন্দরমহলের সঙ্গে কোনোপ্রকার সংশ্রব নাই। সুতরাং তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা যখন ইচ্ছা আসিয়া উপস্থিত হন। নরেন নিজের এই অপূর্ব ছোট ঘরটির নাম রাখিয়াছিলেন, 'টঙ'। কাহারও সঙ্গে সেখানে যাইতে হইলে বলিতেন, 'চল, টঙে যাই'। ঘরটি বড়ই ছোট, প্রস্থে চারি হাত, দৈর্ঘ্যে প্রায় তাহার দ্বিগুণ। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটি ক্যাম্বিসের খাট, তাহার উপর ময়লা ছোট একটি বালিশ। মেঝের উপর একটি ছেঁড়া বালিশ। সেখানে একটি ছেঁড়া সপ্ পাতা। এক কোণে একটি তম্বুরা। তাহারই নিকট একটি সেতার ও একটি বাঁয়া। বাঁয়া কখনো ঐ মাদুরের উপরে পড়িয়া থাকে, কখনো-বা খাটিয়ার নীচে, কখনো-বা তাহার উপর চড়িয়া বসিয়া থাকে। ঘরের একপার্শ্বে একটি থেলো হুঁকা, তাহার নিকট খানিকটা তামাকের গুল আর ছাই ঢালিবার একখানি সরা। তাহারই কাছে তামাক টিকে ও দেশলাই রাখিবার একখানি মৃৎপাত্র। আর কুলুঙ্গিতে, খাটের উপর, মাদুরের উপর হেথা-সেথা ছড়ানো পড়িবার পুস্তক। একটি দেওয়ালে একটি দড়ি খাটানো, তাহাতে কাপড়, পিরান ও একখানি চাদর ঝুলিতেছে। ঘরে দু'-একটি ভাঙা শিশিও রহিয়াছে; সম্প্রতি তাঁহার পীড়া হইয়াছিল; তাহারই নজির।"

স্বামী সারদানন্দ নরেন্দ্রনাথকে প্রথম দর্শন করে কিভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, সেকথা নিজেই লিখেছেন। নরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর তখনো পরিচয় ঘটেনি, নরেন্দ্রের প্রতিবেশীর মুখে শুনেছেন, 'এই বাটীতে একটা ছেলে আছে, তার মত ত্রিপণ্ড ছেলে এখনো দেখিনি। বি-এ পাস করেছে বলে যেন ধরাকে সরা দেখে—বাপ্ খুড়োর সামনেই তবলায় চাঁটি দিয়ে গান ধরলে, পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে দিয়েই চুরুট খেতে খেতে চললো—।' এরপর সারদানন্দ (তখন শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী) সাক্ষাতে নরেন্দ্রনাথকে দেখলেন এক বন্ধুর বাড়ীতে, যে-বন্ধুটি লেখক-সম্পাদক, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছেন, এমন অপবাদ তাঁর সম্বন্ধে রটেছে। এই বন্ধুর বাড়িতে সারদানন্দ বসে আছেন, "এমন সময়ে সহসা এক যুবক সেই ঘরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং গৃহস্বামীর পরিচিতের ন্যায় নিঃসঙ্কোচে নিকটস্থ একটি তাকিয়ায় অর্ধশায়িত হইয়া একটি হিন্দী গানের একাংশ গুন্-গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিলেন। যতদূর মনে আছে, গীতটি শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক, কারণ 'কানাই' ও 'বাঁশরী' এই দুইটি শব্দ স্পষ্ট মনে প্রবেশ করিয়াছিল। সৌখীন না হইলেও যুবকের পরিষ্কার পরিচ্ছদ, কেশের পারিপাট্য এবং উন্মনা দৃষ্টির সহিত 'কালার বাঁশরী'র গান, ও আমাদিগের উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুর সহ ঘনিষ্ঠতার সংযোগ করিয়া লইয়া আমরা তাঁহাকে বিশেষ সুনয়নে দেখিতে পারিলাম না। গৃহমধ্যে আমরা যে বসিয়া রহিয়াছি, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহাকে ঐরূপ নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার এবং পরে তামাকু সেবন করিতে দেখিয়া আমরা ধারণা করিয়া লইলাম—আমাদের উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুর ইনি একজন বিশ্বস্ত অনুচর, এবং এইরূপ লোকের সহিত মিশিয়াই তাঁহার অধঃপতন হইয়াছে।"

সারদানন্দকে অবশ্য অবিলম্বে মতপরিবর্তন করতে হয়েছিল যখন তিনি ইংরেজী ও বাংলাসাহিত্য-বিষয়ে উক্ত যুবকের গভীর পাণ্ডিত্য ও ভাবপূর্ণ বক্তব্য শুনেছিলেন। সাহিত্যে আদর্শবাদের পক্ষে তাঁর তীক্ষ্ণ ও গভীর উক্তিগুলি সারদানন্দকে মোহিত করেছিল।

বেপরোয়া খুশিতে নরেন্দ্রনাথ সর্বত্র ঘুরেছেন, সর্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশেছেন, যাদের অনেকেই সমাজের উচ্চবর্গের মানুষ নয়। নরেন দত্তের প্রতিভার জন্য তারা সমীহ করত, কিন্তু ভালবাসার টান এড়াতেও পারত না। নরেন দত্ত যখন বিশ্ব-বিখ্যাত বিবেকানন্দ তখনকার ঘটনা : "স্বামীজী ৫৭ নম্বরে বলরামবাবুর বাড়িতে এসেছেন ; গান করবেন। বললেন—'ওরে, কাছেই এই সরকারবাড়ি লেনে জগন্নাথ ঠাকুর নামে আমার এক বাল্যবন্ধু পাখোয়াজি আছে। যা ছুটে তাকে ডেকে নিয়ে আয়। বললেই হবে, নরেন দত্ত ডাকছে, বাজাতে হবে।' নরেন দত্তের নাম শুনে সত্যই সে ছুটে এসেছিল। কারণ নরেন দত্ত সকলের বন্ধু।

# পরম রসিক

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে একই চেহারা নিয়ে যুবকটি উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ যেহেতু রামকৃষ্ণ—তিনি স্তম্ভিত হয়ে বলেছিলেন—এ কী দেখলাম!—

"পশ্চিমের দরজা দিয়ে নরেন প্রথমদিন এই ঘরে ঢুকেছিল। দেখলাম, নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই, মাথার চুল ও বেশভূষার কোনোরূপ পারিপাট্য নেই, কোনো পদার্থেই ইতরসাধারণের মতো আঁট নেই, সবই যেন তার আলগা। আব চোখ দেখে মনে হল, তার মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন জোর করে সর্বদা টেনে রেখেছে। দেখে মনে হল, বিষয়ী লোকের আবাস কলকাতায় এতবড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব!"

সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গাধরকে বললেন, "দ্যাখ্, নরেন একশোটা পান খায়, যা পায় তাই খায়। এত বড়-বড় চোখ—ভেতর দিকে টান—কলকাতায় রাস্তা দিয়ে যায়, আর বাড়ি, ঘরদোর, ঘোড়াগাড়ি, সব নারায়ণময় দেখে। তুই তার কাছে যাস্—সিমলেয় বাড়ি।"

নরেন্দ্রের বর্ণনায় শ্রীরামকৃষ্ণ উপমার পর উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। তা কোথাও অভিজাতসাহিত্য, কোথাও লোকসাহিত্য।—"নরেন্দ্র উঁচু ঘর, নিরাকারের ঘর, পুরুষের সত্তা।" "অন্য পদ্ম কারুর দশদল, কারুব ষোড়শদল, কারুর শতদল; কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।" "চাষারা হাটে গরু কিনতে যায়; তারা ভাল-মন্দ গরু বেশ চেনে। ল্যাজের নীচে হাত দিয়ে দ্যাখে। কোনো গরুর ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে—সে গরু কেনে না। যে-গরুর ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং-মিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে, সেই গরুকেই পছন্দ করে। নরেন্দ্র সেই গরুর জাত।" এবং নরেন্দ্র যখন গান করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ মুহূর্তে জ্বলে ওঠেন; নরেন্দ্র চলে যাবার পরেও সে আগুন নেভে না; বলেন, "আগুন জ্বেলে গেছে, এখন থাকলো আর গেলো।" কোনো মানুষের ভালোত্বের পক্ষে বড় সার্টিফিকেট—নরেন্দ্রকে তাঁর ভাল লাগা।—"ইনি ভাল লোক যেকালে নরেন্দ্রের সুখ্যাতি করেছেন।" নরেন্দ্রের প্রতি এই পক্ষপাত দেখে শোভাবাজার রাজবাড়ির যতীন দেব নির্বিদ্বেষ ঈর্ষায় বলতে বাধ্য হন—"কেবল 'নরেন্দ্র খাও, নরেন্দ্র খাও!' আমরা শালারা ভেসে এসেছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে কী আনন্দের দিনগুলিই কাটিয়েছেন নরেন্দ্রনাথ! তার স্মরণে বলেছিলেন—"পঞ্চবটীতলে আমরা দৌড়াদৌড়ি করতাম, গাছে চড়তাম, মোটা দড়ির মতো ঝুলন্ত মাধবীলতায় বসে দোল খেতাম; কখনো-কখনো চড়ুইভাতি করতাম।"

পরপর কতকগুলি ছবি দেখে নিতে পারি—

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে বা ভক্তগৃহে অন্যান্যের সঙ্গে নরেন্দ্র বসে আছেন। রসের হাট বসেছে। এক ভাগবতের পণ্ডিত উদ্ভট শ্লোক বলছেন—"দর্শনাদিশাস্ত্র অপেক্ষা কাব্য মনোহর ; যখন কাব্যপাঠ হয়, লোকে শ্রবণ করে, তখন বেদান্ত সাংখ্য ন্যায় পাতঞ্জল এইসব দর্শন শুষ্ক বোধ হয়। কাব্য অপেক্ষা গীত মনোহর, সঙ্গীতে পাষাণহৃদয় লোকও গলে যায়। গীতের এত আকর্ষণ, কিন্তু যদি সুন্দরী নারী কাছ দিয়ে চলে যায়—কাব্যও পড়ে থাকে, গীত পর্যন্ত ভাল লাগে না, সব মন ঐ নারীর দিকে চলে যায়। আবার যদি বুভুক্ষা হয়, ক্ষুধা পায়, কাব্য, গীত, নারী কিছুই ভাল লাগে না ; অন্নচিন্তা চমৎকারা।" শ্লোক শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে মন্তব্য করছেন, "এনি রসিক।"

থালাভর্তি মোহনভোগ এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেই বলছেন—"ওরে, মাল এসেছে ! মাল ! মাল ! খা ! খা !" আবার বলছেন, "হ্যাঁ গা, কি বলে ? 'পরমহংসের ফৌজ এসেছে !' শালারা বলে কি !"

দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রাদির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হচ্ছে—কিন্তু রাখাল কোথায় ? শোনা গেল ঘুমোচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, "একজন মাদুর বগলে করে যাত্রা শুনতে এসেছিল। যাত্রার দেরী দেখে মাদুরটি পেতে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন উঠল তখন সব শেষ হয়ে গেছে।" তারপর ? "তখন মাদুর বগলে ক'রে বাড়ি ফিরে গেলো।"

ডাক এসে গেলে কিভাবে সব ছেড়ে ছুটতে হয়, তাও সবাই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে শিখে নিলেন—

দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া—রাত্রি জ্যোৎস্নায় ভরা। সকলে শোয়ার কিছু পরেই গঙ্গায় বান এল। শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানা ছেড়ে 'ওরে বান দেখবি আয়' বলে ডাক দিয়ে পোস্তার উপরে ছুটলেন। সগর্জনে বান এসে গেল—উত্তাল তরঙ্গ উন্মত্তের মতো পোস্তার উপরে লাফিয়ে পড়তে লাগল। তা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের মতো আনন্দে নাচতে লাগলেন। এধারে ভক্তগণ ঠিক সময়ে হাজির হতে পারেননি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে কাপড়চোপড় সামলে বেরুতে হয়েছিল। তাঁরা যখন গেলেন, তখন বান প্রায় চলে গেছে—কেউ সামান্য দেখলেন, কেউ তাও নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এধারে বড় আনন্দে ছিলেন—বান চলে যাবার পরে ভক্তদের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে কেমন দেখলি ?' তাঁর ধারণা ছিল, সবাই তাঁর সঙ্গে ছুটে এসেছিল। যখন শুনলেন, কাপড়-চোপড় সামলে আসতে দেরী হয়ে গিয়েছিল, তার ফলে ঠিকভাবে বান দেখা হয়নি, তখন বললেন, 'দুর্ শালারা, তোদের কাপড় পরবার জন্য কি বান অপেক্ষা করবে ? আমার মতো কাপড় ফেলে দিয়ে এলি না কেন ?'

ছবির পর ছবি দেখলেন, গল্পের পর গল্প শুনলেন নরেন্দ্রনাথ—হাসতে-হাসতে

পেটে খিল ধরে গেল—তারই মধ্যে বদলে যেতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের গল্পগুলি সাহিত্যের সম্পদ। সেগুলি কখনো কয়েকটি আঁচড, কখনো পুরো নকৃশা, কখনো একেবারে ছোট গল্প। যেমন পোদোর গল্প—

"নরেন্দ্র ও তাঁহাব বন্ধুগণ পঞ্চবটীব চাতাল হইতে অবতবণ করিলেন ও ঠাকুবের কাছে আসিয়া দাঁডাইলেন। ঠাকুব দক্ষিণাস্য হইয়া নিজেব ঘবেব দিকে তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে-কহিতে আসিতেছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে হৃদয়মন্দিবে আগে প্রতিষ্ঠা কবো। বক্তৃত, লেকচার তারপর ইচ্ছা হয়তো কবো। শুধ ব্রহ্ম ব্রহ্ম বললে কি হবে যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে? ও তো ফাঁকা শঙ্খধ্বনি।

"এক গ্রামে পদ্মলোচন বলে একটি ছোকবা ছিল। লোকে তাকে পোদো বলে ডাকতো। গ্রামে একটি পড়ো মন্দিব ছিল। ভিতবে ঠাকুব বিগ্রহ নাই, মন্দিবেব গায়ে অশ্বত্থ গাছ, অন্যান্য গাছপালা হয়েছে। মন্দিবেব ভিতরে চামচিকে বাস করেছে। মেঝেতে ধূলো ও চামচিকেব বিষ্ঠা। মন্দিবে লোকজনের আব যাতায়াত নাই।

"একদিন সন্ধ্যার কিছু পবে গ্রামেব লোকেরা শঙ্খধ্বনি শুনতে পেলে। মন্দিরের দিক থেকে শাঁখ বাজছে ভোঁ-ভোঁ কবে। গ্রামেব লোকেবা মনে কবলে, হয়ত ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা কেউ করেছে, সন্ধ্যাব পব আবতি হচ্ছে। ছেলে বুড়ো পুরুষ মেয়ে সকলে দৌড়ে-দৌড়ে মন্দিরের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত—ঠাকুব দর্শন করবে আব আরতি দেখবে। তাবই মধ্যে একজন মন্দিবেব দ্বার আস্তে-আস্তে খুলে দেখে, পদ্মলোচন একপাশে দাঁড়িয়ে ভোঁ-ভোঁ শাঁখ বাজাচ্ছে—ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা নাই—মন্দিব মার্জনা হয় নাই—চামচিকাব বিষ্ঠা রয়েছে। তখন সে চেঁচিয়ে বলছে—

"মন্দিরে তোব নাহিক মাধব!
পোদো, শাঁখ ফুঁকে তুই কবলি গোল।
তায় চামচিকে এগার জনা দিবানিশি দিচ্ছে থানা—"

আরও কতকগুলি গল্প—উচ্চহাস্যও যাকে উড়িয়ে দিতে পারেনি কিংবা সরসতা যাকে কোমল করতে পাবেনি এমন কঠিন সেগুলি—সংসারসজ্জার তামাশাকে যা খুলে ধরেছিল—তাদের দু'একটিকে উপস্থিত কবা যায়। গল্পগুলির সামনে ঝুলছে হাসিব চিত্রিত যবনিকা, ভিতরে উদ্যত মোহমুদ্গর—

"শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার কথা লবে কে? আমি সঙ্গী খুঁজছি—আমার ভাবের লোক। খুব ভক্ত দেখলে মনে হয়, এই বুঝি আমার ভাব নিতে পাববে। আবার দেখি সে আর একরকম হয়ে যায়।

"একটা ভূত সঙ্গী খুঁজছিল। শনি-মঙ্গলবারে অপঘাত-মৃত্যু হলে ভূত হয়। ভূতটা যেই দেখে কেউ শনি-মঙ্গলবারে ঐরকম করে মরেছে, অমনি দৌড়ে যায়। মনে করে, এইবার বুঝি আমার সঙ্গী হল। কিন্তু কাছেও যাওয়া—আর সে লোকটা দাঁড়িয়ে উঠেছে। হয়তো ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়েছে, আবার বেঁচে উঠেছে।

"নরেন্দ্র যখন প্রথম-প্রথম আসে, ওর বুকে হাত দিতে বেহুঁস হয়ে গেল। তারপর চৈতন্য হলে কেঁদে বলতে লাগল, ওগো আমার এমন করলে কেন? আমার যে বাবা আছে, আমার যে মা আছে গো!

"গুরু শিষ্যকে বললেন, সংসার মিথ্যা, তুই আমার সঙ্গে চলে আয়। শিষ্য বললে, ঠাকুর, এরা আমায় এত ভালবাসে—আমার বাপ, আমার মা, আমার স্ত্রী—এদের ছেড়ে কেমন করে যাব? গুরু বললেন, তুই 'আমার' 'আমার' করছিস বটে, আর বলছিস—ওরা ভালবাসে—কিন্তু ওসব ভুল। আমি তোকে একটা ফন্দি শিখিয়ে দিচ্ছি, সেইটি করিস, তাহলে বুঝবি সত্যই ভালবাসে কি না! এই বলে একটা ঔষধের বড়ি তার হাতে দিয়ে বললেন, এইটি খাস, মড়ার মতন হয়ে যাবি। তোর জ্ঞান যাবে না, সব দেখতে শুনতে পাবি। তারপর আমি গেলে তোর ক্রমে-ক্রমে পূর্বাবস্থা হবে।

"শিষ্যটি ঠিক ঐরূপ করলে। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। মা, স্ত্রী সকলে আছড়া-পিছড়ি করে কাঁদছে। এমন সময় একটি ব্রাহ্মণ এসে বললেন, কি হয়েছে মা? তারা সকলে বললে, এ ছেলেটি মারা গেছে। ব্রাহ্মণ মরা-মানুষের হাত দেখে বললেন, সে কি, এতো মরে নাই। আমি একটি ঔষধ দিচ্ছি, খেলেই সব সেরে যাবে। বাড়ির সকলে তখন যেন হাতে স্বর্গ পেলে। তখন ব্রাহ্মণ বললেন, তবে একটি কথা আছে। ঔষধটি আগে একজনকে খেতে হবে, তারপর ওকে খেতে হবে। যিনি আগে খাবেন তাঁর কিন্তু মৃত্যু হবে। এর তো অনেক আপনার লোক আছে দেখছি, কেউ না কেউ অবশ্য খেতে পারে। মা কি স্ত্রী এঁর খুব কাঁদছেন, এঁরা অবশ্য খেতে পারেন।

"তখন তারা সব কান্না থামিয়ে চুপ করে রইল। মা বললেন, তাই তো, এই বৃহৎ সংসার, আমি গেলে কে এসব দেখবে শুনবে। এই বলে ভাবতে লাগলেন। স্ত্রী এইমাত্র এই বলে কাঁদছিল—দিদি গো, আমার কি হলো গো। সে তখন বললে, তাই তো, ওঁর যা হবার হয়ে গেছে! আমার দুটি-তিনটি নাবালক ছেলে-মেয়ে—আমি যদি যাই, এদের কে দেখবে!

"শিষ্য সব দেখছিল, শুনছিল। সে তখন দাঁড়িয়ে উঠে পড়ল, আর বললে, গুরুদেব চলুন, আপনার সঙ্গে যাই।

"আর একজন শিষ্য গুরুকে বলেছিল, আমার স্ত্রী বড় যত্ন করে ; ওর জন্য গুরুদেব যেতে পারছি না। শিষ্যটি হঠযোগ করতো। গুরু তাকেও একটি ফন্দী শিখিয়ে দিলেন। একদিন তার বাড়িতে খুব কান্নাকাটি পড়েছে—পাড়ার লোকেরা এসে দেখে, হঠযোগী ঘরে আসনে বসে আছে, এঁকে-বেঁকে—আডষ্ট হয়ে। সব্বাই বুঝতে পারলে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। স্ত্রী আছড়ে কাঁদছে—'ওগো, আমাদের কি হল গো—ওগো, তুমি আমাদের কি করে গেলে গো—ওগো দিদি গে', এমন হবে, তা জানতাম না গো।' এদিকে আত্মীয় বন্ধুরা খাট এনেছে, ওকে ঘর থেকে বার করছে।

"এখন একটি গোল হল। এঁকে-বেঁকে আডষ্ট হয়ে থাকতে সে দ্বার দিয়ে বেরুচ্ছে না। তখন একজন প্রতিবেশী দৌড়ে একটি কাটারি লয়ে দ্বারেব চৌকাট কাটতে লাগল। স্ত্রী অস্থির হয়ে কাঁদছিল—সে দুম্-দুম্ শব্দ শুনে দৌড়ে এল। এসে কাঁদতে-কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলে, 'ওগো, কি হয়েছে গো?' তারা বললে, 'ইনি বেরুচ্ছেন না, তাই চৌকাট কাটছি।' তখন স্ত্রী বললে, 'ওগো, অমন কর্ম করো না গো। আমি এখন রাঁড়-বেওয়া হলুম। আমার আর দেখবার লোক কেউ নাই ; কটি নাবালক ছেলেকে মানুষ করতে হবে! এ দোয়ার গেলে আর তো হবে না! ওগো, ওঁর যা হবার তা তো হয়েছে—হাত-পা ওঁর কেটে দাও।' তখন হঠযোগী দাঁড়িয়ে পড়ল। তার তখন ঔষধের ঝোঁক চলে গেছে। দাঁড়িয়ে বলছে, 'তবে-রে শালী, আমার হাত-পা কাটবে।' এই ব'লে বাড়ি ত্যাগ করে গুরুর সঙ্গে চলে গেল।"

নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন—আত্মবিকাশের সুযোগ দিতে —আবার এইটুকু জানাতে যে, স্বাধীনতাই শেষ কথা নয়। নরেন্দ্রনাথ তর্ক করুক—তর্ক করে সকলকে হারিয়ে দিক—তিনি চাইতেন। নরেন্দ্রের প্রতিভার প্রদর্শনী ঘটুক—এর জন্যই তাঁর ঐ তর্ক-পক্ষপাত নয় (তিনি বৃথা তর্ক একেবারে পছন্দ করতেন না)—ঐ তর্কের মধ্যে তিনি নরেন্দ্রনাথের সত্যসান্ধিৎসার আলোকশিখা দেখতেন। তিনি বলতেন, "দ্যাখ, চারটে দর্শনের পণ্ডিত, পাঁচটা দর্শনের পণ্ডিত, সব দুচার কথায় চুপ। কিন্তু এই ছোঁড়াটা আজ দু'বৎসর ধরে আমার সঙ্গে খটাখটি করছে। কেন জানিস? ইখানকার কাজ করবেক, তাই গড়ছি।" নরেন্দ্রনাথ অতসব বুঝতেন কিনা সন্দেহ, বুদ্ধির উত্তেজনায় এবং শত্রুনিপাতের উল্লাসে তিনি ভরপুর থাকতেন। দক্ষিণেশ্বরে এক প্রতাপ হাজরা ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছা-কাছি, বিশ্বাসের দ্বারে সংশয়ের দৌবারিকের মত। হাজরা অবশ্য একেবারে অবিশ্বাসী ছিলেন না, জপ-তপ করবার চেষ্টা করতেন, এবং সেই সঙ্গে সেসব যে করছেন, তা দেখিয়েও দিতেন। হাজরা তর্কাদিও করতেন। শেষোক্ত কারণে

হাজরার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব, যাঁর ক্ষত্রিয়স্বভাব ভক্তিরসে ডুবিয়ে তরবারিতে-মরচে পড়ানো পছন্দ করত না। বারান্দায় নরেন্দ্রের সঙ্গে হাজরার কথাবার্তা হচ্ছিল—সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ হাজির হয়ে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি গো! তোমাদের কি-সব হচ্ছে?' নরেন্দ্রও হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—'কত কি হচ্ছে—লম্বা-লম্বা কথা!' হাজরার বড়-বড় কথা, আত্মম্ভরিতা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কটাক্ষ ও কৌতুক করতে ছাড়তেন না। হাজরাকে ধমক দিতেন, আবার কিছুটা প্রশ্রয়ও দিতেন, কারণ 'জটিলে-কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না।' হাজরা ও নরেন্দ্রের পারস্পরিক তারিফ তাঁর কৌতুক-কটাক্ষের লক্ষ্য হত—

"হাজরার অহঙ্কারের কথা পড়িল। কোনো কারণে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী ত্যাগ করিয়া হাজরাকে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল।

"নরেন্দ্র। হাজরা এখন মানছে, তার অহঙ্কার হয়েছিল।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। ও-কথা বিশ্বাস করো না। দক্ষিণেশ্বরে আবার আসবার জন্ম ওরূপ কথা বলেছে। (ভক্তদিগকে) নরেন্দ্র কেবল বলে, 'হাজরা খুব লোক।'

"নরেন্দ্র। এখনও বলি।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন, এত সব শুনলি—

"নরেন্দ্র। দোষ একটু—কিন্তু গুণ অনেকটা।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। নিষ্ঠা আছে বটে!—সে আমায় বলে, এখন তোমার আমাকে ভাল লাগছে না—কিন্তু পরে আমাকে খুঁজতে হবে। শ্রীরামপুর থেকে একটি গোঁসাই এসেছিল, অদ্বৈতবংশ। ইচ্ছা এখানে একরাত্রি দু'রাত্রি থাকে। আমি যত্ন করে তাকে থাকতে বললুম। হাজরা বলে কি, 'খাজাঞ্চির কাছে ওকে পাঠাও।' এ-কথার মানে এই যে, দুধ-টুধ পাছে চায়, তাহলে হাজরার ভাগ থেকে কিছু দিতে হয়। আমি বললুম, তবে রে শালা, গোঁসাই বলে আমি ওর কাছে সাষ্টাঙ্গ হই; আর তুই সংসারে থেকে কামিনী-কাঞ্চন লয়ে নানা কাণ্ড করে, এখন একটু জপ করে এত অহঙ্কার হয়েছে! লজ্জা করে না!

"সত্ত্বগুণে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়; রজঃ তমোগুণে ঈশ্বর থেকে তফাত করে। সত্ত্বগুণকে সাদা রঙের সঙ্গে উপমা দিয়েছে; রজোগুণকে লাল রঙের সঙ্গে; আর তমোগুণকে কালো রঙের সঙ্গে। আমি একদিন হাজরাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বলো, কার কত সত্ত্বগুণ হয়েছে? সে বললে, 'নরেন্দ্রের ষোল আনা; আর আমার এক টাকা দুই আনা।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার কত হয়েছে?' তা বললে, 'তোমার এখনো লালচে মারছে—তোমার বারো আনা।' (সকলের হাস্য)

"দক্ষিণেশ্বরে বসে হাজরা জপ করতো। আবার ওরই ভিতর থেকে দালালীর

চেষ্টা করতো। বাড়িতে কয় হাজার টাকা দেনা আছে—সেই দেনা শুধতে হবে। রাঁধুনী বামুনদের কথায় বলেছিল, ওসব লোকের সঙ্গে আমরা কি কথা কই ?"*

নরেন্দ্রনাথের জীবনের বিরাট বৈপ্লবিক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হাজরার সঙ্গে হাসি-তামাশার সূত্রেই ঘটেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে একদিন জীব ও ব্রহ্মের অদ্বৈত-তত্ত্বের নানা কথা শুনে নরেন্দ্রনাথ ঘরের বাইরে গিয়ে হাজরার সঙ্গে ঐসকল কথা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা জুড়ে দিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে নিরাকার একেশ্বরবাদী নরেন্দ্রনাথের কাছে তখন অদ্বৈতবাদ ভয়াবহ তত্ত্ব—হাস্যকরও বটে। সুতরাং হাজরার সঙ্গে বসে তামাক টানতে-টানতে নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'তাও কি কখনো হয়, সবই ঈশ্বর ? ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর, যা দেখছি তা ঈশ্বর, আমি-তুমি সবাই ঈশ্বর—হাঃ হাঃ হাঃ!' নিজের জন্য ঈশ্বরত্বের দাবি ত্যাগ করার ঔদার্যে ও উল্লাসে নরেন্দ্রনাথ ও হাজরা যখন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছেন—ঠিক সেইসময়ে পরনের কাপড়খানি বগলে নিয়ে রামকৃষ্ণ সেখানে হাজির হয়ে নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করে এমন অবস্থা ঘটিয়ে দিয়েছিলেন, যার জন্য পরবর্তীকালে কীটকেও ভগবান বলতে তাঁর বাধবে না। সে প্রসঙ্গ এখানে আলোচ্য নয়।

নরেন্দ্রের তর্ক তবু সুন্দর, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তিনি চাইতেন, নরেন সাব

* আমার বন্ধু রসসাহিত্যিক কার্তিক মজুমদারের কাছে আমি একটি ব্যাপারে খুবই কৃতজ্ঞ—বহু বৎসর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালে তিনি কথামৃতের ধর্মাতিরিক্ত সাহিত্যগুণ সম্বন্ধে আমাকে সচেতন করেছিলেন, এবং সেইসময়ে হাজরা কী অনবদ্য চরিত্র, তা আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। অনেকদিন পরে তিনি আমাকে হাজরার বিষয়ে কিছু লিখতে অনুরোধ করেন : "এবার প্রতাপ হাজরাকে নিয়ে কিছু লেখো।···অমন বেপরোয়া, স্বধর্মে অটুট মহাজনটি আমার খুবই প্রিয়, সকলেরই প্রিয়। হাজরা না-থাকলে কথামৃতের অনেকখানি রস কমে যেত। কথামৃতে রামকৃষ্ণের দুটি ভক্ত উজ্জ্বল—নরেন্দ্রনাথ ও হাজরা।" আমি জানি, হাজরা সম্বন্ধে ঠিক-ঠিক যদি কেউ লিখতে পারেন তিনি কার্তিক মজুমদার। সুতরাং তাঁকেই ফিরে অনুরোধ করেছিলাম। স্বভাব-অলস এই মানুষটি কিছু সময়ের জন্য আলস্য সরিয়ে দু'চার টানে (ইনি আবার ভালো কার্টুনিস্টও বটেন) হাজরার যে-কথাচিত্র এঁকেছেন, পাঠকদের তা উপহার দিচ্ছি, এইটুকু জেনে যে, এখনো পর্যন্ত হাজরা সম্বন্ধে এর থেকে ভালো কিছু লেখা হয়নি :

"হাজরা ছিল রামকৃষ্ণ-পাঠশালার ব্যাক-বেঞ্চার। পাঠশালার যিনি গুরু তিনি জ্ঞানের সাগর অপেক্ষা রসের সাগর হিসাবে বড়। তাই খাঁটি লোহা হাজরার উপর তিনি কোনোদিন হস্তক্ষেপ করেননি ; তাঁর রসিক মন হাজরার বিকার কল্পনাও করতে পারত না। যে-পরশমণিটি ঠেকিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বিবেকানন্দ, গিরিশ ঘোষকে ভক্ত-ভৈরব করেছিলেন, সেটি তিনি হাজরার সামনে বার করেননি। তার একটা কারণ, হাজরা ওটা দেখলেই মেরে দিত, তারপর ব্যবসায়ে খাটাত।

"দ্বিতীয় কারণ, ঠাকুরের হুঁস ছিল যে, সংসারে সব শিলাই যদি শালগ্রাম শিলা হয় তো বাটনা বাটব কিসে ?—এই কারণেই হাজরা নির্বিকার ও চমৎকার।"

সঙ্গে তর্ক করুক এবং সবাই হারুক তার কাছে। মাস্টারের ( শ্রীম ) সঙ্গে নরেন্দ্রের তর্ক বাধিয়ে দিতে চেয়ে, খোঁচা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আজ বিদ্যে-বুদ্ধি বোঝা যাবে ; তুই মোটে আড়াইটে পাশ ( ম্যাট্রিক, আই-এ ; এবং বি-এ পড়ছেন )—আজ সাড়ে তিনটে পাস-করা মাস্টার ( ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ ; এবং বি-এল পড়ছেন ) এসেছে—চল তার সঙ্গে কথা বলবি।" তর্কের পরে মাস্টার-মশায় চলে গেলে তিনি বিশেষ খুশীতে বলেছিলেন, 'পাশ করলে কি হয়, মাস্টারটার মাদিভাব, কথা কইতেই পারে না।'

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট ভক্ত এবং ঢাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গেও শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের তর্ক বাধিয়ে দিতেন। ভগবান যদি দয়াময়, তাহলে এত দুঃখ কষ্ট কেন—এই পুরাতন প্রশ্নের একটি লাগসই উত্তর কেদার দিতেন, যেটি শ্রীরাম-কৃষ্ণের বড় পছন্দ ছিল। কেদার বলতেন, 'দয়াময় হয়েও ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিতে দুঃখ-কষ্ট অপমৃত্যু ইত্যাদি রাখবার কথা যেদিন স্থির করেছিলেন, সেদিনকার মিটিংয়ে আমাকে ডাকেন নি।' এই ভক্তের যুক্তি শুনিয়ে কিন্তু নরেন্দ্রকে ঠাণ্ডা করা যায় নি। এবং শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ভজনের সময়ে কেদারের ভাবাবেশ, পুলকাশ্রুর প্রসঙ্গ তুলেছিলেন, তখন নরেন্দ্রনাথ ঝাঁঝালো ভাবে বলেছিলেন, 'আপনি মশায় লোক-চরিত্র জানেন, আপনি ভাল-মন্দ বলতে পারেন ; নতুবা কান্নাকাটি দেখে ভাল-মন্দ কিছু বোঝা যায় না। একদৃষ্টে চেয়ে থাকলে চোখ দিয়ে অমন কত জল পড়ে। আর রাধার বিরহের কীর্তনে যারা কাঁদে তাদের বেশীর ভাগ নিজের বউয়ের সঙ্গে বিরহের কথা ভেবেই কাঁদে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ পুনশ্চ খুশি—'কেদারের কথাগুলো [ নরেন্দ্র ] কেমন কচ্‌কচ্‌ করে কেটে দিল।' 'খাপ-খোলা তলোয়ার' নরেন্দ্রনাথ—অযথা ভাবাবেগ বা আড়ম্বরের বিরুদ্ধে সর্বদাই ধৃতাস্ত্র। মহিম চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতেন। যাকে তিনি 'লোকমান্য' বলতেন, তার জন্য এঁর আগ্রহ সীমা ছাড়িয়ে অনেক সময় এঁকে হাস্যাস্পদ করে তুলত। সবকিছু ইনি গুরুতররকম করতে চাইতেন। এঁর গুরুর নাম নাকি 'আগমাচার্য ডমরুবল্লভ' ; পুত্রের নাম 'মৃগাঙ্কমৌলীপূতভুণ্ডী', বাড়ির পোষা হরিণের নাম 'কপিঞ্জল', একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলেছিলেন, তার নাম 'প্রাচ্য-আর্য-শিক্ষা-কাণ্ড-পরিষৎ।' পর্বদিনে দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী-মূলে তিনি ব্যাঘ্রচর্ম বিছিয়ে, গেরুয়াবস্ত্র পরে, রুদ্রাক্ষধারণ করে, একতারা নিয়ে সাড়ম্বরে সাধনা করতেন, এবং যাবার সময়ে ব্যাঘ্রচর্মটি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের এককোণে ঝুলিয়ে রেখে যেতেন, যাতে করে 'ওটি কার' জিজ্ঞাসা করে সবাই জানতে পারে—ওটি অন্য কারো নয়, মহাসাধক মহিম চক্রবর্তীর।

এহেন মহিম চক্রবর্তীকে বলাইবাহুল্য নরেন্দ্রনাথ বিনা আপত্তিতে মেনে নিতে-

পারেন না। চক্রবর্তী-মহাশয়ের বাড়িতে ইংরেজী সংস্কৃত নানা বই ছিল। নরেন্দ্রনাথ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'চক্রবর্তী মশায়, এসব বই পড়েছেন?' সবিনয়ে চক্রবর্তী-মহাশয় স্বীকৃতির ঘাড় নেড়েছিলেন। তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্রনাথ বই খুলে পাতা ওল্টাতে লাগলেন, দেখেন—বইয়ের পাতা কাটা নেই। অপ্রস্তুত মহিমাচরণ কৈফিয়ত দিলেন—'কি জানো ভায়া, লোকে আমার পড়া বইগুলি নিয়ে গিয়ে আর ফিরিয়ে দেয়নি ; তার জায়গায় ঐ নতুন বই কিনেছি।' নরেন্দ্রনাথের অবশ্য আবিষ্কার করতে দেরী হয়নি—মহিম চক্রবর্তীর কোনো বইয়ের পাতাই কাটা হয়নি। 'সব বই-ই চুরি গিয়েছিল?'—নরেন্দ্রনাথ এই প্রশ্ন করেছিলেন কি-না আমরা জানিনা।

চক্রবর্তী-মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের তর্ক বাধিয়ে দিতেন। মহিম চক্রবর্তী একতারা বাজিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করতেন—এবং এই কাজকেই ঈশ্বরলাভের একমাত্র পথ বলে ঘোষণা করতেন। এই মতের গোঁড়ামি দেখে তীব্রস্বরে নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, একতারা বাজিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করলেই ঈশ্বরদর্শন হবে তার প্রমাণ কি?' মহিম চক্রবর্তী বোঝাতে চাইলেন, 'নাদই ব্রহ্ম ; ঐ স্বরসংযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণের প্রভাবে ঈশ্বরকে দেখা দিতেই হবে—অন্য আর কিছু করবার দরকার নেই।' নরেন্দ্রের আর সহ্য হল না, খর ব্যঙ্গে ঝলসে উঠে বললেন, 'ঈশ্বর আপনার সঙ্গে ঐরকম লেখাপড়া করছেন না কি? কিংবা ঈশ্বর মন্ত্রৌষধিবশ সাপের মতো—সুর চড়িয়ে হুম্‌হাম্ করলেই তিনি সুড়্‌সুড়্ করে সামনে নেমে আসবেন?'

নরেন্দ্রের তর্ক বাধত সকলের সঙ্গে—গিরিশ ঘোষ, ডাঃ মহেন্দ্র সরকার, কেউই বাদ যেতেন না। গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তভৈরব–প্রতিভাবান নট নাট্যকার, সুপণ্ডিত। তাঁর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের তর্কের অবধি থাকত না। সেই অগ্নিময় সুখের দিনগুলির স্মৃতিচারণা করেছেন গিরিশ বিষাদ নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঃ

"গিরিশবাবু একদিন বলরামবাবুর বাড়িতে খাওয়ানোর কথায় বলিতে লাগিলেন, 'আমি আর নরেন পাশাপাশি বসেছি। যত আম আমার পাতে দিচ্ছে, সবগুলি মিষ্টি, আর নরেনকে যতগুলি দিয়েছে সব টক। এইতে নরেন চটে গিয়ে বললে, 'শালা জি-সি, তোমার পাতে যত মিষ্টি আম আর আমার পাতে যত টক—নিশ্চয় তুমি বাড়ির ভিতরে গিয়ে বন্দোবস্ত করে এসেছো।' আমি বললাম, 'আমরা গৃহী সংসারী, আমরাই তো মজা মারবো। তুই শালা সন্ন্যাসী-ফকির, পথে-পথে ঘুরে বেড়াবি, তোদের কপালে শুঁটকো-টোকো ছাড়া আর কি জুটবে?' এইতে লেগে গেল দুজনায় ঝগড়া। তারপর দুজনেই খুব খানিক হাসলুম। নরেন তার্কিক, আমিও তর্কে কম যাই না। ঝগড়া করে এমন সুখ আর কোথাও পাইনি। সে ঝগড়া কী মিষ্টি লাগত।' তারপর গিরিশবাবু খানিকক্ষণ মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার সমস্ত মুখের ভাবভঙ্গি বদলাইয়া গেল। এক ভিন্নভাবে ভিন্নস্বরে বলিতে লাগিলেন,

'কী ক্ষণে দু'জনের দেখা ! একদিনও যেন একটা মিষ্টি কথা বলতে পারলুম না, কেবল ঝগড়াই করলুম ! কিন্তু তার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি গালমন্দ না করলে যে আমার সোয়াস্তি হত না, বুকটা যেন খোলসা হত না।"

গিরিশের সঙ্গে নরেন্দ্রের তর্ক শ্রীরামকৃষ্ণ খুবই উপভোগ করতেন। তবে সেই সতর্ক শিক্ষক রঙ্গমঞ্চের গিরিশের সঙ্গে বালক ভক্তদের বেশি মেলামেশা করতে দিতেন না। ছোটো গাছের চারধারে বেড়া দিয়ে রাখতে হয়—তিনি বলতেন। এই প্রসঙ্গে নরেন্দ্রকে উপদেশচ্ছলে যে-কটি কথা বলেছিলেন, বস্তু-রস-রসিকতায় সেগুলি অনবদ্য ঃ

"শ্রীরামকৃষ্ণ। তুই গিরিশ ঘোষের ওখানে বেশি যাস্। কিন্তু রসুনের বাটি যত ধোও না কেন, গন্ধ একটু থাকবেই। যেমন কাকে-ঠোকরানো আম ; ঠাকুরদের দেওয়া যায় না, নিজেরও সন্দেহ। নূতন হাঁড়ি আর দৈ-পাতা হাঁড়ি ; দৈ-পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে ভয় হয় ; প্রায় দুধ নষ্ট হয়ে যায়।

"নরেন্দ্র। গিরিশ আগেকার সঙ্গ ছেড়েছে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। বড বেলায় দামডা হয়েছে। আমি বর্ধমানে দেখেছিলাম—একটা দামড়া—গাই-গরুর কাছে তাকে যেতে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এ কি হল, এ তো দামড়া ? তখন গাড়োয়ান বললে, মশায় এ বেশি বয়সে দামডা হয়েছিল।

"এক জায়গায় সন্ন্যাসীরা বসে আছে—একটি স্ত্রীলোক সেইখান দিয়ে চলে যাচ্ছে। সকলেই ঈশ্বরচিন্তা করছে, একজন আড়চোখে চেয়ে দেখলে। সে তিনটি ছেলে হবার পরে সন্ন্যাসী হয়েছিল।

"তবে কি এদের ঘৃণা করি ? না, ব্রহ্মজ্ঞান তখন আনি। তিনি সব হয়েছেন—সকলেই নারায়ণ। সব যোনিই মাতৃযোনি। তখন বেশ্যা ও সতীলক্ষ্মীতে কোনো প্রভেদ দেখি না।"

শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন অবতার বলে অনেকে গ্রহণ করেছেন, তখনো তাঁর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের বেপরোয়া ব্যবহার। নরেন্দ্রনাথ গান গাইবেন। তার আগে অনেকক্ষণ ধরে তানপুরা বাঁধছেন—তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। বিনোদ কৌতুক করে বলছেন, 'বাঁধা আজ হবে, গান আর একদিন হবে।' শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বলছেন, 'এমনি ইচ্ছে হচ্ছে যে, তানপুরাটা ভেঙ্গে ফেলি। কি টং টং! আবার তানা নানা নেরে নুম্ হবে।' ভবনাথ বললেন—'যাত্রার গোড়ায় অমনি বিরক্তি হয়।' নরেন্দ্র তানপুরা বাঁধতে-বাঁধতে উত্তর দিলেন—'সে না বুঝলেই হয়।' এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে খুশি হয়ে বললেন—'ঐ! আমাদের সব উড়িয়ে দিলে !!!'

শ্রীরামকৃষ্ণকে মুখের উপর মূর্খ বলেন নরেন্দ্রনাথ। বড় আনন্দে আত্মসমর্থন করছেন ঠাকুর—

"লবেন আমাকে যত মুক্খু বলে, আমি তত মুক্খু লই।"

তারপর বাঁ-হাতের চেটোয় ডান হাতের আঙুল দিয়ে লেখবার ভঙ্গি করে বিরাট দাবি জানালেন—'আমি অক্ষর জানি।'

শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বাসকে যদি কেউ টলাতে পেরে থাকেন—নরেন্দ্রনাথই (অর্থাৎ নরেন্দ্রের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসাই) পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক—অনবদ্য-নাটকীয় রচনা—

"নরেন্দ্র। Proof না হলে কেমন করে বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন?

"গিরিশ। বিশ্বাসই sufficient proof—এই জিনিসটা এখানে আছে, এর প্রমাণ?—বিশ্বাসই প্রমাণ।

"একজন ভক্ত। External world বাইরে আছে তা philosopher কেউ prove করতে পেরেছে? তবে বলেছে, irresistible belief.

"গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি)। তোমার সম্মুখে এলেও তো বিশ্বাস করবে না। হয়ত বলবে, ও বলছে আমি ঈশ্বর, মানুষ হয়ে এসেছি—ও মিথ্যাবাদী ভণ্ড।

"দেবতারা অমর এই কথা পড়িল।

"নরেন্দ্র। তার প্রমাণ কই?

"গিরিশ। তোমার সামনে এলেও তো বিশ্বাস করবে না!

"নরেন্দ্র। অমর, past ages-তে ছিল প্রুফ চাই।

"মণি পল্টুকে কি বলিতেছেন।

"পল্টু (নরেন্দ্রের প্রতি সহাস্যে)। অনাদি কি দরকার? অমর হতে গেলে অনন্ত হওয়া দরকার।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। নরেন্দ্র উকিলের ছেলে, পল্টু ডেপুটির ছেলে। (সকলের হাস্য)

"সকলে একটু চুপ করে আছেন।

"যোগীন (গিরিশাদি ভক্তদের প্রতি সহাস্যে)। নরেন্দ্রের কথা ইনি (ঠাকুর) আর লন না।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। আমি একদিন বলছিলাম, চাতক আকাশের জল ছাড়া আর কিছু খায় না। নরেন্দ্র বললে, চাতক এ জলও খায়। তখন মাকে বললুম, মা, এসব কথা কি মিথ্যা হয়ে গেল? ভারি ভাবনা হল। একদিন আবার নরেন্দ্র এসেছে। ঘরের ভিতর কতকগুলি পাখী উড়ছিল দেখে বলে উঠল—ঐ! ঐ! আমি বললাম—কী? ও বললে—ঐ চাতক! ঐ চাতক! দেখি কতকগুলো চামচিকে! সেই থেকে ওর কথা আর লই না। (সকলের হাস্য)

"শ্রীরামকৃষ্ণ। যদু মল্লিকের বাগানে নরেন্দ্র বললে, তুমি ঈশ্বরের রূপ-টুপ যা দেখ, ও মনের ভুল। তখন অবাক হয়ে ওকে বললাম, কথা কয় যে রে। নরেন্দ্র বললে, ও অমন হয়। তখন মার কাছে এসে কাঁদতে লাগলাম। বললাম, মা, এ কি হল! এ সব কি মিছে? নরেন্দ্র এমন কথা বললে! তখন দেখিয়ে দিলে—চৈতন্য—অখণ্ড চৈতন্য—চৈতন্যময় রূপ। আর বললে—'এ সব কথা মেলে কেমন করে, যদি মিথ্যে হবে!' তখন বলেছিলাম, শালা, তুই আমায় অবিশ্বাস করে দিছলি! তুই আর আসিস নাই!

"আবার বিচার হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বিচার করিতেছেন। নরেন্দ্রের বয়স এখন বাইশ বৎসর চার মাস হইবে।

"নরেন্দ্র (গিরিশ, মাস্টার প্রভৃতিকে)। শাস্ত্রই বা বিশ্বাস কেমন করে করি। মহানির্বাণতন্ত্র একবার বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞান না-হলে নরক হবে, আবার বলে, পার্বতীর উপাসনা ব্যতীত আর উপায় নাই! মনুসংহিতায় মনু লিখছেন মনুরই কথা! মোজেস্ লিখছেন Pentasteuch—তাঁরই নিজের মৃত্যুর কথা বর্ণনা! সাংখ্যদর্শন বলছেন, 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।' ঈশ্বর আছেন, এ প্রমাণ করবার যো নাই। আবার বলে, বেদ মানতে হয়, বেদ নিত্য।

"তা বলে এসব নাই, বলছি না। বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে দাও। শাস্ত্রের অর্থ যার যা মনে এসেছে তাই করেছে। এখন কোনটা লব? White light, red medium-এর মধ্য দিয়ে এলে লাল দেখায়, green medium এর মধ্য দিয়ে এলে green দেখায়।

"একজন ভক্ত। গীতা ভগবান্ বলেছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। গীতা সব শাস্ত্রের সার। সন্ন্যাসীর কাছে আর কিছু না থাকে, গীতা একখানি ছোট থাকবে।

"একজন ভক্ত। গীতা শ্রীকৃষ্ণ বলছেন।

"নরেন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, না ইয়ে বলেছেন—

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অবাক হইয়া নরেন্দ্রের এই কথা শুনিতেছেন।...

"আবার অবতারের কথা পড়িল।

"নরেন্দ্র। ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলেই হল। তারপর তিনি কোথায় ঝুলছেন বা কি করছেন—এ আমার দরকার নাই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড! অনন্ত অবতার!

" 'অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড' 'অনন্ত অবতার' শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিলেন ও বলিতেছেন, 'আহা!' "

নরেন্দ্রের কাছ থেকে 'অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত অবতার' এই জ্ঞানলাভ করলেও

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচলিত অবতারতত্ত্ব অপূর্ব সরস ভাষায় নরেন্দ্রনাথকে বোঝাতে ছাড়েননি।—

"শ্রীরামকৃষ্ণ। মানুষদেহ ধারণ করে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্বস্থানে সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা পূরে না, প্রয়োজন মেটে না। কি রকম জানো—গরুর যেখানটা ছোঁবে, গরুকে ছোঁয়াই হয় বটে। শিঙ্‌টা ছুঁলেও গাইটাকে ছোঁয়া হল, কিন্তু গাইটার বাঁট থেকেই দুধ হয়! (হাস্য)

"মহিম। দুধ যদি দরকার হয়, গাইটার শিঙে মুখ দিলে কি হবে—বাঁটে মুখ দিতে হবে। (সকলের হাস্য)

"বিজয়। কিন্তু বাছুর প্রথম-প্রথম এদিক-ওদিক ঢু মারে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। আবার কেউ হয়ত বাছুরকে ঐ রকম করতে দেখে বাঁটটা ধরিয়ে দেয়। (সকলের হাস্য)।"

হাসি—হাসি—হাসি। প্রশ্রয়ে হাসি, তিরস্কারে হাসি, শাসনে হাসি, শিক্ষায় হাসি, সমাধিতে হাসি, জাগরণে হাসি—একেবারে হাসির অষ্টপ্রহর। বলরাম-ভবনে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়েছেন—একটি হিন্দুস্থানি ভিখারী গান গাইছে। নরেন্দ্রের গান ভাল লেগেছে, তিনি গায়ককে বললেন, 'আবার গাও!' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'থাক্ থাক্, আর কাজ নেই, পয়সা কোথায়?' নরেন্দ্রকে সমঝালেন—'তুই তো বললি!' এক ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তামাশার সুযোগ ছাড়লেন না, হেসে বললেন —'মশায়, আপনাকে আমীর ঠাওরেছে, আপনি তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছেন।' কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে কথায় হারানো সম্ভব নয়—তিনি সকলকে হাসিয়ে উত্তর দিলেন—'ব্যায়রাম হয়েছে, ভাবতেও পারে।'

নরেন্দ্রের গান শুনলে শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মহারা হয়ে যেতেন। নিজের উপভোগকে কৌতুককাহিনীর সঙ্গে মিশিয়ে তিনি পরিবেশন করেছেন। অসুস্থ হয়ে তিনি শ্যামপুকুরের ভাড়া বাড়িতে আছেন, ডাঃ মহেন্দ্র সরকার চিকিৎসার জন্য এসেছেন, সেখানে নরেন্দ্রনাথ গানের পর গান গেয়ে গেছেন 'দেবদুর্লভ কণ্ঠে', মোহিত ডাক্তার সরকার অনেকক্ষণ আটকে পড়েছেন, যদিও তিনি উল্টোদিকে শ্রীরামকৃষ্ণকে এইসব গান শুনে ভাবাবিষ্ট হতে নিষেধ করেছিলেন। কথামৃতের বর্ণনা এইরকম অতঃপর—

"ডাক্তার একাগ্রমনে শুনিতেছেন। গান সমাপ্ত হইলে বলিতেছেন, 'চিদানন্দ-সিন্ধুনীরে—এটি বেশ!" ডাক্তারের আনন্দ দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন—'ছেলে বলেছিল, 'বাবা একটু (মদ) চেখে দেখ, তারপর আমায় ছাড়তে বলো তো ছাড়া যাবে।' বাপ খেয়ে বললে, 'তুমি বাছা ছাড়ো আপত্তি নাই, কিন্তু আমি ছাড়ছি না।"

গানের ব্যাপারে নরেন্দ্রের অভিমান ছিল না, বললেই গাইতেন। কিন্তু তা বলে এমন ভক্ত-দীনতাও তাঁর ছিল না যে, ভালো না লাগলেও গাইবেন। সুতরাং একবার শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধেও তিনি 'না' করলেন। বললেন, 'ঘরে যাই, অনেক কাজ আছে।' শ্রীরামকৃষ্ণও তখন ফোঁস করলেন।—'তা বাছা, আমাদের কথা শুনবে কেন? যার আছে কাণে সোনা, তার কথা আনা আনা। যার আছে পোঁদে ট্যানা, তার কথা কেউ শোনেনা।' শুনে সবাই হাসল। অপ্রস্তুত নরেন্দ্রনাথ অগত্যা যন্ত্র নেই, এই অজুহাত তুললেন—'যন্ত্র নাই শুধু গান—।' শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে বললেন, 'আমাদের বাছা যেমন অবস্থা! এইতে পারো তো গাও। তাতে বলরামের বন্দোবস্ত।' অতপর 'বলরামের বন্দোবস্তে'র অপূর্ব রসচিত্রটি পাওয়া গেল। কথাবার্তা বলরামের বাড়িতেই হচ্ছিল—

"শ্রীরামকৃষ্ণ। বলরাম বলে, 'আপনি নৌকা করে আসবেন। একান্ত না-হয় গাড়ি করে আসবেন। (সকলের হাস্য)। খ্যাঁট দিয়েছে। তাই আজ বৈকালে না'চিয়ে নেবে। (হাস্য)। এখান থেকে একদিন গাড়ি করে দিছলো—বারো আনা ভাড়া। আমি বললাম, বারো আনায় দক্ষিণেশ্বর যাবে? তা বলে, 'ও অমন হয়।' গাড়ি রাস্তায় যেতে-যেতে একধার ভেঙে পড়ে গেল। (সকলের উচ্চ হাস্য)। আবার ঘোড়া মাঝে-মাঝে থেমে যায়। কোনোমতে চলে না। গাড়োয়ান এক-একবার খুব মারে এক-একবার দৌড়ায়। (উচ্চ হাস্য)। তারপর রাম খোল বাজাবে—আর আমরা নাচবো—রামের তালবোধ নাই। (সকলের হাস্য)। বলরামের ভাব—আপনারা গাও, নাচো, আনন্দ করো। (সকলের হাস্য)।"

বলরাম ধনী, দানী, শ্রীরামকৃষ্ণের রসদদার, কিন্তু তিনি অপব্যয়কে এমনভাবে শাসনে রাখতে চাইতেন যে, তাঁকে আপাতত রীতিমতো কৃপণ বলে মনে হত। "কন্যা, দৌহিত্র ও শ্যালক অনেকদিন বাড়িতে থাকিলে বলরাম তাহাদের নিকট খরচের টাকা চাহিয়া লইতেন। ইহাতে তাঁহার পত্নী লজ্জিতা হইতেন।" বলরামের উত্তর ছিল—"সাধুসেবা ব্যতীত আত্মীয় পোষণ—ভূতভোজন মাত্র।" নিজের কনিষ্ঠা কন্যা কৃষ্ণময়ীর বিয়েতে যখন নিজ অগ্রজের আগ্রহে অনেক খরচ হয়ে গিয়েছিল, সেই 'অপব্যয়ের জন্য' তিনি সারাদিন অস্বস্তি ও মনঃকষ্টে ছিলেন। পরে দৈবযোগে স্বামী যোগানন্দ হাজির হলে ব্যাকুলভাবে বলেছিলেন, 'জানি, বিয়েতে খাওয়া সন্ন্যাসীদের নিষিদ্ধ। কিন্তু তুমি যদি একটাও মিষ্টান্ন খাও, জানব আমার সব সার্থক হল।'

সাধুসেবার কালেও অবশ্য পূর্বোক্ত 'বলরামের বন্দোবস্ত' মাঝে-মাঝে দেখা দিত: "স্বামীজী খাবেন, গলদা চিংড়ি হবে। মাছটা একটু বাসী ছিল। স্বামীজী দিব্যি খেয়ে গেলেন, কোনো খুঁত ধরলেন না। [বলরামের এক আত্মীয়] কিন্তু দোষ ধরেছে

বলরামবাবু বললেন, 'নরেন সোনারচাঁদ ছেলে, কিছু নিন্দে করলে না। [ পত্নীকে—] আর তোমার ভাই বললে, মাছ খারাপ।"

উক্ত 'সোনার চাঁদ' নরেন অপরপক্ষে বলরামকে তাঁর কৃপণতা নিয়ে কম মধুবাক্য শোনাতেন না। অসুস্থতা সত্ত্বেও বলরাম খরচের ভয়ে বায়ুপরিবর্তনে যেতে অনিচ্ছুক। তাঁকে খোঁচা দিয়ে স্বামীজী লিখেছিলেন, "সার কথা এই যে, আপনার ন্যায় দুর্বল অথচ অত্যন্ত নরম-শরীর লোকের অধিক অর্থব্যয় না করিলে উক্ত স্থানে [বৈদ্যনাথে] চলা অসম্ভব। যদি পরিবর্তনই আপনার পক্ষে বিধি হয়, এবং [ সেক্ষেত্রে ] যদি কেবল সস্তা খুঁজিতে এবং কেবল গয়ংগচ্ছ করিতে-করিতে এতদিন বিলম্ব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।...ইতিপূর্বে আপনাকে একখানা পত্র লিখি—তাহা কি আপনি পাইয়াছেন, না বেয়ারিং দেখিয়া the devil take it করিয়াছেন? আমি বলি change ( বায়ুপরিবর্তন) করিতে হয় তো শুভস্য শীঘ্রং। রাগ করিবেন না—আপনার একটি স্বভাব এই যে—ক্রমাগত 'বামুনের গরু' খুঁজিতে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ-জগতে সকল সময়ে তাহা পাওয়া যায় না। আত্মানং সততং রক্ষেৎ। Lord have mercy ( ঈশ্বর করুণা করুন ) ঠিক বটে, কিন্তু—He helps him who helps himself ( যে উদ্যমী, ভগবান তাহারই সহায় হন )। আপনি খালি টাকা বাঁচাতে যদি চান, Lord কি বাবার ঘর হইতে টাকা আনিয়া আপনাকে change করাইবেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণের হাসির কথায় ফেরা যাক। সে-হাসি কিন্তু সর্বদা সহজ-মধুর থাকেনি, কঠিন হয়েছে নানা সময়ে। যে-নরেন্দ্রের গানের ভিখারী শ্রীরামকৃষ্ণ—তারই গান প্রত্যাখ্যান করেছেন 'আলুনি' বলে। 'জন্মবিদ্রোহী কালাপাহাড়' নরেন্দ্রকে নিজ চেতনার সমুদ্রে স্নান করিয়ে নবজীবন দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শিক্ষা দিচ্ছেন—

"শ্রীরামকৃষ্ণ। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি?

"নরেন্দ্র। আমি মনে করব কুকুর ঘেউ-ঘেউ করছে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )। নারে অতদূর নয়। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাত থাকতে হয়। বাঘের ভিতরেও নারায়ণ আছেন, তা বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণের হাসি নরেন্দ্রনাথকে শেখালো—জীবনের সবটাই বিদ্রোহ নয়—সামঞ্জস্য করতে হয়। সৃষ্টির মধ্যে মন্দের অস্তিত্ব যখন অনিবার্য তখন মহাযোদ্ধাকেও বিশ্রাম নিতে হয়, অন্তত অশ্বপৃষ্ঠে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মরাজ্য অধিকার করার ক্ষেত্রে দিগ্বিজয়ী ( শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় ), কিন্তু সাংসারিক ব্যাপারে সামঞ্জস্যের পক্ষপাতী। তাঁর সাংসারিক আপসতত্ত্ব

উল্লিখিত 'বাঘ নারায়ণে'র গল্পে পেয়েছি—'হাতি নারায়ণ, মাহুত নারায়ণের গল্পে'ও তা রয়েছে। গুরু বলেছেন, সবই নারায়ণ; সুতরাং শিষ্য পাগলা হাতির সামনে দাঁড়াল, মাহুতের নিষেধ না শুনে—কারণ হাতি যে নারায়ণ! ফল যা হবার তাই হল—হাতি-নারায়ণ তাঁর ভক্তকে শুঁড়ে করে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেলেন। প্রাণটা কোনোক্রমে বাঁচল। গুরু এলেন। শিষ্য কাতর হয়ে অভিযোগ জানাল। গুরু বললেন, বাবা, হাতি-নারায়ণের দিকে এগিয়ে যাবার সময়ে মাহুত-নারায়ণের নিষেধটা শুনলে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ এই গল্পটি প্রায়ই বলতেন। একদা জনৈক মেজাজী সাধক বেশ চড়া সুরে শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে কথাবার্তা বলছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সামনে বিশেষ বিনয়ী, কারণ, তাঁর থিয়োরী—মাতাল (বা পাগল, বা রাগী বা দুর্জন) দেখলেই নমস্কার করে, পাশ কাটিয়ে সরে পড়বে। উক্ত গরম সাধুটি চলে যাবার পরে তাঁর বিষয়ে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মানসিক বিরূপতা দূর করবার চেষ্টা তিনি করছেন:

"শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি একজনকে বলেছিলুম, ও রজোগুণী সাধু, ওকে সিধে-টিধে দেওয়া কেন? আর একজন সাধু আমায় শিক্ষে দিলে—অমন কথা বলো না। সাধু তিন প্রকার,—সত্বগুণী, রজোগুণী, তমোগুণী। সেই থেকে আমি সবরকম সাধুকে মানি।"

এই কথা শোনার পরেও নরেন্দ্রনাথ চুপ করে থাকতে পারেন কখনো? শ্রীরাম-কৃষ্ণকে তাঁর কথা ফিরিয়ে দিয়ে রসিকতা করার যে-একচ্ছত্র অধিকার তাঁর ছিল, তাকে গ্রহণ করলেনই—

"নরেন্দ্র (সহাস্যে)। কি হাতি নারায়ণ?—সবই নারায়ণ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ শুনে হাসলেন। হাসতে-হাসতে সৃষ্টির সুগভীর বেদনাময় সত্যকে উন্মোচন করলেন—

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তিনি বিদ্যা অবিদ্যারূপে লীলা করছেন। দুইই আমি প্রণাম করি। চণ্ডীতে আছে তিনি লক্ষ্মী, আবার হতভাগাদের ঘরে অলক্ষ্মী।"

নরেন্দ্রনাথের বিচারপ্রবণতাকে তারিফ করেও শ্রীরামকৃষ্ণ জানিয়ে দিলেন, ধর্মপথে বিচার শেষপর্যন্ত এগোতে পারে না:

"শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি), যতক্ষণ বিচার ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই। তোমরা বিচার করছিলে, আমার ভাল লাগে নাই। নিমন্ত্রণ-বাড়ির শব্দ কতক্ষণ শুনা যায়? যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে। যাই লুচি-তরকারি পড়ে, বারো আনা শব্দ কমে যায়। (সকলের হাস্য)। অন্য খাবার পড়লে আরও কমতে থাকে। দই পাতে পড়লে কেবল সুপ্‌সাপ্। ক্রমে খাওয়া হয়ে গেলেই নিদ্রা। ঈশ্বরকে

যত লাভ হবে ততই বিচার কমবে। তাঁকে লাভ হলে আর শব্দ—বিচার—থাকে না। তখন নিদ্রা—সমাধি।"

নরেন্দ্র শক্তি মানেন না তখনো। তাঁর অহঙ্কার—'আমি মানলে সকলেই মানবে—তাই কেমন করে মানি?' শ্রীরামকৃষ্ণ বোঝালেন—'দেহধারণ করলেই শক্তি মানতে হয়।' কিভাবে সকলকে শক্তি মানতেই হয়, উপমা দিয়ে তা বোঝালেন, 'জজ সাহেব পর্যন্ত যখন সাক্ষী দেয়, তাঁকে সাক্ষীর বাক্সে নেমে এসে দাঁড়াতে হয়।'

তথাকথিত পুঁথিগত শিক্ষার অসারত্ব নরেন্দ্রকে বোঝালেন উপমাযোগে:

"শ্রীরামকৃষ্ণ। সত্য বলছি, আমি বেদান্ত-আদি শাস্ত্র পড়ি নাই বলে একটু দুঃখ হয় না। আমি জানি, বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আবার গীতার সার কি? গীতা দশবার বললে যা হয়—ত্যাগী, ত্যাগী।

ধর্মের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ যথার্থ সন্ন্যাসীর আচরণীয় ধর্মের ক্ষেত্রে, শ্রীরামকৃষ্ণ কোনো আপসকে সহ্য করতে পারতেন না। 'এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি'—এই হল সংসারের আদর্শ ধর্মাচরণ—স্মিত কৌতুকে বলতেন, কিন্তু জানতেন, ঘর না-পুড়িয়ে কেউ পরিব্রাজক হয় না। কেশব সেনের সংসার ও ধর্ম মেলাবার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কৌতুক করে নরেন্দ্র প্রভৃতিকে বলেছিলেন:

"শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশব সেন উপাসনা করছিল—বলে, 'হে ঈশ্বর, তোমার ভক্তি-নদীতে যেন ডুবে যাই।' সব হয়ে গেলে কেশবকে বললুম, ওগো, তুমি ভক্তিতে ডুবে যাবে কি করে? ডুবে গেলে, চিকের ভিতর যারা আছে তাদের কি হবে? তবে এক কর্ম করো—মাঝে মাঝে ডুব দিও, আর এক-একবার আড়ায় উঠো।"

নরেন্দ্র—কেশব সেন হোক, শ্রীরামকৃষ্ণ চাননি। চেয়েছিলেন নরেন্দ্র হোক তাঁরই মতো 'শনিবারের ভূত'। নরেন্দ্রের রবিবাসরীয় সাবধানী ধর্মকে তাই হাসির খড়্গে বারে-বারে ছিন্ন করেছেন। নরেন্দ্র—তাঁর 'নরেন'—যার ভিতর এমন আগুন জ্বলছে যাতে পড়লে কাঁচা কলাগাছ পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে যায়—সেও সংসারে আপসের পথে যাবে, সেও ভাববে, শিবনাথের মতো, বেশি ঈশ্বরচিন্তা করলে মানুষ বেহেড হয়!! সেও বলবে—ডুব দেবোনা—পাড়ে বসে মুখ বাড়িয়ে রস খাবো!!!—

"শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলাম—ঈশ্বর রসের সমুদ্র, তুই এ-সমুদ্রে ডুব দিবি কিনা বল্? আচ্ছা মনে কর্, খুলিতে এক খুলি রস রয়েছে, আর তুই মাছি হয়েছিস—কোথা বসে রস খাবি বল্? নরেন্দ্র বললে, আমি খুলির আড়ায় বসে

মুখ বাড়িয়ে খাবো ; কেননা বেশি দূরে গেলে ডুবে যাবো। তখন আমি বললাম, বাবা, এ সচ্চিদানন্দ সাগর—এতে মরণের ভয় নেই—এ সাগর অমৃতের সাগর। যারা অজ্ঞান তারাই বলে, ভক্তি প্রেমের বাড়াবাড়ি করতে নেই। ঈশ্বরপ্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে ?"

ঈশ্বরপ্রেমের বাড়াবাড়ি করতে নেই—এই সাবধানী ধারণার মতো আরও এক উদ্ভট ধারণা—'ঈশ্বর নীরস—তোমরা নিজের প্রেমভক্তি দিয়ে সরস করো।' সমাধ্যায়ী নামক পণ্ডিতের ঐ অপূর্ব উক্তিকে সকৌতুক বিদ্রূপে লাঞ্ছিত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। বেদে যাকে রসস্বরূপ বলেছে, তাঁকে কি নীরস বলে ? এতে বোধ হচ্ছে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর কী বস্তু কখনো ভাবে নাই, তাই এরূপ গোলমেলে কথা। একজন বলেছিল, 'আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে।' একথায় বুঝতে হবে, ঘোড়া আদবেই নাই, কেননা গোয়ালে ঘোড়া থাকে না।"

সুতরাং কঠিন থেকে কঠিনতর হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের হাসি—যখন দেখেছেন নরেন্দ্রনাথের চিন্তা বা ভাবনার দুর্বলতা। নরেন্দ্রের অতীব শোকের যাতনার ক্ষণকে তিনি আঘাতের ক্ষণরূপে বেছে নিয়েছিলেন। নরেন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়েছে—অন্ন জোটে না। সুন্দর সাজানো দারিদ্র্য নয়—একেবারে পেটের জ্বালা—তবু সেই দারিদ্র্যের সঙ্গে বিনা বিকারে লড়াই করতে হবে নরেন্দ্রনাথকে—সে না পুরুষ মানুষ! সে কি বিরহিণী নারী ? কৌতুকের শরে বিদ্ধ করে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে শুধোলেন : "তুই কি হাজরার কাছে বসেছিলি ? তুই বিদেশিনী, সে বিরহিণী। হাজরারও দেড় হাজার টাকা দরকার।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্রূপ করেই চললেন—

"শ্রীরামকৃষ্ণ। তুই তো 'খ' ( আকাশবৎ ) ; তবে যদি টেক্‌সো না থাকত।

"কৃষ্ণকিশোর বলত, 'আমি খ'। একদিন তার বাড়িতে গিয়ে দেখি, সে চিন্তিত হয়ে বসে আছে। বেশি কথা কচ্ছে না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে গা, এমন করে বসে রয়েছ কেন ? সে বললে, 'টেকসোওয়ালা এসেছিল ; সে বলে গেছে, টাকা যদি না দাও তাহলে ঘটি-বাটি নীলাম করে নিয়ে যাব। তাই আমার ভাবনা হয়েছে।' আমি হাসতে-হাসতে বললাম, সে কি গো, তুমি তো 'খ'—আকাশবৎ ; যাক্ শালারা ঘটি-বাটি নিয়ে থাক্, তোমার কি।"

নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতর হয়ে উঠতে লাগল শ্রীরামকৃষ্ণের পরিহাস। নরেন্দ্রনাথের অভিপ্রায়—বাড়ির কিছু অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দিয়ে সন্ন্যাস নেবেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। তীব্র বৈরাগ্য হলে ওসব হিসাব থাকে না। 'বাড়ির সব বন্দো-

বস্ত করে দেব তবে সাধনা করব'—তীব্র বৈরাগ্য হলে এরূপ মনে হয় না। গোঁসাই লেকচার দিয়েছিল ; তা হলে, দশ হাজার টাকা হলে ঐ থেকে খাওয়া-দাওয়া এই সব হয়—তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বরকে বেশ ডাকা যেতে পারে। ··

"একটি মেয়ের ভারি শোক হয়েছিল। আগে নৎটা কাপড়ের অাঁচলে বাঁধলে—তারপর 'ওগো! আমার কি হল গো!' বলে আছড়ে পড়ল, কিন্তু খুব সাবধান, নৎটা না ভেঙে যায়।"

গল্প শুনে সকলের হাসি থামে না, আর যাঁর উদ্দেশ্যে গল্পটি বলা, সেই—

"নরেন্দ্র এই সকল শুনিয়া বাণবিদ্ধের ন্যায় একটু কাত হইয়া শুইয়া পড়িলেন।"

এতখানি কঠিন হাসি শ্রীরামকৃষ্ণ অল্পই হেসেছেন—যে হাসি গিয়ে পুড়িয়েছে তাঁর অপর সত্তাকে—নরেন্দ্রনাথকে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরে এক পরম নিষ্ঠুর মানুষ ছিল, জগতের যজ্ঞে নরেন্দ্রকে বলি দিয়ে যে তৃপ্ত—যে ভাবছে, ভালই হচ্ছে নরেন্দ্র দুঃখ পাচ্ছে, পেটের জ্বালায় জ্বলছে, নইলে সে-কি অপরের দুঃখ বুঝত।

এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরশায়ী আর একটি মানুষ—সে বাঁধা পড়েছিল ভালবাসায়। সেই ভালবাসার কাছে নরেন্দ্র ধরা দিয়েছিলেন।—'তুমি তো মূর্খ, তুমি জানো কি? আমি মিল জানি, হ্যামিলটন জানি—তুমি আমাকে শেখাবে কি? তবু তোমার কাছে আসি কেন? ভালবাসি বলে।'

জগতের সকল হাসি এবং কান্নার মূলে আছে এই 'ভালবাসা' কথাটি। ভালবাসা থেকেই কান্নার কালো কালিন্দীর জন্ম। আবার কত সময় কান্নার কালো জলের উপর হাসির শ্বেতপদ্ম—রক্তপদ্ম—ফুটে ওঠে। রসশাস্ত্রীরা তাকেই 'হিউমার' বলেন যখন তাঁরা দেখেন—রাত্রির নীলপদ্ম আলোর ছলনায় রক্তপদ্ম হয়ে উঠেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ভালবাসার মনটি পূর্ণ হয়ে আছে বিধাতার প্রতি নিগূঢ় অভিমানে। সকরুণ পরিহাসের অনবদ্য ছবিটি ঃ

"শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্য ও ভক্তদের প্রতি)—দেহের দুঃখ আছেই। দেখনা নরেন্দ্র—বাপ মারা গেছে। বাড়িতে বড় কষ্ট, কোন উপায় হচ্ছে না। তিনি কখনো সুখে রাখেন, কখনো দুঃখে।

"ত্রৈলোক্য। আজ্ঞে ঈশ্বরের (নরেন্দ্রের উপর) দয়া হবে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। আর কখন হবে। কাশীতে অন্নপূর্ণার বাড়ি কেউ অভুক্ত থাকে না বটে কিন্তু কারো-কারো সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকতে হয়।

"হৃদে শম্ভু মল্লিককে বলেছিল, আমায় কিছু টাকা দাও। শম্ভু মল্লিকের ইংরেজী মত—সে বললে, তোমায় কেন দিতে যাব? তুমি খেটে খেতে পারো, তুমি যা হোক কিছু রোজগার করছ। তবে খুব গরীব হয় সে এক কথা; কি কানা, খোঁড়া, পঙ্গু—এদের দিলে কাজ হয়। তখন হৃদে বললে, মহাশয়! আপনি উটি বলবেন না।

আমার টাকায় কাজ নাই। ঈশ্বর করুন যেন আমার কানা, খোঁড়া, অতি দরিদ্দীর এসব না হতে হয়। আপনারও দিয়ে কাজ নাই, আমারও নিয়ে কাজ নাই।”

মূর্খ মানুষটি—জগতের সর্ব রহস্যের কেন্দ্রে বসে আছেন। তিনি স্পর্শ করেছেন নরেন্দ্রনাথকে। নরেন্দ্রনাথ বললেন, গত শনিবার এখানে ধ্যান করছিলাম। হঠাৎ বুকের ভিতর কি রকম করে এল।...আজ সকালে বাড়িতে গেলাম। সকলে বকুতে লাগল, আর বললে, কি হো-হো করে বেড়াচ্ছিস? আইন-এগজামিন নিকটে, পড়া-শোনা নাই, হো-হো করে বেডাচ্ছ!...দিদিমার বাডিতে সেই পড়তে গেলাম। পড়তে গিয়ে—পডাতে একটা ভয়ানক আতঙ্ক এল—পডাটা যেন কী ভয়ের জিনিস! বুক আটুপাটু করতে লাগল! অমন কান্না কখনো কাঁদি নাই। তারপর বই-টই ফেলে দৌড়—রাস্তা দিয়ে ছুট। জুতো-টুতো রাস্তায় কোথায় একদিকে পড়ে রইল। খড়ের গাদার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম—গা-ময় খড—আমি দৌড়ুচ্ছি কাশীপুরের রাস্তায়—’

কাশীপুরে অপেক্ষা ক’রে ছিলেন মূর্খ মানুষটি—প্রস্তুত হয়ে—

“নরেন্দ্র চীৎকার করে উঠলেন—Lo! The Man is entering into me!

“তাই শুনে ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, ‘শালা, মনে করেছ, তোমার কিড়িরমিড়ির ইংরিজি-বুলি বুঝি না? তুমি বলছ—আমি তোমার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি।”

অনেকদিন পরে স্বামীজী আমেরিকায় বললেন—

“আমি এমন একজন মানুষের শিষ্য যিনি নিজের নামটাও ভাল করে লিখতে পারতেন না। কিন্তু আমি তাঁর পা ছোঁয়ারও যোগ্য নই। আমার এই বুদ্ধিকে যদি উপড়ে গঙ্গায় ফেলে দিতে পারতাম।”

“কিন্তু স্বামীজী!”—এক মহিলা প্রতিবাদ করে ওঠেন—“আপনার বুদ্ধির জন্যই তো আপনাকে এত পছন্দ!”

“তার কারণ, মহাশয়া,” স্বামীজী বললেন, “আপনি নির্বোধ—আমারই মতো!!”

কোন্ পরম রসিককে নরেন্দ্রনাথ নিত্য দেখেছিলেন, তার আরও কিছু পরিচয় উদ্ধার করা যেতে পারে। অগণ্য বিষয়ে রামকৃষ্ণের অজস্র হাসি—তার খণ্ডাংশ মাত্র ধরে রাখা হয়েছে—যা ধরা আছে তারও খণ্ডাংশ মাত্র এখানে উপস্থিত করতে পারি। অভিনয়ের ভঙ্গিতে, অত্যন্ত জীবন্ত করে শ্রীরামকৃষ্ণ বক্তব্যকে প্রকাশ করতে পারতেন, উপস্থিত-বুদ্ধি ছিল অসাধারণ, বাকপটুতাও তদনুরূপ। এই তথাকথিত অশিক্ষিত মানুষটির শব্দশ্লেষ করবার ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। যার গানে তাল মেলে না, সে তাঁর কাছে ‘বেতালসিদ্ধ।’ চারটে পাস জ্ঞানবাবু হাজির হলে তিনি শুধোন—

'কি গো, হঠাৎ যে জ্ঞানোদয় ?' আবার উল্টোদিকে কেউ পাস করতে না পারলে সে হয় 'পাশমুক্ত'। মধুসূদন নামক ডাক্তার যখন তাঁর ভাঙা হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে থাকেন, তখন তিনি সকৌতুকে বলেন—'ঐহিক ও পারত্রিকের মধুসূদন।' বালক ভক্ত নারাণকে এক মহিলা গোপালভাবে দেখেন; তাকে সতর্ক করে বলেন, 'সাবধান! গোপাল যেন মদনগোপাল না হয়।' এবং কাব্যে বিচিত্র সংস্কৃত শোনার পরে বিচিত্রতর সংস্কৃত শুনিয়ে দেন তৎক্ষণাৎ—'হাঁ, একজন যেমন বলেছিল, মাতারং ভাতারং খাতারং, অর্থাৎ মা ভাত খাচ্ছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—'গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে।' পৃথিবীর কঠিনতম কাজ—ঐ 'মাল' বেছে নেওয়া। গোলমাল পাকাতেই সকলে ভালবাসে। তাদের মামার বাড়িতে 'এক গোয়াল ঘোড়া' থাকে। তারা লেখাপড়া শেখে নির্বোধ নকলনবিশ হবার জন্য। তেমন শিক্ষিতজনের চেহারা অশিক্ষিত রামকৃষ্ণের চোখে—

"একটা গল্প শোনো। একজন এসে বললে, 'ওহে, ও-পাড়ায় দেখে এলুম, অমুকের বাড়ি হুড়্মুড়্ করে ভেঙ্গে পড়ে গেছে।' যাকে ও-কথা বললে, সে ইংরাজি লেখাপড়া জানে। সে বললে, 'দাঁড়াও, একবার খপরের কাগজখানা দেখি।' খপরের কাগজ পড়ে দেখে যে, ভাঙার কথা কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বললে, 'ওহে, তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি না। কই, বাড়ি ভাঙার কথা তো খপরের কাগজে লেখা নাই। ওসব মিছে কথা।' "

এর সঙ্গে আছে স্বার্থপর বুদ্ধিমানেরা, যাদের হিসেবী বুদ্ধি হরবল্লভের ভাষায় সর্বদাই বলে—'মরিয়া তো গিয়াছি, দুর্গানাম করিয়া কি হইবে ?' হরবল্লভের ছবি বঙ্কিমচন্দ্র এঁকেছেন তিক্ত বিদ্রূপ মিশিয়ে। আর শ্রীরামকৃষ্ণের আঁকা নিম্নের নকশায় বিদ্রূপের তুলনায় কৌতুকের পরিমাণ অধিক—

"একজন লোকের পাহাড়ের উপর একখানা ঘর ছিল। কুঁড়েঘর। সে অনেক মেহনত করে ঘরখানি করেছিল। কিছুদিন পরে একদিন ভারি ঝড় এল। কুঁড়েঘর টলমল করতে লাগল। তখন ঘররক্ষার জন্য সে ভারি চিন্তিত হল। বললে, 'হে পবনদেব, দেখো, ঘরটি ভেঙো না বাবা!' পবনদেব কিন্তু শুনছেন না—ঘর মড়মড় করতে লাগল। তখন লোকটি একটা ফিকির ঠাওরাল—তার মনে পড়ল যে হনুমান পবনের ছেলে। যেই মনে পড়া অমনি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—'বাবা, ঘর ভেঙো না, হনুমানের ঘর, দোহাই তোমার!' তবু ঘর মড়মড় করে। কেবা তার কথা শোনে! অনেকবার 'হনুমানের ঘর, হনুমানের ঘর' করার পর দেখলে যে, কিছুই হল না। তখন বলতে লাগল—'বাবা, লক্ষ্মণের ঘর, লক্ষ্মণের ঘর!' তাতেও হল না। তখন বলে—'বাবা, রামের ঘর, রামের ঘর! দেখো বাবা, ভেঙো না দোহাই তোমার!'

তাতেও কিছু হল না। ঘর মড়মড় করে ভাঙতে আরম্ভ হল। তখন প্রাণ বাঁচাতে হবে—লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় বলছে—'যা, শালার ঘর!' "

অনুরূপ একটি গল্প, যাতে অবশ্য বিদ্রূপই বেশি—

এক ব্রাহ্মণ অতি যত্নে একখানি বাগান করেছিল। নানারকম ফুল ফলে সেটির সৌন্দর্যের সীমা ছিল না। বাগানটি ছিল ব্রাহ্মণের প্রাণ; তা নিয়ে সে সর্বদাই গৌরব করত। একদিন হয়েছে কি, দরজা খোলা পেয়ে একটা গরু ঢুকে পড়েছে বাগানে, আর মুড়িয়ে খেতে আরম্ভ করে দিয়েছে ফুলগাছগুলি। ব্রাহ্মণ বাইরে গিয়েছিল—ফিরেই দেখে এই কাণ্ড! রাগে অন্ধ হয়ে সে একটা লাঠি তুলে নিয়ে গরুর উপর বসিয়ে দিলে। মোক্ষম মার! এক আঘাতেই গরু ধড়পড় করে মরে গেল। দেখে ব্রাহ্মণের আফশোসের শেষ রইল না—ইস্ ব্রাহ্মণ হয়ে শেষে গোহত্যা করলুম। এ যে মহাপাপ। অনেক ভাবনার পরে ব্রাহ্মণ একটা সাফাই খুঁজে পেল। শাস্ত্রে আছে, মানুষ যন্ত্র—দেবতারা যন্ত্রী—তাঁরা যা করান মানুষ তাই করে। সুতরাং আমি গোহত্যা করিনি—ও ইন্দ্রের কীর্তি। এইরকম চিন্তা করে ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হল, এবং যখন গোহত্যা-পাপ ব্রাহ্মণকে ধরতে এল, তাকে সে খেদিয়ে ইন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিলে। ওধারে ইন্দ্র পড়লেন মুশকিলে। তিনি তখন অগত্যা গোহত্যা-পাপের কাছে খানিক সময় চেয়ে নিয়ে, মানবরূপ ধরে, মর্ত্যে এলেন, এবং উপস্থিত হলেন ব্রাহ্মণের বাগানে। ব্রাহ্মণ বাগানের পরিচর্যা করছিল। মানববেশী ইন্দ্র বাগানে ঢুকেই গাছপালার প্রশংসা করতে আরম্ভ করলেন—'আহা! কি সুন্দর গাছ! কি সুন্দর পাতাগুলি! কি সুন্দর ফুল! আহা, না জানি এসব কে করেছে?' সেকথা শুনে ব্রাহ্মণ আহ্লাদে আটখানা। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললে—'এ বাগান আমার, এ সবই আমি করেছি।' 'তাই না কি? সব আপনি করেছেন?'—ইন্দ্র বললেন। 'নিশ্চয়, সব আমার করা।' তখন ইন্দ্র বাগানের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে বলতে লাগলেন—'কী অপূর্ব এই ফুলগাছটি—এও আপনি করেছেন?'—'হাঁ, আমিই করেছি।' 'গাছগুলি এইভাবে লাগানো কী চমৎকার হয়েছে—এ বোধহয় অন্যের করা?' —'না না, ওসবও আমিই করেছি।' 'ফুলের এই বেদীটা কার করা—এমন জিনিস তো আগে দেখিনি।' ব্রাহ্মণ গদ্‌গদ্ হয়ে বলল—'আপনাকে আর কি বলব, এ বাগানে এমন কিছুই নেই, যা আমার করা নয়।' 'আহা আহা' বলতে-বলতে ইন্দ্র এগিয়ে চললেন—আর ঠিক গিয়ে পড়লেন সেখানে, যেখানে মরা গরুটি পড়ে আছে। দেখেই ইন্দ্র শিউরে উঠলেন—'আরে রাম রাম! এ যে গোহত্যা—এ মহাপাপ করল কে!' ব্রাহ্মণ এবার থতমত খেয়ে চুপ। তার এতক্ষণের 'আমি করেছি, আমি করেছি'র স্রোত বন্ধ হয়ে গেল। আমতা-আমতা করেন বললে—'তা—অ্যাঁ—হাঁ—গরুটা আমি মেরেছি—কিন্তু—' ব্রাহ্মণ মরীয়া হয়ে বলল—'ওতে আমার পাপ হয়নি।' ইন্দ্র

বললেন,—'সে কি ? গরু মেরেও পাপ করেননি ?' ব্রাহ্মণ চটে বলল—'আমার পাপ কোথায় ? যিনি আমাকে দিয়ে সব করাচ্ছেন, সেই ইন্দ্রই পাপের কারণ।' ইন্দ্র তখন নিজ মূর্তি ধরলেন—'তবে রে ব্যাটা ভণ্ড বামুন। বাগান করার বেলা তুমি করেছ, আর গোহত্যার বেলা ইন্দ্র করেছে ? নে, তোর গোহত্যার পাপ নে—।'

সংসারীর ধর্ম, সংসারীর ঈশ্বর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের এই মনোরম মন্তব্য—

"বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জানো ? যেমন খুড়ি-জেঠির কোঁদল শুনে ছেলেরা খেলা করবার সময় পরস্পর বলে, 'আমরা ঈশ্বরের দিব্য', আর যেমন কোনো ফিটবাবু পান চিবুতে-চিবুতে ইস্টিক হাতে করে বাগানে বেড়াতে-বেড়াতে একটি ফুল তুলে বন্ধুকে বলে—'ঈশ্বর কি বিউটিফুল ফুল করেছেন।"

মানুষের বিচিত্র রুচি সম্বন্ধে কিছু নিরপেক্ষ বক্তব্য—

"বারোয়ারীতে নানা মূর্তি করে।...রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী, সীতারাম।...প্রত্যেক মূর্তির কাছে লোকের ভিড় হয়েছে। যারা বৈষ্ণব তারা বেশি রাধাকৃষ্ণের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে, যারা শাক্ত তারা হরপার্বতীর কাছে, যারা রামভক্ত তারা সীতারাম-মূর্তির কাছে। তবে যাদের কোনো ঠাকুরের দিকে মন নাই তাদের আলাদা কথা। বেশ্যা উপপতিকে ঝাঁটা মারছে—বারোয়ারীতে এমন মূর্তিও করে। ওসব লোক সেইখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখে, আর চীৎকার করে বন্ধুদের বলে—আরে, ওসব কি দেখছিস, এদিকে—আয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিয়ে শেখাতেন। গুরুতর বিষয় বোঝাতে যেসব কৌতুকজনক কথা-গল্প বলতেন, তার দু'একটি নমুনা এখানে দিতে পারি। শাস্ত্র ইত্যাদি যে ঈশ্বর নয়, তা যে কেবল ঈশ্বরপথের নির্দেশ মাত্র দিতে পারে এবং তা পেয়ে গেলে ওসবের কোনো প্রয়োজন থাকে না—এই কথাটি বোঝাতে শ্রীরামকৃষ্ণের এই সরস দৃষ্টান্ত—

"একজন একখানি চিঠি পেয়েছিল—কুটুম্ববাড়ি তত্ত্ব করতে হবে, কি কি জিনিস চাই, লেখা ছিল। জিনিস কিনতে দেবার সময় চিঠিখানি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কর্তাটি তখন ব্যস্ত হয়ে চিঠির খোঁজ আরম্ভ করলেন। অনেকক্ষণ ধরে অনেকজন মিলে খুঁজলে। শেষে পাওয়া গেল। তখন আর আনন্দের সীমা নাই। কর্তা ব্যস্ত হয়ে অতি যত্নে চিঠিখানি হাতে নিলেন আর দেখতে লাগলেন, কি লেখা আছে। লেখা এই—'পাঁচসের সন্দেশ পাঠাইবে, একখানা কাপড় পাঠাইবে'; আরও কত কি। তখন আর চিঠির দরকার নাই। চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অন্যান্য জিনিসের চেষ্টায় বেরুলেন।"

এইসূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশের সংলাপ—

"শ্রীরামকৃষ্ণ—পাঁজিতে লিখেছে—বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়্—কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ে না।

"গিরিশ ( সহাস্যে )—মহাশয় ! পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না ? ( সকলের হাস্য ) ।

"শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )—পণ্ডিত খুব লম্বা-লম্বা কথা বলে কিন্তু নজর কোথায় ? কামিনী আর কাঞ্চনে, দেহের সুখ আর টাকায়। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, নজর ভাগাড়ে। ( হাস্য )। কেবল খুঁজছে—কোথায় মরা জানোয়ার, কোথায় ভাগাড়, কোথায় মড়া !"

জ্ঞানী ও ভক্তের তফাত নিয়ে আর একটি সহাস্য সংলাপ—

"শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞানীরা দেখে সব স্বপ্নবৎ ! ভক্তেরা সব অবস্থা লয়। জ্ঞানী দুধ দেয় ছিড়িক্-ছিড়িক্। ( সকলের হাস্য )। এক-একটা গরু আছে—বেছে-বেছে খায়, তাই ছিড়িক্-ছিড়িক্ দুধ। যারা অত বাছে না, আর সব খায়, তারা হুড়হুড় করে দুধ দেয়। উত্তম ভক্ত নিত্য ও লীলা দুই লয়। তাই নিত্য থেকে মন নেমে এলেও তাঁকে সম্ভোগ করতে পায়। উত্তম ভক্ত হুড়হুড় করে দুধ দেয়। ( হাস্য )।

"মহিমা—তবে দুধে একটু গন্ধ হয়। ( হাস্য )।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—( সহাস্য ) হয় বটে, তবে একটু আওটাতে হয়। একটু আগুনে আউটে নিতে হয়। জ্ঞানাগ্নির উপর একটু দুধটা চড়িয়ে দিতে হয়, তাহলে আর গন্ধটা থাকবে না। ( সকলের হাস্য )।"

ভক্তগণের বিবাদ নিয়েও মজা কম নয়। শাক্ত ও বৈষ্ণবের সংঘর্ষ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—শিব ও রামে যুদ্ধ বেধেছিল—সে যুদ্ধ থেমেও গিয়েছিল, কিন্তু শিবের চেলা ভূত আর রামের চেলা বাঁদরদের খিচ্‌মিচ্ থামেনি !

সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে তাঁর কিছু কৌতুককথা—

"আমি বৈষ্ণবচরণকে অনেক সুখ্যাত করে সেজোবাবুর ( মথুরনাথ বিশ্বাস ) কাছে আনালুম। সেজোবাবু খুব যত্ন-খাতির করলে। রূপার বাসন বার করে জল খাওয়ানো পর্যন্ত। তারপর সেজোবাবুর সামনে বলে কি—'আমাদের কেশবমন্ত্র না নিলে কিছুই হবে না।' সেজোবাবু শাক্ত, ভগবতীর উপাসক। মুখ রাঙা হয়ে উঠল। আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি !

"শ্রীমদ্ভাগবত—তাতেও নাকি ঐরকম কথা আছে—কেশবমন্ত্র না নিয়ে ভবসাগর পার হওয়াও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধরে মহাসমুদ্র পার হওয়াও তাই। সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় করে গেছে।

"শাক্তরাও বৈষ্ণবদের খাটো করবার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী, পার করে দেন—শাক্তরা বলে, 'তাতো বটেই। মা রাজরাজেশ্বরী। তিনি কি

আপনি এসে পার করবেন?—ঐ কৃষ্ণকে রেখে দিয়েছেন পার করাবার জন্য।' (সকলের হাস্য)।"

মানবমনে সংস্কার কত দৃঢ়মূল, সেই প্রসঙ্গে—

"একজন হিন্দু বড় ভক্ত ছিল—সর্বদা জগদম্বার পূজা আর নাম করত। মুসলমানদের যখন রাজ্য হল তখন সেই ভক্তকে ধরে মুসলমান করে দিলে আর বললে, 'তুই এখন মুসলমান হয়েছিস্—বল্ আল্লা! কেবল আল্লা-নাম জপ কর্।' সে অনেক কষ্টে 'আল্লা আল্লা' বলতে লাগল। কিন্তু এক-একবার বলে ফেলতে লাগল—'জগদম্বা।' তখন মুসলমানেরা তাকে মারতে যায়। সে বলে, 'দোহাই শেখজী! আমায় মারবেন না। আমি তোমাদের আল্লা নাম করতে খুব চেষ্টা করছি কিন্তু আমাদের জগদম্বা আমার কণ্ঠা পর্যন্ত রয়েছেন—তোমাদের আল্লাকে ঠেলে-ঠেলে দিচ্ছেন।' (সকলের হাস্য)।"

আসল জিনিস ব্যাকুলতা! ব্যাকুলতা এসে গেলে জাগতেই হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অব্যর্থ লৌকিক উপমায় ব্যাপারটা এইরকম—

"ছেলে বিছানায় শোবার সময় মাকে বললে, 'মা, আমার যখন হাগা পাবে তখন তুমি আমাকে উঠিও।' মা বললে, 'বাবা, হাগাই তোমাকে ওঠাবে, এজন্য তুমি কিছু ভেবো না।"

কৌতুক অবশ্য সব সময়ে বজায় থাকেনি। তখনো হাসি ছিল, যে-হাসি শুকিয়ে দেয় অন্যের হাসি। যেমন—

"বদ্ধজীবেরা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ রয়েছে, হাত-পা বাঁধা।...বদ্ধজীব যখন মরে, তার পরিবার বলে, 'তুমি তো চললে, আমার কি করে গেলে?' আবার এমনি তার মায়া যে, প্রদীপটাতে বেশি সলতে জ্বললে বদ্ধজীব বলে, 'তেল পুড়ে যাবে, সলতে কমিয়ে দাও।' এদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে।

"বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না। যদি অবসর হয়, তাহলে হয় আবোলতাবোল ফালতু গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি।' হয়তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করে।"

"স্বার্থপর লোকের কথা তো জানো—এখানে মোত্ বললে মুতবে না, পাছে তোমার উপকার হয়। (সকলের হাস্য)। এক পয়সার সন্দেশ দোকান থেকে আনতে দিলে চুষে-চুষে এনে দেয়। (হাস্য)।"

অতঃপর একটি অনবদ্য নাটকীয় বর্ণনা—কৌতুক, বিদ্রূপ এবং গভীর জীবনসত্য যেখানে—

"হৃদে একটা এঁড়ে-বাছুর এনেছিল। একদিন দেখি সেটিকে বাগানে বেঁধে

দিয়েছে, ঘাস খাওয়াবার জন্য। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হৃদে, ওটাকে রোজ ওখানে বেঁধে রাখিস কেন? হৃদে বললে, 'মামা, এ'ড়েটাকে দেশে পাঠিয়ে দেব, বড় হলে লাঙল টানবে।' যেই একথা বলেছে—আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম। মনে হয়েছিল, কি মায়ার খেলা। কোথায় কামারপুকুর-সিওড়, কোথায় কলকাতা! এ বাছুরটি যাবে ঐ পথ! সেখানে বড় হবে, তারপর কতদিন পরে লাঙল টানবে! এরই নাম সংসার—এরই নাম মায়া!

"অনেকক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভেঙেছিল।"

কেবল সংসারীর মায়া? সন্ন্যাসীর নয়? রামকৃষ্ণের চোখকে ফাঁকি দেবার উপায় নেই—

"শ্রীরামকৃষ্ণ— দ্যাখো বিজয় (গোস্বামী), সাধুর সঙ্গে যদি পুঁটলি-পাঁটলা থাকে, পনরটা গাঁটওয়ালা যদি কাপড়-বুঁচকি থাকে, তাহলে তাদের বিশ্বাস করো না। আমি বটতলায় ঐরকম সাধু দেখেছিলাম। দু'তিনজন বসে আছে, কেউ ডাল বাচ্‌ছে, কেউ কাপড় সেলাই করছে, আর বড়মানুষের বাড়ির ভাণ্ডারার গল্প করছে। বলছে—'আরে, ও বাবুনে লাখো রূপেয়া খরচ কিয়া, সাধু লোক্‌কো বহুত খিলায়া—পুরী, জিলেবী, পেঁড়া, বরফি, মালপুয়া, বহুত চিজ্‌ তৈয়ারী কিয়া।" (সকলের হাস্য)।

"বিজয়—আজ্ঞা হাঁ। গয়ায় ঐরকম সাধু দেখেছি! গয়ার লোটাওয়ালা সাধু (সকলের হাস্য)।"

গল্প শুনে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে হেসে উঠে কখনো-কখনো ভক্তগণ অনুভব করেছেন, তাঁদের হাসি আত্মঘাতী। অনুরূপ আরো কিছু গল্প আছে যা শুনে হাসবার সময়ে অবশ্য রামকৃষ্ণকে ততখানি ভয়ঙ্কর মনে হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐসব কথাকাহিনীতে লোকশিক্ষার জন্য সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র এ'কেছেন—শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরাও ঈর্ষা বোধ করবেন এমনই আশ্চর্য বাস্তব ও জীবন্ত সেই ক্ষুদ্রাকার রেখাচিত্রগুলি। নকশা-গুলির সঙ্গে শিক্ষামূলক যে অংশ জড়িয়ে আছে তা ভুলে গিয়ে পাঠক নিরুপদ্রবে এখন ওগুলি উপভোগ করুন।—

"এক ডেপুটি, আটশো টাকা মাইনে, কেশব সেনের বাড়িতে (নববৃন্দাবন) নাটক দেখতে গিছল। আমিও গিছলাম। আমার সঙ্গে রাখাল, আরও কেউ-কেউ গিছল। নাটক শুনবার জন্য আমি যেখানে বসিছি, তারা আমার পাশে বসেছে। রাখাল তখন একটু উঠে গিছল। ডেপুটি এসে ঐখানে বসল। আর তার ছোট ছেলেটিকে রাখালের জায়গায় বসালে। আমি বললুম, এখানে বসা হবে না—আমার এমনি অবস্থা যে, কাছে যে বসবে সে যা বলবে তাই করতে হবে—তাই রাখালকে কাছে বসিয়েছিলাম। যতক্ষণ নাটক হল, ডেপুটির কেবল ছেলের সঙ্গে কথা। শালা

একবারও কি থিয়েটার দেখলে না। আবার শুনেছি নাকি মাগের দাস—ওঠ্ বললে ওঠে, বোস্ বললে বসে—আবার একটা খেঁদা বানুরে ছেলের জন্য এই—"

গঙ্গার ঘাটে বা ঠাকুরঘরে নিষ্ঠাবতীদের চেহারা—

"কেউ হয়ত গঙ্গাস্নান করতে এসেছে। সে সময় কোথা ভগবানের চিন্তা করবে—গল্প করতে বসে গেল। যত রাজ্যের গল্প।—'তোর ছেলের বিয়ে হল, কি গয়না দিলে?'—'অমুকের বড ব্যামো।'—'অমুক শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে কিনা?'—'অমুক কনে দেখতে গিছল—তা দেওয়া-থোওয়া সাধ-আহ্লাদ খুব করবে।'—'হরিশ আমার বড ন্যাওটা, আমায় ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারে না।'—'এতদিন আসতে পারিনি মা—অমুকেব মেয়ের পাকা দেখা, বড ব্যস্ত ছিলাম।' "

"বিধবা পিসি বলছে—'মা, দুর্গাপূজা আমি না-হলে হয় না—শ্রীটি গডা পর্যন্ত। বাড়িতে বিয়ে-থাওয়া হলে সব আমায় করতে হবে মা, তবে হবে—ফুলশয্যার জোগাড, খয়েরের বাগানটি পর্যন্ত।' "

"অনেকে আহ্নিক করবার সময়ে যত রাজ্যের কথা কয়। কিন্তু কথা কইতে নাই—তাই ঠোঁট বুজে যত প্রকার ইশারা করতে থাকে—এটা নিয়ে এসো, ওটা নিয়ে এসো, হুঁ, উঁহু—এইসব করে। (হাস্য)।

"আবার কেউ মালা জপ কবছে—তার ভিতর থেকেই মাছের দর করে। জপ করতে-করতে হয়ত আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—ঐ মাছটা। যত হিসাব সেই সময়ে। (সকলের হাস্য)।

"ছাদের উপর ঠাকুরঘর, নারায়ণপূজা হচ্ছে—পূজার নৈবেদ্য, চন্দনঘষা—এইসব হচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরের কথা একটিও নাই। কি রাঁধতে হবে—আজ বাজারে কিছু ভাল পেলে না—কাল অমুক ব্যঞ্জনটি বেশ হয়েছিল—ও ছেলেটি আমার খুড়তুতো ভাই হয়—হাঁরে তোর সে কর্মটা আছে—আব আমি কেমন আছি?—আমার হরি নাই।—এইসব কথা!"

গৃহস্থের উপভোগ্য একাদশী—

"সন্ন্যাসীর হচ্ছে নির্জলা একাদশী। আর দু'রকম একাদশী আছে। ফলমূল খেয়ে—আর লুচি-ছক্কা খেয়ে। (সকলের হাস্য)। (সহাস্যে)—তোমরা নির্জলা একাদশী পারবে না।

"কৃষ্ণকিশোরকে দেখলাম—একাদশীতে লুচি-ছক্কা খেলে। আমি হৃদুকে বললাম—হৃদু, আমার কৃষ্ণকিশোরের একাদশী করতে ইচ্ছা হচ্ছে। (সকলের হাস্য)। তাই একদিন করলাম। খুব পেট ভরে খেলাম। তার পরদিন আর কিছু খেতে পারলাম না। (সকলের হাস্য)।"

অবিবাহিত অপদার্থ পুরুষের চিত্র—

"শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )—সে কি ? তুমি যে 'কুমড়ো-কাটা বড়ঠাকুর' হলে। তুমি না সংসারী, না হরিভক্ত। এ ভাল নয়। একএকজন বাড়িতে পুরুষ থাকে—মেয়ে-ছেলেদেব নিয়ে দিনরাত থাকে—আর বহিরের ঘরে বসে থাকে—আর বাহিরের ঘরে বসে ভুড়ুর-ভুড়ুর করে তামাক খায়—নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকে। তবে বাড়ির ভিতরে কখনো-কখনো কুমড়ো কেটে দেয়। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নাই, তাই ছেলেদের দিয়ে তারা বলে পাঠায়—বডঠাকুরকে ডেকে আন্, তিনি কুমডোটা দু'খানা করে দিবেন। তখন সে কুমড়োটা দু'খানা করে দেয়। এই পর্যন্ত পুরুষের ব্যবহার। তাই নাম হয়েছে 'কুমডো-কাটা বডঠাকুর।' "

স্ত্রৈণের চিত্র—

"শ্রীবামকৃষ্ণ—সকলেই দেখি, মেয়েমানুষেব বশ। কাপ্তেনের বাডি গিছলাম—তাব বাডি হয়ে রামের বাডি যাবো। তাই কাপ্তেনকে বললাম—গাড়িভাড়া দাও। কাপ্তেন তাব মাগকে বললে। মে মাগও তেমনি—ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া, করতে লাগল। শেষে কাপ্তেন বললে যে, ওবাই ( রামেবা ) দেবে। গীতা ভাগবত বেদান্ত সব ওর ভিতবে। ( সকলের হাস্য )।

"টাকাকডি সর্বস্ব মাগেব হাতে। আবার বলা হয়—আমি দুটো টাকাও আমার কাছে রাখতে পারি না—কেমন আমার স্বভাব।...

"পুরুষগুলো বুঝতে পারে না, কত নেবে গেছে। কেল্লায় যখন গাড়ি করে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন বোধ হল যেন সাধারণ রাস্তা দিয়ে এলাম। তারপরে দেখি চার-তলা নীচে এসেছি। কলমবাডা রাস্তা। যাকে ভূতে পেয়েছে, সে জানতে পারে না যে, আমাকে ভূতে পেয়েছে। সে ভাবে, আমি বেশ আছি।...যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে, আজ্ঞা হাঁ, আমার স্ত্রীটি ভাল। একজনেরও স্ত্রী মন্দ নয়। (সকলের হাস্য )।"

"( সহাস্যে ) হ্যাঁ গা, লোকে বলে—খেটেখুটে গিয়ে পরিবারের কাছে বসলে নাকি খুব আনন্দ হয়।"

· কৃপণ বিষয়ীর চেহারা—

"শ্রীরামকৃষ্ণ—সেদিন জয়গোপাল এসেছিল। গাড়ি করে আসে। গাড়িতে ভাঙা লণ্ঠন, ভাগাড়ের ফেরত ঘোড়া, মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল-ফেরত দরোয়ান—আর এখানের জন্য নিয়ে এল দুই পচা ডালিম। ( সকলের হাস্য )।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ—যদু মল্লিকের বাড়ি গিয়েছিলাম। একবার এদের জিজ্ঞাসা করে—গাড়ি-ভাড়া কত ? যখন এরা বললে—তিনটাকা দু'আনা। তখন একবার-আমাকে জিজ্ঞাসা করে। আবার গুকুল ঠাকুর আড়ালে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করছে। সে

বললে—তিনটাকা চার আনা। (সকলের হাস্য)। তখন আবার আমাদের কাছে দৌড়ে আসে, বলে—ভাড়া কত?

"কাছে দালাল এসেছে। সে যদুকে বললে—বড়বাজারে ৮ কাঠা জায়গা বিক্রী আছে, নেবেন?' যদু বলে, 'কত দাম? দাম কিছু কমায় না?' আমি বললুম, তুমি নেবে না, কেবল ঢঙ করছ, না? তখন আবার আমার দিকে ফিরে হাসে। বিষয়ী লোকের দস্তুরই এই—পাঁচটি লোক আনাগোনা করবে, বাজারে খুব নাম হবে।"

তবু উমেদার ও মোসাহেবদের দল ধনী বিষয়ীর সঙ্গ ছাড়ে না। তাদের লাভের বরাত নিম্নোক্তপ্রকার—

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, যদু মল্লিককে)—তুমি অত ভাঁড়, মোসাহেব রাখো কেন?

"যদু (সহাস্যে)—তুমি উদ্ধার করবে বলে। (সকলের হাস্য)।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—মোসাহেবরা মনে করে, বাবু তাদের টাকা ঢেলে দেবে। কিন্তু বাবুর কাছে আদায় করা বড় কঠিন। একটা শৃগাল একটা বলদকে দেখে তার সঙ্গ আর ছাড়ে না। সে চ'রে বেড়ায়, ওটাও তার সঙ্গে-সঙ্গে। শৃগালটা মনে করছে, ওর অণ্ডের কোষ ঝুল'ছ, সেইটে কখনো না কখনো পড়ে যাবে আর আমি খাবো। বলদটা কখনো ঘুমোয়, সেও কাছে শুয়ে ঘুমায়। আর যখন উঠে চরে বেড়ায়, সেও সঙ্গে-সঙ্গে থাকে। কতদিন এইরূপে যায়, কিন্তু কোষটা পড়ল না। তখন নিরাশ হয়ে চলে গেল। (সকলের হাস্য)। মোসাহেবদের এইরূপই অবস্থা।"

নিখরচার ভক্তদের চেহারা অতঃপর—

"এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল। একজন লোকের বসে শোনবার ভারি ইচ্ছা। কিন্তু সে উঁকি মেরে দেখলে যে, আসরে প্যালা পড়ছে, তখন সেখান থেকে আস্তে-আস্তে পালিয়ে গেল। আর এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল, সেই জায়গায় গেল। সন্ধান করে জানতে পারলে যে, এখানে কেউ প্যালা দেবে না। ভারি ভীড় হয়েছে। সে দুই হাতে কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে-ঠেলে আসরে গিয়ে উপস্থিত। আসরে ভাল করে বসে গোঁপে চাড়া দিয়ে শুনতে লাগল। (হাস্য)।"

পণ্ডিতের বৃথা বিনয় নিয়ে বিদ্রূপ ও কৌতুক—

"শ্রীরামকৃষ্ণ (শশধরের প্রতি)—তুমি আদ্যশক্তির কথা কিছু বলো।

"শশধর—আমি কি জানি!

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একজনকে একটি লোক খুব ভক্তি করে। তাকে তামাক সাজার আগুন আনতে বললে। তা সে বললে, আমি কি আপনার আগুন আনবার যোগ্য? আর আগুন আনলেও না। (সকলের হাস্য)।"

নির্বোধ অন্যমনস্কতার রূপ—

"ঠাকুর, ঘরে পৌঁছিয়া বলিতেছেন—তোমাদের কারুরই ছাতাটা আনতে মনে

নাই। (সকলের হাস্য)। ব্যস্তবাগীশ লোক কাছের জিনিসও দেখতে পায় না। একজন আর একটি লোকের বাড়িতে টিকে ধরাতে গিছল, কিন্তু হাতে লণ্ঠন জ্বলছে। একজন গামছা খুঁজে-খুঁজে তারপর দেখে—কাঁধেতেই রয়েছে।"

গ্রাম্য মানুষের সহজ চতুর বুদ্ধি—

"চাষারা নিমন্ত্রণ খাচ্ছে। তাদের জিজ্ঞাসা করা হল—তোমরা আমড়ার অম্বল খাবে? তারা বললে—'যদি বাবুরা খেয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের দেবেন। তাঁরা যেকালে খেয়ে গেছেন, সেকালে ভালই হয়েছে।' (সকলের হাস্য)।"

সংসারজীবনে কাদের এড়িয়ে চলতে হবে, তার একটা কাজ-চলা তালিকা—

"এই কয়টির কাছ থেকে সাবধান হতে হয়। প্রথম, বড় মানুষ। টাকা, লোকজন অনেক, মনে করলে তোমার অনিষ্ট করতে পারে—তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়। হয়ত যা বললে, সায় দিয়ে যেতে হয়। তারপর কুকুর। যখন কুকুর তেড়ে আসে, কি ঘেউ-ঘেউ করে, তখন দাঁড়িয়ে মুখের আওয়াজ করে তাকে ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর ষাঁড়। গুঁতুতে এলে, তাকেও মুখের আওয়াজ করে ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর মাতাল। যদি রাগিয়ে দাও, তাহলে বলবে, তোর চৌদ্দ-পুরুষ, তোর হেন-তেন—বলে গালাগালি দেবে। তাকে বলতে হয়—কি খুড়ো। কেমন আছো? তাহলে খুব খুশি হয়ে তোমার কাছে বসে তামাক খাবে।"

মনোরম সমদৃষ্টি! ধনী, কুকুর, ষাঁড়, মাতাল—একই বন্ধনীভুক্ত!!

সংসারে লাট-খাওয়া মানুষের হাস্যকরুণ রূপ—

"শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় বিদ্যা-অভিনেতা যুবকের প্রতি)—তোমার কি বিবাহ হয়েছে? ছেলেপুলে?

"বিদ্যা অভিনেতা—আজ্ঞে, একটি কন্যা গত; আরো একটি সন্তান হয়েছে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—এর মধ্যে হল গেল! তোমার এই কম বয়স। বলে—সাঁজ সকালে ভাতার মলো, কাঁদব কত রাত? (সকলের হাস্য)।...

"যাত্রাওয়ালার কাজ করছ, তা বেশ। কিন্তু বড় যন্ত্রণা। এখন কম বয়স, তাই গোলগাল চেহারা। তারপর সব তুবড়ে যাবে। যাত্রাওয়ালারা প্রায় ঐ রকমই হয়। গাল তোবড়া, পেট মোটা, হাতে তাগা। (সকলের হাস্য)।"

কুটিল শাশুড়ির সাংসারিক দুষ্টবুদ্ধির খণ্ডচিত্র—

"সরার মাপে শাশুড়ি বৌদের ভাত দিত। তাতে কিছু ভাত কম হত। একদিন সরাখানি ভেঙে যাওয়াতে বৌরা আহ্লাদ করছিল। তখন শাশুড়ি বললে—'যতই নাচো কোঁদো বৌমা, আমার হাতের আটকেল (আন্দাজ) আছে।"

উপস্থিত-বুদ্ধির সঙ্গে উপস্থিত-বুদ্ধির সংঘর্ষ বর্ণনাসূত্রে একটি ক্ষুদ্র রমণীয় ছোটো-গল্পের জন্ম—

"এক ব্যান ( বেয়ান ) অন্য ব্যানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ও-ব্যান তখন সুতো কাটছিল—নানা রকমের রেশমের সুতো। সে-ব্যান এ-ব্যানকে দেখে আনন্দ করতে লাগল, আর বললে—'ব্যান, তুমি এসেছো বলে আমার যে কী আনন্দ হয়েছে, তা বলতে পারি না। যাই, তোমার জন্য কিছু জলখাবার আনিগে!' সে-ব্যান জল-খাবার আনতে গেছে—এদিকে নানা রঙের রেশমের সুতো দেখে এ-ব্যানের লোভ হয়েছে। সে একতাড়া সুতো বগলে করে লুকিয়ে ফেললে। ও-ব্যান জলখাবার নিয়ে এল, আর অতি উৎসাহের সহিত জল খাওয়াতে লাগল, কিন্তু সুতোর দিকে দৃষ্টিপাত করে বুঝতে পারলো যে, একতাড়া সুতো তার ব্যান সরিয়েছে। তখন সে সুতোটা আদায় করবার একটা ফন্দী ঠাওরালে।

"সে বলছে—'ব্যান, অনেক দিনের পর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। আজ ভারি আনন্দের দিন। আমার ভারি ইচ্ছে করছে যে, দুজনে নৃত্য করি।' এ-ব্যান বললে—'ভাই আমারও ভারি আনন্দ হয়েছে।' তখন দুই ব্যানে নৃত্য করতে লাগল। সে ব্যান দেখলে যে, ইনি বাহু না তুলে নৃত্য করছেন। তখন সে বললে, 'এসো ব্যান, দুহাত তুলে আমরা নাচি—আজ ভারি আনন্দের দিন।' কিন্তু এ-ব্যান এক হাতে বগল টিপে, আর একটি হাত তুলে নাচতে লাগল। তখন সে-ব্যান বললে, 'ব্যান, ওকি? এক হাত তুলে নাচা কি? এসো দুহাত তুলে নাচি। এই দ্যাখো, আমি দুহাত তুলে নাচছি।' এ-ব্যান কিন্তু বগল টিপে হেসে-হেসে এক হাত তুলে নাচতে লাগল, আর বলল 'যে যেরকম জানে ব্যান।'"

সংসার কার বশ? শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর বড়ই পুরাতন—কামিনী ও কাঞ্চনের বশ। কামিনী-বশ্যতার একটি গোলাপী গল্প—

"একজন উমেদার বড়বাবুর কাছে আনাগোনা করে হয়রান হয়েছে। কর্ম আর হয় না। অফিসের বড়বাবু কেবলই বলেন—'এখন খালি নাই, মাঝে মাঝে এসে দেখা করো।' এইরূপে কতকাল কেটে গেল—উমেদার হতাশ হয়ে গেল। সে একজন বন্ধুর কাছে দুঃখ করছে—বন্ধু বললে, 'তোর যেমন বুদ্ধি। ওটার কাছে আনাগোনা করে পায়ের বাঁধন ছেঁড়া কেন? তুই গোলাপীকে ধর্, কালই তোর কর্ম হবে।' উমেদার বললে, 'বটে! আমি এক্ষুণি চললাম।' গোলাপী বড়বাবুর রাঁড়। উমেদার দেখা করে বললে—'মা, তুমি এটি না করলে হবে না—আমি মহা বিপদে পড়েছি। ব্রাহ্মণের ছেলে আর কোথায় যাই। মা, অনেকদিন কর্ম নাই, ছেলেপুলে না খেতে পেয়ে মারা যায়। তুমি একটি কথা দিলেই কাজ হয়।' গোলাপী ব্রাহ্মণের ছেলেকে বললে, 'বাছা, কাকে বললে হয়?' আর ভাবতে লাগল, আহা ব্রাহ্মণের ছেলে বড় কষ্ট পাচ্ছে! উমেদার বললে, 'বড়বাবুকে একটি কথা বললে আমার নিশ্চয় একটি কর্ম হয়।' গোলাপী বললে, 'বড়বাবুকে বলে ঠিক করে রাখব।' তার পরদিন

সকালে উমেদারের কাছে একটি লোক গিয়ে উপস্থিত। সে বললে, 'তুমি আজ থেকে বড়বাবুর অফিসে বেরুবে।' বড়বাবু সাহেবকে বললে, 'এ ব্যক্তি বড় উপযুক্ত লোক। একে নিযুক্ত করা হয়েছে। এর-দ্বারা অফিসের বিশেষ উপকার হবে।'"

গোলাপীগণের আবির্ভাবকথা, সংক্ষিপ্তভাবে—

"একজন বলেছিল, সাবির এখন খুব সময়—এখন তার বেশ হয়েছে—একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে—ঘুঁটে রে, গোবর রে, তক্তপোষ, দুখানা বাসন হয়েছে, বিছানা, মাদুর, তাকিয়া—কত লোক বশীভূত, যাচ্ছে আসছে। অর্থাৎ সাবি এখন বেশ্যা হয়েছে, তাই সুখ ধরে না।"

অহংশূন্য শ্রীরামকৃষ্ণও নিজের সম্বন্ধে দাবি না করে পারেননি—"মেয়েদের ঢং বেশ বুঝতে পারতুম। তাদের কথা, সুর, নকল করতুম। কড়ে রাঁড়ি বাপকে উত্তর দিচ্ছে, 'যা— ই।' বারান্দায় মাগীরা ডাকছে, 'ও তোপসে মাছওলা।' নষ্ট মেয়ে বুঝতে পারতুম। বিধবা, সোজা সিঁতে কেটেছে, আর খুব অনুরাগের সহিত গায়ে তেল মাখছে, লজ্জা কম, বসবার রকমই আলাদা।"

সুতরাং সতীত্বের বিচিত্র চেহারা আঁকতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। যথা—

এক বামুনের ঘরের বিধবা, ম্লেচ্ছ উপপতি করেছে—সে কিন্তু একাদশীর দিন তাকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না, পাছে মুখে প্যাঁজ-রশুনের গন্ধ ঢুকে ধর্মহানি হয়।

এই ধরনের অতুলনীয় একটি গ্রাম্য রসিকতা শ্রীরামকৃষ্ণ করেছেন, যার তির্যকতার কাছে বক্র নাগরিকতা হতমান। ভাসুরের সঙ্গে নষ্ট নারী সাফাই গাইছে—

"আমি তো আপনার ভাসুরকে নিয়ে আছি, তাইতে লজ্জায় মরি। এরা সব (অন্য মাগীরা) পরপুরুষ নিয়ে কি করে থাকে!"

এইসব কথাগল্প যখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন তখন—উথলিল মহারঙ্গে সদানন্দ লহরী! গল্পগুলি বলতেন কী অপূর্ব ভঙ্গিতে!—

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুদ্ধাত্মা ভক্তদিগকে পাইয়া আনন্দে ভাসিতেছেন ও ছোট খাটটিতে বসিয়া-বসিয়া তাহাদিগকে কীর্তনের ঢঙ দেখাইয়া হাসিতেছেন। কীর্তনী, সৈজেগুজে সম্প্রদায়-সঙ্গে গান গাহিতেছে—কীর্ত্তনী দাঁড়াইয়া—হাতে রঙিন রুমাল, মাঝে-মাঝে ঢঙ করিয়া কাসিতেছে ও নথ তুলিয়া থু-থু ফেলিতেছে—আবার যদি কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া পড়ে, গান গাহিতে-গাহিতেই তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে, বলিতেছে, 'আসুন!'—আবার মাঝে-মাঝে হাতের কাপড় সরাইয়া তাবিজ, অনন্ত ও বাউটি ইত্যাদি অলঙ্কার দেখাইতেছে।

"অভিনয়-দৃষ্টে ভক্তরা সকলেই হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। পলটু হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। ঠাকুর পলটুর দিকে তাকাইয়া মাস্টারকে বলিতেছেন—ছেলে-মানুষ কিনা, তাই হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (পল্টুর প্রতি সহাস্যে)—তোর বাবাকে এসব কথা বলিসনি! যাও (আমার প্রতি) একটু টান ছিল, তাও যাবে। ওরা একে ইংলিশম্যান লোক।"

হাসতে-হাসতে ভক্তরা কোথায় উপস্থিত হতেন? সেখানে—যেখানে জীবনের অসঙ্গতির চেহারা চোখের সামনে খুলে যায়। তাঁরা জানলেন—অতিবড ভক্তও যখন সম্পূর্ণ ঈশ্বর-নির্ভরতার ভঙ্গি দেখায়, তখন তার মধ্যেও অনেকখানি ফাঁক থাকতে পারে—

"বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী-নারায়ণ বসে আছেন। হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী পদসেবা করছিলেন, বললেন, 'ঠাকুর কোথা যাও?' নারায়ণ বললেন, 'আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে, তাই তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি।' এই বলে নারায়ণ বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ফিরলেন। লক্ষ্মী বললেন, 'ঠাকুর এত শীঘ্র ফিরলে যে!' নারায়ণ হেসে বললেন, ভক্তটি প্রেমে বিহ্বল হয়ে পথে চলে যাচ্ছিল, ধোপারা কাপড় শুকাতে দিছল, ভক্তটি মাড়িয়ে যাচ্ছিল, দেখে ধোপারা লাঠি নিয়ে তাকে মারতে যাচ্ছিল, তাই আমি তাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম!' লক্ষ্মী বললেন, 'তা ফিরে এলে কেন?' নারায়ণ হাসতে-হাসতে বললেন, 'দেখলুম, ভক্তটি নিজে ধোপাদের মারবার জন্য ইঁট তুলেছে। (সকলের হাস্য)। তাই আর আমি গেলাম না।'"

সংসারে মূল্যবোধের তারতম্য সম্বন্ধে একটি সরস শিক্ষাপ্রদ কাহিনী ভক্তগণ শুনলেন—

"যার যেমন পুঁজি—জিনিসের সেইরকম দর দেয়। একজন বাবু তার চাকরকে বললে; 'তুই এই হীরেটি বাজারে নিয়ে যা। আমায় বলবি, কে কিরকম দর দেয়! আগে বেগুনওয়ালার কাছে নিয়ে যা।' চাকরটি প্রথমে বেগুনওয়ালার কাছে গেল। সে নেড়ে-চেড়ে দেখে বললে, 'ভাই, নয় সের বেগুন আমি দিতে পারি।' চাকরটি বললে, 'ভাই, আর একটু ওঠো! না হয় দশ সের দাও!' সে বললে, 'আমি বাজারদরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি। এতে তোমার পোষায় তো দিয়ে যাও।' চাকর তখন হাসতে-হাসতে হীরেটি ফিরিয়ে নিয়ে বাবুর কাছে বললে, 'মহাশয়, বেগুনওয়ালা নয় সের বেগুনের বেশি একটিও দেবে না। সে বললে, বাজারদরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি।' বাবু হেসে বললে, 'আচ্ছা, এবার কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে যা! ও বেগুন নিয়ে থাকে, ও আর কতদূর বুঝবে? কাপড়ওয়ালার পুঁজি বেশি, দেখি ও কী বলে?' চাকরটি কাপড়ওয়ালার কাছে বললে, 'ওহে, এটি নেবে? কত দর দিতে পারো?' কাপড়ওয়ালা বললে, 'হাঁ, জিনিসটা ভাল; এতে বেশ গয়না হতে পারে। তা ভাই, আমি নয় শো টাকা দিতে পারি।' চাকরটি বললে, 'একটু ওঠো, তাহলে ছেড়ে দিয়ে যাই। না হয়, হাজার টাকাই দাও।' কাপড়ওয়ালা বললে, 'ভাই, আর কিছু বলো না। আমি বাজারদরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি।

নয় শো টাকার বেশি একটি টাকাও আমি দিতে পারব না।' চাকর মনিবের কাছে হাসতে-হাসতে ফিরে গেল। আর বললে যে, 'কাপড়ওয়ালা বলেছে, নয় শো টাকার বেশি একটি টাকাও সে দিতে পারবে না। আর বলেছে, আমি বাজারদরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি।' তখন তার মনিব হাসতে-হাসতে বললে, 'এইবার জহুরীর কাছে যাও—সে কি বলে দেখা যাক।' চাকরটি জহুরীর কাছে এল। জহুরী একটু দেখেই একেবারে বললে—'এক লাখ টাকা দেবো।' "

এই গল্পের একটি পরিশিষ্ট-অংশ আছে। জহুরী যখন হীরেটির দর বলে দিয়েছে, তখন দেখা গেল, আর একজন জহুরী সেই দিকে আসছে। পাছে অন্য জহুরী বেশি দর দিয়ে ফেলে, সেই ভয়ে এই জহুরী তাড়াতাড়ি হীরেটা পায়ের জুতোর মধ্যে গুঁজে রাখলে। অন্য জহুরী চলে যাবার পর এই জহুরী হীরে বার করে দেখে—অবাক কাণ্ড! হীরে ফেটে গেছে! হীরে ফাটল কেন? হীরে বললে, 'বেগুনওয়ালা, কাপড়ওয়ালা যা করে করুক, তারা আমার মূল্য বোঝে না, কিন্তু তুমি জহুরী, তুমি কি বলে আমাকে পায়ের তলায় রাখলে! সেই অভিমানে আমার বুক ফেটে গেল!' "

শ্রীরামকৃষ্ণের আর একটি সুগভীর গল্পে—নীরবে রক্তাক্ত যন্ত্রণা ও মৃত্যুকে বরণ করেছিল একটি প্রাণী। রাম ও লক্ষ্মণ একদিন বনপথে চলতে-চলতে থেমে বিশ্রাম নেবার জন্য তাঁদের ধনুক দুটি মাটিতে পুঁতে রাখলেন। বিশ্রামশেষে রামচন্দ্র ধনুক তুলে দেখেন, তার প্রান্তে রক্তের ছিটে। কী ব্যাপার? কোনো জীবহত্যা বুঝি হল! রাম তাড়াতাড়ি লক্ষ্মণকে মাটি খুঁড়ে দেখতে বললেন। লক্ষ্মণ মাটি খুঁড়ে একটি রক্তাক্ত মুমূর্ষু ব্যাঙকে তুলে আনলেন। কাতর রামচন্দ্র তাকে বললেন, 'তোমরা সর্বদা এত চীৎকার করো, কিন্তু আমি যখন তোমার গায়ে ধনুক পুঁতলাম, চেঁচালে না কেন?' সে বললে—বোধহয় মরণ-হাসি হেসেই বললে—'প্রভু, অন্যেরা মারলে ডাক ছেড়ে বলি, রাম, বাঁচাও! স্বয়ং রাম মারলে কাকে ডাকবো!' "

ভক্তরা জানলেন—শিক্ষার শেষ নেই। তাঁরা আরও জানলেন—কারো-কারো ভবিতব্য বোধহয় চির অশিক্ষা!—"সাধুর কমণ্ডলু চার ধাম ঘুরে আসে, কিন্তু যেমন তেতো তেমনি তেতো থাকে। মলয়ের হাওয়া যে-গাছে লাগে তারা সব চন্দন হয়ে যায়, কিন্তু শিমূল অশ্বত্থ আমড়া—এরা হয় না। কেউ-কেউ সাধুসঙ্গ করে গাঁজা খাবার জন্য!"

ভক্তেরা জানলেন বিচিত্র মানবভাগ্যের কথা—

"একজন বাজিকর খেলা দেখাচ্ছে রাজার সামনে। আর মাঝে-মাঝে বলছে—রাজা টাকা দেও, কাপড়া দেও। এমন সময়ে তার জিব তালুর মূলের কাছে উল্টে গেল, অমনি কুম্ভক হয়ে গেল। আর কথা নাই, শব্দ নাই, স্পন্দ নাই। তখন সকলে তাকে ইঁটের কবর তৈয়ার করে সেই ভাবেই পুঁতে রাখলে। হাজার বৎসর পরে

সেই কবরকে খুঁড়েছিল। তখন লোকে দেখে যে, একজন যেন সমাধিস্থ হয়ে বসে আছে। তারা তাকে সাধু মনে করে পূজা করতে লাগল। এমন সময়ে নাড়াচাড়া দিতে-দিতে তার জিভ তালু থেকে সরে এল। তখন তার চৈতন্য হল, আর সে চীৎকার করে বলতে লাগল—লাগ্ ভেলকি লাগ্! রাজা, টাকা দেও, কাপড়া দেও—"

ক্ষুদ্র বুদ্ধির অভিমান সম্বন্ধে একটি গভীর রসিকতা তাঁরা শুনলেন—

"চিনির পাহাড়ে একটি পিঁপড়ে গিছল। এক দানা চিনি খেয়ে তার পেট ভরে গেল। আর এক দানা মুখে করে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে খাবার সময়ে ভাবছে, এবার এসে পাহাড়টা সব নিয়ে যাবো।"

তাঁরা পেয়ে গেলেন জীবনযন্ত্রণা নিয়ে একটি হিউমার, যা বলছে—যন্ত্রণা .কবল তার নয় যে মার খাচ্ছে—যে মারছে তারও দুঃখনিয়তি—

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একটা কোলাব্যাঙ হেলে-সাপের পাল্লায় পড়েছিল। সে ওটাকে গিলতেও পারছে না, ছাড়তেও পারছে না। আর কোলাব্যাঙটাব যন্ত্রণ'—সেটা ক্রমাগত ডাকছে। ঢোঁড়া সাপটারও যন্ত্রণা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও হাসির সঙ্গে অতঃপর যোগ করে দিয়েছেন—

"কিন্তু গোখরো সাপের পাল্লায় যদি পড়ত, তাহলে দু'এক ডাকেই শান্তি হয়ে যেত!"

তেমন গোখরো সাপের মুখস্থ হয়ে চিরশান্তির সৌভাগ্য ক'জন পায়? কজন হাসতে পারে এই চূড়ান্ত হাসি, যা রামকৃষ্ণের?—

"কৈলাসে শিব বসে আছেন, নন্দী কাছে আছেন। এমন সময়ে একটা ভারী শব্দ হল? নন্দী জিজ্ঞাসা করল—'ঠাকুর! এ কিসের শব্দ হল?' শিব বললেন—'রাবণ জন্মগ্রহণ করল, তাই শব্দ।' খানিক পরে আবার একটি শব্দ হল। নন্দী জিজ্ঞাসা করল—'এবার কিসের শব্দ?' শিব হেসে বললেন—'এবার রাবণ বধ হল।' "

এই রামকৃষ্ণ বসের গুরু।

বিবেকানন্দ বললেন—"তাঁরই শক্তি, তিনিই ছড়াচ্ছেন—কুড়িয়ে নাও! কুড়িয়ে নাও—যদি বাঁচতে চাও!"

শ্রীরামকৃষ্ণের হাসি নয়—বিবেকানন্দের হাসিই আমাদের বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। তবু রামকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে বিবেকানন্দকে ভাবা যায় না, এবং আমরা দেখলাম, তিনি বিবেকানন্দের হাসিরও গুরু। মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন—"পরমহংস মশাই বড়

হাসি-তামাশার লোক ছিলেন।...অতি নূতন রকমের তামাশা করিতে ও নূতন রকমের উদাহরণ দিতে পারিতেন। কোনোরকম একঘেয়ে ভাব, গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা বা গুরুগিরির ভাব, তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না।...এই হাসি-তামাসা তাঁহার এক বিশেষ অস্ত্রস্বরূপ ছিল। ব্যঙ্গচ্ছলে এমন একটি উপস্থিত উদাহরণ তিনি দিতেন যে, শ্রোতারা একেবারে আশ্চর্য ও মুগ্ধ হইয়া যাইত। এইরূপ অদ্ভুত কৌতুকের ক্ষমতা থাকায় কলিকাতার শিক্ষিত যুবকেরা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল।"

স্বামীজীর রসিকতা-প্রীতি ও ক্ষমতার বিষয়ে মহেন্দ্রনাথ অতঃপর লিখেছেন, "স্বামীজীর ভিতরও হাস্য কৌতুকের ক্ষমতা অদ্ভুতরূপে ছিল। ইহা তাঁহার স্বভাবজাত ও বংশগত। 'পয়েন্‌টেড্‌ রিপার্টি'—চট্‌পটে সুতীক্ষ্ণ ও সরস উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা স্বামীজীর ভিতর বিশেষভাবে ছিল। এইজন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অল্পতেই বিধ্বস্ত হইয়া পড়িত।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে, আমরা দেখেছি, পরিহাস, কৌতুক, তাঁর লোকশিক্ষার অস্ত্র; স্বামীজীর ক্ষেত্রে অনেক সময়েই তা দীপ্ত বুদ্ধির অভিব্যক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ অতি সহজে উচ্চ ও নিরপেক্ষ ভূমি থেকে সৃষ্টির অসঙ্গতি দেখতে পেতেন এবং সুগভীর রসিকতায় সেই অসঙ্গতিকে উদ্‌ঘাটিত করতেন—বিবেকানন্দ সেখানে প্রায়শঃ মাটিতে দাঁড়িয়ে বুদ্ধির অসিদীপ্তিতে চারিদিক চমকিত করেছেন। রামকৃষ্ণের কাছে বুদ্ধি ও বোধি—এই দুই জগতের ব্যবধান ছিল না। বিবেকানন্দ—আপাতভাবে অন্ততঃ লৌকিক থেকে লোকোত্তরের অভিমুখীন। তাই তাঁর চরম প্রকাশ ধ্যানে—বুদ্ধের পরে যে-ধ্যানমূর্তি ভারতে শ্রেষ্ঠ। আর শ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণ যেহেতু লোকোত্তর থেকে লোকজগতে—তাই পেয়েছি তাঁর সমাধির ও সমাধিশেষের অপূর্ব হাসি।

পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে বুদ্ধির অস্ত্র নিয়ে প্রায়শঃ লড়াই করতে হয়েছে বলে বিবেকানন্দের মধ্যে তীক্ষ্ণধার কথার প্রাধান্য। তিনি সগর্বে বলেছেন—পাঁচিশ পুরুষে উকিল আমরা, আমাদের সঙ্গে অন্যে কথায় পারবে কেন? কিন্তু একই সঙ্গে তিনি উকিলি বুদ্ধিকে চরম ঘৃণা করতেন। মেজভাই মহেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেছিলেন, ও যদি উকিল হয়—দূর্ করে দেব। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে—বিবেকানন্দ যখন বুদ্ধির চমককে প্রত্যাখ্যান করেছেন—তখন শ্রীরামকৃষ্ণের মতো তাঁর কাছেও জগৎ-রহস্য স্বচ্ছ—তিনি তখন সৃষ্টির কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর ভিতর থেকে হা-হা করে উঠছে আত্মার অট্টহাসি—বিবেকানন্দের রসিকতা তখন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সামগ্রী। তেমন অনেক উদাহরণ আমরা ভবিষ্যতে দেব।

# নামরহস্য

বিবেকানন্দের রসিকতার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে পুনরায় অবতরণ করা যেতে পারে। শুরু করা যাক নামগান দিয়ে—সেটাই রীতি বাংলা দেশে—নামৈব কেবলম্। নামের প্রতি প্রেম আমাদের দেশে শ্মশান পর্যন্ত বিস্তৃত—সেখানে গিয়েও, শ্মশানবৈরাগ্য কিছু সামলে, আমরা মড়া-পোড়ানো কয়লায় নিজের (বা মৃতের) নাম লিখে আসি।

নামরহস্যে স্বামীজীর বিশেষ প্রীতি ছিল। মজাদার একটা নতুন নাম না-দেওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি ছিল না। বাল্যকাল থেকেই ঐ অভ্যাস। বিবেকানন্দ নামক বিধাতা, পরিচিতদের ললাটে নতুন নামাক্ষর লিখে দেবার দায় গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্রূপ-কৌতুক-স্নেহ-শ্রদ্ধা—সবকিছুর স্বাক্ষর পাওয়া 'যায় তাঁর দেওয়া নামগুলির মধ্যে।

স্বামীজী একবার বলেছিলেন—সব যায়, পোড়া নামের মোহ যায় না। তাই কি তিনি নাম নিয়ে ছেলেখেলা করতেন। নামের আর রূপের সঙ্গে মানুষের আত্মা যেন জড়িয়ে না পড়ে—এই বোধহয় ছিল তাঁর নিগূঢ় অভিপ্রায়। রাম নামক জনৈক যুবক (যিনি পরে 'রাম-মহারাজ' হয়েছিলেন) স্বামীজীর জীবনের শেষপর্যায়ে মাঝে-মাঝে শনিবার বেলুড়ে গিয়ে রবিবার পর্যন্ত থাকতেন। একদিন গেছেন—স্বামীজী ছাগল দুইবেন—রামকে দেখেই বললেন—'ক্যাবলা, ছাগলটা ধর্‌তো, দুইবো।' খানিক পরে তাঁর মনে হল, ছেলেটাকে ঠিক নামে না-ডেকে 'ক্যাবলা' বলে ডেকেছি বলে হয়ত বেচারা দুঃখ পেয়েছে। তখন সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'নাম একটা নাম মাত্র—যেমন লোকে বলে বিবেকানন্দ!'

'নাম একটা নাম মাত্র'—তখন তার বর্ষণে বদান্য হতে সন্ন্যাসীরও বাধা ছিল না।

বিবেকানন্দ-রচিত নামাবলীর এক খুঁটে বাঁধা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের নাম—অন্য খুঁটে নিজের নাম—মধ্যে বহুতর জনের নাম-লাঞ্ছন।

শ্রীরামকৃষ্ণের 'নরেন' শ্রীরামকৃষ্ণকে বহু নামে ও পরিচয়ে চিহ্নিত করেছেন—'পরমহংস,' 'পরমহংস মশাই,' 'দক্ষিণেশ্বরের বামুন,' 'পাগলা বামুন,' 'মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণ,' 'বৃদ্ধ,' 'বুড়ো' এবং 'ঠাকুর'। জগতের জন্য তিনি হাজির করেছিলেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম, ভক্তগোষ্ঠীতে বলতেন 'ঠাকুর,' আর নিজের জন্য বিশেষভাবে ছিল—'সেই বুড়ো।' আরও ছিল—ব্যাকুল আত্মনিবেদনের সুরে বলেছেন—'প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর—বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।'

গুরুভাইদের সন্ন্যাসী-নাম স্বামীজীরই দেওয়া। নামগুলি অদ্ভুত সার্থক। সুগভীর সুগম্ভীর আধ্যাত্মিকতাকে নাম দিয়েছিলেন 'ব্রহ্মানন্দ'; ঈশ্বরের এবং মানবের প্রতি ভক্তিপ্রেমে বিহ্বল মানুষটিকে—'প্রেমানন্দ'; শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও

পুরোহিতকে—'রামকৃষ্ণানন্দ'; জননী সারদার দ্বারপালকে—'সারদানন্দ'; যোগ তন্ময়তাকে—'যোগানন্দ'; শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত সৃষ্টিকে—'অদ্ভুতানন্দ'; অভেদবাদী বৈদান্তিককে—'অভেদানন্দ'; তুরীয় প্রজ্ঞাসীনকে—'তুরীয়ানন্দ'; আনন্দময় শিব-স্বরূপকে—'শিবানন্দ'; বস্তুবিজ্ঞানের উত্তম ছাত্র এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞানে সিদ্ধ ব্যক্তিকে —'বিজ্ঞানানন্দ'; অখণ্ড পবিত্রতাকে 'অখণ্ডানন্দ'—এমনি সব নাম।

একটি নাম বোধহয় স্বামীজী দিয়ে উঠতে পারেননি, আর গণ্ডগোল সেখানেই। অতি গুরুভার 'ত্রিগুণাতীতানন্দ' নামটি স্বামীজীর দেওয়া নয় বলেই মনে হয়—কারণ গলাধঃকরণের এবং উদ্গিরণের পক্ষে এহেন বৃহৎ কঠিন বস্তু তিনি স্বতঃই দিতে পারেন না। আমেরিকা থেকে ত্রিগুণাতীতানন্দকে এক অগ্নিময় পত্র লিখলেন ঃ

"লোহার দিল চাই, তবে লঙ্কা ডিঙ্বি। বজ্রবাঁটুলের মতো হতে হবে, পাহাড়-পর্বত ভেদ হয়ে যাতে যায়। আসছে শীতে আমি আসছি। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দেব।..তোদের মুখে হাতে বাগ্‌দেবী বসবেন—ছাতিতে অনন্তবীর্য ভগবান বসবেন—তোরা এমন কাজ করবি যে, দুনিয়া তাক্ হয়ে দেখবে। তোর নামটা একটু ছোটখাট কর্ দেখি বাবা, কি নাম রে বাপ্। একখানা বই হয়ে যায় এক নামের গুঁতোয়। ঐ যে বলে হরিনামের ভয়ে যম পালায়,—তা 'হরি'—এই নামে নয়, ঐ যে গম্ভীর নাম—'অঘভগনবকবিনাশন ত্রিপুরমদমঞ্জন অশেষনিঃশেষকল্যাণকর'—প্রভৃতি নামের গুঁতোয় যমের চোদ্দ পুরুষ পালায়!—[তোর] নামটা একটু সরল করলে ভাল হয় না কি? এখন বোধহয় আর হবে না, ঢাক বেজে গেছে—কিন্তু কি জাঁহাদারি যমতাড়ানো নামই করেছ!"

একই দমে এমন উদ্বুদ্ধ ও উচ্ছল বিবেকানন্দই হতে পারেন।

সন্ন্যাস-নাম দিলেও স্বামীজী গুরুভাইদের সংসার-নামেই ডাকতেন—কারণ ঐ নামগুলি তাঁর গুরুদেবের প্রিয় ছিল। সুতরাং ব্রহ্মানন্দ, স্বামীজীর কাছে 'রাখাল'ই (রাখালচন্দ্র ঘোষ) ছিলেন। তাঁর গুরুদেব রাখালকে রাখাল-রাজার সখা মনে করতেন বলে তিনি 'রাখাল-রাজা' নাম ধরেছিলেন—তার থেকে—'রাজা'—স্বামীজীর বড় আদরের সখা। 'রাজা' নামটি খুবই অর্থবহ হয়ে উঠেছিল যখন স্বামীজী দেখে-ছিলেন, তাঁর 'রাজা' একটা রাজ্য চালাতে পারে।

শিবানন্দ (তারকনাথ ঘোষাল) স্বামীজীর চেয়ে বয়সে বড়, তাই তিনি 'তারক-দাদা'; তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির জন্য—'মহাপুরুষ'।

শশীকে (শশিভূষণ চক্রবর্তী) শশীই বলতেন, যদিও বরাহনগর-মঠে দুই জ্ঞাতিভাই 'শরৎ' ও 'শশী' একত্র হয়ে 'শরৎশশী' আখ্যা পেয়েছিলেন। এখনো বুড়ি ঠাকুরমার কাছে খোঁজ করলে বা পুরনো বাংলা গল্প-উপন্যাস পড়লে কিরণশশী, শরৎশশী, হেমশশী জাতীয় মহিলার নাম পাওয়া যায়। শশী ঠাকুরঘর ছেড়ে যেতেন না বলে

আর একটি মজার নাম পেয়েছিলেন—'ভিটেশ্বর'। সেটি অবশ্য দিয়েছিলেন, স্বামী যোগানন্দের রসিক পিতা। তিনি 'কালী-বেদান্তী'র নাম-প্রসঙ্গে বলেছেন, এতদিন শুনতুম 'মা কালী,' এখন এ যে দেখছি 'বাবা কালী'। রামকৃষ্ণ-সংঘের শান্ত সাত্ত্বিক প্রেমানন্দ সম্বন্ধে তাঁর জিজ্ঞাসা—'ইনি দাদাবাবু না দিদিবাবু ?'

শরৎ ও শশীর মতো দুই জোয়ান পুরুষ একত্র হয়ে সবিশেষ কাব্যময় নামেব অধিকারী হয়েছিলেন, কিন্তু শরৎ যখন কালী-বেদান্তীর সঙ্গে বন্ধনীবদ্ধ হলেন তখন কিন্তু কাব্যসৃষ্টি হয়নি। নরেন্দ্রনাথের আদরেব চোটে 'কালী' হলেন 'কেলো'—আদরাধিক্যে 'কেলুয়া'—সেক্ষেত্রে তাঁর সাথী শরৎ 'ভুলুয়া' না হয়ে যান কোথায় ; স্বামীজী বরাহনগব-মঠে তাঁর দুই অনুগত অনুচরকে 'কেলুয়া-ভুলুয়া' বলে ডাকতেন। শবৎ বিচ্ছিন্নভাবে অবশ্য 'শরৃতা শালা' সম্বোধনও শুনতেন।

ভক্তিভাবময় প্রেমানন্দ, স্বামীজীব ঠাট্টা-তামাশাব পাত্র হতেন প্রায়ই। তাঁব নাম দিয়েছিলেন 'ভেঁপু'—অর্থাৎ প্যাঁ-প্যাঁ পোঁ-পোঁ করে বেজেই আছেন। স্বামীজী বলতেন, "দ্যাখো ভেঁপু, তোমার ও খালি 'হায়বে লিতাই, হায়বে লিতাই' এ মঠে চলবে না।" তাঁকে স্বামীজী 'রাধারাণী'ও বলতেন—এবং তাঁর মতো যাঁবা তাঁদেব—'সখী'।

বামচন্দ্র দত্তের বাড়ির বালকভৃত্য—ছাপরা জেলার অশিক্ষিত 'রাখতুরাম'—যি'নি ক্রমে 'লাটু'—এবং 'লেটো' হয়েছিলেন—তিনি একদা সহজ সুরে গভীব জ্ঞানেব কথা বলে হয়ে উঠলেন 'প্লেটো'—স্বামীজীর কাছে। এই লাটুই স্বামী অদ্ভুতানন্দ।

গঙ্গাধর-মহারাজ (গঙ্গাধর ঘটক) স্বামীজীর কাছে—'গ্যাঞ্জেস', কিংবা 'গ্যাঞ্জীস, লাটু-মহারাজের বিশুদ্ধ ইংরাজীতে—'গোঞ্জিস'। স্বামিজী তাঁকে 'গঙ্গা' বলেও ডাকতেন, কিংবা তাঁর হিমালয়প্রীতির জন্য 'ববফানী বাবা।' এবং খাড়া নাকের জন্য —'তলোয়ারকা মাফিক নাকওয়ালা' সা্। দুর্ভিক্ষে সেবাকর্মেব জন্য নিবেদিতাব কাছে তিনি অধিকন্তু 'ফেমিন-স্বামী।'

এলাহাবাদেব এঞ্জিনীয়ার 'হরিপ্রসন্ন'র (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) 'হরি' বাদ পডে 'প্রসন্ন', তার থেকে—'পেসন্'। হরিপ্রসন্ন লম্বা গৈরিক আলখাল্লা পরে থাকতেন বলে—'এলাহবাদের বিশপ।'

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্যরাও নব নামে বঞ্চিত হননি। সব কটি নাম নরেন্দ্রনাথের দেওয়া না হতে পারে কিন্তু নামগুলি প্রচারের স্বেচ্ছাদায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন। গিরিশ ঘোষকে স্বামীজী জি-সি বলে ডাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দরিদ্র ভক্ত যজ্ঞেশ্বরচন্দ্র চন্দ্রের নাম হয়েছিল 'দমদম মাস্টার', কারণ তিনি দমদমের এক স্কুলে মাস্টারি করতেন।

'দমদম মাস্টার' চলে, তাই বলে 'শাঁকচুন্নি মাস্টার ?'

'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'র রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেন সগৌরবে তাঁর উক্ত নামকরণের ইতিহাস বিবৃত করেছেন—

"জনে জনে আখ্যা দিলা নরেন্দ্র এখানে।
সৌভাগ্য বিদিত হৈনু শাঁকচুন্নি নামে ॥"

শাঁকচুন্নি উপাধিপ্রাপ্ত অক্ষয়কুমার সেন অবশ্যই রূপবান ছিলেন না।—"একদিন বৈকালে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া দেখি [বৈকুণ্ঠ সান্ন্যাল লিখেছেন], একজন কৃষ্ণকায় লোক দেবালয়ের সকলকে কুলপি খাওয়াইতেছেন। বরফওয়ালাও আপনার ভক্ত নাকি? —জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর সহাস্যে কহেন—বরফওয়ালা নয় রে, কায়স্থর ছেলে, এখানকে আসে যায়, কলকাতার ঠাকুরদের বাড়িতে ছেলে পড়ায়।"

"কালী নাম কল্পতরু"—সুতরাং বাংলাদেশে কালী নাম অনেকেরই। কালী-বেদান্তীর কথা আগেই বলেছি, এখন 'বুঁটে কালী'র কথা। কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের এমন নাম হওয়ার কারণ তিনি 'অধিক পরিমাণে বুটের (ছোলার) ডাল খাইতেন।' অন্যদিকে সওদাগরি অফিসের বড় চাকুরে কালীপদ ঘোষ হয়েছিলেন 'দানা কালী', কোনো দোষের জন্য নয়, গুণের জন্যই। নির্ভীক ও দানশীল ছিলেন বলে নরেন্দ্রনাথ তাঁকে দানাদত্যিদের মধ্যে ফেলেছিলেন।

ভক্ত গোপাল ঘোষের নাম, 'হুটকো গোপাল।' এই অপূর্ব নামটির হেতু—ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে হুট্ করে আসতেন আবার হুট্ করে পালিয়ে যেতেন। হুটকো নাম শ্রীরামকৃষ্ণের দেওয়া। এই হুটকো গোপালের প্রতিবেশী হওয়ার অপরাধে গড়পারের সতীশ দত্তের নাম হল 'মুটকো' বা মুট্‌কু'। নাম দিলেন নরেন্দ্রনাথই।

প্রতাপ হাজরা, যাঁর বিষয়ে আগেই কিছু জেনেছি, যাঁর সন্দিগ্ধ কূটবুদ্ধির জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন 'জটিলে-কুটিলে'—তাঁকে নরেন্দ্রনাথ এককভাবে পছন্দ করতেন বলে সবাই বলত, হাজরা নরেন্দ্রের 'ফেরেণ্ড'। নরেন্দ্র তাঁর 'ফেরেণ্ডে'র পদবীর এক বিচিত্র অনুবাদ করেছিলেন—'থাউজেণ্ডা'। হাজার = থাউজেণ্ড + আ = থাউজেণ্ডা!

প্রতাপ হাজরা কুটিল বুদ্ধিতে তর্ক করতেন, আর সরল প্রাণে সদাই হৈ-চৈ লাগিয়ে রাখতেন হরমোহন মিত্র। হরমোহনকে স্বামীজী 'পাগ্‌লা হরমোহন'ই বলতেন; এবং তাঁর সশব্দ স্বভাবের জন্য বলতেন, 'হারমোনিয়াম।'

হিন্দু বা ক্রিশ্চানী নাম ছাড়া স্বামীজী মুসলমানী নামও দিতেন। কিশোরীমোহন রায়ের মুখে লম্বা দাড়ি ছিল এবং তিনি মুসলমানী ভাষা নকল করতে পারদর্শী ছিলেন, তাই তাঁকে নরেন্দ্রনাথ 'আব্দুল' বলতেন; তার থেকে তিনি হয়ে দাঁড়ালেন —'আব্দুল দাদা'। কিশোরীমোহনের অনুরূপ যাবনী ভাষায় অধিকার যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যের ছিল না, কিন্তু তাঁর মুখেও ছিল মুসলমানী দাড়ি, এবং তাঁর ডাকনাম ছিল 'ফকির', এতএব নরেন্দ্রনাথের নামোন্মেষশালিনী প্রতিভায় ফকির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—'ফকিরুদ্দিন হায়দার।'

স্বামীজী তাঁর দেশী-বিদেশী শিষ্য-শিষ্যা ও ভক্তদের উপরও নামবর্ষণ করেছেন।

অধ্যাপক সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়ার হয়েছিলেন 'কিডি।' মহেন্দ্রনাথের মতে, তিনি কিছুদিন ফল ও দুধ খেয়ে থেকেছিলেন বলে কিডি বা টিয়াপাখি নাম পেয়েছিলেন।

স্বামীজীর সুবিখ্যাত মাদ্রাজী-শিষ্য, ব্রহ্মবাদিন্ পত্রিকার সম্পাদক আলাসিঙ্গা পেরুমলকে স্বামীজী 'আচিঙ্গা' বলতেন। এক্ষেত্রে 'আচিঙ্গা'র ভাই 'চিচিঙ্গা' না হয়ে পারেন?

স্বামীজী তাঁর শেষবয়সের দুই সেবক গৌর ও নেদাকে আদর করে ডাকতেন—'আমার নন্দী-ভৃঙ্গী', বা 'আমার তাল-বেতাল', আবার কখনো—'আমার হামটি-ডামটি।' নিজের বাল্যবন্ধু প্রিয় সিংগি'র (প্রিয়নাথ সিংহের) নাম উল্টে ডাকতেন—'সিয় প্রিঙ্গি।'

চিকাগোর হেল-ভবনকে স্বামীজী নিজের আস্তানা মনে করতেন—সে বাড়ির কর্তা, পরম খ্রীস্টান জর্জ হেল স্বামীজীর সম্বোধনে—'ফাদার পোপ' এবং তাঁর পত্নী—'মাদার চার্চ।' আমেরিকার বিদগ্ধমণ্ডলীর এক মধ্যমণি মিসেস ওলি বুলকে তাঁর প্রশান্ত আধ্যাত্মিক স্বভাবের জন্য স্বামীজী বলতেন—'ধীরা মাতা' বা 'স্থিরা মাতা।' নিউইয়র্কের ধনী বদান্য ব্যবসায়ী মিঃ ফ্রান্সিস লেগেট হয়েছিলেন—'ফ্রাঙ্কিনসেন্স'—অর্থাৎ সুগন্ধিবিশেষ—মানুষটির স্বভাব অমনই সৌরভময় ছিল। তাঁর শ্যালিকা, স্বামীজীর ভাবে ও কাজে জীবন উৎসর্গকারিণী জোসেফিন ম্যাকলাউড, বোধহয় সবচেয়ে বেশীসংখ্যক নাম পেয়েছেন। জোসেফিন সংক্ষিপ্ত হয়ে 'জো', সমাদরে দ্বিগুণ হয়ে 'জো জো', এবং 'জয়', 'জয়া'। নিবেদিতাদির কাছে তিনি 'য়ুম্', 'য়ুম্ য়ুম্'। জো-কে অনেকে 'ট্যান্টিন'ও বলতেন।

মার্গারেট নোবল—ভারত-ইতিহাসে স্বামীজীর দেওয়া নাম নিয়ে বিখ্যাত হয়েছেন—'নিবেদিতা।' এই নামটিই একটি সৃষ্টি—যার উপরে স্বামীজী আশীর্বাদ ও ইতিহাস বর্ষণ করেছিলেন। মার্গারেট নোবল স্বতঃই সম্বোধনে—'মার্গট' বা 'মার্গো', কিংবা স্নেহব্যঞ্জনায় 'মার্গোরাইট'।

মার্গারেট কন্যা; স্বামীজীর তিরস্কার তাঁর বরাতে বহু জুটেছে, কিন্তু তাঁর নামটিকে তিনি বিকৃত করেননি; অপরপক্ষে পুত্র গুডউইন, যিনি ভারতের সেবাতেই শহীদ হয়েছিলেন, তিনি স্বামীজীর রাগের মাথায় হয়ে যেতেন, 'ব্যাডউইন।' পুত্রবৎ 'উদ্বোধন' পত্রিকাকে 'উদ্বন্ধন' বলে তামাশা করতে স্বামীজীর বাধত না।

ভারতীয় নামগুলি অধিকাংশই অর্থপূর্ণ। ভারতীয় পদ্ধতিতে স্বামীজী বিদেশী নামের অর্থ করেও কৌতুক করতেন। যেমন যাঁর নাম 'মিল', তিনি পেযাই-কাজ কিরকম চালাচ্ছেন, তা জিজ্ঞাসা করতেন এবং ক্রীশ্চান সায়েন্স সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস এডি-কে 'মিসেস 'হায়ার্লপুল' বলতে পেরে খুশি হতেন।

কিন্তু জাপানী শিল্পশাস্ত্রী কাকাজু ওকাকুরা যদি জানতেন স্বামীজীর হাতে তাঁর

নামের কী দুর্দশা হয়েছিল ! স্বামীজীকে জাপানে নিয়ে যাবার জন্য ওকাকুরা ভারতে এসেছিলেন। তাঁর সেই অক্রূর-ভূমিকার জন্য—ধ্বনিসাদৃশ্যের জন্যও বটে—ওকাকুরা স্বচ্ছন্দে হয়ে দাঁড়ালেন—'অক্রূর খুড়া'। একবার যদি 'অক্রূর খুড়া' পাওয়া গেল, তা থেকে 'অক্রূর' খসে 'খুড়া'—'খুড়ো'—এমন কি দূর পথ ? স্বামীজী চিঠিপত্রে ও নিজেদের মধ্যে আলাপে ওকাকুরাকে 'খুড়োই' বলতেন। ওকাকুরার খর্ব-ভারিক্কি জাপানী আকার অধিকন্তু ঐ নামটিকে অনিবার্য করে তুলেছিল। [ 'কাকাজু' ওকাকুরার 'কাকা' থেকেও 'খুড়ো' আসতে পারে। ]।

স্বামীজী, ওকাকুরা প্রভৃতির সঙ্গে বুদ্ধগয়া দর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে এক বাঙালী ভদ্রলোক খেজুর রস ও তালের রস পাঠাতেন। স্বামীজী ছোকরা শিষ্যদের খেজুররস দিতেন আর তালরস খাওয়াতেন ওকাকুরাকে। 'ওকাকুরার নেশা হত ; ওঁকে নিয়ে রগড় করতেন খুব।' কাশীতে গিয়ে ওকাকুরাকে কালাপেড়ে ধুতি, সিল্কের পাগড়ি পরিয়ে বিশ্বনাথদর্শনে পাঠিয়েছিলেন। মন্দিরে তাঁকে জাপানী বলে কেউ মনে করেনি, ভেবেছিল নেপালের রাজবংশীয় কেউ এসেছেন।

অন্য সকলকে তো নাম দিলেন—কিন্তু নিজের নাম ? সেখানেও তিনি অস্থির। বাল্যনাম 'বীরেশ্বর', তার থেকে—'বিলে'। তারপর 'নরেন্দ্রনাথ'। তা ভেঙ্গে 'নরেন'—শ্রীরামকৃষ্ণের 'নরেন্দর', 'নরেন'। কখনো-বা আদরে শ্রদ্ধায় রামকৃষ্ণ তাঁকে 'শুকদেব'ও বলতেন। লাটু-মহারাজ ছাপরা-উচ্চারণে বলতেন, 'লোরেন ভাই।' কেশব সেন নাকি তাঁকে 'বিবেক' বলতেন। ইউরোপ-আমেরিকায় তিনি 'The Swami ;' 'বিবেকানন্দ' শব্দটি ভেঙে আমেরিকায় অনেক সময় 'Vive-Kanand'—কখনো শুধুই 'Kanand'। কেবল বিশেষণেও চিহ্নিত হতেন সেখানে—'The Cyclonic Hindu Monk।' নিবেদিতা-গোষ্ঠীতে 'Swami No. One' ('Swami No. Two' ছিলেন—সারদানন্দ)—কিংবা 'King' ; আর ভারতে সকল স্বামী-সন্ন্যাসীদের মধ্যে তিনি—'স্বামীজী'—রামকৃষ্ণ-গোষ্ঠীতে 'স্বামীজী-মহারাজ।'

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে যখন নিজের শ্রাদ্ধ করে এবং নাম পুড়িয়ে নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তখন তিনি কোন্ নাম নিয়েছিলেন ? স্বামী অভেদানন্দের মতে তা হল—'বিবিদিষানন্দ'। শোনা যায়, 'রামকৃষ্ণানন্দ' নাম নেবার ইচ্ছা ছিল তাঁর ; কিন্তু শশীর অধিক দাবির কাছে তিনি সানন্দে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন।

পরিব্রাজক-জীবনে স্বামীজী কেবলই খ্যাতির মালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পথ চলতেন। ব্যাপারটাকে নিরঙ্কুশ করবার জন্য নাম বদলাতেন বারবার। কখনো 'বিবিদিষানন্দ', কখনো 'সচ্চিদানন্দ', কখনো 'বিবেকানন্দ।' ভারত ছেড়ে যাবার সময়ে নাম থাকল 'বিবেকানন্দ।' আমেরিকার ধর্মমহাসভায় সেই নামের গলায়

বরমাল্য পড়ল বলে সেইটাই ইতিহাসে উঠে গেল—আর বদলাবার কোনো সুযোগ রইল না। কিন্তু তিনি নিজে কোন্ নামটিকে ভালবাসতেন?

মেরী হেল দেখেছিলেন—ভারত থেকে পাঠানো এক চিঠিতে স্বামীজীকে 'নরেন' বলা হয়েছে। 'নরেন'—সে আবার কি?

স্বামীজী লজ্জিতভাবে লিখেছেন তাঁকে—

"ওটা একটা নামের অপভ্রংশ।...নামটা খুবই কাব্যিক। চিঠিতে সংক্ষেপে নামটা লেখা হয়েছে। গোটা নামটা হল, নরেন্দ্র—অর্থাৎ মানুষের ইন্দ্র বা রাজা। উদ্ভট, নয় কি? কি করা যাবে, আমাদের দেশের নামগুলো ঐ রকম। নামটা ছাড়তে পেরে আমি খুশি।"

ছাড়তে পেরে খুশি। স্বামীজী নিশ্চয় জানতেন, সকলে তাঁকে কি বলে পাশ্চাত্ত্যদেশে—তাঁর নামের অর্থ না জেনেই—তাঁকে দেখেই—'Prince among men!' সে কথা বলেছে—রাজা মহারাজাদের বন্ধুবান্ধবেরা পর্যন্ত। স্বামীজীর নিজেরও বাল্যকালে রাজা হবার ইচ্ছা ছিল, কিংবা সন্ন্যাসী হবার—সন্ন্যাসী হয়ে হয়েছেন স্বামীজী-মহারাজ—

না, নরেন্দ্রনাথ নয়—ঐ 'নরেন' নামটাই। ঐ নামটাই গানের মতো। পৃথিবীর খ্যাতির সেবক বিবেকানন্দ-নাম তাঁর ললাটে সেঁটে দিলেও কলরব যখনি শান্ত হয়েছে, ভিতর থেকে তৃষ্ণা জেগেছে একটি নাম ফিরে পাবার জন্য—অশ্বিনীকুমার দত্তকে বললেন ব্যাকুল হয়ে—'না না, নরেন্দ্রনাথ দত্তর মৃত্যু হয়নি—আমায় ডাকুন, ঐ নরেন নামেই ডাকুন—ঠাকুর যে-নামে আমায় ডাকতেন।'

## হাসি-খুশি-গাল-গল্প

বিবেকানন্দের রসিকতা যেখানে ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে কঠোর কিংবা গভীরতায় অতল-স্পর্শ—তার প্রসঙ্গে আমরা আসব যথাক্রমে—তার আগে কিছু মজার কাহিনী বলে নেওয়া যাক। এখানে বিবেকানন্দ কখনো সদানন্দ শিশু, কখনো কৌতুকপরায়ণ দুষ্ট বালক, কখনো-বা মজাদার হুল্লোড়ের মুগ্ধ কিশোর। তাঁর চিরকালের বালকস্বভাব তাঁকে কোনদিন ত্যাগ করেনি বলেই তিনি জীবনের ভয়াবহ দিনগুলির মধ্যেও মরূদ্যানের আশ্রয় পেয়েছেন। পৃথিবীর যন্ত্রণা বহন করতে হত এই প্রমিথিউসকে—শিষ্য-ভক্ত-বন্ধুরা অগ্নিবহনের জ্বালা থেকে তাঁকে রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকতেন—তিনিও সানন্দে সাময়িকভাবে বিস্মৃতির মায়াফলটি খেতেন—আর সেই সময়ে তাঁকে দেখে 'শিশু-ঈশ্বরের' অপরূপ ছবিখানি সকলের সামনে খুলে যেত। সন্ধ্যায় আগুনের ধারে বসে 'পাঞ্চ' পত্রিকা পড়ে তিনি হেসে লুটোপুটি খেয়েছেন—তাঁর সঙ্গীরা তাঁরই মতো হেসেছেন—কিন্তু তাঁরা একই সময়ে সচেতন থেকেছেন—হাসির বাতাসে দুলছে এই যে শিখা, এ হয়ত এখনি নিবাত নিষ্কম্প হয়ে যাবে—সে বড় ভয়ঙ্কর নির্জনতা—সকলের সমক্ষে অপরিচিত কোনো এক আত্মনির্বাসন।

সে কথা থাক। এখন শুধু গাল-গল্প, শুধু স্ফূর্তি, মজাদারি।

স্বামীজী যে সর্বদাই আত্মস্থ, তার প্রমাণ, আগেই বলেছি, তিনি শিশুর সঙ্গে শিশু এবং রাজার সঙ্গে রাজা হয়ে থাকতে পারতেন। আবার রাজা ও শিশু গলা জড়া-জড়ি করে তাঁর মধ্যে খেলা করত। কিংবা রাজার সাজানো রাজ্যকে শিশু লণ্ডভণ্ড করে দিত। তিনি গুছিয়ে পরিকল্পনা করাকে যেন সহ্য করতে পারতেন না। এক-বার এক প্রতিপত্তিশালিনী ধনী মহিলা স্বামীজীর সুবিধার জন্য নানারকম সুষ্ঠু ব্যবস্থাদি করেছেন। দিব্য দুষ্ট বালকটি তাকে একেবারে ওলটপালট করে দিলেন। মহিলা গেলেন চটে। কিন্তু রাগ ধরে রাখতে পারলেন না। হতাশ আনন্দে বললেন—"উঃ, মানুষ বটে! শেষ মুহূর্তে আমার সব পরিকল্পনা তচ্‌নচ্‌ করে দিলেন! যেন (মহিলা যে-উপমাটি ব্যবহার করলেন তা অবশ্য পরম রমণীয় ছিল না) চীনা-কাচের দোকানে পাগলা ষাঁড়।"

স্বামীজীর শিশুমূর্তির রূপ কিছু দেখা যাক।

স্বামীজীর বাল্যকালে তাঁর শিশু ভাই-বোনেরা রাত্রে শোবার পরে গল্পের জন্য বায়না করত, আর তিনি গল্প বলতেন। ঐসব গল্পের অন্যতম-শ্রোতা ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ তেমন কয়েকটি গল্পের কথা বলেছেন। তার একটি—

এক বাগদী-মাগীর একটা ছাগল ছিল। একদিন একটা দুষ্টু লোক সেটাকে চুরি করে খেয়ে ফেলেছে। বাগদী-মাগী ছাগল খুঁজে পায় না। তারপর দুষ্টু লোকটাকে

জিজ্ঞেস করলে—আমার ছাগল কোথায়? সে বুঝিয়ে দিলে, ছাগলটা উদ্ধার হয়ে মানুষ হয়েছে এবং কাজী হয়ে বিচার করছে। বাগদীমাগী তার ছাগল-দড়ি নিয়ে কাজীর এজলাসে হাজির হল। ছাগলটার যেমন দাড়ি ছিল, কাজীরও তেমনি ছোট দাড়ি। ছাগলের রঙ কালো, কাজীরও রঙ কালো। বাগদী-মাগীর তাই ঠিক ধারণা হল—তার ছাগল উদ্ধার হয়ে কাজী হয়েছে। তাই সে তার দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে কাজীর দিকে দেখিয়ে ক্রমাগত বলতে ছাগল, 'অ-র্-র্-র্ হিলি, আয়!' কাজী এজলাস থেকে ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে চাপরাশিকে বলল—'ও বুড়িটা কি বলছে?' চাপরাশি বুড়িকে গিয়ে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলে। বুড়ি বললে, 'কেন, তোমার কাজী কি সব ভুলে গেছে? আজকেই না হয় কাজী হয়েছে, কিন্তু আমি যে এতদিন তাকে মাঠে চরালুম, ছোলা খাওয়ালুম, গায়ে হাত বুলোলুম, ও সব ভুলে গেল? মুখপোড়া এখন তোমাকে বলছে, মাগী কি বলে?' চাপরাশি মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে না পেরে কাজীকে গিয়ে যা শুনেছিল বললে। কাজী তখন এজলাস থেকে নেমে বুড়ির কাছে এল ব্যাপার কি জানতে। বুড়ি তখন ফাঁসওয়ালা দড়িটা কাজীর গলায় দিয়ে বললে, 'অ-র্-র্-র্ হিলি, আয়। তোকে আর এদের বাড়ি থাকতে হবে না, নিজের বাড়ি চল্।' কাজী হতভম্ভ, চারদিকে লোকজন হৈ-চৈ করে উঠল। বুড়ি অবাক। বলল, 'আরে বাবা, তুই আমার সেই ছাগল, এখন না-হয় মানুষ হয়ে, কাজী হয়ে, বিচার করতে বসেছিস। তা বেশ হয়েছিস, আমি সুখী হয়েছি। তাই বলে কি এই বুড়িকে ভুলে যেতে হয়?' কাজী ব্যাপারটা বুঝতে পারলে, এবং দোষীকে খুঁজে এনে সাজা দিলে।

আর একটি গল্প—

একবার এক ব্যাঙের বাড়ি খুব যজ্ঞী। কিন্তু তাদের পয়সা ফুরিয়ে গেছে। ব্যাঙ-কর্তা তাই মশাদের বাড়ি গিয়ে বললে, 'আমাদের বাড়ি যজ্ঞী হবে, অনেক লোক খাবে, তোমাদেরও নেমতন্ন। তা তোমরা আমায় কিছু কড়ি ধার দাও, কিছুদিন পরে ফেরত দেব।' মশারা ব্যাঙ-কর্তাকে কিছু কড়ি ধার দিলে। ব্যাঙ-কর্তা তা নিয়ে বাড়ি এসে যজ্ঞী করলে। তারপর বর্ষাকাল এল। মশারা দল বেঁধে ব্যাঙ-কর্তার বাড়িতে এসে বলতে লাগল, 'কঁড়ি দাঁও ভাঁই, কঁড়ি দাঁও ভাঁই!' ব্যাঙ তখন খেয়ে-দেয়ে খুব মোটা হয়েছে, জলেতে গিয়ে বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে আছে। মশারা সেখানে যেতে পারে না, তাই ওপর থেকে বলতে লাগল 'কঁড়ি দাঁও ভাঁই।' ব্যাঙ-কর্তা পেটটা ফুলিয়ে-ফুলিয়ে বলতে লাগল, 'কে কার কড়ি ধারে, কে কার কড়ি ধারে'। মশারা হতভম্ব। তারা গাছের উপর বসে অপেক্ষা করতে লাগল। খানিকটা পরে একটা সাপ এল। সে ব্যাঙটাকে ধরে খানিকটা গিলে ফেললে। ব্যাঙের তখন প্রায় দমবন্ধ। সেই অবস্থায় পরিত্রাহি বলতে লাগল, 'কড়ি নাও,

কড়ি নাও, কড়ি নাও।' মশারা গাছ থেকে তা শুনতে পেয়ে বলতে লাগল, 'এখন সাপের পেটে যাও। এখন সাপের পেটে যাও।'

মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "গল্পটি বীরেশ্বর মশার গুন্‌গুন্ আওয়াজ ও ব্যাঙের আওয়াজের মতো করিয়া নানাপ্রকার ভাবভঙ্গিসহ বলিত, আমরা হাসিতাম ও ঘুমাইয়া পড়িতাম।"

শিশুরা স্বামীজীর প্রতি বিচিত্র আকর্ষণ বোধ করত। "স্বামীজী এলেই খেলাধূলা ছেড়ে আমরা তাঁর কাছে দৌড়ে হাজির হতাম; বুঝতে পারি না-পারি, তাঁর কথা শুনতে ভাল লাগত"—একজন তাঁর বাল্যস্মৃতি বলেছেন—"আমাদের সঙ্গে বালকের মতো খেলা করেছেন; গেরুয়ার কাপড় দিয়ে মুখের একপাশ ঢেকে বলেছেন—বল্ দিকি, আমাকে মেয়েছেলের মতো দেখতে লাগে কি না?" নৌকায় আসতে-আসতে তিনি রহস্য করে ছেলেদের জন্য চিংড়িমাছের গান গেয়েছেন, যার বক্তব্য, চিংড়িমাছের দল দাড়া দিয়ে নৌকাগুলোকে আটকে দিচ্ছে।

"ছেলেমানুষের মতো কখনো-কখনো হয়ে যেতেন; নিজের গুরুত্ব ভুলে যেতেন," —আর একজনের স্মৃতিকথা—"আমরা তখন ছোকরা; একদিন আমাদের মেসে বেড়াতে এসেছেন, কচুরি ভেজে দেওয়া হয়েছে, খাচ্ছেন, খুব ভাল লেগেছে; একটু খেয়ে আমাকে খেতে দিলেন; আমি তাঁর প্রসাদ খাচ্ছি; আবার বলছেন, 'ঐটে থেকেই আর একটু দে না—বেশ চমৎকার; কি বলিস্?'"

একই স্মৃতি আর একজনের। নেয়াপাতি ডাবের ভিতর চিনি দিয়ে, বরফ দিয়ে খেতে স্বামীজী ভালবাসতেন। বলরামবাবুর বাড়িতে সে জিনিস জুটেছে। খেতে-খেতে বলছেন, 'আঃ চমৎকার, নে তুই খা!' সে খাচ্ছে—তখন উৎসুক তিনি—'আমায় একটু দে না!'

আর একটু স্মৃতি ঃ

"বিকালে কতকগুলি যুবক স্বামীজীকে দেখতে এসেছে। তারা দলে ১০।১২ জন, সকলেই প্রায় কলেজের ছাত্র।...স্বামীজী অল্প পরেই তাদের কাছে হাজির। তিনি প্রাণখুলে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। এত স্ফূর্তিতে ছিলেন যে, মনে হল, তিনি ছেলেগুলির মতোই হয়ে গেছেন—অমনই তরুণ ও প্রাণোচ্ছল—কারো সঙ্গে-বা কথা বলছেন, কারো পিঠে কিল মারছেন, কারো কাঁধে ঝাঁকানি দিচ্ছেন—সে এক সুমধুর দৃশ্য।"

বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দের এই আচরণ যখন, নরেন্দ্র দত্ত যে অনুরূপ ব্যবহার করতে পারেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তখন দুষ্টুমীর অংশ অবশ্যই বেশী। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের নাতি নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

জিজ্ঞেস করলে—আমার ছাগল কোথায়? সে বুঝিয়ে দিলে, ছাগলটা উদ্ধার হয়ে মানুষ হয়েছে এবং কাজী হয়ে বিচার করছে। বাগদীমাগী তার ছাগল-দড়ি নিয়ে কাজীর এজলাসে হাজির হল। ছাগলটার যেমন দাড়ি ছিল, কাজীরও তেমনি ছোট দাড়ি। ছাগলের রঙ কালো, কাজীরও রঙ কালো। বাগদী-মাগীর তাই ঠিক ধারণা হল—তার ছাগল উদ্ধার হয়ে কাজী হয়েছে। তাই সে তার দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে কাজীর দিকে দেখিয়ে ক্রমাগত বলতে ছাগল, 'অ-র্-র্-র্ হিলি, আয়!' কাজী এজলাস থেকে ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে চাপরাশিকে বলল—'ও বুড়িটা কি বলছে?' চাপরাশি বুড়িকে গিয়ে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলে। বুড়ি বললে, 'কেন, তোমার কাজী কি সব ভুলে গেছে? আজকেই না হয় কাজী হয়েছে, কিন্তু আমি যে এতদিন তাকে মাঠে চরালুম, ছোলা খাওয়ালুম, গায়ে হাত বুলোলুম, ও সব ভুলে গেল? মুখপোড়া এখন তোমাকে বলছে, মাগী কি বলে?' চাপরাশি মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে না পেরে কাজীকে গিয়ে যা শুনেছিল বললে। কাজী তখন এজলাস থেকে নেমে বুড়ির কাছে এল ব্যাপার কি জানতে। বুড়ি তখন ফাঁসওয়ালা দড়িটা কাজীর গলায় দিয়ে বললে, 'অ-র্-র্-র্ হিলি, আয়। তোকে আর এদের বাড়ি থাকতে হবে না, নিজের বাড়ি চল্।' কাজী হতভম্ভ, চারদিকে লোকজন হৈ-চৈ করে উঠল। বুড়ি অবাক। বলল, 'আরে বাবা, তুই আমার সেই ছাগল, এখন না-হয় মানুষ হয়ে, কাজী হয়ে, বিচার করতে বসেছিস। তা বেশ হয়েছিস, আমি সুখী হয়েছি। তাই বলে কি এই বুড়িকে ভুলে যেতে হয়?' কাজী ব্যাপারটা বুঝতে পারলে, এবং দোষীকে খুঁজে এনে সাজা দিলে।

আর একটি গল্প—

একবার এক ব্যাঙের বাড়ি খুব যজ্ঞী। কিন্তু তাদের পয়সা ফুরিয়ে গেছে। ব্যাঙ-কর্তা তাই মশাদের বাড়ি গিয়ে বললে, 'আমাদের বাড়ি যজ্ঞী হবে, অনেক লোক খাবে, তোমাদেরও নেমতন্ন। তা তোমরা আমায় কিছু কড়ি ধার দাও, কিছুদিন পরে ফেরত দেব।' মশারা ব্যাঙ-কর্তাকে কিছু কড়ি ধার দিলে। ব্যাঙ-কর্তা তা নিয়ে বাড়ি এসে যজ্ঞী করলে। তারপর বর্ষাকাল এল। মশারা দল বেঁধে ব্যাঙ-কর্তার বাড়িতে এসে বলতে লাগল, 'কঁড়ি দাঁও ভাঁই, কঁড়ি দাঁও ভাঁই!' ব্যাঙ তখন খেয়ে-দেয়ে খুব মোটা হয়েছে, জলেতে গিয়ে বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে আছে। মশারা সেখানে যেতে পারে না, তাই ওপর থেকে বলতে লাগল 'কঁড়ি দাঁও ভাঁই।' ব্যাঙ-কর্তা পেটটা ফুলিয়ে-ফুলিয়ে বলতে লাগল, 'কে কার কড়ি ধারে, কে কার কড়ি ধারে'। মশারা হতভম্ব। তারা গাছের উপর বসে অপেক্ষা করতে লাগল। খানিকটা পরে একটা সাপ এল। সে ব্যাঙটাকে ধরে খানিকটা গিলে ফেললে। ব্যাঙের তখন প্রায় দমবন্ধ। সেই অবস্থায় পরিত্রাহি বলতে লাগল, 'কড়ি নাও,

কড়ি নাও, কড়ি নাও।' মশারা গাছ থেকে তা শুনতে পেয়ে বলতে লাগল, 'এখন সাপের পেটে যাও। এখন সাপের পেটে যাও।'

মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "গল্পটি বীরেশ্বর মশার গুন্‌গুন্‌ আওয়াজ ও ব্যাঙের আওয়াজের মতো করিয়া নানাপ্রকার ভাবভঙ্গিসহ বলিত, আমরা হাসিতাম ও ঘুমাইয়া পড়িতাম।"

শিশুরা স্বামীজীর প্রতি বিচিত্র আকর্ষণ বোধ করত। "স্বামীজী এলেই খেলাধূলা ছেড়ে আমরা তাঁর কাছে দৌড়ে হাজির হতাম; বুঝতে পারি না-পারি, তাঁর কথা শুনতে ভাল লাগত"—একজন তাঁর বাল্যস্মৃতি বলেছেন—"আমাদের সঙ্গে বালকের মতো খেলা করেছেন; গেরুয়ার কাপড় দিয়ে মুখের একপাশ ঢেকে বলেছেন—বল্‌ দিকি, আমাকে মেয়েছেলের মতো দেখতে লাগে কি না?" নৌকায় আসতে-আসতে তিনি রহস্য করে ছেলেদের জন্য চিংড়িমাছের গান গেয়েছেন, যার বক্তব্য, চিংড়িমাছের দল দাড়া দিয়ে নৌকাগুলোকে আটকে দিচ্ছে।

"ছেলেমানুষের মতো কখনো-কখনো হয়ে যেতেন; নিজের গুরুত্ব ভুলে যেতেন," —আর একজনের স্মৃতিকথা—"আমরা তখন ছোকরা; একদিন আমাদের মেসে বেড়াতে এসেছেন, কচুরি ভেজে দেওয়া হয়েছে, খাচ্ছেন, খুব ভাল লেগেছে; একটু খেয়ে আমাকে খেতে দিলেন; আমি তাঁর প্রসাদ খাচ্ছি; আবার বলছেন, 'ঐটে থেকেই আর একটু দে না—বেশ চমৎকার; কি বলিস্‌?' "

একই স্মৃতি আর একজনের। নেয়াপাতি ডাবের ভিতর চিনি দিয়ে, বরফ দিয়ে খেতে স্বামীজী ভালবাসতেন। বলরামবাবুর বাড়িতে সে জিনিস জুটেছে। খেতে-খেতে বলছেন, 'আঃ চমৎকার, নে তুই খা।' সে খাচ্ছে—তখন উৎসুক তিনি—'আমায় একটু দে না!'

আর একটু স্মৃতি :

"বিকালে কতকগুলি যুবক স্বামীজীকে দেখতে এসেছে। তারা দলে ১০।১২ জন, সকলেই প্রায় কলেজের ছাত্র।...স্বামীজী অল্প পরেই তাদের কাছে হাজির। তিনি প্রাণখুলে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। এত স্ফূর্তিতে ছিলেন যে, মনে হল, তিনি ছেলেগুলির মতোই হয়ে গেছেন—অমনই তরুণ ও প্রাণোচ্ছল—কারো সঙ্গে-বা কথা বলছেন, কারো পিঠে কিল মারছেন, কারো কাঁধে ঝাঁকানি দিচ্ছেন—সে এক সুমধুর দৃশ্য।"

বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দের এই আচরণ যখন, নরেন্দ্র দত্ত যে অনুরূপ ব্যবহার করতে পারেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তখন দুষ্টুমীর অংশ অবশ্যই বেশী। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের নাতি নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন :

"সতীশবাবু আমাদের ন'কাকা। নরেনবাবু তাঁর সহপাঠী। দুজনে গলাগলি ভাব। বাবা ও কাকাবাবুদের দুটো বৈঠকখানাকে বলা হত—অক্সফোর্ড আর কেমব্রিজ। বাবার অসামান্য মেধা-প্রতিভার জন্য কলকাতার এলেমদার ছাত্ররা জমায়েত হত এই জোড়া-ঘরে। নরেনবাবু এইসব গুণীদের মজলিশে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান আলোচনায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য মহড়া নিতেন। তখন থেকেই সব ছোকরারা ওঁকে সমবয়সী হলেও চিহ্নিত সর্দারের মতো সমীহ, শ্রদ্ধা করত—তাঁর অপূর্ব তীক্ষ্ণ ধীশক্তি আর বাগ্‌বিভূতির জন্য। গলায়, গম্ভীর ভারী আওয়াজ। দেখতে একহারা। চোখ দুটো চমৎকার। মুখ যেন মনস্বিতা দিয়ে মাজা। তাঁর মুখে হাসি দেখলে সবাই আমোদ-আহ্লাদ করবার অধিকার পেত, কিন্তু যদি মুখে গাম্ভীর্য-মেঘ দেখা দিল, কার বাবার সাধ্যি আছে এগোয়!

"কৈলেস খাবারওয়ালা নানা রকমারী খাবার ঝুড়িভরে আনত। সব ছেলেরা মিলে পরমানন্দে জলপান করা হত। নরেনবাবু ন'কাকার বন্ধু বিধায় ঠিক বাড়ির ছেলের মতন গণ্য হতেন। আমাদের সব কারুর দু'পয়সা বরাদ্দ, কারুর চার পয়সা, কারুর-বা দু'আনা! যার যা স্কেল বাঁধা, মাথা খুঁড়লেও তার এক রতি বেশি পাবার উপায় নেই। নরেনবাবু সিনিয়ার গ্রেড, ন'কাকার র‍্যাংকের বড়দের দল, যেদিন আসতেন তাঁরও ওঁদের মতো হার বাঁধা। জিভে-গজা ওঁর বড়ই প্রিয়। একদিনের কথা—ওঁর বখরায় যা পেলেন তাতে তুষ্ট নন। একখানা গজা হঠাৎ তুলে নিয়ে সব্বায়ের সামনে নিজের জিভে ঠেকালেন, এবং হাঁড়ির মধ্যে টপ্ করে ফেলে দিয়ে হো-হো করে হেসে বললেন—'এই যা! স-ব এঁটো হয়ে গেল—!—ওরে তোরা কেউ আর গজা খাসনি।' হাঁড়িসুদ্ধ একাই মেরে দিলেন। কী আমোদই করতেন!"

শান্তিরাম বসুর স্মৃতি : "আমার ভাগ্নে-ভাগ্নী—রাম, কেষ্টময়ী প্রভৃতি ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা বসেছিল। ওদের জন্য আনন্দ করে, মুখে মজার আওয়াজ করে ছড়া বলতে লাগলেন—'দে দই, দে দই পাতে, ওরা বেটা হাঁড়ি-হাতে! ওদের পাতে মাছের মুড়ো—ওরা কি তোর বাবা—খুড়ো?' ওরা হেসেই খুন।"

হাসির পিঠাপিঠি গাম্ভীর্য। বেলুড়ে নিজের হাতে নর্দমা পরিষ্কার করছেন, তখন যে-ছেলেটিকে জল দিতে বলেছেন, সে একটু অন্যমনস্ক হয়েছে কি এমন বকুনি দিলেন যে, তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। খানিক পরেই সেই ভয়ে জড়োসড়ো ছেলেটিকে করুণাভরা স্বরে বলছেন, 'বাবা, আর একটু জল দে তো।' সেবক কানাইলালের কান মলে দিয়েছেন অন্যায়ের জন্য—কানাই লুকিয়ে কাঁদছিল—"কর্তা দূর হতে দেখে হাসতে-হাসতে বললেন—দেখতে পেয়েছি কানাই। আর কেঁদো না বাবা! তারপর গলা জড়িয়ে আবদারের সঙ্গে বললেন—ওরে কিছু মনে করিস নি। তোদের ভালবাসি তাই এমন করে বলি।"

প্রত্যক্ষদর্শীরা এক্ষেত্রে বলতে বাধ্য ছিলেন—'তিনি হাসলে ভুবন হাসত, কাঁদলে পৃথিবী কাঁদত।'

তাঁর শক্তি ও আনন্দ অপরের ভয় হরণ করে নিত। তাঁর সম্পর্কের বোন প্রিয়ংবদা দেবীর ছিল মেঘ-বজ্র সম্বন্ধে ভয়ানক আতঙ্ক। আকাশে মেঘ উঠলেই তিনি ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে, কানে তুলো গুঁজে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকতেন। তারপর একদিন—

"স্বামীজী তাঁর বাড়িতে এসেছেন। আকাশে আচম্বিতে বাজ ডাকতে আরম্ভ করল। দোতলার ঘরে স্বামীজীর সঙ্গে ভগিনীর সাক্ষাৎ! ঘরের দরজা-জানলা খোলা ছিল। আশ্চর্য ব্যাপার—আজ কিন্তু বাজ ডাকা সত্ত্বেও দরজা-জানলা বন্ধ করার কথা ভগিনীর মনে উঠল না—কানে তুলো দেবার কথাও নয়। স্বামীজী উচ্চরোলে হাসতে-হাসতে বললেন—কিরে! আজ তোর ভয়-ডর গেল কোথায়? হল কি? ভগিনী বললেন—আজ আমার মোটেই ভয় পাচ্ছে না।"

মীরাটের ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের বড় মেয়ে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের এক টুকরো মনোহর ছবি উপহার দিয়েছেন—

"বাবা স্বামীজীদের চেয়ে বয়সে বড়, তাই তিনি বাবার সামনে তামাক খেতেন না—বাগানের দিকে এক ধারের ঘরে তক্তপোষের উপর বসে খুব খেতেন। হাসতে-হাসতে বলতেন, 'বাবাকে যেন বলিসনি!' আমাদের দু'বোনকে নিকষা-মাসী, সূর্পনখা-মাসী বলে খেপাতেন। আমরা রেগে গেলে বলতেন, 'তোরা চটিস কেন? ওঁরা দুজন কি কম? স্বয়ং রামচন্দ্র একজনের নাক কেটেছেন, আর বিভীষণ অন্যজনের ছেলে।' চাটনি পরিবেশনের সময়ে মজা করতেন 'দেখিস, দিতে-দিতে যেন লাল পড়ে না যায়।'

"বাগানে বেড়াতে-বেড়াতে তুড়ি দিয়ে গান গাইতেন। আলু-কড়াইশুঁটি-সেদ্ধ খেতেন শীতকালে আগুন পোয়াতে-পোয়াতে। এই সময়ে সেখানে গঙ্গাধর-মহারাজ ছিলেন—তাঁকে আমরা ছোট স্বামীজী বলতাম। ছিপছিপে চেহারা, অদ্ভুত স্মরণশক্তি। খড়ের গাদার উপর উঠে একলাটি বসে থাকতেন। স্বামীজী আমাদের বলতেন, 'কেন একলা বসে আছে জানিস? মা-মাসীর জন্য চুপি-চুপি কাঁদছে রে! —কেউ যেন দেখতে না পায়! কান্না কেন বাপু—দেশে গিয়ে দেখে এলেই হয়! তারা বোধ করি মানাই করেছে। আর এখান থেকে যাবেই বা কি করে—এমন খ্যাঁটের বহর কোথায় পাবে।'"

শিশু-মনস্তত্ত্ব স্বামীজী খুব বুঝতেন; জানতেন কখন ছেলেদের স্নেহের প্রশ্রয় দিতে হয়। গৌর নামক বালকটি বকাটে হয়ে গিয়েছিল। তার মা তাকে শোধরাবার জন্য মঠে রেখে গিয়েছিলেন। শ্রীমান্ গৌর কিন্তু অবিলম্বে সংশোধিত হননি—রাখাল-

মহারাজের পকেট থেকে পয়সা চুরি করতেন। তাকে ধরে নিয়ে রাখাল-মহারাজ স্বামীজীর সামনে হাজির—অনুযোগ করে বললেন—'তুমি গৌরেকে আশ্‌কারা দাও, তাই এ এমন কাজ করে।' গৌর তখন ভয়ে থরহরি। স্বামীজী কিন্তু বকলেন না, উল্টে রাখাল-মহারাজকেই বললেন—'তুই মোহন্ত, সকলকে দেখার ভার তোর উপর। ও ছেলেমানুষ, ইস্কুলে যায়, টিফিনে অবাক-জলপান, নকলদানা, ঘুগনিদানা খাবার শখ স্বাভাবিক—যেমন তোর আমার ছেলেবেলায় ছিল। মাঝে-মাঝে দু'চার আনা দিয়ে দ্যাখ—চুরি বন্ধ হয় কিনা।'

আনন্দাশ্রু মিশিয়ে বৃদ্ধ বয়সে গৌরবাবুই এ কাহিনী বলেছেন।

এবং স্বামীজী একবাব এক অপকারী বালককে যে-যুক্তিতে বাঁচিয়েছিলেন, তা একেবারে ক্লাসিক। এ ঘটনাও মঠের এক বালক-ব্রহ্মচারী সম্পর্কে। ছেলেটি একটি অত্যন্ত দামী সৌখিন কাঁচের গ্লাস ভেঙে ফেলে, যেটি স্বামীজীকে জনৈক ইউরোপীয়-ভক্ত উপহার দিয়েছিলেন। এক বৃদ্ধ সাধু এর জন্য ছেলেটিকে ভয়ানক বক-ঝকা করছিলেন। সেটা স্বামীজীর কানে গেল। তিনি থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'অত বকুনি কেন? আরে বাপু, কাঁচের গ্লাস তো ঐ কবেই যাবে—তার তো কলেরাও হবে না, থাইসিসও হবে না।'

রগড় সর্বাবস্থায়। সকলেব সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিশতে পারতেন—অতি অল্প সময়ের মধ্যে সরিয়ে দিতে পারতেন মনের আড়াল—সে গাড়োয়ান-কোচম্যান হোক, সাধু-সন্ন্যাসী হোক বা বাজা-মহাবাজা হোক। কোচম্যানের সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে উর্দু-হিন্দী-মেশানো ভাষায় অশ্বতত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা কবতেন—তাদের হুঁকো টানতে-টানতে। উচ্চতম দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব এবং উচ্চতম রাজনীতি কোনোটাই তাঁর ধারণার বাইরে ছিল না। কিন্তু মাঝে-মাঝে গা-ঝাড়া দিয়ে সবকিছু ফেলে দিয়ে ইয়ার্কি শুরু করতেন। যে ছেলে সাধু হতে এসেছে তাকে বলছেন—'কিরে বাড়ি থেকে পালিয়ে এলি কেন, বউ পছন্দ হয়নি বুঝি? না, ঘড়ি, ঘড়ির চেন বা অন্য দেওয়া-থোওয়া মনঃপূত হয়নি?' ঘরের পাশে মালী-বউ তারস্বরে প্রাভাতিক আলাপাদি করছে, বললেন, 'আহা মালী-বউয়ের কি সাধা গলা!' কিংবা আলমোড়া পাহাড়ে যখন তাঁকে থালায় কর্পূর জ্বেলে দীর্ঘকাল নানা আড়ম্বরে আরতি করা হয়েছিল, তখন বলেছিলেন, 'বাপ্‌রে, ভূতেও এ-রকম আরতি সহ্য করতে পারবে না, মানুষ কোন্ ছার!' কিংবা মজার স্মৃতিকথা বললেন—

"ফ্রান্সে যাচ্ছি—জাহাজে শুয়ে আছি; সকালবেলা; তখনো চোখে তন্দ্রার আমেজ; এমন সময় শুনছি—কানের কাছে ক্রমাগত কে যেন বলছে—'ব্যাঙমশায়ের বে, ব্যাঙমশায়ের বে!' তারপর চমক ভাঙতে উঠে বুঝলাম, সকালবেলা ওয়েটার

সব যাত্রীর কেবিনে ধাক্কা মারছে আর বলছে—ইঁয়া মঁশিয়ে এ-প্রে'—গরম জল এনেছি মশাই।"

স্বামীজী বিশেষ আপত্তি করতেন, যদি দেখতেন যে, তাঁর পরবর্তী খ্যাতির জন্য পূর্বপরিচিত কেউ সংকোচে সরে যাচ্ছে! প্রথমবার বিদেশ থেকে ফেরার পরে রামলালদাদা (শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র) তাঁকে সসম্ভ্রমে 'আপনি অমুক করেচেন, তমুক করেচেন' ইত্যাদি বলতে লাগলেন। স্বামীজী শুনে বললেন—"দাদা! 'এই করেচেন, সেই করেচেন' বলে এত 'চেন' লাগাচ্ছেন কেন? আমি সেই বিলেই আছি।"

এই কালেরই কথা! স্বামীজী বাগবাজার থেকে সিমলায় আসছেন। হরি ঘোষ স্ট্রীটে একটি ছোট মনিহারী দোকান পড়ল—দোকানটির অতি দীন অবস্থা। সেখানে থেমে স্বামীজী দোকানীকে নাম ধরে ডাকলেন। সে তাঁর বাল্যবন্ধু। অনেকদিন পরে দুই বন্ধুর মোলাকাত হল। স্বামীজী দোকানের সামনে রাস্তার উপরে একটা কেরোসিন তেলের বাক্সের উপরে বসে দোকানী-বন্ধুর হুঁকোয় তামাক খেতে-খেতে গল্প জুড়ে দিলেন। দোকানদারটির কিন্তু তত সুনাম নেই—রীতিমত গেঁজেল সে—তাদের নরেন বিবেকানন্দ হয়েও তাকে সাঙাৎ বলে চিনবে—জীবনের এই ঐশ্বর্যের কথা সে কল্পনা করতে পারেনি। অশ্রুসজল কণ্ঠে সে বলতে লাগল—'ভাই নরেন, তুই এখন বড়লোক হয়েছিস্; তোর এখন কত নাম-যশ, আর আমি একটা সামান্য গেঁজেল। তবু তুই যে আমাকে চিনতে পারবি, এমন আদর করে কথা কইবি, ভাবতেও পারিনি। তাই চোখে জল আসছে। একসঙ্গে ছেলেবেলায় কত খেলা করলুম, কিন্তু তুই কত বড়লোক হয়ে গেলি, আর আমি হয়ে গেলুম সামান্য গেঁজেল।'

স্বামীজী ওসব কথায় কান না দিয়ে পূর্ববৎ কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু পাড়ার কতকগুলো ছোকরা ইতিমধ্যে দেখে ফেলেছে ব্যাপারটা। তারা সেখানে জুটে বলাবলি করতে লাগল, 'দ্যাখ, ঐ লোকটা বিবেকানন্দ-স্বামী—একটা কেরোসিন তেলের বাক্সে বসেছে, ঐ গেঁজেলটার হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে আর ওর সঙ্গে হেসে গল্প করছে—আরে ছি!' সেসব কথা শুনে দোকানদারের মনে বড় দুঃখ হল। সে বললে, 'দ্যাখ ভাই নরেন, তুই আমার সঙ্গে কথা কইছিস বলে ছোঁড়ারা আমাকে কত ঠাট্টা করছে, তোকেও করছে।'

ছোঁড়াগুলোকে তাড়াতে স্বামীজীকে বেশি-কিছু করতে হয়নি—একবার মাত্র তাদের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন, তাতেই কাজ হয়েছিল। এবং স্বামীজী সমান আনন্দে ও ঔদাসীন্যে পূর্ববৎ পথে বসেছিলেন, পথ হেঁটেছিলেনও—

"শিষ্য আজ বৈকালে কলিকাতার গঙ্গাতীরে বেড়াইতে-বেড়াইতে দেখিতে পাইল, কিছুদূরে একজন সন্ন্যাসী আহিরিটোলার ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি নিকটস্থ হইলে শিষ্য দেখিল, সাধু আর কেহ নহেন—তাহারই গুরু, স্বামী

শ্রীবিবেকানন্দ। স্বামীজীর বামহস্তে শালপাতার ঠোঙায় চানাচুরভাজা ; বালকের মতো উহা খাইতে-খাইতে তিনি আনন্দে পথে অগ্রসর হইতেছেন। ভুবনবিখ্যাত স্বামীজীকে ঐরূপে পথে চানাচুরভাজা খাইতে-খাইতে আগমন করিতে দেখিয়া শিষ্য অবাক হইয়া তাঁহার নিরভিমানিতার কথা ভাবিতে লাগিল। পরে তিনি সম্মুখস্থ হইলে শিষ্য তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার হঠাৎ কলিকাতা আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

"স্বামীজী—একটা দরকারে এসেছিলুম। চল্, তুই মঠে যাবি ? চারটি চানাচুর-ভাজা খা না! বেশ নুন-ঝাল আছে।"

স্বামীজীর আর এক শিষ্য—প্রথম শিষ্য—স্বামী সদানন্দ কিন্তু সদাবিনীত চরিত্রের মানুষ ছিলেন না। গুরুর সঙ্গে সমানে কথা চালাতেন। নীলাম্বর মুখুজ্জের বাগান-বাড়ির মঠে ঠাকুরের উৎসব হচ্ছে। কখনো ধ্যান, কখনো গান। সারদানন্দ তানপুরায় তান তুলছেন, অন্যরা ধ্যানে মগ্ন। "গুপ্ত-মহারাজ এই সময়ে ঠিক যেন ভৃঙ্গীর মতো একটা ডাণ্ডা নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। স্বামীজী বললেন, 'শালা, খালি কুলিগিরি করবি কি ? বোস্, ধ্যান লাগা।' গুপ্ত-মহারাজ মিটিমিটি হাসতে-হাসতে বললেন, 'এ মহারাজ! ধেয়ান তো আতাহি নেহি।'"

গুপ্ত-মহারাজ গুরুকে প্রয়োজনে উপযুক্ত শাসন করতে পারতেন। সদানন্দের স্মৃতিকথায় তার বিবরণ :

"বেলুড়ে শেষ দিনকতক তাঁর রুচিমত রান্না করি। তাঁর শরীর একেবারে ভেঙেছে। একদিন কি কারণে তিনি চটে লাল হয়ে বসে আছেন, মেজাজ অত্যন্ত গরম, কার সাধ্য সামনে এগোয়। খানা তৈরী করে বাবুর্চির কায়দায় কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে, ঘরে খাবার নিয়ে গিয়ে সাধাসাধি—'মহারাজ, নরম হোন্। গুস্সা ছোড়্ দীজিয়ে।' টেমপারেচার তবু নামে না।—'মেহেরবানী করুন, সব কুছ্ কসুর মাফ্ কীজিয়ে।'—'যাঃ শালা, দূর হ, খাবো না।' তখন আমিও দাঁত দেখালুম, তুম ভী মিলিটারী, হাম্ ভী মিলিটারী। রেগে হাত নেড়ে মুখের উপর বললুম—'যাঃ শালা! ভুখা রহো, হামারা ক্যা পরোয়া।' বলে তর্তর্ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলুম।"

একটু পিছন ফিরে বিবেকানন্দীয় দুষ্টুমির দু'একটি পুরনো দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যেমন গাজিপুরের ঠাকুর্দাকে বেদ শোনানো—

"গাজিপুরে এক সরকারী ঠাকুর্দা ছিল, জাতিতে ব্রাহ্মণ, এবং গাঁজা, গুলি ও চরসে সিদ্ধপুরুষ। কোনো কথা উত্থাপন করিবার আগেই ঠাকুর্দা বলিত—'ও বিষয় আমি জানি।' একদিন শিরীষচন্দ্রের বাড়িতে পরিব্রাজক নরেন্দ্রনাথ বসিয়া আছেন এমন সময় সেই ঠাকুর্দা আসিয়া উপস্থিত। সকলে ঠাকুর্দাকে পাইয়া খুব

স্ফূর্তি করিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর্দাকে বেদ পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন—'কস্মিংশ্চিৎ বনে ভাসুরকো নাম সিংহঃ প্রতিবসতি স্ম—এই হল বেদের প্রথম স্তোত্র'। বেদের নাম শুনিয়াই তো ঠাকুর্দা কান্না জুড়িয়া দিল। নরেন্দ্রনাথ তাহার পর ব্যাখ্যা শুরু করিলেন—'আহা, কি পদলালিত্য! কি শব্দবিন্যাস! কি ভাবপূর্ণ শ্লোক!' নরেন্দ্রনাথ চেয়ারে বসিয়া আছেন, আর ঠাকুর্দা মেঝেতে উপু হইয়া বসিয়া বেদের ব্যাখ্যা শুনিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে আর রুদ্ধ কণ্ঠে শোকব্যঞ্জক উহু-উহু করিতেছে। এই সময়ে শিরীষচন্দ্র আসিয়া পড়িল—সে হাসিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ শিরীষচন্দ্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'তুই যা এখন, চলে যা—আমি ঠাকুর্দাকে বেদ শোনাচ্ছি।' শিরীষচন্দ্র বাড়ীর ভিতর গিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল আর গেঁজেল ঠাকুর্দা নরেন্দ্রনাথের সামনে বসিয়া ব্যাখ্যা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল।"

পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী আলোয়ারে গিয়েছেন। সেখানে একদিন সদ্য পরিচিত যুবকদের জিজ্ঞাসা করলেন—কাছাকাছি কোনো সাধু আছেন কি না? একজন তাঁকে এক বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে নিয়ে গেলেন। বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী কিন্তু গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীদের খুবই অপছন্দ করেন। গেরুয়াপরা স্বামীজীকে দূর থেকে আসতে দেখেই তিনি গাল পাড়তে শুরু করলেন। স্বামীজী কাছাকাছি গেলে ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'তুই গেরুয়া পরেছিস কেন? আমি গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী দু'চোখে দেখতে পারি না।' স্বামীজী এক নজরেই তাঁকে চিনে নিয়েছিলেন। এ ধরনের চরিত্র নাড়াচাড়া করতে তাঁর মহা মজা লাগে। বিনয়ে বিগলিত হয়ে তিনি ধর্মোপদেশ প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মচারী কিছু নরম হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, তোর উপর তেমন রাগ নেই। তুই কিছু খাবি?' স্বামীজী করজোড়ে বললেন, আহারের প্রয়োজন নেই, তিনি শুধু তত্ত্বকথা শোনারই প্রত্যাশী। সে কথা শুনে মুহূর্তে ব্রহ্মচারী তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে দারুণ চীৎকার করে উঠলেন—'দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা।' স্বামীজীকে যিনি সাধু দেখাতে এনেছিলেন, তাঁর তখন শোচনীয় অবস্থা, স্বামীজীর অপমানে তিনি রেগেও গেলেন, কিন্তু স্বামীজীর আমোদের শেষ নেই। যতক্ষণ বৃদ্ধের কাছে ছিলেন, কষ্টে হাসি চেপে রেখেছিলেন, তারপরে রাস্তায় বেরিয়েই হাসিতে ফেটে পড়লেন। আর বলতে লাগলেন, 'আচ্ছা সাধু দেখালে। কি তিরিক্ষে মেজাজ! গালাগালির কি চোট রে বাবা!' তারপরেই বৃদ্ধের কথা ও ভাবভঙ্গির এমন নকল শুরু করলেন যে, উক্ত সঙ্গী হেসে লুটোপুটি।

অনেক বছর পরে, ১৯০০ সালের একেবারে শেষে প্রচণ্ড শীত ও তুষারপাতের মধ্যে স্বামীজী যাচ্ছেন আলমোড়ার মায়াবতীতে তিনি ডাণ্ডীতে ছিলেন। বৃষ্টি ও কুয়াসায় চারদিক আচ্ছন্ন, তুষারপাতও ক্রমে বাড়তে ল, আর ডাণ্ডীবাহকদের

পদস্খলন হতে লাগল। স্বামীজী তাদের স্ফূর্তিতে রাখবার জন্য গল্প জুড়ে দিলেন। নানারকম ফস্টিনস্টি মস্করা চলল। "তাদের ভিতর একজন বড মজার লোক ছিল। তাহার বারকতক বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু একটি স্ত্রীও বাঁচিয়া ছিল না। আর 'চণ্ডী' পুস্তকখানি সমস্ত তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। তার সেই অদ্ভুত সুব আর বিশ্রী উচ্চাবণের সঙ্গে চণ্ডীর সংস্কৃত অতি অপূর্ব আকার ধারণ করিল। স্বামীজী তাহাকে . আরও বলিবার জন্য উৎসাহ দিতেছিলেন, আর মাঝে-মাঝে তাহাকে 'পণ্ডিতজী' বলিয়া ডাকিতেছিলেন। তাহাতে লোকটি খুব আত্মপ্রসাদ বোধ করিতেছিল। আর একটু মজা করিবার জন্য স্বামীজী জিজ্ঞাসা কবিলেন, সে আর বিবাহ করিতে রাজি আছে কিনা? সে অম্লানবদনে বলিল, 'খুব রাজি আছি। কিন্তু যৌতুকের টাকা কোথায়?' স্বামীজী বলিলেন, 'ধর, যদি আমিই দিই।' লোকটির আনন্দ দেখে কে? আনন্দে গদ-গদ হইয়া সে ঘন-ঘন স্বামীজীকে প্রণাম করিতে লাগিল।"

মজা করবার সময়ে স্বামীজীর পাত্রবিচার ছিল না। গেঁজেল ঠাকুর্দা থেকে 'বৃদ্ধ ঋষি' পর্যন্ত তাঁর কৌতুকের গতায়াত। পরিব্রাজক অবস্থায় দেওঘরে গেছেন —তখন সেখানে আছেন পরম শ্রদ্ধাভাজন ঋষি রাজনারায়ণ বসু। স্বামীজী, গঙ্গাধর-মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর দর্শনে গেলেন। কথাবার্তার সময়ে বৃদ্ধ আচার্যের কেন জানি মনে হল—এই ছোকরা সাধু-দুটি ইংরেজী জানে না। তাই তিনি সযত্নে সব-কিছু বাংলায় বোঝাতে লাগলেন—এমনকি 'প্লাস' শব্দটিকে আঙুলে প্লাস বানিয়ে বোঝালেন। এক পেট ফুটন্ত হাসি নিয়ে নির্বিকার মুখে তাঁবা বৃদ্ধের ব্যাকুল অনুবাদ লক্ষ্য করতে লাগলেন, কদাপি ভাঙলেন না তাঁরা কতখানি জানেন—তারপর বাইরে এসে হাসিতে ফেটে পডলেন।

রঙ্গকৌতুকের সময়ে স্বামীজী কোনো কিছুকেই পূজার্হ, তাই পরিহার্য বিবেচনা করতেন না। দশনামী সন্ন্যাসীদের নানা ভাগ—গিরি, পুরী, বন, পর্বত, সাগর, আশ্রম, ইত্যাদি। রামকৃষ্ণ সংঘ পুরী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীর কাছে বেদান্ত-সাধনার দীক্ষা নিয়েছিলেন। স্বামীজীকে তাঁর পরিব্রজ্যা-কালে হৃষীকেশ অঞ্চলে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—'আপনারা গিরি না পুরী?' —স্বামীজী ঝটিতি উত্তর দেন—'কচুরী।'

মজা ক'রে স্বামীজী অপরকে সাজা দিতেও পারতেন। আমেরিকায় যখন তিনি বিনা পয়সায় বক্তৃতাদি করছেন, তখনকার কথা। নিতান্ত সামান্যভাবে থাকেন; "একটা ছোট ঘরে খাওয়ার জিনিসপত্র, মশলাদি থাকত। এক সাহেব একদিন সেই ঘরে ঢুকে প্রত্যেকটি জিনিস কী জেনে নিয়ে চেখে দেখতে লাগল। এটি খুব বিরক্তিকর ব্যাপার। চক্ষুলজ্জা আর এটিকেটের খাতিরে স্বামীজী কিছুই বলতে পারছেন না। একটি পাত্রে অনেকগুলি লঙ্কা ছিল। সাহেব জিজ্ঞাসা করলে,

এগুলি কী? স্বামীজী ভাবলেন, এবার ব্যাটাকে জব্দ করতে হবে।—'এগুলি ভারতীয় কুল'—বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এদিকে সাহেব একমুঠো মুখে দিয়ে মরে আর কি!...লোকটি আর সে ঘরে ঢোকেনি।"

ধর্মনেতা বিবেকানন্দের অবশ্যই কিছু শিষ্য ছিল। কিন্তু শিষ্যের মুখের হাসি কেড়ে নেওয়াকে তিনি কদাপি গুরুকৃত্য মনে করতেন না। কেম্ব্রিজের ডক্টর, সুপণ্ডিত বিদগ্ধ ডাঃ ওয়াইট, স্বামীজীর দলের সঙ্গে গেছেন 'সহস্র দ্বীপোদ্যানে।' স্বামীজীর উপদেশ ও শিক্ষায় তিনি এত মগ্ন, অভিভূত হতেন যে, প্রতিটি ভাষণের শেষে অতি-অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতেন—'আচ্ছা স্বামীজী, তাহলে কি এই দাঁড়াল—আমি হলাম ব্রহ্ম, আমি হলাম নিত্য?' স্বামীজী প্রশ্রয়ের হাসিসহ মিষ্টভাবে বলতেন—'হ্যাঁ ডক্টর, আপনি ব্রহ্ম, আপনি নিত্য—মূল স্বরূপে আপনি তাই।' তারপরে উক্ত সুপণ্ডিত ডক্টর যখন কিছু বিলম্বে খাওয়ার টেবিলে আসতেন, তখন স্বামীজী মুখে গাম্ভীর্য, চোখে ঝিলিক নিয়ে বলতেন,—'ঐ যে, শ্রীযুক্ত ব্রহ্ম আসছেন', কিংবা 'এই যে, নিত্যবাবু এসে গেছেন।'

সরস কথা স্বামীজীর ওষ্ঠাগ্রে যেন প্রস্তুত থাকত। প্রত্নতাত্ত্বিক মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় স্বামীজীর স্নেহভাজন ছিলেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ইনি স্বামীজীর অনুরোধে Combustion সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন—তার নাম দেন 'জ্বলন'। 'প্রবন্ধটি নীরস হইয়াছিল।' স্বামীজী পড়েই বললেন—'বাবা, এ যে হাড়-জ্বলন।'

অনুগত শিষ্য গুডউইনের সঙ্গে স্বামীজীর ঠাট্টা-তামাশা ভালই চলত। তখন তিনি লণ্ডনে আছেন, গুডউইনও সঙ্গে আছেন। গুডউইন আগে গোঁফ কামাতেন—এখন কিছুদিন না-কামিয়ে, নিজ ওষ্ঠোপরি উদ্‌গত কিশলয়ের সৌন্দর্যমোহে পড়ে গেছেন। তাই নিয়ে উভয়ের কিছু সংলাপ :

গুডউইন ( গোঁফে হাত বুলিয়ে, পরম আহ্লাদে )—A painter will give me ten pounds to make this a model.

স্বামীজী—Yes, it would be the model of a pair of very nice broom.

[ গুডউইন—( গোঁফে হাত বুলিয়ে ) এই গোঁফকে মডেল হিসাবে ব্যবহার করতে পেলে যে-কোনো শিল্পী দশ পাউণ্ড দিয়ে দেবে।

স্বামীজী—অবশ্য অবশ্য, অতি চমৎকার ঝাঁটার মডেল হবে ওটি। ]

গুডউইন তাঁর গোঁফের এতখানি সাফল্য আশা করেননি—একেবারে সুন্দর ঝাঁটার মডেল!! নেহাত তিনি সুকুমার রায়ের কবিতা পড়ার সুযোগ পাননি, নচেৎ সহজেই বলতে পারতেন—'গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা।'

গুডউইনের লাঞ্ছনা এইখানেই শেষ নয়। বেচারা সর্বদাই উৎফুল্ল এবং উৎসাহী।

কথার পিঠে কথা বলতে উদ্‌গ্রীব, কিন্তু সব সময়ে ঠিক কথাটা বলে উঠতে পারেন না। সকলে বসে আছেন, মিঃ স্টার্ডি তাঁর পুরনো স্মৃতি শোনাচ্ছিলেন—স্কুলে পড়ার সময়ে এক শিক্ষক একটি ছাত্রের হাতে বেত মারেন ; তেজস্বী ছাত্রটি হাত না সরিয়ে শিক্ষককে বারবার বলেছিল—আরও মারুন ! আরও মারুন। ছাত্রটির হাত দিয়ে রক্ত পড়লেও সে স্থির ছিল। শিক্ষকই শেষপর্যন্ত লজ্জিত হয়ে নিরস্ত হয়েছিলেন।

স্টার্ডি বললেন—তারপর থেকে I become awefully angry when I see a man beating a boy.

একথা শুনে গুডউইন একটা-কিছু বলার প্রেরণায় বলে বসলেন—Yes Mr. Sturdy, I too become awefully angry when I see a man beating a donkey.

স্বামীজী ওঁদের কথাবার্তা শুনছিলেন। গুডউইনের কথা শেষ হওয়া মাত্র তিনি বলে উঠলেন—Yes, because it rouses your fellow-feeling.

[ স্টার্ডি—সেই থেকে আমি যখনই দেখি, কোনো লোক কোনো ছেলেকে মারছে —আমি ভয়ানক রেগে যাই।

গুডউইন।—হাঁ মিঃ স্টার্ডি, আমিও ভয়ানক রেগে যাই যখন দেখি কোনো লোক গাধাকে পেটাচ্ছে।

স্বামীজী—ঠিক, যেহেতু তা তোমার স্বজন-প্রেম জাগিয়ে তোলে। ]

স্বামীজী সর্বদাই নিরপেক্ষ। তিনি কি পুরুষ-গুডউইনের গুম্ফ-প্রসাধনের উপর কটাক্ষ করেই থেমে যাবেন ? সুপ্রসাধিতা মহিলাগণ যদি জানতেন—তাঁদের সৌন্দর্য-সাধনা সম্বন্ধে স্বামীজীর কী উপাদেয় ধারণা ছিল !! লণ্ডনে থাকাকালীন একটি ঘটনা—

"বেলা দশটা হইয়াছে, রাস্তায় অনেক লোকজন আনাগোনা করিতেছে। ডাইনিং-ঘরের রাস্তার দিকের জানলার সমস্তটা একখানা বড় কাঁচ দিয়া ঢাকা—রাস্তার লোকজন দেখা যাইতেছিল— সেইদিকে চাহিয়া স্বামীজী একটি কৌতুকপূর্ণ গান রচনা করিলেন :

"ছাতি হাতে, টুপি মাথায় আসচে যত ছুঁড়ি,
মুখেতে মেখেছে তারা ময়দা ঝুড়ি-ঝুড়ি।"

অতীব আপত্তিকর কবিতা। মেয়েরা পাউডার মাখে, হয়ত একটু বেশিই মাখে, তাই বলে তা এত বেশি কি যে, 'কোদাল দিয়ে চাঁচা যায়' ? কিংবা পরবর্তীকালে এক সাহিত্যিক যেমন বলেছেন—পাউডার-মাখা মহিলারা যেন রাঁধবার আগে ছাই-মাখানো কই মাছ ( মেম হলে চাঁদা মাছ )।

মহিলারা অভিযোগ করে বলতে পারেন—ও হল স্বামীজীর সুন্দর চেহারার

অহঙ্কার। বসুমতী-মা তো নব্বুই বছর বয়সেও দুঃখ করতে ছাড়েননি। তিনি ছিলেন কালো মেয়ে, বিয়ে হয়েছিল ফর্সা সুন্দর চেহারার উপেন মুখুজ্জের সঙ্গে—বর-বউ নরেন দত্তের পাড়ার ছেলে-মেয়ে, তাই তিনি দুজনকেই চেনেন। বিয়ের রাতে ছোট্ট কালো বউটির খোঁপা নেড়ে বন্ধুকে বলেছিলেন—'এ কাকে বিয়ে করলি রে উপেন—এর পেটে যে বাগদীপাড়া জন্মাবে।'

জ্বলন্ত সুন্দর নরেন্দ্রনাথের উপর তখন থেকেই অনেকের নজর—আমেরিকায় সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের উপরও বহুতর নয়নবাণ। সেখানে একজন বললেন, 'স্বামীজী সাবধান! আপনার উপরে অনেক মহিলার দৃষ্টি।' স্বামীজী মহাগম্ভীরভাবে বললেন—'খবরদার। কেউ যদি আমার দিকে খারাপ চোখে তাকায়, তখনি সবুজ ব্যাঙ হয়ে যাবে।'

কোনো মহিলা এরকম বিদ্‌ঘুটে ভবিষ্যৎ চাইতে পারেন না, এবং তাঁরা অনেকেই নিতান্ত অপছন্দ করেছিলেন স্বামীজীর 'মা' ডাক, অন্য কারণে না হলেও একটি বিশেষ কারণে—মা মানেই তো বুড়ি। মহিলাদের বিহ্বলভাবকে নাড়া দেবার জন্য ইচ্ছে ক'রে তিনি 'এটিকেট' ভাঙতেন; মেয়েদের সামনেই চুরুট খেতেন (সাহেবভক্ত জনৈক বাঙালী সংস্কারক সেই কাণ্ডের কথা জেনে ঘৃণায় ব্রহ্মস্মরণ করেছিলেন); খাওয়ার টেবিলে বসেই, অপেক্ষা করার রীতি না মেনে, অবিলম্বে খেতে শুরু করে দিতেন; মাঝে মাঝে কাঁটা চামচে ফেলে দিয়ে নিজের হাতে খাওয়ার বর্বর ভারতীয় প্রথাও চালাতেন; হাত চাটতেন পর্যন্ত।*

আমাদের বিবরণ বাঁকা পথে ঘুরছে—পুনশ্চ স্বামীজীর গাল-গল্পের দিকে মোড় ফেরা যাক। না, গল্প নয়—সত্য-কাহিনী—

এক আমেরিকান দম্পতি ভূতের ব্যবসা করত। কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে তারা স্বর্গত প্রিয়জনদের (প্রয়োজনে অপ্রিয়জনদেরও) পর্দায় নামাত। ঐ ভূত-বাণিজ্যের অন্যতম অংশীদার জনৈক মিসেস উইলিয়ামস। ভদ্রমহিলা সবিশেষে স্থূলকায়া। একবার এক ইঞ্জিনীয়ার-ছোকরা তার ভৌতিক জননীকে দেখতে এল ব্যাকুল হয়ে। ওহেন ভক্তিব্যাকুলতা মেটাবার জন্যই তো ভূতব্যবসা। ছোকরার জননী জীবৎকালে ছিলেন ক্ষীণকায়—তাঁর ভূমিকায় পর্দাসীন হলেন স্থূলকায় মিসেস উইলিয়ামস। মাতৃকাতর

* একবার জনৈক অভিজাত ইংরেজ মহিলা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এব্রাহাম লিংকনের দর্শনে গিয়ে অবাক—প্রেসিডেন্ট নিজের জুতো পালিশ করছেন। হতভম্ব মহিলাটি কোনক্রমে বললেন—

'মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনি নিজে নিজের জুতো পালিশ করছেন?'

লিংকন সুমধুর স্বরে প্রতিপ্রশ্ন করেছিলেন—

'মাননীয় ভদ্রমহিলা, আপনি নিজে অন্য কার জুতো পালিশ করেন?'

ছোকরাটি তখন বিহ্বল বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল—'মা মা, প্রেতরাজ্যে গিয়ে তুমি কী মোটাই হয়েছে !'

ছেলেটির বিগড়ানো মাথা ঠিক করবার জন্য স্বামীজী তাকে একটি গল্প শোনালেন—

এক চিত্রকরের কাছে একজন রুশ হাজির হয়ে বলল—তার বাবার ছবি এঁকে দিতে হবে। 'কিন্তু কি দেখে আঁকব—তাঁর ছবি-টবি আছে কিছু ?'—চিত্রকর শুধালো। 'না তা নেই।' এমনকি বাবার চেহারার ভালো বর্ণনাও পুত্র দিতে পারল না। না পেরেও সে অকুণ্ঠিত—'কেন, বললাম তো, বাবার নাকের উপরে একটা আঁচিল ছিল।'

চিত্রকর তখন একটি কৃষকের ছবি আঁকলে, এবং নাকের উপরে একটি মস্ত আকারের আঁচিল বসিয়ে দিলে। ছবি দেখে পুত্র একেবারে অভিভূত—

'অ্যাঁ—অ্যাঁ—বাবা !—বাবা !—শেষ দেখার পরে তুমি কত বদলে গেছ !'

গল্পটি এইখানেই শেষ নয়। পেত্নী-মডেল মিসেস উইলিয়ামস স্বামীজীকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। তিনি নিজের ভৌতিক কীর্তি দেখাবার জন্য একবার স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। স্বামীজী উপস্থিত—ভূতগণ পর্দায় নামলেন। ভূতগণের সঙ্গে জনগণের পরিচয় করিয়ে দেন মিডিয়ম। তিনি বলতে লাগলেন—

"আমি দেখতে পাচ্ছি, একজন ভূত ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন। উনি বলছেন, দর্শকদের বেঞ্চে একজন হিন্দু ভদ্রলোক বসে আছেন !"

স্বামীজী আর থাকতে পারলেন না—তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"আমি যে আছি, তা বলবার জন্য কোনো ভূতের প্রয়োজন নেই !"

এই ভূত-ব্যবসার পুরুষ-পার্টনারকে স্বামীজী একদিন খুবই তিরস্কার করছিলেন—লোক ঠকানোর জন্য। তা শুনে উক্ত ব্যক্তির স্ত্রী সাগ্রহে বলে উঠল—"হাঁ মহাশয়, আমিও ওঁকে বারণ করি। উনি যত ভূত সেজে মরেন, আর টাকাকড়ি হাতিয়ে নিয়ে যান মিসেস উইলিয়ামস।"

আমেরিকানরা টাকা রোজগারে বদ্ধপরিকর—ভূত অদ্ভুত যে-কোনো ব্যবসায়ের দ্বারা। ডলারপ্রীতি তাদের মজ্জাগত। পাদরী-পুরুতদের মধ্যেও ঐ ডলারপ্রীতি কতখানি প্রকট, তাকে হাসির ঝাপটে খুলে ধরেছিলেন স্বামীজী একটি মজার গল্প শুনিয়ে—

সমুদ্রে একটি আমেরিকান জাহাজ ডুবুডুবু। সবাই ডুববে—অব্যাহতি নেই। নিরুপায় যাত্রীরা অগত্যা পারলৌকিক সদ্‌গতি চাইল। জাহাজে ছিলেন এক প্রেসবিটেরিয়ান পাদরী—তিনিও ডুবছিলেন। তাঁকে সবাই ধরে বসল—'পাদরী-বাবা, মরতে বসেছি, কিছু ধর্মকথা শোনাও !'

'অবশ্য অবশ্য'—পাদরী রাজি—এবং তৎক্ষণাৎ তিনি টুপি উল্টে 'দান' সংগ্রহ করতে লেগে গেলেন।

আমেরিকানদের ডলারপ্রীতির পরিচয় স্বামীজী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও দিয়েছিলেন। চিকাগো এগজিবিশনে তিনি নাগরদোলায় উঠেছেন। উঠবার সময়ে দেখলেন—দুটো লোকের মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় প্রথা—পরস্পর দুঃখ-বিনিময় করা। তার বদলে তারা কার্ড বিনিময় করলে। দুজনেই ব্যবসা করে।

ধর্মপ্রচারক হিসেবে ধর্মপ্রচার নিয়ে কৌতুক করার পুরো অধিকার তাঁর ছিল। এবং তিনি অধিকারসচেতন ছিলেন। এক নিগ্রো প্রচারকের গল্প তিনি শুনিয়েছেন। নিগ্রো-পাদরী শ্রোতাদের কাছে চেঁচিয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝাচ্ছেন—

"ঈশ্বর কাদা তৈরী করলেন—সেই কাদায় আদমকে গড়লেন—তারপর কাদার আদমকে বেড়ায় শুকুতে দিলেন—তারপর—"

"থামুন, থামুন, মশাই।"—এক মহা বিজ্ঞ শ্রোতা চীৎকার করে বাধা দিল—"কিন্তু ঐ বেড়াটা এল কোথা থেকে—কে তাকে সৃষ্টি করল—?"

শুনে নিগ্রো-পাদরী ভয়ানক গম্ভীর, এবং বিষণ্ণ—

"চুপ! আর একটি কথা নয়! কদাপি এমন প্রশ্ন করবে না। যদি করো, তাহলে অবিলম্বে সব ধর্মশাস্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে।"

মারাত্মক গল্প ছিল আর একটি—স্বামীজীর বড় প্রিয় সেটি।

এক মিশনারী ধর্মপ্রচারের জন্য নরখাদকদের মধ্যে গিয়েছেন। কিছুদিন পরে তাঁর পথানুসরণ করে আর একজন মিশনারী একই জায়গায় গেলেন। স্বতঃই স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে তিনি পূর্ববর্তীর বিষয়ে খোঁজখবর নিতে লাগলেন, বিশেষতঃ ধর্মপ্রচারে তাঁর সাফল্য বিষয়ে।

মিশনারী মহোদয় নরখাদকদের সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন—"তাঁকে তোমাদের কেমন লেগেছে?"

নরখাদকেরা পরমানন্দে জিভে ঝোল টেনে উত্তর দিল—"আহা, বড়ই সু-স্বা-দু!"

পাশ্চাত্ত্যে স্বামীজী ভারতের নানা কাহিনী শোনাতেন—তার অধিকাংশই গভীর-রসাত্মক—কিন্তু হাল্কা গল্পও থাকত। আমাদের সকলেরই পরিচিত সেই কাহিনীটি তিনি বলেছিলেন, যার মধ্যে ভাগ্যগণনা সম্বন্ধে নির্বোধ বিশ্বাসকে কশাঘাত করা হয়েছে।—

রাজার ভাগ্যগণনা করে গণৎকার অভ্রান্ত বিশ্বাসে বলে দিল, 'মহারাজ, অমুক তারিখে আপনি নির্ঘাত মরছেন।' সুতরাং রাজা দিন-দিন শুকোতে লাগলেন। জ্যোতিষীর গণনার চোটে না হোক, ভয়ের চোটে রাজার এন্তেকাল ঘনিয়ে এল।

এধারে রাজা-মানুষটি ছিলেন ভাল। মন্ত্রী দেখলেন, রাজ্যের সর্বনাশ! সুতরাং তিনি রাজাকে বোঝাতে লাগলেন—ঐ রকম বাজে কথায় কদাপি বিশ্বাস করবেন না। রাজা তাতে কর্ণপাত না করে অটল বিশ্বাসে নিয়মিত মরতে লাগলেন। তখন মন্ত্রী উক্ত গণককে রাজার সামনে ডেকে আনলেন। 'ভাল করে গনে বলুন, আপনার গণনা সঠিক কি না?' গণক বলল—'আর গনার দরকার নেই—রাজা অমুক তারিখে মরছেনই।' শুনে রাজা তখনি মর-মর। 'এবার ভাল করে গনে বলুন তো, আপনি নিজে মরছেন কবে?'—'তা-ও এখন গনার দরকার নেই—আমি আগেই গনে রেখেছি—বাঁচব আরও বহু বছর।' 'তাই নাকি'—মন্ত্রী মৃদু হাসলেন—তারপর সাঁ করে তলোয়ার বার করে ঘ্যাচ্ করে গণৎকারের মুণ্ডু ধড় থেকে খসিয়ে পুরো হেসে রাজাকে বললেন—'মহারাজ, দেখুন গণনার ছিরি!' বলাবাহুল্য এহেন বে-ধড়ক পরিহাসে রাজা চমৎকৃত হয়ে পুনর্জন্মের হাস্য করলেন।

মানুষ তার নিজের বুদ্ধি ও রুচিসীমায় কিভাবে আবদ্ধ থাকে, তা বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী গল্প ফাঁদলেন—

এক রাজা একবার অন্য রাজ্য জয় করতে সসৈন্যে হাজির। আক্রান্ত রাজ্যে সভা বসেছে—কিভাবে শত্রুর হাত থেকে বাঁচা যায় স্থির করবার জন্য। সভায় আছে ইঞ্জিনীয়ার, সূত্রধর, চর্মকার, কর্মকার, উকিল, পুরোহিত। ইঞ্জিনীয়ার জিজ্ঞাসিত হয়ে বলল, শহরের চারিদিকে খাল খুঁড়ে বেড়া দিয়ে দাও। সূত্রধর বলল, কাঠের দেওয়াল দেওয়া যাক। চর্মকার বলল, চামড়ার মতো মজবুত আর কিছু নেই—চামড়া ঝুলিয়ে দাও। কামার বলল, লোহার দেওয়ালই ভাল, তা ভেদ করে গুলি-গোলা আসতে পারবে না। উকিল বলল, কিছুই করতে হবে না, আমাদের রাজ্য কেড়ে নেবার অধিকার শত্রুপক্ষের নেই, একথা যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হোক। শেষে পুরোহিত বলল, তোমরা বাতুল; মন্ত্রশক্তিই বড় শক্তি; যাগ-যজ্ঞ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করো, তুলসী দাও, দেখবে শত্রু উড়ে গেছে। অতঃপর রাজ্যরক্ষা দূরে গেল—ইঞ্জিনীয়ার, সূত্রধর, চর্মকার, কর্মকার, উকিল, পুরোহিতে তুমুল তর্ক—কোলাহল—বিবাদ।

একই জিনিসকে নিজ প্রবৃত্তি বা প্রকৃতি অনুযায়ী কিভাবে বিভিন্ন মানুষ ভিন্ন-ভিন্নভাবে দেখে, তার কাহিনী স্বামীজী শোনালেন—

রাত্রে চুরি করতে বেরিয়েছে চোর। কিছু পথ গিয়ে মাঠের ধারে দেখল—উঁচুমতো কি একটা জিনিস রয়েছে। সে ভাবল—আর একটা চোর চুরি করবার জন্য গুঁড়িগুড়ি মেরে পড়ে রয়েছে। চোরটা সেখানে গিয়ে বলতে লাগল—'কি ভায়া, রাত্রে কাজ-টাজ কেমন চলছে? কিন্তু রাত তো এখনো অনেক বাকি, এক জায়গায় চুপ ক'রে বসে থাকলে কি চলবে—পাঁচ জায়গায় না ঘুরলে রোজগার ভাল হবে

কেন?' উঁচু জিনিসটা থেকে কিন্তু কোনো উত্তর এল না। তখন চোর আবার বলল, 'কি বাবা, মাল সাট করে গ্যাট হয়ে বসে আছ! থোক্-থাক্ কিছু মেরেছ বুঝি—তাই কাজে মন নেই! আমার বরাত, এখনও মালের খোঁজে রাস্তায় ঘুরতে হচ্ছে।' এই বলে চোর চলে গেল।

একটু পরে এক মাতাল সেখানে হাজির। উঁচু জিনিসটাকে সে পড়ে-থাকা এক মাতাল বলে ঠাওরালে। বললে—'কি বাওয়া, ঘুপটি মেরে কোনো মাগীর জন্যে ওৎ পেতে বসে আছো? বেশ বাওয়া বেশ! আমি এক চক্কর মেরে আসি—তারপর তোমার মাল ছিনিয়ে নেবো।'

তারপর এলেন এক সাধু। তিনি বলতে লাগলেন—'বাঃ বাঃ, বেশ মজা মারছ! মাঠের ধারে একলা বসে সারারাত জপ করে নিচ্ছ, আর আমাকে এমন বোকা মনে করেছ—আমি সারারাত ঘুমিয়ে কাটাব? তা হচ্ছে না। আমিও এখানে বসলুম।' বলে সাধু সেইখানে বসে জপ শুরু করে দিলেন। শেষ রাতে চোর এবং মাতালও সেখানে এল—এবং নিঃশব্দে নিজ নিজ অভীষ্টের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

তারপর রাত পোয়ালো। দেখা গেল, উঁচু জিনিসটা—চোর নয়—মাতাল নয়—সাধু নয়— একটা কেটে-নেওয়া গাছের গুঁড়ি!!

নিজ বুদ্ধিতে অতিবিশ্বাসের অনেক কাহিনীই স্বামীজী বলতেন। সবাই নিজের মাপে সব কিছুকে মাপতে ব্যস্ত। বোম্বাইয়ের একটি মজার ঘটনা তিনি শোনালেন:

বোম্বাইয়ের এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়িতে বসে দাবা খেলছিল দুই ব্যক্তি—একজন হিন্দু, অপরজন জৈন। বাড়িটি ছিল সমুদ্রের ধারে। দাবা খেলা বহুক্ষণ ধরে হয়—সুতরাং খেলার মধ্যে জানালা থেকে সমুদ্রের জোয়ার ও ভাঁটা তারা দেখতে পেল। কা অদ্ভুত কাণ্ড—সমুদ্রের জল ফুলে উঠল, আবার কমে গেল! কী করে? কারণ ব্যাখ্যা করতেই হয়। একজন বলল—'ও আর কিছু নয়, দেবতাদের খেলা। তাঁরা হুড়হুড় করে জল ঢালছেন, আবার তুলে ফেলে দিচ্ছেন।' দ্বিতীয় ব্যক্তির এই ব্যাখ্যার সবটা পছন্দ হল না। তবে এটা যে, দেবতাদেরই কীর্তি, তাও অগ্রাহ্য করতে পারল না। সে বলল—'না হে, দেবতারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য উঁচু পাহাড়ের মাথায় জলটা তুলে নিয়ে যান; তারপর কাজ শেষ হলে সেটা ফেলে দেন—তাতেই জল কখনো কমে কখনো বাড়ে।' এক ছোকরা-ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিল। দাবাড়েদের কথা শুনে সে হেসে ফেলল—'না মহাশয়রা, জোয়ার-ভাঁটার বৈজ্ঞানিক কারণ আছে, ওসব হয় চাঁদের টানে।' শুনে দাবাড়েরা মহা গরম, হয়ে, নিজেদের পার্থক্য ভুলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলল—'কে হে ছোকরা তুমি—কি বাজে বকছ? আমরা গাধা নাকি? বলি, চাঁদের হাতে কি কোনো দড়ি আছে যে, সে

দড়ি দিয়ে জলকে টেনে তুলবে ? আর অতবড় দড়িই বা সে পাবে কোথা থেকে ? যাও, যাও, ওসব আহাম্মকি শোনার সময় আমাদের নেই।' ঠিক এই সময়ে গৃহস্বামী ঢুকলেন সেখানে। তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি, কিন্তু দেখলেন, মূর্খ দাবাড়েদের আসল কথা বোঝানো অসম্ভব। তখন তিনি ছোকরাটিকে চোখ টিপে নিরস্ত ক'রে নিজের ব্যাখ্যা দিলেন—'তোমাদের জানা উচিত, বহুদূরে সমুদ্রের মাঝখানে স্পঞ্জের একটি বিরাট পর্বত আছে। স্পঞ্জ কাকে বলে তোমরা নিশ্চয় জানো। বুঝতেই পারছ, ঐ বিরাট স্পঞ্জের পাহাড প্রচুর জল টেনে রাখে—যখন তা রাখে তখন সমুদ্রের জল কমে গিয়ে ভাঁটা হয়। তারপর ঐ পাহাড়ে দেবতারা এসে হাজির হন—এবং নাচতে শুরু করেন—আর বোঝো, অন্য কারো নয়, দেবতাদের নাচ!—তার ধাক্কায় স্পঞ্জের পাহাড়ের জল বেরিয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে এবং জোয়ার শুরু হয়ে যায়। মশাইরা, এই হল জোয়ার-ভাঁটার আসল কারণ—কী সহজ অথচ কী যুক্তিযুক্ত!'

ব্যাখ্যা শুনে দুই দাবাড়ে মুগ্ধ। তারা চাঁদের টানে জোয়ার-ভাঁটা হয়, বিশ্বাস করেনি, কিন্তু স্পঞ্জের পাহাড়ে দেবতাদের নাচে অবিশ্বাসের কিছু নেই। তাদের কাছে দেবতারা সত্য, এবং তারা স্পঞ্জও দেখেছে—উভয়ের যোগে জোয়ার-ভাঁটা ঘটা আশ্চর্য কি!

পাশ্চাত্ত্যের সাধারণ মানুষের ধর্মবিষয়ক অজ্ঞতাব প্রসঙ্গে স্বামীজী একটি মজার গল্প শোনালেন। এক পাদরী গেছেন কয়লা খনিতে ধর্মপ্রচার করতে। তিনি সেখানকার কুলিমজুরদের সামনে নানাভাবে বাইবেলের মাহাত্ম্য প্রচার করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা কি খ্রীস্টকে জানো ?' একজন শ্রোতা খুবই উৎসুক হয়ে শুনছিল, আর ঘাড নাডছিল। সে ভাবল, এবার তার কিছু বলার সুযোগ এসেছে। খ্রীস্টকে সে যদিও ঠিকমতো জানে না, কিন্তু খুঁজে পেতে কোনোই অসুবিধে হবে না। সে তৎপর হয়ে বলল—'খ্রীস্ট ? এজ্ঞে তেনার লম্বরটা বলুন, খুঁজে এনে দিচ্ছি।'

সবচেয়ে মজাদার গল্প—আইরিশ চাষার। ধর্মপ্রচারের সাক্ষাৎ ফলের অতি উপাদেয় কাহিনী স্বামীজী শুনিয়েছেন—

বুড়ো বয়সে এক আইরিশ চাষার ধর্মে মতি হল। সে আগে কখনো চার্চে যায়নি বা খ্রীস্ট-কাহিনী শোনেনি। গির্জায় পাদরীর মুখে শুনল, ইহুদীরা প্রভু যীশুকে কাঁটায় বিঁধে মেরেছিল। শুনে তার রক্ত টগ্‌বগ্ করে ফুটতে লাগল। মহা রাগে গির্জা থেকে বেরিয়েই দেখে—এক ইহুদী যাচ্ছে।—'ঐ তো ব্যাটা!'—বলেই তাকে ধরে বেদম প্রহার। ইহুদী তো অবাক। কাতর হয়ে বললে—'ভাই মারো কেন ?' কে কার কথা শোনে। শক্তিমান চাষার নতুন ধর্মপ্রেরণা, সুতরাং পুনঃপুনঃ প্রহার। ইহুদী পুনশ্চ সকাতরে শুধোয়—'ভাই, কি অপরাধ করলুম—মারছ কেন ?'

'মারবো না ? তোরা আমাদের প্রভুকে কেন মেরেছিস ?'

'সে তো ভাই ১৯০০ বছর আগে—'

আইরিশ চাষা বীরদর্পে পেটাতে-পেটাতে বললে—'তাতে কি হয়েছে—আমি তো সবে শুনলুম !'

কটা গল্পই-বা পেয়েছি ! যিনি ক্ষণে-ক্ষণে হাস্যমুখর গল্পমুখর ছিলেন, তাঁর কথা-গল্প লিখে রাখাও তো সম্ভব নয়। যেখানে গেছেন সেখানেই তরঙ্গ। বেলগাঁওয়ের ফরেস্ট-অফিসার হরিপদ মিত্র তাঁকে প্রথম দেখলেন—"প্রশান্তমূর্তি, দুই চক্ষু হইতে বিদ্যুতের আলো বাহির হইতেছে, গোঁফ দাড়ি কামানো, অঙ্গে গেরুয়া আলখাল্লা, পায়ে মহারাষ্ট্রীয় দেশের বাহানা চটি, মাথায় গেরুয়া কাপড়েরই পাগড়ি—সন্ন্যাসীর অপরূপ মূর্তি—।" দেখলেন—"তিনি (স্বামীজী) আমাপেক্ষা হাজার গুণে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। ইচ্ছা করিলে অনেক টাকা উপার্জন করিতে পারেন, তথাপি ছোঁন না, ও সুখী হইবার সমস্ত বিষয়ের অভাব সত্ত্বেও আমাপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী।...মনে হইল এমন নিস্পৃহ, চিরসুখী, সদাসন্তুষ্ট, প্রফুল্লমুখ পুরুষ তো কখনো দেখি নাই।" এসব দেখেও হরিপদ মিত্র তাঁকে কোনো কাজ না করে ঘুরে বেড়ানোর কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে শুনেছিলেন—"তোমরা কষ্টে উপার্জন করছ—মরে গেলে অন্যে ভোগ করবে, এবং আরও বেশি টাকা কেন রেখে যাওনি, তার জন্য গাল দেবে। এইতো তোমাদের হাল ! আর আমি ওসব কিছুই করি না। খিদে পেলে পেট চাপড়ে, মুখে হাত তুলে দেখাই। যা পাই তাই খাই। রোজগারের কষ্ট করি না, সংগ্রহ করি না। আমাদের মধ্যে কে বুদ্ধিমান—তুমি না আমি ?"

হরিপদ মিত্র দেখলেন—সন্ন্যাসীর সবেতেই হাসি। কখনো তিন দিন উপোস করে কাটিয়েছেন—কখনো এমন লঙ্কা খেয়েছেন যে, বাটি-বাটি তেঁতুলগোলা খেয়েও পেটের জ্বালা কমেনি—কখনো 'ভাগো হিঁয়াসে' বলে খেদড়ে দিয়েছে গৃহস্বামী—কখনো-বা লাঞ্ছনা হয়েছে পুলিশের হাতে—সবই মজার ব্যাপার। তিনি দেখলেন—হাসি-মস্করা করেও সন্ন্যাসী শিক্ষা দিচ্ছেন, এবং সর্বদা সচেতন—কে কোন্ উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে আসে। এক মহা ধনীর পুত্র প্রায়ই আসে তাঁর কাছে—তিনি তার সঙ্গে অনেক কথা বলেন। কেন বলেন—সে সাধু হবে—এই জন্য ? প্রশ্ন শুনে স্বামীজী হাসতে লাগলেন।—'আরে না না। ওর পরীক্ষা কাছে—সেই ভয়ে সাধু হবার ইচ্ছা। আমি বলছি, এম-এ পাস করে সাধু হও। এম-এ পাসের চেয়ে অনেক কঠিন সাধু হওয়া।'

আবার জলবৎ সহজ করে দিতেন সাধু হওয়া ব্যাপারটা।—'মহারাজ, আপনি

গেরুয়া পরেন কেন ?'—প্রশ্ন হল। স্বামীজী উত্তরে বললেন—'আরে এ হল ফকিরের ভেক। সাদা কাপড় পরলে গরীব লোক ভিক্ষে চায়। এখন আমি তো ফকির, ভিক্ষে দিই কোথা থেকে ? তাই গরীবের এই ভেক নিয়েছি। এ দেখলেই গরীব লোক সরে যায়। তারা ভাবে—আরে এ লোক নিজেই তো মাঙ্গনেওয়ালা, এর কাছ থেকে আর মাগবো কি ?'

হাঁ, সবেতেই তাঁর হাসি। নিজের দুর্দশাকে পর্যন্ত উপভোগ করতেন সানন্দে। আমেরিকার মধ্যপশ্চিমাঞ্চলে একটি ছোট শহরে বক্তৃতা দিতে গেছেন। অত্যন্ত ক্লান্ত, তাই বক্তৃতার আগে সেক্রেটারি মহাশয় তাঁকে একটি ছোট অন্ধকার ঘর দেখিয়ে দিলেন—সেখানে ঢুকে আরাম কেদারায় যেই বসেছেন, সেটির মাঝখান ভেঙে তিনি ভিতরে ঢুকে গেলেন—এমন অবস্থা যে, বহু চেষ্টাতেও সেখান থেকে উঠতে পারলেন না। উঠতে গেলেই পোষাক ছিঁড়ে, শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেতে লাগল। স্বামীজী চেঁচামেচি না করে চুপ করে সেই অবস্থায় বসে রইলেন। এধারে বক্তৃতার সময় হয়ে গেছে—স্বামীজী মঞ্চে যান নি—শ্রোতারা ঈষৎ চঞ্চল—সেক্রেটারি ব্যস্ত হয়ে স্বামীজীর সন্ধানে এলেন। ঘরের বাইরে থেকে তিনি ডেকে বললে—'স্বামীজী, আসুন, শ্রোতারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' স্বামীজী তখন চেঁচিয়ে বললেন, 'আপনি যদি আমাকে বর্তমান অবস্থা থেকে উদ্ধার না করেন, তাহলে শ্রোতাদের অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে।'

স্বামীজী একটি অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছেন। দিব্য আলোক যেন বর্ষিত হয়েছিল তার মধ্যে। অভিভূত শ্রোতারা নিঃশব্দে বিদায় নিল এক পথ দিয়ে, আর স্বামীজী অন্য পথ দিয়ে বিশ্রামঘরে ঢুকে ছোট ছেলের মতো নাচতে শুরু করলেন—'জয় ভগবান্! শেষ হয়েছে! জয় ভগবান্! শেষ হয়েছে।'

এই মানুষ! হরিদ্বারে এক সাধু হরি-মহারাজকে বলেছিলেন—'এত সাধুর সঙ্গে মিশেছি, কিন্তু ওঁর মতো সাধু কখনো দেখিনি। হাসাতে-হাসাতে পেটে ব্যথা করে দিতেন। অমন ইয়ার সাধু জীবনে দেখিনি।'

হরি-মহারাজ নিজের অভিজ্ঞতাও জানিয়েছিলেন—'এমন একসঙ্গে ধমকাতে—রাগাতে—হাসাতে—ভালবাসা দিয়ে আপনার করে নিতে—খুব কম লোককেই দেখা যায়।'

স্বামীজী নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তিনি এক চরম রসিক সন্ন্যাসীকে হৃষীকেশে পরিব্রাজক-জীবনে দেখেছিলেন। সাধু উন্মাদভাবে থাকতেন। একদিন

রাস্তা দিয়ে উলঙ্গ হয়ে চলেছেন—তাঁর পিছনে ছোঁড়ারা ঢিল মারতে-মারতে ছুটেছে —ফলে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, দরদর করে রক্ত পড়ছে—কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই—হেসেই খুন। স্বামীজী তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে ক্ষতস্থান ধুইয়ে তাতে ন্যাকড়া-পোড়ানো ছাই দিলেন, তবে রক্ত থামে। তাঁর কিন্তু খেয়াল নেই—তিনি অবিরাম হেসে লুটোপুটি—আর বলছেন—'কেয়া মজাদার খেল্ হ্যায়! বিলকুল বাবাকা খেল্! কেয়া আনন্দ!'

স্বামীজী আত্মকথাও বলেছেন: "দ্যাখ, আমি যখন রাত্রে ঘরে গিয়ে শুই—খানিকক্ষণ চুপ করে থাকি, তারপর আমার ভেতর এত আনন্দ আসে যে, আমি আর শুয়ে থাকতে পারি না। দেখি, জগৎ আনন্দময়—জীব জন্তু আকাশ পৃথিবী, সব যেন আনন্দে ভরপুর। তখন উঠে পড়ি—ঘরের মধ্যে ধেই-ধেই করে নাচি। সে আনন্দ বুকে ধরে রাখা যায় না।"

"এই বলিয়া স্বামীজী বালকের মতো নাচিতে ও বলিতে লাগিলেন—আনন্দ করো! আনন্দ করো! বিষণ্ণ থাকতে নেই। সব পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আনন্দময়ী মা সর্বত্র আছেন। সব পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।"

## রসনার রসকথা

বিবেকানন্দের অসীম শক্তি—তিনি জড়কে চেতন, মৃতকে জীবিত, কাপুরুষকে বীর করতে পারতেন। সেক্ষেত্রে অকিঞ্চনকে আলঙ্কারিক করে তুলবেন, এ আর এমন কি! ঐ জোরেই আমি প্রচলিত নবরসকে অগ্রাহ্য করে অভিনব ত্রিরসতত্ত্ব উপস্থিত করতে পারছি!

রস কয় প্রকার?

রস তিন প্রকার—ঈশ্বর-রস, সাহিত্য-রস এবং রসনা-রস!

বিজ্ঞ পাঠক আমাকে হেসে ক্ষমা করুন। মুখে না হলেও মনে ক্ষমা করুন। আপনারা আমারই মতো জানেন, ঐ ত্রিরসতত্ত্ব কত সত্য।

স্বামী বিবেকানন্দ এই তিন রসেরই রসিক ছিলেন।

ধর্মের মানুষ হয়ে বিবেকানন্দের পক্ষে রসনারসের রসিক হওয়াটা গর্হিত মনে হতে পারে। ওটা যদি দোষ হয়, তাহলে বিবেকানন্দ সৎসঙ্গে দোষী। ভক্তসহ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভোজনলীলার যে বিস্তারিত বিবরণ মেলে, তা পড়ে ভক্তিরস কতখানি বৃদ্ধি পায় জানি না, কিন্তু পাচকরস যে যথেষ্ট নির্গত হয়, বুঝতে পারি।

বিবেকানন্দের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ একটি মোক্ষম কথা বলে গেছেন—'খালি পেটে ধর্ম হয় না!' সুতরাং বিবেকানন্দ ঈশ্বররস ও রসনারসের মধ্যে একটা আবশ্যিক সম্পর্ক গুরুকৃপায় পেয়ে গিয়েছিলেন।

বিবেকানন্দ যাঁকে শ্রেষ্ঠ মানব মনে করতেন, সেই শ্রীবুদ্ধের জীবনচরিত থেকে এক্ষেত্রে আরও শিক্ষা নিয়েছিলেন। শাক্যসিংহ তপস্যার আসনে বসে বলেছিলেন—'এই আসনে বসলাম। আমার শরীর শুকিয়ে যাক—ত্বক অস্থি মাংস ধ্বংস হয়ে যাক—'; তাই হয়ে যাচ্ছিল, সুজাতার হাত থেকে পয়সান্ন গ্রহণ করে সামলে নিয়েছিলেন। তিনি পরিষ্কার বুঝেছিলেন—পরমান্ন যদি না জোটে অন্ততঃ কিছু সাদা অন্ন দিয়ে শরীরটাকে খাড়া রেখে সিদ্ধি ইত্যাদি পেতে হবে!

এইসব মহাজনশিক্ষায় এবং নিজ অভিজ্ঞতায় স্বামীজী জেনেছিলেন—অন্নাভাবে আত্মা খাঁচাছাড়া হলে পড়ে-থাকা খাঁচাটি আধ্যাত্মিকতার সুবাস ছড়ায় না। সুগভীর আত্মপরিহাসের সঙ্গে বলেছিলেন—শরীর ভাল থাকলে ব্রহ্মচিন্তা করি, আর পেট কামড়ালে 'মা' ডাকি!

পেটে কিল-মারা আধ্যাত্মিকতাকে স্বামীজী ডালকুত্তা-করা বলতেন। কাহিনীটি বেশ কৌতুকজনক।

বাল্যকালে নরেন্দ্রনাথ একজনের বাড়িতে গেছেন। সেখানে দেখলেন, বাড়ির ছেলেটা একটা নেড়িকুত্তার পেটে কষে নারকেলদড়ি বাঁধছে। নেড়িকে সে কয়েকদিন

আগে ধরেছে, ইতিমধ্যে ভাল করে খেতে দেয়নি, ফলে তার হাড়-পাঁজরা বের হয়ে পড়েছে, দাঁড়াতে পারছে না, পা থর্‌থর্‌ করছে, চেঁচাবার ক্ষমতা নেই। তার উপরে পেটে দড়ির বজ্রবাঁধন—কুকুরলীলা শেষ হবার উপক্রম। অবস্থা দেখে নরেন্দ্রনাথ শুধোলেন—'কি ব্যাপার রে? কুকুরটাকে মেরে ফেলছিস কেন?' ছেলেটি মহা গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল—'না, মারছি না, একে আমি ডালকুত্তা করছি।'

বঙ্গসন্তানকে সাহেবনন্দন করার অতি সহজ পথ ছেলেটি আবিষ্কার করেছিল। বিলেতি কুকুর ডালকুত্তা দেখতে রোগাপানা, তার পেট সরু—আমাদের পাড়াতো নেড়ি যদি অমনি রোগা আর পেট-সরু হয়, তাহলেই সে ডালকুত্তা হয়ে পড়বে। তাই নেড়ির জন্য অনাহারের এবং পেটে দড়ির বিধান।

উপোসী আধ্যাত্মিকদের ঠাট্টা করে তাই স্বামীজী বলতেন—'কি রে ডালকুত্তা হচ্ছিস নাকি?'

বিবেকানন্দের প্রতিভা ও মহিমা এইখানে—আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়েও খাদ্য-তত্ত্বকে ভুলতে পারেন নি। এই ধর্মাচার্যই মুক্তকণ্ঠে বলবার সাহস রেখেছিলেন—Religion is not the crying need of India to-day. রুটি—আমাদের রুটি চাই। বিবেকানন্দের দেড়শো বছর আগে অবশ্য ভক্ত রামপ্রসাদ সুজলা সুফলা বাংলার বহু শতাব্দীর জাতীয় সঙ্গীত শুনিয়েছেন—

'অন্ন দে মা, অন্ন দে মা, অন্ন দে মা—অন্নদা!'

স্পষ্ট কথায় নেমে আসি।

খাদ্যতত্ত্ব নিয়ে কথা বলবার পূর্বভূমিকা বিবেকানন্দের ছিল। পিতা জীবিত থাকাকালে বাড়িতে প্রতিদিন পোলাও ভক্ষণ করতেন। বিশ্বনাথ দত্ত মুসলমানী আদবকায়দার অনুরাগী ছিলেন—সেজন্য তাঁর পাকশালায় শুদ্ধ অন্ন মিশ্রসংস্কৃতির পলান্নে রূপান্তরিত হত।

তাঁরা অধিকন্তু শাক্ত। মাছ-মাংসের উপর তাঁদের প্রসাদী ভালবাসা! 'মাংসই দত্তবাড়ির প্রধান আহার্য।'

এই বাড়িতে একদা উদ্ভট কাণ্ড—বাড়ির মেজ ছেলে মহেন্দ্রনাথ তাঁর বৈষ্ণব রামদাদার পাল্লায় পড়ে বৈষ্ণব হয়ে পড়েছে। আর সে কী দারুণ বৈষ্ণব। "আমার [ মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন ] নাকে তখন তিলক থাকত। একদিন বিকালে রামদাদা কাঁচি দিয়া আমার চুল কাটিয়া টিকি রাখিয়া দিলেন। সকাল বিকালে তখন তুলসীতলায় প্রণাম করিতাম, মন্তর বলিতাম। আর তুলসীতলার মাটি খাইতাম। ...আর একটা বীভৎস কার্য ছিল—কাঁচা গোবরের একটা গুলি মুখে রাখিতাম ও

খাইতাম। ইহা অপেক্ষা আরও এক কদর্য কাজ ছিল—ছোট ছেলে, পায়খানায় গিয়া মলত্যাগ করিলে তিনবার মাটি দিয়া গুহ্যদ্বারে ঘষিতে হইত।"

বাঘের বাচ্ছার এই ভেড়ুয়ারূপ দেখে নরেন্দ্রনাথের দাঁত কিড়মিড় করত। রামদাদা কাছে থাকতে সুবিধা হয়নি—কিন্তু যখন সপরিবারে রায়পুরে যাচ্ছিলেন—তখন পথিমধ্যে সুযোগ পেলেন :

"গরুর গাড়ি···ঘোড়তলাও নামে একটি গ্রামে পৌঁছিলে মাংস রান্না হইল। আমি তো কিছুতেই মাংস খাইব না। দাদা আমার মুখে মাংস গুঁজিয়া দিয়া পিঠে কিল মারিতে লাগিল। অনেক বৎসর পরে আমার জিভে মাংস ঠেকিল। আমার তো বুকে ভারি ভয় হইতে লাগিল। এদিকে দাদা বকিতে ও কিল মারিতে লাগিল। মুখে অনেকক্ষণ মাংস রাখিয়া ফেলিয়া দিলাম—গিলিতে পারিলাম না।"

তারপর? স্বামীজী যে-গল্পটি বলতে কখনো ক্লান্ত হননি, পরিণতি ঠিক তারই মতো হল।—

একদা এক ভেড়ার পালে এক সিংহশিশু মিশে যায়। সঙ্গগুণে সে ঘাস খেতে লাগল এবং ডাকতে লাগল ভ্যা-ভ্যা করে। একদিন এক সিংহ ভেড়ার পালকে সাবাড় করতে এসে দেখে—অহো বিচিত্র! ভেড়ার পালে সিংহের বাচ্চা! ঘাস খাচ্ছে!! ডাকছে ভ্যা-ভ্যা করে!!! সে ডাক শুনে অমন যে পশুরাজ, তারও ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হল। সে তখন এক লাফে সেখানে পড়ে, সিংহশিশুর টুঁটি ধরে, তিন লাফে জলের ধারে এনে ফেলল, তারপর জলের দিকে তার মুখ গুঁজে দিয়ে বলল—দ্যাখ—হতভাগা! নিজের চেহারা দ্যাখ! তার আত্মদর্শনকে মজবুত করবার জন্য মুখে গুঁজে দিল এক থাবা কাঁচা মাংস। এই শাক্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে মেষ-মতে সিংহশিশু গোড়ায় ভ্যা-ভ্যা করে যথেষ্ট আপত্তি করলেও যেই মাংসের স্বাদ মালুম হল অমনি খোলস খুলে গেল হঠাৎ—তখনই মৌল ধ্বনি তুলল—হা-লু-ম—তারপরেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল মেষমৃগয়ায়।

মহেন্দ্রনাথ বলেছেন—দাদা তাঁর মুখে মাংস গুঁজে দেবার পরে—

"মাংসের স্বাদ একবার জিভে ঠেকিতে বংশের সংস্কার ও অভ্যাস জাগিয়া উঠিল। খুব মাংসপ্রিয় হইয়া উঠিলাম—বৈষ্ণবভাব আর কিছুই রহিল না।"

রবীন্দ্রনাথের গুরুগোবিন্দও বলেছেন—'বাঘের বাচ্চারে যদি বাঘ না করিনু, কি শেখানু তারে।'

কেবল ভাইয়ের উপর নয়—গুরুভাইদের উপরও নরেন্দ্রনাথ পরীক্ষাকাজ চালিয়েছেন। জাতিসংস্কার তাঁর কোনোকালেই ছিলনা, এবং খাদ্যাখাদ্যের বিচারও করতেন না—কিন্তু তাঁর তরুণ গুরুভাইরা তা করতেন। সুতরাং তাঁদের কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেলেন মিনার্ভা থিয়েটারের কাছে পীরুর হোটেলে। সেখানে মুর্গীর

কারী অর্ডার দিলেন। 'কুসংস্কার ভাঙা'র মহাব্রত পালনের তাগিদে গুরুভাইরা মুসলমান-হোটেলের মুরগী-অমৃত অল্পমাত্র গ্রহণ করলেন, এবং সবিস্ময়ে 'নিরীক্ষণ করিতে' লাগলেন 'নরেন্দ্রনাথ মহানন্দে প্রায় সমস্তটাই আহার করিল।'

শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন—নরেন সব-কিছু খায়। তাতে তাঁর স্নেহের কমতি কিছু ঘটেনি—তাঁর নরেন যে, দাউ-দাউ-করা আগুন, যাতে কাঁচা কলাগাছ দিলেও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সুতরাং তাঁর ব্যবসায়ী-ভক্তেরা সাধুসেবার জন্য যেসব খাদ্যাদি আনতেন, সেগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্য ভক্তদের দেওয়া নিরাপদ মনে করেননি—আহুতি দিতেন নরেন্দ্রের উদর-যজ্ঞাগ্নির উপরই। 'নরেনকে খাওয়ালে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করানোর পুণ্য হয়'—তিনি বলতেন। ঠাকুরের কথা 'বেদবাক্য' জ্ঞান করে পরবর্তীকালে ঠাকুরের এক শিষ্য ঐ কথাগুলি নরেন্দ্রের সাক্ষাতে অন্য এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তখনি 'বেদবিরোধী' কৌতুকে উচ্চকিত হয়ে বলেছিলেন—'কি রে শালা, হোটেল খুলেছিস্ নাকি ?'

নরেন্দ্রকে না খাইয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের শান্তি ছিল না। নরেন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন—রাত্রে থাকবেন—মাতাঠাকুরাণীকে ঠাকুর বলে পাঠালেন—'আজ নরেন খাবে, ভাল ক'রে রেঁধো।' মা বড় যত্ন ক'রে রাঁধলেন—রুটি, মুগের ডাল ইত্যাদি। নরেন্দ্র খেলেন। আহারান্তে নরেন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সংলাপ :

'কিরে, রান্না কি রকম খেলি ?'

'ভালই। রোগীর পথ্য—ভালই !'

ঠাকুর মাতাঠাকুরাণীকে বলে পাঠালেন—

'নরেন খেলে মোটা ক'রে রুটি আর ঘন ক'রে ছোলার ডাল করবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ নরদেহে থাকতেই অতঃপর এই নরেন্দ্রের একদিন মাংস খাওয়া ঘুচেছিল, নুন-ভাতও বহুদিন বন্ধ—না, কোনো আধ্যাত্মিক বিপাকে নয়, বাস্তব কারণে, পিতার মৃত্যু নামক সর্বনাশে—সেকথা আগে বলে এসেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে নরেন্দ্রনাথ ঘর ছেড়ে বরাহনগরের এক ভাঙা বাড়িতে এসে উঠলেন। সেখানকার দারিদ্র্য এবং সেখানকার বৈরাগ্য ইতিহাসের সামগ্রী হয়ে গেছে, সে বিষয়ে এখন বিস্তারিত লেখার প্রয়োজন নেই, শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে—সসঙ্গী বিবেকানন্দ এখানে আধা পওহারী বাবা অর্থাৎ পবন-আহারী বাবা হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের ভাত জুটত হয়ত, কিন্তু সবজীর সাক্ষাৎ প্রায় থাকত না—এক বাটি লঙ্কা গোলা থাকত, তার মধ্যে বুড়ো আঙুল ডুবিয়ে সেই আঙুল চুষে পরমানন্দে কাঁড়া-আকাঁড়া ভিক্ষান্ন ভোজন করতেন। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন দুধ জুটে গেল। মোটামুটি সম্পন্নঘরের এখন-সন্ন্যাসী এই ছেলেগুলির হঠাৎ মনে পড়ে গেল—দুধ খেলে শরীরে বল হয়। সুতরাং সেদিন রাত্রে খাবার সময়ে পাতে দুধ

পড়তেই তাঁরা পরস্পরকে শুধোতে লাগলেন—'কি হে, বল পাচ্ছ তো?' কথাটা প্রত্যেকেই এমন উচ্চৈঃস্বরে ও উচ্চসুখে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে, বরাহনগরের পোড়োবাড়ি বলধ্বনিতে কাঁপতে লাগল থরথর করে।

তারপর পরিব্রাজক হয়ে স্বামীজী হাঁটতে লাগলেন পথে-পথে। শূন্য উদরে ঘুরেছেন দিনের পর দিন। অনাহারে কিভাবে মরতে বসেছিলেন বারবার, তাও বিবেকানন্দ-জীবনীর পরিচিত কাহিনী; এবং মাঝে-মাঝে বিচিত্র উপায়ে কিভাবে আহার জুটেছে, তাও। 'সদর্পে' আহারসংগ্রহের কাহিনীও রয়েছে। এই বীর-কাহিনীর নায়ক কিন্তু তিনি নন—তাঁর স্নেহাস্পদ কিশোর-দর্শন গুরুভাই গঙ্গাধর-মহারাজ বা স্বামী অখণ্ডানন্দ।

পরিব্রজ্যায় গঙ্গাধর নরেন্দ্রনাথের চেয়ে কম যেতেন না। এবং আহারসংগ্রহের বাস্তববুদ্ধি স্বামীজীর থেকে তাঁর বেশি ছিল। গাড়োয়ালের এক গ্রামে ঘুরছেন স্বামীজীর সঙ্গে—ভিক্ষাদির অবস্থা সুবিধাজনক নয়—গ্রামবাসীদের সাধুসেবায় সবিশেষ ঔদাসীন্য অথচ সাধুদের উদরে জ্বলন্ত পবিত্র অগ্নি—এই অবস্থায় গঙ্গাধর-মহারাজই সন্ধান নিয়ে পথ বাতলালেন। এ অঞ্চলে হুঙ্কার দিয়ে ভিক্ষা না চাইলে ভিখ্ মেলে না। তদনুযায়ী গঙ্গাধর-মহারাজ গ্রামে হাজির হয়ে 'সদর্পে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন'—'লক্‌ড়ি লাও, আটা লাও, ডাল লাও—।' এমন জাঁহাদারি হাঁক ছাড়লেন যে, সারা গ্রাম বেরিয়ে পড়ল—বৃদ্ধরা সসম্ভ্রমে ছুটে চলল গ্রামের 'পরধান' বা মোড়লের কাছে—'এ পরধান। বাবা-লোগ্ আয়া হ্যায়—!'

তাই বলে আহারসংগ্রহের ব্যাপারে স্বামীজী একেবারে নির্বোধ হতে পারেন না, বিশেষতঃ যখন জানেন—'নিরাহার' এবং 'নিরাকার' একই জিনিষের এপিঠ-ওপিঠ।

স্বামীজী ট্রেনে যাচ্ছেন—একই কামরায় আছেন এক থিয়জফিস্ট। ভদ্রলোক রীতিমত শিক্ষিত, কিন্তু থিয়জফিস্ট হওয়ার কারণে জ্ঞানগম্যি কিঞ্চিৎ লুপ্ত—পৃথিবীর যত উদ্ভট অলৌকিকতায় একান্ত বিশ্বাস। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাত্মারা, যাঁদের আদি বাস তিব্বতে, তাঁরা সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়িয়ে চিঠিপত্রাদি বিলি ক'রে ধর্মদান করছেন—এমন থিয়জফিক বিশ্বাস তিনি করে বসে আছেন। এদিকে স্বামীজী থিয়জফির উপরে হাড়ে-চটা। সুযোগ পেলেই জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা মুগ্ধ নয়নে ঢুকিয়ে দেন। সেই সুযোগ এখানেও ঘটে গেল। থিয়জফিস্ট ভদ্রলোক দেখলেন—সামনে জ্যান্ত সন্ন্যাসী, এবং পরিব্রাজক। সুতরাং নির্ঘাত গুপ্তরহস্যের গুহায় পূর্ণ হিমালয়ে ইনি গেছেন। গেছেন বলে গেছেন! প্রশ্ন করে তিনি জানলেন—সন্ন্যাসী বছরের পর বছর হিমালয়ে ঘুরেছেন। শুনেই তিনি ভাবাবিষ্ট।—হিমালয়—আহা—হিমালয়। সেখানে 'বিশালকায়, দীর্ঘজটা, অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন অমর পুরুষেরা'

ঘোরাফেরা করেন—স্বামীজী-মহারাজ কি তাঁদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন? স্বামীজী-মহারাজ বলাই বাহুল্য এ সুযোগ ছাড়তে পারেন না। হাঁ, অবশ্যই তাঁদের দেখা তিনি পেয়েছেন—ডাঁই-ডাঁই মহাত্মা—'যিনি যত বড় মহাত্মা, তাঁর দেহ তত বড়, তাঁর জটা তত দীর্ঘ, এবং শক্তিও সেই রকম অদ্ভুত।' ব্যস, থিয়জফিস্ট ভদ্রলোককে আর পায় কে! তাঁর কল্পনা ছুটতে লাগল রথে চড়ে—স্বামীজী তার সারথি হয়ে বসলেন। হিমালয়বাসী মহাত্মাদের কত বিচিত্র কথাই স্বামীজী তাঁকে শোনালেন—যা অলৌকিকতার বৈচিত্র্যে শ্রেষ্ঠ থিয়জফিস্ট-সাহিত্যকে ছাড়িয়ে গেল। উক্ত বিশ্বাসী থিয়জফিস্ট সত্যযুগের জন্য উদ্‌গ্রীব; জিজ্ঞাসা করলেন—'মহাত্মারা বর্তমান কল্পের স্থিতিকাল সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন কি?'—'বলেননি আবার? অনেক কথাই বলেছিলেন। এ কল্প শেষ হয়ে এসেছে, শীঘ্রই সত্যযুগ আরম্ভ হবে। মহাত্মারা মানবজাতির উদ্ধারের জন্য কত কি করবেন!' মহাত্মারা কোন্-কোন্ উন্নয়নমূলক কাজ করবেন তার লম্বা তালিকা স্বামীজী পেশ করলেন। ভদ্রলোক স্বামীজীর প্রতিটি কথা অসংশয়ে বিশ্বাস করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে স্বামীজীর পেটে আগুন জ্বলতে আরম্ভ করেছে, কারণ আগের দিন বিশেষ-কিছু জোটেনি, এখন আবার বকতে হয়েছে একনাগাড়ে। সুতরাং এরপরে ভদ্রলোক যখন মহাত্মা-চূড়ামণি কুতমিলালের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ সায় দিলেন—'দেখা হয়নি আবার, খুব হয়েছে'—বলেই দৃশ্যপটসহ উক্ত সাক্ষাৎকারের জীবন্ত বর্ণনা দিতে শুরু করলেন—'এই তো, ক'দিন আগে কুতমিলালের ভাণ্ডারাতে গিয়েছিলুম। সে কি এলাহি ব্যাপার! হাজার-হাজার সাধু খাচ্ছে—ইয়া ইয়া লাড্ডু—।' এই বর্ণনা অভীপ্সিত ফল আনল—কুতমিলাল-ভক্ত ভদ্রলোকটি এরপরেও কুতমিলালের ভাণ্ডারায় আহূত এই সাধুকে আহার না করিয়ে পারেন? স্বামীজীর জলযোগ ভালই হল—তিনি শরীরে বল পেলেন—এবং তারপর নিজ মূর্তি ধরলেন। গাঁজা না খেয়েও গাঁজাখুরি জিনিসের প্রতি বিশ্বাস দেশের কী সর্বনাশ ডেকে আনছে, তা ঝাঁঝালো ভাষায় লোকটিকে শোনালেন। হতভম্ব ভদ্রলোক পরিষ্কার জেনে ফেললেন—অলৌকিকতা মানে আধ্যাত্মিকতা নয়।

স্বামীজীর ভগবান কিন্তু একবার সত্যই অলৌকিক উপায়ে স্বামীজীর আহার জুটিয়ে দিয়েছিলেন। গাজিপুরের দিকে তিনি ট্রেনে যাচ্ছেন; আছেন থার্ডক্লাশ কামরায়; সম্বল একটি টিকেট ও একটি কম্বল; কোনো পয়সা নেই, জলপানের ঘটি পর্যন্ত নয়। ভয়ানক গরম—তেষ্টায় ছাতি ফাটছে—কিন্তু পয়সা না দিলে পানিপাঁড়ে জল দেয় না। এক বেনে একই কামরায় আসছিল। তার খুব মজা লাগল ব্যাপার দেখে। পানিপাঁড়েকে পয়সা দিয়ে সে জল কিনে খেল, এবং তেষ্টা মিটিয়ে খুশি হয়ে বলল—'রোজগারের ভাল ফল দ্যাখো! কি রকম চমৎকার ঠাণ্ডা জল খেলুম—

তুমি সন্ন্যাসী হয়ে রোজগার না করে তেষ্টা মেটাতে পর্যন্ত পারলে না! বাবাজি! রোজগারের ধান্ধা করো।' গাজিপুরের অপরদিকে তাড়িঘাট স্টেশনে স্বামীজী যখন নামলেন তখন ভর-দুপুর—আগুন ছুটছে চারদিকে—স্টেশন-চৌকিদার স্টেশনের ছায়ায় পর্যন্ত বসতে দিল না—অগত্যা বাইরে কম্বল বিছিয়ে বসলেন। সেই বেনেও ঐ স্টেশনে নেমেছিল এবং কাছাকাছি ছাউনির নীচে সতরঞ্চ বিছিয়ে বসে পড়ল। তার খিদে পেয়েছিল, আর স্বামীজীর শুকনো মুখ দেখে তামাশাও পেয়েছিল। সে পোঁটলা খুলে বাশীকৃত পুরী-কচুরি, পেঁড়া-মেঠাই বার করে সেবা করতে লাগল এবং চর্বণের ফাঁকে ফাঁকে উপদেশামৃত বিতরণ করতে লাগল—'দ্যাখো হে বাবাজি! পয়সার ক্ষমতা দ্যাখো! তুমি পয়সা-কড়ির ধার ধারো না, তার ফল, পেটে কিল মেরে বসে আছো; আর আমি রোজগার করি—তাই পুরী-মেঠাই দিয়ে পেট ভরাচ্ছি। রোজগার—রোজগার করহে বাবাজি!'

অতঃপর যা ঘটল তার অধিক ব্যাখ্যানের প্রয়োজন নেই। স্থানীয় এক মিঠাইওয়ালা হঠাৎ উদিত হয়ে স্বামীজীকে প্রচুর খাওয়াল—সে নাকি স্বপ্নে সাধুসেবা করার নির্দেশ পেয়েছিল!! ঘটনাটি বিধাতার রসিকতা রূপেই মাত্র এখানে উল্লেখযোগ্য।

নন্দ গাঁটার বরাতেও একই ব্যাপার ঘটেছিল। লোকটি জাত বেনে, মহা কৃপণ। তার 'নন্দ' নামের সঙ্গে 'গাঁটা' শব্দ যোগ হওয়ার কারণ—লোকে দেখত, সে সর্বদা নিজের জন্য গাঁট বাঁধতে পটু। এধারে তার মুখে তত্ত্বকথা লেগেই থাকত। মহা বৈদান্তিক সে। বলত, 'মহারাজ, পাঁচ মিনিটমে তত্ত্ব খিঁচ্ লিয়া হ্যায়। জগৎ তিন কালমে হ্যায়ই নেহী। তুসীতো স্বরূপ হ্যায়।' এইসব বলত, আর কষে পয়সার গাঁট বাঁধত। এমন চরিত্রের মানুষ পেলে স্বামীজী আর কিছু চাইতেন না, সর্বদাই রঙ্গকৌতুক করতেন। বলাবাহুল্য এক্ষেত্রে নন্দ গাঁটার কৃপণতা স্বামীজীর বিশেষ তামাশার বিষয় হয়ে উঠেছিল।

স্বামীজী একইসঙ্গে আবার নন্দ গাঁটার গৃহভেদ করে ফেলেছেন। তার পুত্র স্বামীজীর ভক্ত হয়ে পড়েছে, এবং স্বামীজীকে রাত্রিতে নিমন্ত্রণ করেছে খাওয়ার জন্য। নন্দ গাঁটা দিনান্তে বাড়িতে এসে চমৎকৃত—তার পুত্র ভূরিভোজ করাচ্ছে তার গাঁট কেটে। কিন্তু কি করে, যা হবার তা হয়েছে, যার ছেলের মতিচ্ছন্ন হয়, তার বরাতে দুঃখ থাকেই। নন্দ গাঁটা সে যাত্রা মনে মনে পুত্রের চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ করে নিঃশব্দে সরে গেল।

পৃথিবীতে সবাই ঐসব বেনেদের মতো নয়। আলমোড়ার সেই মুসলমান ফকিরের কাছে বিবেকানন্দ-ভক্তদের অনন্ত কৃতজ্ঞতা যিনি শশা খাইয়ে ক্ষুধায় মূর্ছিত

স্বামীজীকে প্রাণ দিয়েছিলেন, কিংবা সেই মুচির প্রতি—যে একই কাজ করেছিল—কিংবা আলোয়ারের বৃদ্ধার প্রতি—।

রামসানাইয়ার সঙ্গেও স্বামীজীর আলোয়ারেই সাক্ষাৎ। রামসানাইয়া হিন্দুস্থানী রমৃতা বৈষ্ণব। তাঁর একটি হাজার তালিমারা ঘটি, আর একটি নুড়ি ছিল। নুড়ি দিয়ে ঘটি বাজিয়ে রামসানাইয়া গান করতেন। মাধুকরী করে তিনি কিছু আটা জোটাতেন, তাতে নুন লঙ্কা মেখে ধুনিতে পুড়িয়ে টিক্কর করে নিতেন। কিছু দা-কাটা তামাকের জোগাড়ও থাকত। রামসানাইয়ার সঙ্গে থেকে, টিক্কর খেয়ে, দা-কাটা তামাক টেনে, ঘটির যন্ত্রবাদ্যের সঙ্গে ভজন গেয়ে, স্বামীজী কত দিন কাটিয়েছেন। সেই সুখের দিনগুলির স্মরণে স্বামীজী গুপ্ত-মহারাজকে একবার বলেছিলেন—'ওরে রামসানাইয়ার সঙ্গে যে-কদিন ছিলুম বড় আনন্দে ছিলুম। জগতের দিকে দৃক্‌পাত করতুম না, দেহটাকে তুচ্ছ মনে হত।'

আলোয়ারের পূর্বোক্ত দরিদ্র বৃদ্ধাটির কাহিনী মাধুর্যে অপরূপ। ঘুরতে-ঘুরতে এই বুড়ির আশ্রয়ে জুটে যান স্বামীজী। পাঁচ বাড়ী গম পিষে অল্প-কিছু আটা পেত বুড়ি। সেই আটার রুটি সে খাওয়াত স্বামীজীকে। স্বামীজীকে সে বড় ভালবেসে ফেলেছিল; 'মেরে লালা' বলে ডাকত। সেই 'লালা' কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্ব-বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে পড়লেন! পাশ্চাত্ত্য থেকে ফিরে তিনি আবার আলোয়ারে গেলেন। এবার রাজভবনে অতিথি। চতুর্দিকে তখন স্বামীজী-মহারাজের জয়ধ্বনি। স্বামীজী কিন্তু রামসানাইয়া এবং ঐ বুড়ি, কাউকেই ভোলেননি। একদিন ভিড়ের মধ্যে রামসানাইয়াকে দূর থেকে দেখে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। অন্য একদিন রাজবাড়ির দলবল নিয়ে ঘুরে বেড়াবার সময়ে হঠাৎ পথিমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আসলে তিনি বুড়ির ঝুপড়ির কাছাকাছি এসে, জায়গাটা চিনতে পেরে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন, তারপর চুপিসাড়ে ঢুকে পড়েছিলেন ঝুপড়ির মধ্যে, এবং কিছু সময়ের মধ্যে বুড়ির সঙ্গে পুরনো সম্পর্ক পাতিয়ে পূর্ববৎ টিক্কর আহারের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। রাজকর্মচারীরা স্বামীজীর সন্ধান করে ঝুপড়ির কাছে হাজির, উঁকি দিয়ে দেখল, বুড়ির সামনে উপু হয়ে স্বামীজী বসে; উনুন জ্বলছে, আটা মাখাও হচ্ছে। অনেক লোকের উঁকি-ঝুঁকি দেখে বুড়ি ভয় পেয়ে গেল। স্বামীজী ইঙ্গিতে সকলকে সরে যেতে বললেন। রাজকর্মচারীরা যে, স্বামীজীর খোঁজেই এসেছিল—বুড়ি বুঝতে পারেনি। আটা মাখতে-মাখতে সে বলতে লাগল—'আরে লালা, শুনেছিস্, এক মস্ত সাধু এসেছে? সে রাজার বাড়িতে থাকে। তার সঙ্গে অনেক লোক। কত লোক তাকে দেখতে যায়। তুই তাকে দেখতে যাবি? না, এখন তোর খিদে পেয়েছে—আমি টিক্কর বানিয়ে দিই, তুই খা, তারপর ন-হয় সাধুকে দেখতে যাবি।' বলেই কিন্তু বুড়ি খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল—'তুই তো যাবি—কিন্তু সে সাধু বড়লোক—

তোকে কি সেখানে ঢুকতে দেবে!' স্বামীজী মজা ক'রে বুড়িকে চমকে দেবার জন্য বললেন—'এ মায়ী, তুই সেই সাধুকে দেখবি?—আচ্ছা, যদি আমি সেই সাধু হই!' বুড়ি শুনে হেসে ফেলল। তার লালা বড় তামাশা করে। বুড়ি বলল, 'কি বলিস্! তুই তো মেরে লালা! তুইও গরীব, আমিও গরীব। নে, এখন খা!'—এই বলে সে উনুন থেকে দুটি গরম টিক্কর বার করে ছাই ঝেড়ে তার লালাকে খেতে দিল।

বুড়ির দোষ নেই! তার লালা কত গরীব সে তো নিজের চোখে দেখেছে। খালি-পেটে কতদিন তাকে পথে-পথে ঘুরতে হয়েছে। লালা কিন্তু হাজার কষ্টের মধ্যেও মজা করতে ছাড়ে না! লালার বুদ্ধিও খুব। যেমন দারোগার সঙ্গে তার মোলাকাতের ব্যাপারটাই ধরা যাক।—

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ বিহারের পথে ঘুরছেন। সেখানকার সরকারী মহলে তখন জোর গুজব—সিপাহী-বিদ্রোহের মতো একটা বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র চলেছে তলে-তলে। সাধুদের উপরে পুলিশের খরদৃষ্টি। স্বামীজী একদিন পথে হাঁটছেন—এমন সময়ে পিছনে ঘোড়া-ছোটার শব্দ—তারপরেই অতি কর্কশ ডাক—'ঠারো ঠারো!' পিছন ফিরে দেখেন—ঘোড়ার পিঠে দারোগা—সঙ্গে পুলিশবাহিনী। কাছে হাজির হয়ে দারোগার কড়া জিজ্ঞাসা—'কৌন তুম্? কিধার রহ্‌তা?' স্বামীজী বললেন—'খাঁ সাহেব, দেখতেই পাচ্ছেন আমি রমৃতা সাধু।' দারোগা—'সব শালা সাধু বদমাস। চলো আমার সঙ্গে—তোমাকে গারদে ঢোকাবো।' স্বামীজী অতি মধুরস্বরে শুধোলেন—'খাঁ সাহেব, কতদিনের জন্য?' গম্ভীর হয়ে খাঁ সাহেব জানালেন—'তা সপ্তাহ-দুই, কি মাসখানেকের জন্য হতে পারে।' স্বামীজী দারোগার আরো কাছে এগিয়ে গেলেন, বড় কাতর অনুনয়ের সঙ্গে বললেন—'মাত্র একমাস! মেহেরবানী করুন খাঁ সাহেব—ওটাকে বাড়িয়ে ৬ মাস করে দিন—নিদেন তিন-চার মাস।' খাঁ সাহেব থতমত খেয়ে গেলেন—'কি বলছ হে! জেলে বেশি থাকতে চাও—কেন?' স্বামীজী একই ভঙ্গিতে বললেন—'কি বলছেন—চাইব না? বাইরে থাকলে আমাকে কত খাটতে হয় বলুন—সারাদিন পথ হাঁটা—তাতে রোজ খাবার জোটে না, প্রায়ই উপোসে থাকতে হয়—বড় কষ্ট—জেলে গেলে অন্ততঃ দু'বেলা পেটপুরে খেতে পাবো—খাঁ সাহেব, গরীব আদমির উপর দয়া করুন—একটু বেশি সময় আটক রাখুন—বড় উপকার হয়—।' খাঁ সাহেব মহা বিরক্ত হলেন। তিনি আবার কারো উপকার করতে পারেন না। দাবড়ে উঠলেন—'ভাগো হিঁয়াসে।' তারপরই তিনি এবং তাঁর ঘোড়া রাগে একেবারে উল্টোমুখ।

স্বামীজী স্বদেশের কারাগার এড়ালেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে বিদেশের খ্যাতির কারাগারে বন্দী হয়ে পড়লেন। অন্নবস্ত্রের আর অভাব রইল না! এবং রান্নার

জিনিসপত্র যথেষ্ট মিলতে লাগল। শেষপর্যন্ত রান্না তাঁর একটা প্রমোদ হয়ে দাঁড়াল। বাল্যকাল থেকেই তিনি রাঁধতে পারেন। মহেন্দ্রনাথ বলেছেন—ফরাসী রন্ধন-পদ্ধতির বই থেকে অধিকন্তু স্বামীজী ফরাসী রান্না শিখেছিলেন। ভারতের ঐতিহ্য-পূর্ণ হিন্দু-রন্ধন এবং খানদানী মুসলমানী রান্না—সবই তাঁর অভ্যাসের মধ্যে। এই সমস্ত গুণাবলীসহ তিনি আমেরিকায় এক রন্ধনশালায় প্রবেশ করে পুরো আন্তর্জাতিক রান্না রেঁধে ফেললেন। তারপর তাঁকে দেখা গেল ডাইনিংকারের ওয়েটারের বেশে। হাতে সাদা ন্যাপকিন জড়িয়ে হুবহু ওয়েটারের গলা নকল করে সকলকে ডাক দিচ্ছেন—

'শেষবারের মতো ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদয়গণকে ডাইনিংকারে আহ্বান জানানো হচ্ছে ; আপনারা আসুন—খাদ্য পরিবেশিত হয়েছে।'

স্বামীজী ভাল রাঁধতে পারেন, সকলে জানে ; খাওয়ার টেবিলে তাঁর উপস্থিতির চেয়ে আনন্দের বস্তু আর কিছু নেই ; তবু—পিছন থেকে মরণাপন্নের মুখ ক'রে ল্যাণ্ডসবার্গ বললেন—'হে ঈশ্বর বাঁচাও।'

'বাঁচাও বাঁচাও ভগবান'—পেটে হাত চেপে ছটফট করছেন স্বামীজীর বিদেশী অনুরাগীবৃন্দ। তাঁরা মরিয়া হয়ে স্বামীজীর রান্না খেয়েছিলেন। তাঁদের একজনের বক্তব্য—সে বক্তব্য তাঁর মুখেই শোনা যাক—

'যে খাবার স্বামীজী তৈরী করেন তা হয়ত উপাদেয়, কিন্তু মশলায়-মশলায় আগুন। কিন্তু মনস্থির করলাম—যদি দম বন্ধ হয়েও যায় তবু খাব—একজন বিবেকানন্দ আমার জন্য রাঁধতে পারেন আর আমি খেতে পারব না? তাতে প্রাণ যায় যাক। প্রাণ অবশ্য প্রায় গিয়েছিল।'

স্বামীজীর রান্নার বেদীমূলে এঁরা প্রাণদানে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এঁরা বুঝে নিয়েছিলেন—'বিবেকানন্দ নামক মানুষটির সান্নিধ্যে থাকা মানে বেড়ে ওঠা, বড় হয়ে ওঠা।' সুতরাং বিবেকানন্দ যখন রান্নাঘরে পাচকবৃত্তি করছেন তখন এঁরা সঙ্গছাড়া হতে চাইতেন না, বিশেষতঃ ঐকালে যেহেতু তিনি কঠোর মানসিক পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি নিয়ে বড় আনন্দে থাকতেন। কিন্তু রান্নাঘরে স্বামীজীর সান্নিধ্য কি সুখকর? কদাপি নয়—তা একেবারে 'ধূমজ্যোতি'পূর্ণ, যা অনুরাগিগণের নাসা ও নয়নসলিলের হেতুস্বরূপ। মশলা পেষাইয়ের কাজটা স্বামীজী নিজের হাতেই করতেন, অনেকক্ষণ ধরে তা করতেন, সেই চূর্ণ মশলারাশি তিনি ঘৃতসহ তপ্ত কড়ায় আহুতি দিতেন, এবং অবিলম্বে সেখান থেকে সশব্দে ঘোরকৃষ্ণ সঘন ধূম্র উত্থিত হত, যাকে স্বচ্ছন্দে আরব্য উপন্যাসের 'জিন' বলা যায়—স্বামীজী কিন্তু ভক্তিস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলতেন—'এইবার ঠাকুর্দা জাগছেন—আপনারা, বিশেষতঃ ভদ্রমহিলারা, ইচ্ছা হলে প্রস্থান করুন।'

যাঁরা প্রস্থান করতে চাইতেন না, তেমন একজনের আত্মঘাতী উক্তি :

"স্বামীজী জিনিসটা এগিয়ে দিয়ে বললেন—খেয়ে ফেল, ভাল হবে।

"স্বামীজী হাতে ক'রে বিষ দিলেও তা খাওয়া যায়. সুতরাং—। এক্ষেত্রে ফল —তাঁর কুটোপাটি মজা এবং আমাদের যন্ত্রণা।"

স্বামীজী হাত বাড়িয়ে কী এগিয়ে দিয়েছিলেন ? অন্য কিছু নয়—লঙ্কার গুঁড়ো। তিনি তখন আমেরিকায় ক্যাম্প-আরভিং-এ আছেন। সেখানে দুটো পাথর জোগাড় ক'রে লঙ্কা গুঁড়িয়ে নিতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। খেতে বসার সময়ে লঙ্কার গুঁড়ো পাশে রাখলেন—তারপর মাঝে মাঝে মুখ ব্যাদিত করে তার মধ্যে চিমটি-চিমটি লঙ্কা ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। কী তৃপ্তি তাঁর!

স্বামীজী এত লঙ্কা খান কেন ? প্রশ্নের উত্তরে হরিপদ মিত্রকে স্বামীজী বলেছিলেন —পথচারী সন্ন্যাসীদের পেটে কত দূষিত জল যায়, তার দোষ কাটাতে এই লঙ্কার ঔষধ। 'অন্য সাধুরা গাঁজা চরসে যে-কাজ করে, আমি তা করি লঙ্কা দিয়ে।'

অপর কারণও আছে। স্বামীজী অন্যত্র বলেছেন, 'মশাই, চির জীবনটা পথে-পথে ঘুরে বেড়িয়েছি আর বুড়ো আঙুলের টাকনা দিয়ে ভাত খেয়েছি। লঙ্কা তো এক-মাত্র সম্বল ছিল। ঐ লঙ্কাই আমার পুরনো বন্ধু। আজকাল না হয় দু'চারটে জিনিস খেতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু চিরকালটা তো উপোস করে মরেছি।"

তবে স্বামীজীর যা স্বভাব—কোনো কিছুর চূড়ান্ত না করে ছাড়তেন না। লঙ্কা শুধু 'ব্যঞ্জন' নয়, একবার অন্ততঃ 'অন্ন'ও হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যখন তিনি অভিনব প্রতিযোগিতায়, লঙ্কা খাওয়ার প্রতিযোগিতায়, অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং বলাবাহুল্য তাতে জিতেছিলেন। আবার একদা উদরস্থ বিদ্রোহী লঙ্কাসিংহকে শায়েস্তা করতে কিভাবে বাঘা-তেঁতুলকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ আগেই করেছি।

ইউরোপ আমেরিকায় স্বামীজী একটি অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন—ঐ প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দেশে মানুষ লঙ্কা খায় না—অথচ তারা গা গরম করবার জন্য মদ্যের আচমনসহ খাওয়ার টেবিলে নিত্য বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করে। ঠিক এর বিপরীত ভারতীয় আচরণ। এই গরম দেশে লঙ্কা খাওয়ার অর্থ অগ্নিতে অগ্নি আহুতি—আর ভারতীয়রা নিয়মিত সেই অগ্নিযজ্ঞ করে যাচ্ছে। মানব-আচরণের অসঙ্গতি স্বামীজীর কাছে সদাই হাসির বস্তু।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মেলাতে দায়বদ্ধ বিবেকানন্দ সংস্কৃতি বিনিময়ের সদুদ্দেশ্যে-প্রণোদিত হয়েই পাশ্চাত্য-ভোজনাগারে লঙ্কাকাণ্ড ঘটাতেন কিনা—আমাদের সে তথ্য জানা নেই।

এবং এক্ষেত্রে বিবেকানন্দকেই খেসারত ধরতে হয়েছিল, কারণ যে-সব মহাপ্রাণ ভারতীয় আমেরিকায় স্বামীজীর গরু-খাওয়া নিয়ে এদেশের পানাপুকুরে বিপ্লব

এনেছিলেন, তাঁরা কোনো রাঁধুনি পাঠাননি স্বামীজীর খাদ্যদোষ নিবারণের জন্য। সে যাই হোক, বিবেকানন্দ কিন্তু রন্ধনভূমিতে সম্পূর্ণ ভারতীয় থাকতে পারেননি। তিনি স্বয়ং-রচিত এক খাদ্য-মহাসভার বিবরণ দিয়েছেন এইভাবে :

“কাল রাত্রে আমি নিজেই রান্না করেছিলাম। জাফরান, লেভেণ্ডার, জায়ত্রী, জায়ফল, কাবাবচিনি, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, মাখন, লেবুর রস, পেঁয়াজ, কিসমিস, বাদাম, গোলমরিচ এবং চাল—এই সবগুলি মিলিয়ে এমনই খিচুড়ি বানিয়েছিলাম যে নিজেই গিলতে পারিনি। ঘরে হিং ছিল না, নচেৎ তার খানিকটা মেশালে সুবিধা হত।”

ফিরে আসি মাংস প্রসঙ্গে। সন্ন্যাসী হয়েও বিবেকানন্দ সারাজীবন মাংসাহারের পক্ষে লড়াই করেছেন। মাংসাহার সম্বন্ধে ভারতীয় অপ্রবৃত্তি তাঁর বহু বিদ্রূপ ও কৌতুকের লক্ষ্য হয়েছে। চরম প্রতি-বিদ্রূপ করেছিল অমৃতবাজার পত্রিকা—তাঁর দেহত্যাগের পরে। অমৃতবাজারে প্রকাশিত একটি শোকসংবাদের এই শিরোনামা ছিল—*A Meat Eating Swami*! আমাদের মনে হয়, স্বামীজী স্বর্গ থেকে (যদি স্বর্গ থাকে!) প্রচুর হেসেছিলেন, সৎসঙ্গে অর্থাৎ ভগবান্ বুদ্ধদেবের কাছে বসে —কারণ শ্রীবুদ্ধের দেহান্ত হয় শূকরমাংস খেয়ে, এবং সেজন্য সেকালের নিরামিষাশী সংবাদপত্রগুলি ( যদি থাকে !! ) তাঁর বিষয়েও নিশ্চয় একই শিরোনামাযুক্ত শোক-সংবাদ ছেপেছিল।

এবং আমাদের জানা নেই, অশোকের অহিংসার বিরুদ্ধে স্বামীজীর তিক্ত বিদ্রূপ নিয়ে শ্রীবুদ্ধের সঙ্গে তাঁর কোনো কথাবার্তা হয়েছিল কি না। স্বামীজী বলেছিলেন, অশোক কয়েক হাজার পাঁঠার প্রাণ বাঁচিয়ে দেশটাকে কয়েক শো বছর পরাধীন করার ব্যবস্থা করে গেছেন!

অশোককে অব্যাহতি দিয়ে ( ধর্মাশোকের উদ্দেশ্যসাধুতায় সন্দেহ করতে পারি না ) অগ্রসর হওয়া যাক। কিন্তু স্বামীজী কি অধিকাংশ মানুষের অহিংস নিরামিষাশী স্বভাব বোঝাতে তাঁর গুরুদেবের বলা নিম্নের উপাদেয় কাহিনীটি শোনান নি?

পরিণত বয়সে যাঁরা ত্যাগ-বৈরাগ্য দেখান, তাঁরা কি ধরনের ত্যাগী তা বোঝাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—

“তা জানো, একজনার বাড়ি দুর্গোৎসব হত, উদয়াস্ত পাঁঠাবলি হত। কয়েক বৎসর পরে আর বলির সে ধূমধাম নাই। একজন জিজ্ঞাসা করলে, মশাই, আজকাল যে আপনাদের বাড়িতে বলির ধূমধাম নাই? সে বললে, আরে, এখন যে দাঁত পড়ে গেছে।”

স্বামীজীর মাংসপ্রীতি দেখে বোঝা যায়, খাওয়ার ব্যাপারে মধ্যমার্গকে তিনি

যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করতেন। ধর্ম ঢুকেছে ভাতের হাঁড়িতে—সে হাঁড়িতে ভাত নেই—স্বামীজী দেখলেন। শূন্য হাঁড়ির হাঁড়ি-মুখের নষ্টামীকে তিনি কখনো ক্ষমা করেননি।

পাশ্চাত্ত্যেও নিরামিষ আহারের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা কিভাবে যেন জড়িয়ে গিয়েছিল। ধর্মাচার্য বিবেকানন্দকে সুতরাং নিরামিষ ভোজনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে ডাকা হয়েছিল। তিনি গিয়েছিলেন, 'এক পেট মাংস খেয়ে,' কারণ তার দ্বারা, তিনি ভেবেছিলেন, 'বক্তৃতাটা জোরালো হবে।'

স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর শিষ্য গুডউইনের একবার মজার ঝগড়া বেধে গেল এই ব্যাপার নিয়ে। গুডউইন বললেন, আপনি নিরামিষ ভোজনের উপর লেকচার দিলেন কিন্তু মাছ খেলেন কেন? স্বামীজী হাসতে-হাসতে বললেন, আরে বুড়ি ঝি মাছটা এনেছে—সেটা না খেলে নর্দমায় ফেলে দিত—আমি না হয় ওটা পেটে ফেলেছি। এই বলে, মজা করে সংস্কৃত আবৃত্তি করলেন, অহং ন ভোক্তা ইত্যাদি। গুডউইন চটে গিয়ে বললেন, ওসব সংস্কৃত কিড়িমিড়ি বুঝি না। স্বামীজী তাঁকে আরও চটাবার জন্য বেদান্তের নানা শ্লোক বলে চললেন এবং মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন। গুডউইনও সমানে গজ্‌গজ্‌ করে চললেন।

নিরামিষ আহারের সঙ্গে ধর্মের জড়াজড়ি ভালবাসাকে স্বামীজী খুঁচিয়েছেন বারবার:

"ঈশ্বর কি তোমাদের মতো আহাম্মক, তিনি কি ফুলের ঘায়ে এতই মূর্চ্ছা যান যে এক টুকরা মাংসে তাঁর দয়ানদীতে চড়া পড়ে যাবে।"

"সিংহ ব্যাঘ্র মাংসাশী; আর চড়াই পাখি চাল কাঁকর খায়। সিংহ ব্যাঘ্রের সন্তান উৎপাদনের প্রবৃত্তি হয় বৎসরান্তে, আর চড়াই পাখির বাচ্ছা হয় অবিরত। মাংসাহার ধর্মপথের অন্তরায় নাকি?"

"গোরু মাংস খায় না, ভেড়াও তা খায় না—তাই বলে তারা অহিংস যোগী? যে-কোনো মূর্খ ইচ্ছা করলেই মাংস ছাড়তে পারে, কিন্তু সেই কারণেই তাদের নিরামিষাশী জন্তুদের চেয়ে বড় বলা যাবে না। যে-ব্যক্তি নিষ্ঠুরভাবে বিধবা ও অনাথ বালকদের ঠকায়, টাকার জন্য যে-কোনো অন্যায় করতে পারে, সে যদি পুরো ঘাস খেয়েও থাকে তবু সে পশুরও অধম।"

"যদি কোন শুদ্ধ খাদ্য খেলেই সত্ত্ব শুদ্ধ হয় তাহলে একটা বাঁদরকে ধরে সারাজীবন দুধভাত খাওয়াও—সে মস্ত যোগী হয়ে দাঁড়াবে না কি? তাহলে তো গরু আর হরিণ মহাযোগী। শুধু স্নান করলেই যদি স্বর্গে যাওয়া যায় তাহলে মাছেরা আগে স্বর্গে যাবে।"

"প্রাচীনকাল হতে আধুনিক কাল পর্যন্ত এক মহা বিবাদ—আমিষ আর

নিরামিষ। মাংসভোজন উপকারক কি অপকারক? তাছাড়া জীবহত্যা ন্যায় বা অন্যায়, এ এক মহা বিতণ্ডা চিরদিনের। এক পক্ষ বলছেন, কোনো কারণে হত্যারূপ পাপ করা উচিত নয়; আর একপক্ষ বলছেন—রাখো তোমার কথা, হত্যা না করলে প্রাণধারণই হয় না। শাস্ত্রবাদীদের ভেতর মহাগোল—শাস্ত্র একবার বলছেন, যজ্ঞ-স্থলে হত্যা করো—আবার বলছেন, জীবাঘাত করো না। হিন্দুরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যজ্ঞ ছাডা অন্যত্র হত্যা করা পাপ; যজ্ঞ করে সুখে মাংসভোজন করো। এমনকি, গৃহস্থের পক্ষে নিয়ম আছে, কোনো-কোনো স্থলে হত্যা না-করলে পাপ—যেমন শ্রাদ্ধাদি। সে সকল স্থলে নিমন্ত্রিত হয়ে মাংস না খেলে পশুজন্ম হয়—মনু বলছেন। অপরদিকে জৈন বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলছেন যে, তোমার শাস্ত্র মানি না, হত্যা করা কিছুতেই হবে না। বৌদ্ধসম্রাট অশোক, যে যজ্ঞ করবে, বা নিমন্ত্রণ করে মাংস খাওয়াবে, তাকে সাজা দিচ্ছেন। আধুনিক বৈষ্ণব পড়েছেন কিছু ফাঁপরে—তাঁদের ঠাকুর রাম বা কৃষ্ণ মদ মাংস দিব্যি ওড়াচ্ছেন—রামায়ণ মহাভারতে রয়েছে। সীতা-দেবী গঙ্গাকে মাংস, ভাত, আর হাজার-হাজার কলসী মদ মানছেন।…পাশ্চাত্ত্য-দেশে…এক পক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারীর যত রোগ; অপরপক্ষ বলছেন, ও গল্প-কথা, তাহলে হিঁদুরা নীরোগ হত, আর ইংরেজ আমেরিকান প্রভৃতি প্রধান-প্রধান মাংসাহারী জাত রোগে লোপাট হয়ে যেত এতদিনে। একপক্ষ বলছেন যে, ছাগল খেলে ছাগুলে বুদ্ধি হয়, শূয়োর খেলে শূয়োরে বুদ্ধি হয়, মাছ খেলে মেছো বুদ্ধি হবে। অপরপক্ষ বলছেন যে, কপি খেলে কোপো বুদ্ধি, আলু খেলে আলুয়ো বুদ্ধি এবং ভাত খেলে ভেতো বুদ্ধি। জড়বুদ্ধির চেয়ে চৈতন্যবুদ্ধি হওয়া ভাল। একপক্ষ বলছেন, ভাত-ডালে যা আছে মাংসেও তাই। অপরপক্ষ বলছেন, হাওয়াতেও তাই, তবে তুমি হাওয়া খেয়ে থাকো। একপক্ষ বলছেন যে, নিরামিষ, খেয়েও লোকে কত পরিশ্রম করতে পারে; অপরপক্ষ বলছেন, তাহলে নিরামিষাশী জাতিই প্রধান হত। চিরকাল মাংসাশী জাতিই বলবান ও প্রধান। মাংসাহারী বলছে, হিঁদু চীনে দেখো, খেতে পায় না, ভাত খেয়ে, শাক-পাতড়া খেয়ে মরে, ওদের দুর্দশা দেখো—আর জাপানীরাও ঐ ছিল। মাংসাহার আরম্ভ করে অবধি ওদের ভোল ফিরে গেছে। ভারতবর্ষে দেড়লাখ হিন্দুস্থানী সেপাই, এদের মধ্যে কয়জন নিরামিষ খায় দেখো। উত্তম সেপাই গোরখা বা শিখ—কে কবে নিরামিষাশী দেখো। একপক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারে বদহজম; আর একপক্ষ বলছেন, সব ভুল, নিরামিষাশী-গুলোরই যত পেটের রোগ।…ফল কথা, চিরকাল মাংসাশী জাতিরাই যুদ্ধবীর চিন্তাশীল ইত্যাদি। মাংসাশী জাতিরা বলছেন যে, যখন যজ্ঞের ধূম দেশময় উঠত, তখনই হিঁদুর মধ্যে ভাল-ভাল মাথা বেরিয়েছে; এ বাবাজিভোল হয়ে পর্যন্ত তো একটাও মানুষ জন্মাল না।…মাংস খাওয়া অবশ্য অসভ্যতা, নিরামিষভোজন অবশ্যই

পবিত্রতর। যাঁর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্মজীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ ; আর যাকে খেটেখুটে এই সংসারের দিবারাত্রি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরী চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বৈ-কি ! যতদিন মনুষ্যসমাজে এই ভাব থাকবে—'বলবানের জয়'—ততদিন মাংস খেতে হবে, বা অন্য কোনোরকম মাংসের ন্যায় আহার আবিষ্কার করতে হবে। নইলে বলবানের পদতলে দুর্বল পেষা যাবেন ! রাম কি শ্যাম নিরামিষ খেয়ে ভাল আছেন বললে চলে না—জাতি জাতির তুলনা করে দেখো।"

স্বামীজীর পক্ষে যথেষ্ট নিরপেক্ষ রচনা, নিঃসন্দেহে। তাঁর আসল মনোভাব নিম্নের কয়েক লাইনে পরিষ্কার ফুটেছে :

"আমরা হচ্ছি নিরামিষভোজী—এক কাঁড়ি ঘাস-পাতা আহার। আবার বেজায় গরম দেশ, এক দমে লোটাভর জল খাওয়া চাই। পশ্চিমী চাষা সেরভর ছাতু খেলে ; তারপর পাতকোকে পাতকোই খালি করে ফেললে—জল খাওয়ার চোটে। গরমী কালে আমরা বাঁশ বার করে দিই, লোককে জল খাওয়াতে। কাজেই সেসব যায় কোথা বলো, দেশ বিষ্ঠামূত্রময় না হয়ে যায় কোথা ? গরুর গোয়াল, ঘোড়ার আস্তাবল, আর বাঘ-সিঙ্গির পিঁজরার তুলনা করো দিকি।"

স্বামীজী কথায় কাজে মিল রাখতেন—এবং কোনো কথাই তাঁর মুখে আটকাত না। সুতরাং পেটে অ্যাসিড হচ্ছিল বলে যখন ডাক্তারের বিধানে তাঁর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল, তখন মনের দুঃখ উজাড় করে লিখলেন :

"আমার শরীর জাহাজে অনেক ভাল ছিল ; কিন্তু ডাঙায় আসিয়া পেটে বায়ু হওয়ায় একটু খারাপ। একজন বড় ডাক্তার বললে, নিরামিষ খাও, আর ডাল ছুঁয়ো না। ইনি এখানকার একজন মুরুব্বি ডাক্তার। এঁর মতে ইউরিক অ্যাসিড-গোলমালে যত ব্যারাম হয়। মাংস এবং ডাল ইউরিক অ্যাসিড বানায়। অতএব 'ত্যাজ্যং ব্রহ্মপদং' ইত্যাদি। যা হোক, আমি তাঁকে সেলাম ক'রে চলে এলাম।"

জাহাজে থাকাকালে স্বামীজী কিভাবে উক্ত 'ব্রহ্মপদ' ধারণ করতেন, তার এক অনবদ্য সরস বর্ণনা দিয়েছেন। ঐ বর্ণনার মধ্যে একটি গল্প আছে—একেবারে হাস্যরত্ন সেটি। গল্পের ভূমিকা—তুরীয়ানন্দ-স্বামী, নিবেদিতা প্রভৃতিকে নিয়ে স্বামীজী পাশ্চাত্ত্যে যাচ্ছেন জাহাজে করে। কলকাতা থেকে জাহাজ ছেড়েছে। সমুদ্রের কাছে গঙ্গায় দুই ভয়ানক চড়া রয়েছে—জেমস আর মেরী চড়া—তাতে লাগলে জাহাজ তৎক্ষণাৎ কুপোকাত। জাহাজের কাপ্তেন এবং যাত্রীরা সদাই শঙ্কাতুর—না-জানি কখন কি হয়। "১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে কলকেতা থেকে কাউণ্ট অব স্টারলিং নামক এক জাহাজ ১৪৪৪ টন গম বোঝাই নিয়ে যাচ্ছিল—ঐ বিকট চড়ায় যেমন লাগা আর তার আট মিনিটের মধ্যেই 'খোঁজ খবর নাহি পাই।' ১৮৭৪ সালে ২৪০০ টন বোঝাই একটি স্টীমারের দু'মিনিটের মধ্যে ঐ দশা হয়।"

স্বামীজীদের জাহাজ অনেক যত্নে চড়া পেরোল—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই। তারপর—স্বামীজী লিখছেন—

"ধন্য মা তোমার মুখ, আমরা যে ভালয়-ভালয় পেরিয়ে এসেছি, প্রণাম করি। তু-ভায়া বললেন, 'মশায়, পাঁটা মানা উচিত মাকে।' আমিও—'তথাস্তু, একদিন কেন ভায়া, প্রত্যহ।' পরদিন তু-ভায়া আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশায়, তার কি হল?' সেদিন আর জবাব দিলুম না। তার পরদিন আবার জিজ্ঞাসা করতেই খাবার সময়ে তু-ভায়াকে দেখিয়ে দিলুম, পাঁটা-মানার দৌড়টা কতদূর চলছে। ভায়া কিছু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ও তো আপনি খাচ্ছেন।' তখন অনেক যত্ন করে বোঝাতে হল যে, কোনো গঙ্গাহীন দেশে নাকি কলকেতার এক ছেলে শ্বশুরবাড়ি যায়। সেথায় খাবার সময় চারিদিকে ঢাক-ঢোল হাজির। আর শাশুড়ির বেজায় জেদ—'আগে একটু দুধ খাও!' জামাই ঠাওরালে বুঝি দেশাচার। দুধের বাটিতে যেই চুমুকটি দেওয়া—অমনি চারিদিকে ঢাক-ঢোল বেজে ওঠা। তখন তার শাশুড়ি আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতা হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললে, 'বাবা, এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গুঁড়া করা—শ্বশুর গঙ্গা পেলেন।' অতএব হে ভাই! আমি কলকেতার মানুষ, এবং জাহাজে পাঁটার ছড়াছড়ি, ক্রমাগত মা-গঙ্গায় পাঁটা চড়ছে, তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হয়ো না। ভায়া যে গম্ভীরপ্রকৃতি, বক্তৃতাটা কোথায় দাঁড়াল বোঝা গেল না।"

'গম্ভীরপ্রকৃতি' শাস্ত্রজ্ঞ গুরুভাই তুরীয়ানন্দের সঙ্গে যদি তামাশা চলতে পারে—শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে যে তা চলবে, বলাই বাহুল্য। এই শিষ্যও আচারপরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তদুপরি 'বাঙাল'। সুতরাং ঠাট্টার অবাধ লক্ষ্য। স্বামীজী সর্বদাই তাঁকে ওসকাতেন। সকালে চা খাচ্ছিলেন বিলেতি বিস্কুটের সঙ্গে, সদানন্দকে আদেশ দিলেন ভট্চাযকে ধরে নিয়ে আয়। ভট্চায এলে তাঁকে বিলেতি বিস্কুট খেতে দিলেন, এবং ভট্চায তা খেলেন। তখন স্বামীজী দুষ্টুমীভরা মুখে বললেন, 'কি খেলি জানিস—ওগুলো মুরগীর ডিমে তৈরী।' ভট্চায চমকে উঠলেও সামলে নিলেন, কারণ স্বামীজীর সঙ্গগুণে তাঁর উন্নতি হয়েছিল—উপযুক্ত উত্তর ফিরিয়ে দিলেন—'ওতে যাই থাক আমার জানবার দরকার নেই। আপনার প্রসাদ অমৃত, খেয়ে অমর হলাম।'

শিষ্য মঠে ভোগ দেবার জন্য মাছ এনেছেন। স্বামীজী স্থির করলেন, মাছের কিছু অংশ ইংরেজি-ধরনে রাঁধবেন। দুধ, দই, ভারমিশেলি প্রভৃতি দিয়ে চার-পাঁচ রকমে মাছ তিনি রেঁধে ফেললেন। রান্নার পরে 'বাঙাল মৎস্যপ্রিয়' বলে আপ্যায়ন করে মাছ তাঁকে পরিবেশন করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন লাগছে।' উত্তর—'অপূর্ব, এমন কখনো খাই নাই।'

এখন এই 'অপূর্ব'টার মধ্যে যে ভারমিশেলি ছিল, তার সঙ্গে শিষ্য পূর্বে পরিচিত ছিলেন না। অতএব স্বামীজী তাঁকে মধুর স্বরে শোনালেন—'ওগুলো কি জানিস, বিলিতি কেঁচো—লণ্ডন থেকে শুকিয়ে এনেছি।'

আমবা ধরে নিতে পারি, বিলিতি কেঁচো নবজীবন লাভ করে শিষ্যের পেটে কিলবিলিয়ে উঠেছিল। কিন্তু কচ্ছপের ক্ষেত্রে স্বামীজীব বৈজ্ঞানিক রসিকতা শিষ্যকে অতখানি বিচলিত করতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ।

স্বামীজী শিষ্যকে বললেন, 'ধর্ম-কর্ম করতে গেলে আগে কূর্মাবতাবের পুজো চাই—পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম।' পূর্ববঙ্গীয়েরা কূর্ম-দ্বারা কূর্মপূজা কবেন বলে স্বামীজী খুশি ছিলেন এবং অখুশি ছিলেন কলকাতায় বাঙালদেব কাণ্ড দেখে—'ঢাকা, বিক্রমপুরও চাঁইমাছ কচ্ছপাদি জলে ছেড়ে দিয়ে সইভ্য হচ্ছে।'

কচ্ছপ খাওয়া ভাল, কিন্তু তাই বলে রসিকতাটা বাদ যাবে কেন? আলিপুরেব চিড়িয়াখানায় নিবেদিতা, যোগানন্দ, 'শিষ্য' প্রভৃতিকে নিয়ে স্বামীজী বেডাতে গিয়েছেন। সুপারিনটেনডেণ্ট বায়বাহাদুর রামব্রহ্ম সান্ন্যাল সঙ্গে থেকে তাঁদের সব কিছু দেখাচ্ছেন। জীবজন্তু দেখতে-দেখতে ডারউইনের ক্রমবিকাশ-তত্ত্বের আলোচনা স্বামীজী করছেন, কিছু-কিছু নিজস্ব মতও জানাচ্ছেন। সাপের ঘরে এসে গায়ে চক্র-আঁকা একটা প্রকাণ্ড সাপ দেখিয়ে বললেন, 'এ থেকেই কচ্ছপ উৎপন্ন হয়েছে; এই সাপই একস্থানে বহুকাল বসে থেকে ক্রমে কঠোরপৃষ্ঠ হয়ে গেছে।' তারপরেই দুষ্ট বুদ্ধি জাগল—শিষ্যের দিকে ফিরে বললেন—'তোরা না কচ্ছপ খাস? ডারউইনের মতে, সাপই কালপরিণামে কচ্ছপ হয়েছে—তাহলে তোরা সাপ খাস।'

শিষ্য বলতে পারতেন, মশাই, মনুষ্যজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধেও ডারউইনের কিছু বক্তব্য ছিল। স্বামীজী অবশ্য তার গোডা মেরে রেখেছিলেন। তিনি মানুষের উৎপত্তি বিষয়ে ডারউইনের মত খণ্ডন করার চেষ্টা একটু আগেই করেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বড় প্রিয় চিংড়িমাছ সম্বন্ধেও তো জীববিজ্ঞানীদের কিছু বক্তব্য ছিল—শিষ্য অন্ততঃ সে কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিতে পারতেন।

শিষ্যের দুর্গতির শেষ সেখানেই নয়। রামব্রহ্মবাবুর বাড়িতে শিষ্যকে জোর করে ম্লেচ্ছ নিবেদিতার সঙ্গে এক টেবিলে বসিয়ে নিবেদিতার ছোঁয়া চা ও মিষ্টি খাওয়ালেন এবং তারপরে মঠে ফিরে এসে সকলের হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন। কী ভালমানুষ তখন তিনি—ভাটপাড়ার বিধবাকে হারিয়ে দেয় এমন আচারনিষ্ঠা—"আর এক কথা সকলে শোনেন—আজ এই ভট্‌চায-বামুন নিবেদিতার এঁটো খেয়ে এসেছে। তার ছোঁয়া মিষ্টি না হয় খেলি, তাতে আসে যায় না—কিন্তু তার ছোঁয়া জলটা কি করে খেলি?"

খাদ্য যে একটা তত্ত্ব—একথা বিশেষভাবে জানা যায় স্বামীজীর লেখা পড়লে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থে বেশ-কিছু পৃষ্ঠা নিয়ে দেশবিদেশের খাদ্য-রীতি ও প্রীতি সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা বাংলা সাহিত্যে এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ রচনা, কোনো সন্দেহ নেই। তার প্রতিটি লাইন রসবস্তু—আমরা সামান্যই তুলছি!

দেশী ও বিলেতি রাঁধুনির চেহারা—

"আমাদের রান্নার মতো পরিষ্কার রান্না কোথাও নেই। বিলেতি খাওয়ার শৃঙ্খলার মতো পরিষ্কার পদ্ধতি আমাদের নেই। আমাদের রাঁধুনি স্নান করেছে, কাপড় বদলেছে, হাঁড়িপত্র উনুন সব ধুয়ে-মেজে সাফ করেছে, নাকে মুখে গায়ে হাত ঠেকলে তখনি হাত ধুয়ে তবে আবার খাদ্যদ্রব্যে হাত দিচ্ছে।

"বিলাতি রাঁধুনির চৌদ্দপুরুষে কেউ স্নান করেনি। রাঁধতে-রাঁধতে চাখছে, আবার সেই চামচ হাঁড়িতে ডোবাচ্ছে। রুমাল বার করে ফোঁৎ করে নাক ঝাড়লে, আবার সেই হাতে ময়দা মাখলে। শৌচ থেকে এল—কাগজ ব্যবহার করে—সে হাত ধোবার নামটিও নেই—সেই হাতে রাঁধতে লাগল। কিন্তু ধবধবে কাপড় আর টুপি পরেছে। হয়ত একটা মস্ত কাঠের টবের মধ্যে দুটো মানুষ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রাশীকৃত ময়দার উপর নাচছে—কিনা ময়দা মাখা হচ্ছে। গরমীকাল—দরবিগলিত ঘাম পা-বেয়ে সেই ময়দায় সেঁদুচ্ছে। তারপর তার রুটি তৈয়ার যখন হল, তখন দুগ্ধফেননিভ তোয়ালের উপর চীনের বাসনে সজ্জিত করে, পরিষ্কার চাদর-বিছানো টেবিলের উপর, পরিষ্কার কাপড়-পরা, কনুই পর্যন্ত সাদা দস্তানা-পরা চাকর, এনে সামনে ধরলে! কোনো জিনিস হাত দিয়ে পাছে ছুঁতে হয়, তাই কনুই পর্যন্ত দস্তানা।

"আমাদের স্নান-করা বামুন, পরিষ্কার বাসনে, পরিষ্কার হাঁড়িতে, শুদ্ধ হয়ে রেঁধে; গোময়সিক্ত মাটির উপর থালাসুদ্ধ অন্ন-ব্যঞ্জন ঝাড়লে। বামুনের কাপড়ে খামচে ময়লা উঠছে। হয়ত, মাটি ময়লা গোবর আর ঝোল—কলাপাতা ছেঁড়ার দরুন—একাকার হয়ে এক অপূর্ব আস্বাদ উপস্থিত করলে!!"

আমাদের লুচি-কচুরী-জিলিপি সম্বন্ধে—

"ভাজা জিনিসগুলো আসল বিষ। ময়রার দোকান যমের বাড়ি। ঘি তেল গরমদেশে যত অল্প খাওয়া যায় ততই কল্যাণ। ঘিয়ের চেয়ে মাখন শীঘ্র হজম হয়। ময়দায় কিছুই নাই, দেখতেই সাদা। গমের সমস্ত ভাগ যাতে আছে এমন আটাই সুখাদ্য। আমাদের বাংলাদেশে এখনো দূর পল্লীগ্রামে যে-সকল আহারের বন্দোবস্ত আছে, তাহাই প্রশস্ত। কোন্ প্রাচীন বাঙালী কবি লুচি-কচুরীর বর্ণনা কচ্ছেন? ও লুচি-কচুরী এসেছে পশ্চিম থেকে। সেখানেও কালেভদ্রে লোকে খায়। উপরি উপরি 'পাকি রসুই' খেয়ে থাকে এমন লোক তো দেখিনি! মথুরার চোবে কুস্তিগীর,

লুচি-লড্ডুকপ্রিয় ; দু'চার বৎসরেই চোবের হজমের সর্বনাশ হয়, আর চোবেজী চূরণ খেয়ে-খেয়ে মরেন।

"গরীবরা খাবার জোটেনা বলে অনাহারে মরে, ধনীরা অখাদ্য খেয়ে আহারে" মরে। যা-তা পেটে পোরার চেয়ে অনাহার ভাল।...খিদে পেলে কচুরী জিলিপি খানায় ফেলে দিয়ে এক পয়সার মুড়ি কিনে খাও—সস্তাও হবে, কিছু খাওয়াও হবে।"*

একই প্রসঙ্গ—

"যার দু'পয়সা আছে আমাদের দেশে, সে ছেলেপিলেগুলোকে নিত্য কচুরী-মণ্ডা-মেঠাই খাওয়াবে !! ভাত রুটি খাওয়া অপমান !!! এতে ছেলেপিলেগুলো নড়ে-ভোলা পেট-মোটা আসল জানোয়ার হবে না-তো কি ! এতবড় ষণ্ডা জাত ইংরেজ —এরা ভাজাভুজি মেঠাই মণ্ডার নামে ভয় খায়—যাদের বরফান্ দেশে বাস, দিনরাত নিত্য কসরত ! আর আমাদের অগ্নিকুণ্ডে বাস, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে নড়ে বসতে চাইনা—আহার লুচি-কচুরী-মেঠাই—ঘিয়েভাজা, তেলেভাজা !! সেকেলে পাড়াগেঁয়ে জমিদার এক কথায় দশ ক্রোশ হেঁটে দিত, দু'কুড়ি কই মাছ কাঁটাসুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, ১০০ বছর বাঁচত। তাদের ছেলেপিলেগুলো কলকেতায় আসে, চশমা চোখে দেয়, লুচি-কচুরী খায়, দিনরাত গাড়ি চড়ে, আর প্রস্রাবের ব্যামো হয়ে মরে। 'কলকত্তা'ই হওয়ার এই ফল !!"

মানুষের পচা খাদ্যপ্রীতি সম্বন্ধে—

"সকল জাতিরই আদিম পুরুষ নাকি প্রথম অবস্থায় যা পেত তাই খেত। একটা জানোয়ার মারলে, সেটাকে এক মাস ধরে খেত—পচে উঠলেও তাকে ছাড়ত না। ক্রমে সভ্য হয়ে উঠল, চাষ-বাস শিখলে···আহার নিত্য জুটতে লাগল, কিন্তু পচা জিনিস খাওয়ার চাল একটা দাঁড়িয়ে গেল। পচা দুর্গন্ধ একটা যা-হয় কিছু—আবশ্যক ভোজ্য হতে নৈমিত্তিক আদরের চাটনি হয়ে দাঁড়াল।—

"ইউরোপীয়রা এখনো বন্য পশু-পক্ষীর মাংস না পচলে খায় না। তাজা পেলেও তাকে টাঙিয়ে রাখে—যতক্ষণ না পচে দুর্গন্ধ হয়। কলকেতায় পচা হরিণের মাংস পড়তে পায় না ; রসা ভেটকির উপাদেয়তা প্রসিদ্ধ। ইংরেজদের পনীর যত পচবে,

* জিলিপির নিন্দায় স্বামীজী কিন্তু গুরুদ্রোহী। শ্রীরামকৃষ্ণ জিলিপি খুব ভালবাসতেন। পেটভরে খাওয়ার পরেও যদি জিলিপি আসত খেয়ে নিতেন। কেউ যদি বলত—আপনি এই তো বললেন, আর কিছু পেটে ঢুকবে না—তা জিলিপি খেলেন কি করে ? শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বলতেন—কি জানো, পুলিশে হাত দেখালে সব গাড়ি থেমে যায়, কিন্তু লাটসাহেবের গাড়ি থামে না। জিলিপি লাটসাহেবের গাড়ি।

যত পোকা কিলবিল করবে, ততই উপাদেয়। পলায়মান পনীর-কীটকেও তাড়া করে ধরে মুখে পুরবে—তা নাকি বড়ই সুস্বাদ !!"

আমাদের মা-জননীরা কিভাবে ছেলেদের দুধ খাওয়ান, তার ছবি—

"দুধ একটা গুরুপাক জিনিস।…মূর্খ মাতা কচি ছেলেকে জোর করে ঢক্‌ঢক্ করে দুধ খাওয়ায় আর দু'-ছ' মাসের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদে !! এখানকার ডাক্তারেরা পূর্ণ বয়স্কের জন্যও এক পোয়া দুধ আস্তে-আস্তে আধ ঘণ্টায় খাওয়ার বিধি দেন। কচি ছেলেদের জন্য ফিডিং-বটল ছাড়া উপায়ান্তর নেই। মা ব্যস্ত কাজে —দাসী একটা ঝিনুকে করে ছেলেটাকে চেপে ধরে সাঁ-সাঁ খাওয়াচ্ছে !! লাভের মধ্যে এই যে, রোগা-পটকাগুলো আর বড় হচ্ছে না, তারা ঐখানেই জন্মের শোধ দুধ খাচ্ছে।…

"মা-ষষ্ঠীর সাক্ষাৎ বরপুত্র না হলে কি সেকালে একটা ছেলে বাঁচত! সে তাপসেক, দাগাফোঁড়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বেঁচে ওঠা, প্রসূতি ও প্রসূত উভয়েরই পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল।"

স্বামীজীর বিবেচনায় চিকিৎসকরা 'যমরাজের দূত'। তাঁদের বিষয়ে কিছু মধুর ভাষণ সম্পূর্ণ-প্রাসঙ্গিক না হলেও উদ্ধৃত করছি—

"ডাক্তার-ফাক্তার কাছে আসতে দিও না। ওরা অধিকাংশ—'ভাল করতে পারব না, মন্দ করব, কি দিবি তা বল্‌?' পারতপক্ষে ওষুধ খেয়ো না। রোগে যদি এক আনা মরে, ওষুধে মরে পনের আনা। পারো যদি প্রতি বৎসর পুজোর বন্ধের সময় হেঁটে দেশে যাও। ধন হওয়া আর কুঁড়ের বাদশা হওয়া—দেশে এক কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাকে ধরে হাঁটাতে হয়, খাওয়াতে হয়, সেটা তো জীবন্ত রোগী, সেটা তো হতভাগা। যেটা লুচির ফুল্‌কো ছিঁড়ে খাচ্ছে, সেটা তো মরে গেছে। যে একদমে দশক্রোশ হাঁটতে পারে না—সেটা মানুষ না কেঁচো?"

পুনশ্চ—

"আর সর্বনাশ করেছে ঐ পোড়া ডাক্তার-বদ্যিগুলো—ওরা সবজান্তা, ওষুধের জোরে সব করতে পারে! একটু পেটগরম হয়েছে তো অমনি ওষুধ দাও। পোড়া বদ্যিও বলে না যে, দূর কর্‌ ওষুধ, যা, দু'ক্রোশ হেঁটে আসগে যা।"

একটু সরে গিয়েছিলাম। খাওয়ার ঘরে আবার ফিরে আসা যাক। শেষপর্যন্ত স্বামীজী দেশী খাওয়ারই ভক্ত।—"নানান দেশ দেখছি, নানান রকমের খাওয়াও দেখছি। তবে আমাদের ভাত ডাল ঝোল চচ্চড়ি শুক্তো মোচার ঘণ্টের জন্য পুনর্জন্ম নেওয়াও বড় বেশি কথা মনে হয় না।" শেষ বয়সেও ঐ শুক্তো, মোচার ডালনা খেতে তিনি দিদিমার কাছে যেতেন। যোগীন-মার বাড়ীতে হাঁক-ডাক ক'রে

ঢুকতেন—"ও যোগেন-মা, আজ কাজ সেরে-সুরে বেলায় তোমার এখানেই আসব—ভাল করে রাঁধবে।" দিশি রান্না খেতেন, মুগ্ধ হতেন। গোলাপ-মা বাগবাজারে 'মায়ের বাড়িতে' একদিন পরিবেশন করতে-করতে হেসে কুটোপাটি—"দ্যাখো, যখনই চিংড়িমাছ দিয়ে পুঁইশাক হয় তখনই নরেনকে মনে পড়ে। আহা সে বড় পছন্দ করত—একগাল হেসে বলত—'গোলাপ-মা—জুতো, জুতো! এর তুলনা নেই।' "

দেশ-বিদেশের রান্না তুলনা করবার যোগ্যতা অবশ্যই স্বামীজীর ছিল। আলোয়ারের বুড়ির টিক্কর থেকে সেরা ফরাসী-খানা সেরা ধনীর বাড়িতে—তাঁর বরাতে জুটেছে। 'পৃথিবীর সব-সেরা জিনিস আমার বরাতে জুটেছে'—একথা স্বামীজী নিজেই বলেছেন। ফরাসী-চালের আমেরিকান ডিনারের পদাবলী তিনি একদা কীর্তন করেছিলেন। বহুপদযুক্ত ডিনারকে পদাবলী না বলে নাটকও বলা চলে, যার এক-একটি কোর্স এক-একটি অঙ্ক—কোথাও পঞ্চাঙ্ক, কোথাও সপ্তাঙ্ক কোথাও দশাঙ্ক ভোজনাট্য। সেইরকম একটি ডিনারের চেহারা—

"প্রথমে একটু-আধটু নোনামাছ বা মাছের ডিম, বা কোনো চাটনি বা সবজি। এটা হচ্ছে ক্ষুধাবৃদ্ধি। তারপর সুপ। তারপর আজকাল ফ্যাসান—একটা ফল। তারপর মাছ। তারপর মাংসের একটা তরকারি। তারপর থান-মাংস-শূল্য, সঙ্গে কাঁচা সবজি। তারপর আরণ্য মাংস, মৃগপক্ষ্যাদি। তারপর মিষ্টান্ন। শেষ কুলপি—মধুরেণ সমাপয়েৎ। ধনী হলে প্রায় প্রত্যেকবার থালা বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে মদ বদলাচ্ছে—শেরী, ক্ল্যারেট, স্যামপাঁ ইত্যাদি, এবং মধ্যে-মধ্যে মদের কুলপি একটু আধটু। থাল বদলাবার সঙ্গে-সঙ্গে কাঁটা চামচ সব বদলাচ্ছে। আহারান্তে 'কাফি'—বিনা দুগ্ধং; আসবমদ্য খুদে-খুদে গ্লাসে, এবং ধূমপান। খাওয়ার রকমারির সঙ্গে মদের রকমারি দেখাতে পারলে তবে 'বড়মানুষি চাল' বলবে।"

ডিনারের শেষে কুলপি—ইউরোপীয়দের কাছে মধু, আর স্বামীজীর কাছে ঔ মধু! অন্ততঃ তাঁর বিষয়ে বিদেশী স্মৃতিকথাগুলি তাঁর কুলপি-প্রীতির উল্লেখে পূর্ণ। কুলপির বিলেতী নাম আইসক্রীম। বিদেশীদের আইসক্রীম-প্রীতির বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন—"মাঠা সর্বদাই ব্যবহার। চায়ে কফিতে, সকল তাতেই ঐ মাঠা (ক্রীম)—সর নয়, দুধের মাঠা।...আর বরফজল—শীত কি গ্রীষ্ম, দিন কি রাত্রি, ঘোর সর্দি কি জ্বর,—এন্তের বরফজল। এরা সায়েন্টিফিক মানুষ, সর্দি বরফজল খেলে বাড়ে শুনলে হাসে। খুব খাও, খুব ভাল। আর কুলপি এন্তের, নানা আকারের।"

লঙ্কার উল্টোপিঠে আইসক্রীম। স্বামীজী বলতেন—আমি চরমের মানুষ। সুতরাং তিনি লঙ্কা ও আইসক্রীমের মধ্যে ছোটাছুটি করতেন। তাঁর আইসক্রীম-প্রীতি সম্বন্ধে মিস ম্যাকলাউড লিখেছেন—

"স্বামীজী চকোলেট-আইসক্রীম খুব ভালবাসতেন। বলতেন, আমিও চকোলেটের

মতো—তাই ভালবাসি। একদিন খাবার সময়ে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, স্বামীজী, স্ট্রবেরি আপনার কেমন লাগে?' স্বামীজী বললেন, 'ও-বস্তু আমি কখনো খাইনি।' —'সেকি? রোজ খাচ্ছেন আইসক্রীমের সঙ্গে।' 'ও হরি! আইসক্রীমের সঙ্গে? তা বাপু, আইসক্রীমে নুড়ি ডুবিয়ে রাখলেও না-দেখে খেয়ে যাব।'"

এক নারকীয় শীতের রাতে রেস্তোঁরায় তিনি খেতে গেছেন। চারদিকে বরফ-ঠাণ্ডা। সেই রাতেও তিনি আইসক্রীম ছাড়লেন না। খাওয়ার শেষে বিল দেবার সময়ে পরিচারিকা তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বলে চলে গেলেন, কারণ টেলিফোনে কে ডাকছে—স্বামীজী হাঁক দিয়ে বললেন, 'মহাশয়া, দেরী করবেন না যেন—যদি করেন, ফিরে এসে দেখবেন আইসক্রীমের ঠোঙার পাহাড়।'

অনুরূপ আর একটি ঘটনা। পরিবেশনের ত্রুটির জন্য পরিবেশিকাকে ম্যানেজার ধমক দিতে যাচ্ছেন—স্বামীজী হাঁক পাড়লেন—'খবরদার! একটুও বকেছ কি দোকানের সব আইসক্রাম সাবাড় করে দিয়েছি।'

এবং আর একটি ঘটনা। ক্যালিফোর্নিয়ায় আছেন 'হোম অব ট্রুথে'র সদস্য-গণের সঙ্গে। আচার-আচরণে তাঁরা বড়ই রক্ষণশীল। একদিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলে সকলে জুটেছেন। কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ড—ক্রীমটা নেই কেন? অথচ গোয়ালা সকালে তো ক্রীম দিয়ে গিয়েছে! কি হল, কোথায় গেল, কোথায় যেতে পারে—সবাই ব্যস্ত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন—নানা রকম সম্ভাব্য কারণ সন্ধান করলেন—কিন্তু কিনারা হল না কিছুতে। তখন অগত্যা তাঁরা 'ব্যাপারটা রীতিমত রহস্যজনক' বলে ক্ষান্তি দিলেন। সবাই যখন কলরব করছেন—স্বামীজী চুপচাপ শুনছিলেন। সকলে থামলে স্বামীজী মুখ খুললেন। অতীব শান্তভাবে জানালেন—ক্রীমটা কেউ সরায়নি—তিনি আগে-আগে সাবাড় করে ফেলেছেন। শুনে সবাই স্তম্ভিত—বিশেষতঃ এটিকেটবাদীরা—তাঁরা হাসবেন না কাঁদবেন স্থির করতে পারলেন না।

আরও ঘটনা। আছেন ক্যালিফোর্নিয়ায় মিড-পরিবারে। সকালে প্রাতরাশে ২'কাপ কফি খান—কফিতে যত-না আকর্ষণ কফির উপরকার ক্রীমে ততোধিক। গৃহস্বামিনী মিসেস হ্যানসবরো একদিন তাঁকে তৃতীয় কাপ কফি নিতে অনুরোধ করলেন।—'না না, তৃতীয় কাপ কদাপি নয়—বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।' মিসেস হ্যানসবরো তথাপি অনুরোধ করেন।

তখন স্বামীজী অগত্যা আত্মসমর্পণ করলেন—ক্রীমবাহিনীর কাছে—

'দিন! দিয়ে ফেলুন! কি আর করা যাবে! মেয়েদের কাজই তো পুরুষকে প্রলুব্ধ করা!'

আইসক্রীম প্রীতিও, বিচিত্র কথা, তিনি হয়ত পেয়েছিলেন গুরুপ্রসাদে। কথা-মৃতের এক টুকরো বর্ণনা—

"ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আনন্দে কথাবার্তা কহিতেছেন। চৈত্র মাস, বড গরম। দেবেন্দ্র কুলপি-বরফ তৈয়ার করিয়াছেন। ঠাকুরকে ও ভক্তদের খাওয়াইতেছেন। ভক্তরাও কুলপি খাইয়া আনন্দ করিতেছেন। মণি আস্তে-আস্তে বলিতেছেন—এন্‌কোর। এন্‌কোর। সকলে হাসিতেছেন। কুলপি দেখিয়া ঠাকুরের ঠিক বালকের ন্যায় আনন্দ হইয়াছে।"

জীবনের প্রভাতবেলার এই ছবি। জীবনসন্ধ্যার একটি বেদনাকরুণ মধুরতামাখা কাহিনী—মিস ম্যাকলাউড বলেছেন—

"একদিন স্বামীজী বললেন, এ জগতে আমার আর কিছু নেই। যা পেয়েছিলুম সবই ফেরত দিয়েছি।

"আমি বললাম, স্বামীজী, আপনি যতদিন বাঁচবেন, প্রতি মাসে পঞ্চাশ ডলার করে দিয়ে যাব।

"স্বামীজী অল্প ভাবলেন, তারপর বললেন, তাতে আমার চলে যাবে তো?

"যাবে, কিন্তু বিনা আইসক্রীমে।

"আমি তাঁকে দুশো ডলার দিলাম। কিন্তু দুশো ডলারের মেয়াদ চার মাস শেষ হবার আগেই তিনি চলে গেলেন।"

আইসক্রীম শেষ। টেবিল ছেড়ে উঠতে হবে। খুবই চমৎকার খাওয়া হয়েছে—নিজের উদর দর্শন করে স্বামীজী ভাবলেন। বক্তৃতার সময়ে 'পেটে ওয়াটারলু-র লড়াই চলেছিল'—এখন কিন্তু পূর্ণ শান্তি—পরিতৃপ্ত-চিত্তে ধূমপান করছেন—এখন কি তাঁর মনে পড়ছে অনাহারের দিনগুলির কথা—কিংবা অপমানের আহারের দিনগুলির কথা? ইংলণ্ডে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন স্টার্ডিরা, তাঁরা আশা করেছিলেন, ভারতীয় যোগী পওহারী-বাবা হয়ে সভামঞ্চে ইংরেজীতে বক্তৃতা করে যাবে—তা নয়, তার ভরপেট খাওয়া চাই, এমনকি চুরুট পর্যন্ত!! সুতরাং 'বিলাসিতা। সন্ন্যাসীর বিলাসিতা!'—অভিযোগ উঠল, বিশেষতঃ স্টার্ডির গৃহিণীর মুখে, যিনি সদাই সন্ত্রস্ত, পাছে তাঁর ভূতপূর্ব যোগী স্বামীকে (স্টার্ডি একবার ভারতের বনে বাদাড়ে যোগাভ্যাস করতে এসেছিলেন) ভুলিয়ে সব টাকাকড়ি স্বামীজীর দল হাতিয়ে নেয়। সবজি-সেদ্ধ, ভাত-সেদ্ধ এবং স্টার্ডি-পত্নীর অভিশাপযুক্ত সস্‌-এর সঙ্গে যাঁকে দিনের আহার সমাধা করতে হয়েছে, কখনো-কখনো থাকতে হয়েছে অন্ধকূপের মতো ঘরে, নিজের হাতে বাঁধতে হয়েছে, বা রাত কাটাতে হয়েছে প্রায়শঃ এককামড় রুটি মাখন খেয়ে, সেইসঙ্গে শুনতে হয়েছে বিলাসিতার অভিযোগ!—স্বামীজীর কি এখন, ভরপেট উত্তম আহারের পরে, মনে পড়ছিল সেই দিনগুলির কথা? ভাবছিলেন কি—জীবনের প্রয়োজনীয় অনিবার্য স্থূলতা এই ভোজন!

আহার—দেহের ঋণ! মনের লোভ নয়? নিশ্চয় তা। 'কলুর বলদের মুখের সামনে এক আঁটি খড় ঝোলানো থাকে—সে তারই লোভে ঘুরছে অনন্ত কাল।'

গভীর বিদ্রূপের সঙ্গে তিক্ত জীবনসত্যকে তিনি প্রকাশ করলেন এক সন্ধ্যায়, বক্তৃতার মধ্যে। নরকের কথা তুলে বললেন—

"আমি দান্তের ইনফার্নো তিনবার পড়েছি কিন্তু তোমাদের খ্রীস্টান-নরক ও তার শাস্তিবিধি আমার কাছে মোটেই ভয়ঙ্কর মনে হয় না। ভয়ঙ্কর হল হিন্দু-নরক। সবচেয়ে ভয়াবহ শাস্তি কি জানা—একজন পেটুক হয়ত মারা গেল; নরকে তার চারদিকে যত ভাল খাদ্য সম্ভব সাজিয়ে দিলে; তার পেট হয়ে গেল হাজার-হাজার মাইল; কিন্তু মুখ? ছুঁচের মতো সরু!"

সত্যই ভয়ঙ্করতম এই নরক—যে নরক ট্যান্টেলাসের। তির্যক হাসি মেশানো আর একটি গভীর বক্তব্য—

"মানুষের মধ্যে কিছু বুদ্ধিসঞ্চার হওয়া মানে তার মৃত্যু। তার জীবন শুরু হয় একটা বিরাট পেট নিয়ে—তার মাথাকে ছাড়িয়ে যায় এমন পেট। যখন তার মধ্যে প্রজ্ঞা আসতে আরম্ভ করে তখনই তার পেট কমতে-কমতে একেবারে মিলিয়ে যায়—শুধু পড়ে থাকে তার মাথা—আর তখন তার মরতে দেরী হয় না।"

# খরশান ব্যঙ্গ

রসনার রসের বহু বিচিত্র প্রকাশকে আমরা খানিক দেখলাম। এবার বিবেকানন্দ-জীবনের মূল রস—ঈশ্বররসের প্রসঙ্গে আসতে হচ্ছে। বিবেকানন্দ যখন চূড়ান্ত ঈশ্বররসিক, তখন বিচিত্র কথা, সব রস হারিয়ে যায়, পৃথিবীর শব্দ গন্ধ স্পর্শ কিছু থাকে না—সেই অবস্থার কথা বলার দায়িত্ব এখন আমার নয়; আমি কেবল তাঁর বিশাল জীবনের হাস্যালোকিত খণ্ডাংশগুলির সন্ধান করছি।

অদ্বৈত প্রলয়লোকের কথা ত্যাগ করে, ঈশ্বর-লীলালোকে বিবেকানন্দকে দর্শন করলে আমরা মানুষটিকে কখনও হাসিতে চঞ্চল দেখি, কখনও-বা হাসিতেই অচঞ্চল —যখন ধ্যানলীন। তখন ললাট-চন্দ্রের স্থির আলোকহাসি তাঁর আননরেখায় মূর্ছিত।

বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন—ঈশ্বররস পান করুক মানুষ, তারা আনন্দিত হোক। তাই হল পরমার্থ। বিবেকানন্দ দেখেছিলেন—ঐ রসের পানসত্র যাদের বলা যায়, সেই ধর্মগুলির মধ্যে কিন্তু আনন্দকে হনন করা হচ্ছে নানা স্বার্থে। ধর্মের বাইরে দাঁড়িয়েও একই কাজ করে যাচ্ছে বিরোধী নানা শক্তি। সুতরাং বিবেকানন্দের অভিযান শুরু হয়ে গেল, যাকে বলা যায় হাসির অভিযান। তবে হাসির হলেও ব্যাপার যখন অভিযান, অর্থাৎ যুদ্ধকাণ্ড, তখন স্বামীজীর অস্ত্রাঘাতে অধর্মাচারীদের সঙ্গে দু-চারটি সৎ মানুষও গঙ্গালাভ করেছেন। এর পক্ষে আছে ভারতচন্দ্রের সহাস্য সমর্থন—'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?'

বিবেকানন্দকে এই অধ্যায়ে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে প্রধানতঃ ব্যঙ্গকাররূপেই দেখব। ইংরেজী মতে স্যাটায়ারিস্ট।

ব্যঙ্গ বা স্যাটায়ার কাকে বলে তা মোটামুটি সকলেরই জানা আছে। স্যাটায়ারের লক্ষণ সম্বন্ধে ইংরেজী সমালোচনাশাস্ত্র থেকে ভূরি-ভূরি রচনা উদ্ধৃত করে পাঠকের মুখের হাসি আমি এখনি কেড়ে নিতে পারি। সেই কুকাজ করতে চাই না। কিন্তু আবার আমাদের দেশের এক সেরা ব্যঙ্গরসিকের কিছু বক্তব্যের উল্লেখ না করেও পারছি না—এমন চমৎকার ব্যঙ্গ মিশিয়ে তিনি ব্যঙ্গপ্রসঙ্গ করেছেন। 'ব্যঙ্গলেখক-বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে এঁর মন্তব্যের কথাই ধরা যাক। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের 'মারাত্মক ব্যঙ্গে'র কিছু নমুনা দেওয়ার পরে ইনি উপসংহারে লিখেছেন:

"কোনো সাহিত্যের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দকে ব্যঙ্গ-রচয়িতারূপে স্মরণ করা হয়নি। এবং তা সম্ভবতঃ এইজন্য যে, ইতিহাস লেখকেরা সম্মানিত ধর্ম-প্রচারককে ব্যঙ্গলেখকের মতো ঘৃণ্য এবং অসম্মানজনক আসনে টেনে নামাতে অনিচ্ছুক।"

যে-লেখকের কথা বলছি—তিনি শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী—ব্যঙ্গকে চরমার্থে

নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য—হাসি মোটেই ব্যঙ্গের আবশ্যিক অঙ্গ নয়। শ্রীযুক্ত গোস্বামী নক্শা কেটে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টাও করেছেন। এক প্রান্তে রেখেছেন একশোভাগ কৌতুকহাস্য, ঠিক উল্টো প্রান্তে একশোভাগ হাস্যহীন আক্রমণাত্মক ব্যঙ্গ। তাঁর বক্তব্য—যখন হাস্য ও ব্যঙ্গ পরিমাণে ৫০·৫০ থাকে, তখন থেকে আসল ব্যঙ্গের শুরু হয়; হাস্যরসের যত হ্রাস, ব্যঙ্গরসের তত বৃদ্ধি; হাস্যরসেব সম্পূর্ণ নাশে তার চরম স্ফূর্তি ঘটে। শ্রীযুক্ত গোস্বামী বলতে চান, ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য—আক্রমণ; কখনও কখনও একটু বেঁকিয়ে তা করা হয়, সরাসরি করলেও ক্ষতি নেই, যদি ব্যক্তিগত কুৎসা লক্ষ্য না হয়। ব্যঙ্গের আক্রমণের লক্ষ্য—'সমাজের ব্যাপক অনাচার অসঙ্গতি।'

শ্রীযুক্ত গোস্বামী আরও বলেছেন, ব্যঙ্গকারের মনোভাব—'অন্যায় ধ্বংসের মনোভাব।...এই ভাঙার মধ্যে হয়ত অনেক স্থলে গড়াব ইঙ্গিত থাকে, কিন্তু তা তাঁর মুখ্য প্রেরণা নয়।...ব্যঙ্গ কিছু কৌতুকমোড়া থাকতে পারে কিন্তু তার মাত্রা আছে। মাত্রা ছাড়লে তা আর ব্যঙ্গ থাকে না।'

ব্যঙ্গের ক্ষেত্রে সরাসরি আক্রমণের প্রতি পক্ষপাত শ্রীযুক্ত গোস্বামী গোপন করেননি। বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ আক্রমণের তারিফ ক'রে তিনি বলেছেন:

"সামাজিক বিষয়ে যুক্তিবাদী হিন্দু-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ সোজাসুজি ব্যঙ্গ বর্ষণ করেছেন অর্থহীন আচারনিষ্ঠদের উপর। এবং তাঁর ব্যঙ্গ কোথাও মৃদু নয়।... উদ্দেশ্যসিদ্ধিই যদি একমাত্র প্রেরণা হয়, তাহলে তর্কের খাতিরে বলা চলে, লাঠিই সবচেয়ে উপযোগী।...কিন্তু ব্যঙ্গকে সাহিত্যের সীমানায় থাকতে হলে লাঠি অথবা অন্যান্য নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র অচল, একথা সাহিত্যিকেরা স্বীকার ক'রে থাকেন। তবে ব্যঙ্গসাহিত্য যদি লাঠি অথবা অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রের কাছাকাছি যায়, তবে আপত্তি থাকা উচিত নয়। স্বামী বিবেকানন্দের ব্যঙ্গ লাঠির নিকট আত্মীয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যঙ্গরচনা সম্বন্ধে মনস্বী ব্যঙ্গলেখক শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর প্রশংসাবাণী আমাদের নিঃসন্দেহে পুলকিত করেছে। তবে এখানে কিছু সংশোধনী কথাও বলতে হচ্ছে! স্বামীজীর ব্যঙ্গ কেবল লাঠি নয়, কখনও তারও বেশি, তা গদা; আবার কখনো-বা একেবারে ছুরি, যার ফলা এমন ধারালো সূক্ষ্ম যে আহত ব্যক্তি সানন্দে দেহত্যাগ করতে সমর্থ। আর, স্বামীজীর ব্যঙ্গ কখনই কৌতুকহাস্যবর্জিত নয়, এবং কদাপি নিছক ধ্বংসাত্মক নয়। এদেশীয় তথাকথিত সংস্কারকদের সঙ্গে স্বামীজীর মূল পার্থক্য এইখানে—তিনি গঠনের মন্ত্র না দিয়ে ভাঙনের আদেশ দেননি।

বিবেকানন্দ মূলে হিউমারিস্ট, স্যাটায়ারিস্ট নন—যদিচ স্যাটায়ারে তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। হিউমার ও স্যাটায়ার কি কারণে ও কিভাবে বিবেকানন্দের মধ্যে

মিশে থাকত, তা যুবক নরেন্দ্রনাথের বিষয়ে স্মৃতিকথা বলতে গিয়ে অনবদ্যভাবে উন্মোচন করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল :

"বিবেকানন্দ—নিঃসন্দেহে প্রতিভাসম্পন্ন যুবক, মুক্তস্বভাব, বেপরোয়া, মিশুক, সামাজিক সম্মেলনেব প্রাণস্বরূপ এবং মধুকণ্ঠ গায়ক ; অসাধারণ বাক্‌নিপুণ, যদিও কথাগুলি অনেক সময়ই অম্ল ও তিক্ত, পৃথিবীর ভণ্ডামি ও জুয়াচুরিকে তীক্ষ্ণশর সহাস্য বাক্যে অবিরত বিদ্ধ কবেন ; মনে হয় অবজ্ঞার উচ্চাসনে তিনি আসীন, কিন্তু সেটা ছদ্মবেশ, তার দ্বারা আবৃত করে রাখেন কোমলতম হৃদয়কে ; সব জড়িয়ে একজন প্রেবণা-উদ্বুদ্ধ বোহেমিয়ান. অথচ বোহেমিয়ানরা যাতে বঞ্চিত সেই লৌহ-কঠিন প্রতিজ্ঞায় সমৃদ্ধ ; ভঙ্গিতে অটল ও অভ্রান্ত, অধিকারের দার্ঢ্য নিয়ে কথা বলেন—সেইসঙ্গে আছে তাঁর চোখে এক অদ্ভুত শক্তি যা সম্মোহিত করে বাখে শ্রোতাদের।"

নরেন্দ্রনাথের গভীর চিত্তসংকটের কথা অতঃপর ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন। আঘাত মথিত নরেন্দ্রনাথেব 'প্রাথমিক সতেজ আবেগ ও সহজ বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়ে' 'এক ধরনেব বিশুষ্কতা ও অবসাদ' এসেছিল, সমস্ত কিছুকে তিনি তখন 'স্বভাবসিদ্ধ উপহাস ও ঔদাসীন্যেব দ্বারা আবৃত' করে বাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছিল আত্মা, যন্ত্রণামোচনের জন্য কখনও-কখনও সঙ্গীতের আশ্রয় নিতেন, যা তাঁর হৃদয়গভীরকে আলোড়িত করত. 'অলৌকিক অপ্রত্যক্ষ সত্যের চেতনায় তাঁকে উন্নীত করত, অশ্রু আনত নয়নে।' নরেন্দ্রনাথ—যৌবনের আকাঙ্ক্ষা, ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণকে অপবিত্র স্থূল দৈহিক মনে করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গীতনৈপুণ্যেব জন্য যে-সব বন্ধু-বান্ধব জুটেছিল তারা অনেকেই সচ্চরিত্র ছিল না, 'তাদের অনেকের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর মনে ছিল তিক্ততম প্রকাশ্য ঘৃণা', কিন্তু সভা-মজলিশের প্রতি আকর্ষণ ছিল বলে তাদের সঙ্গ ছাড়তেও পারতেন না, তবে স্বস্তি পেতেন, যদি তেমন সঙ্গীতের আসরে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গী হতেন। ঐকালে ব্রজেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা :

"তাঁর মধ্যে সমুচ্চ, ঐকান্তিক এবং পবিত্র স্বভাবকে আমি লক্ষ্য করলাম—সে স্বভাব প্রচণ্ড অনুভূতিতে স্পন্দিত ও ধ্বনিত। তিনি অবশ্যই অম্লমুখ, বিরক্ত-স্বভাব, শুচিবাতিক ছিলেন না, কিংবা স্বভাব-বিষণ্ণ কোন মানুষ ; আমাকে বাঁচিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সঙ্গে রীতিগর্হিত ভাষাও ব্যবহার করতেন ; প্রচলিতের ঘাড় ধরে নাড়া দেওয়ায়, ভব্যরীতিকে তার সাজানো আবাসে আক্রমণ করায়, তাঁর যেন একটা বিকট আনন্দ ছিল, এবং আনন্দের জন্য যা করতেন, তা অন্তরঙ্গ বন্ধু ভিন্ন অন্যদের কাছে অনেক সময়ই উদ্ভট ও বিভ্রান্তিকর মনে হত ; কিন্তু সেই একই কালে তিনি সত্তার নিভৃত আলয়ে বাসনার সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত, মায়ার সূক্ষ্ম মোহজাল ছিন্ন করতে উদ্যত।"

বিবেকানন্দ জয়ী হয়েছিলেন। বিবেকানন্দ তাঁর ধর্মকে পেয়েছিলেন—সত্য ধর্মকে। এবং, ব্রজেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য ও অন্য বহু সাক্ষ্য-অনুযায়ী জানা যায়—বিবেকানন্দ ধর্মবিকারকে ছিন্ন করেই ধর্মলাভ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন—ধর্মবিকার ধর্মপথের কতখানি প্রতিবন্ধক, তা খুলে দেখিয়ে না দিলে পথভ্রান্তির সম্ভাবনা পদে-পদে।

ধর্মের বিকারের শেষ নেই। স্বামীজী দেখেছেন—কী বিপুল অসঙ্গতি চতুর্দিকে! ভগবানের ভক্তেরা ভগবানের আলিঙ্গনের হাত-দুটি কেটে তাঁকে ঠুঁটো করে রেখেছেন বিধর্মীদের জন্য! দেখেছেন, ভক্তেরা ভগবানকে সহস্রবাহু করেছেন তাঁর হাজার হাত থেকে নিজেদের পাওনা হাতাবার জন্য!! দেখেছেন, মহাজ্ঞানীরা ভগবানকে নিরাকার করেও তাঁর দুটি চরণ দাবি করেছেন প্রণাম নিবেদনের জন্য!!!

স্বামীজী দেখেছেন—সর্ব বিরোধের সমন্বয় যে-ঈশ্বর সেই তিনি সর্ব বিরোধের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছেন। 'আমরা সর্বজনীন ধর্ম করছি দলাদলি করে'—স্বামীজী এক পত্রে লিখেছেন। আরও বেশি—ধর্মের নামে অপরের মুণ্ডু কেটে পীর এবং নিজের মুণ্ডু খসিয়ে শহীদ হচ্ছি।

দেখেছেন—দেখে হতাশায় ভেঙে পড়েছেন—ঈশ্বরের নামে দুর্বলের উপর সবলের উৎপীড়ন, ধনীর অর্থশোষণ, বিচারের প্রহসন। আর্তনাদ করে লিখেছিলেন—

"আমাদের কোনো ভরসাই আর নেই যদি-না সত্যই এমন কোনো ভগবান থাকেন যিনি সকলের পিতা, যিনি সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষা করতে ভয় পান না, যিনি ঘুষ খান না। তেমন ভগবান কি আছেন?"

তেমন ভগবান সত্যই আছেন—তাঁর স্বরূপ জানাতেই বিবেকানন্দ আত্মদান করেছেন, এবং জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত করতে চেয়েছেন মিথ্যাধর্মের আবরণকে।

বিবেকানন্দের বিদ্রূপ—জ্ঞানেরই শলাকা।

ধর্মের বিদ্রূপ আরম্ভ করা যাক স্বামীজীর গুরুদেবের প্রসঙ্গ দিয়ে। জগতের অবতারগণের মধ্যে চরিত্রাংশে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ, একথা স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, কিন্তু কদাপি আস্থা রাখতে পারেননি 'অবতার' পত্রিকার লেখক ও সম্পাদকগণের বাগাড়ম্বরের উপর। যদি কেউ নিজ গুরুকে সত্যই অবতার বলে বিশ্বাস করে, তাহলে সে সেই বিশ্বাসের প্রমাণ দিক অবতারের প্রতিষ্ঠায় জান কবুল করে। নচেৎ তেত্রিশ কোটির উপরে সংখ্যা চড়াতে তাঁর ইচ্ছা ছিল না। স্বামীজী জানতেন, সে যুগ গিয়েছে যখন অবতারের শিষ্য-প্রশিষ্যরা তরবারির চোটে রক্তের মধ্যে ধর্ম ঢুকিয়ে দিতে পারেন। তার বিকল্প হিসাবে বিটকেল গলায় নামকীর্তন করলেও তা হবে

না। ওটা রাংতা-তরবারির যাত্রা-খেলা। এখন আইডিয়ার যুগ—জয় করতে হবে ভাবে, চিন্তায় এবং চরিত্রে।

রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের একেবারে সূচনায় রামকৃষ্ণ-বাণীকে ছেড়ে এবং রামকৃষ্ণ-চরিত্র কিভাবে ঐ বাণীর দৃষ্টান্ত, তা না দেখিয়ে, তাঁর জীবনের অলৌকিক কাণ্ড-কারখানার উপরে জোর দেবার চেষ্টা কেউ-কেউ করেছিলেন। স্বামীজী বারে-বারে ঝাঁঝালো বিদ্রূপে ও গালাগালিতে সে চেষ্টাকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন। তার কিছু অংশ :

"রামকৃষ্ণের অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধে কী পাগলামি হচ্ছে? আমার অদৃষ্টে সারাজীবন দেখছি গরু তাড়ানো ঘুচল না। মস্তিষ্কহীন আহাম্মকগুলো কেন যে এই বাজে আজগুবিগুলো লেখে, তা জানিও না, বুঝিও না। মদকে 'ডি গুপ্তের ঔষধে' পরিণত করা ছাড়া কি রামকৃষ্ণের জগতে আর কোনো কাজ ছিল না?...এ রকম আহাম্মকি দেখলে আমার রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে!"

অনুরূপ আরও কিছু—

"আমাদের জাতের কোনো ভরসা নাই। কোনো একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা সকলে পড়ে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আর আষাঢ়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমা-সীমান্ত নাই। হরে হরে! বলি একটা কিছু করে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ! খালি পাগলামি! আজ ঘণ্টা হল, কাল তার ভেঁপু হল, পরশু তার উপর চামর হল; আজ খাট হল, কাল খাটের ঠ্যাঙে রূপো বাঁধানো হল;—আর লোকে খিচুড়ি খেলে, আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প ২000 মারা হল—চক্রগদাপদ্মশঙ্খ—আর শঙ্খগদাপদ্মচক্র—ইত্যাদি।...যাদের মাথায় ঐ রকম বেল্‌কামো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম imbecile (ক্লীব)। ঘণ্টা ডাইনে বাজবে বা বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়, পিদ্দিম দুবার ঘুরবে বা চারবার—ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিনরাত ঘামতে চায় তাদেরই নাম হতভাগা। আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া জুতোখেকো।"

এর পরেই ছিল সেই বিখ্যাত রচনা—যার থেকে উদ্দীপ্ত, তিক্ত এবং বেদনার্ত বিদ্রূপ সম্ভব নয়—

"যদি ভাল চাও তো ঘণ্টা-ফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নর-নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের—পূজা করগে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাট রূপ এই জগৎ; তার পূজা মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম—ঘণ্টার উপর চামর চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধ ঘণ্টা বসব—এ বিচারের নাম 'কর্ম' নয়—ওর নাম পাগলাগারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে

কাশী-বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে—এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন—এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন-বিনা বিদ্যা-বিনা মরে যাচ্ছে। বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে—মানুষগুলো মরে যাক।"

রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে ফিরে আসি। নিষ্কর্মাদের গুঁতোগুঁতি আর পরমহংসের অবতার নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি দেখে স্বামীজীর ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। অতি তিক্তভাবে তাদের ঠাট্টা করে বলেছিলেন—'অবতারের বাচ্ছারা—ছোট-ছোট অবতারেরা—ওহে অবতারের পিলেগণ—!' রামকৃষ্ণ-উৎসব কিভাবে পালিত হওয়া উচিত সে-বিষয়ে লিখেছিলেন—'আঙুল বাঁকানো এবং ঘণ্টার বিকট আওয়াজ কিঞ্চিৎ কম ক'রে, কিঞ্চিৎ গীতা উপনিষদাদি পাঠ করবে।...সাণ্ডেল লিখছেন যে, হাজার-হাজার লোক খালি ঘণ্টানাড়া দেখতে আসে।...আমরা কি সর্বত্যাগ করে সাণ্ডেলের জন্য ঘণ্টা বাজাতে এসেছি? সাণ্ডেল কাঁসারীপাড়ায় বাস করুক গে—যদি ঘণ্টানাড়া এত ভাল লাগে।"

বালখিল্য বুদ্ধিতে যারা শ্রীরামকৃষ্ণকে মাপতে চায়, তাদের বিষয়ে কিছু মধুবাক্য ঃ

"প্রভু তোমাদের সদ্‌বুদ্ধি দিন। দু-জন জগন্নাথ দেখতে গেল—একজন দেখলে ঠাকুর, আর একজন দেখলে পুঁইগাছ!!! বাপুহে, তোমরা সকলেই তাঁর সেবায় ছিলে বটে, কিন্তু যখনই মন ফুলে আমড়াগাছ হবে, তখনই মনে ক'রো যে, থাকলে কি হয় তাঁর সঙ্গে—দেখেছ কেবলই পুঁইগাছ!"

এই একদিকের ছবি—ভক্তিতে বিগলিত এবং কর্মে বিচলিতদের রূপ। এর উল্টোদিকে আছেন সাধু সমালোচকগণ, যাঁরা অভক্তিতে উদ্দীপ্ত এবং ছিদ্রকল্পনায় মৌলিক। শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা বুঝবার সামর্থ্য বা ইচ্ছা ওঁদের ছিল না—দলীয় মনোভাবে ওঁদের মন এমনই আচ্ছন্ন। স্বগোষ্ঠীর অতিভক্তিকে স্বামীজী শাসন করেছেন রোষে-বিদ্রূপে; সেই সঙ্গে বিরুদ্ধগোষ্ঠীর অযথা অভক্তির বিরুদ্ধেও শ্লেষাস্ত্র তুলে ধরেছেন। গুরুপূজা নাকি ভয়ানক মন্দ, ওই পাপকে বিদায় দিলেই নাকি প্রগতিশীলেরা ধেয়ে এসে তাঁর করমর্দন ক'রে তাঁর সঙ্গে সসৈন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বেন মানবসেবায়! এহেন কথা শুনে স্বামীজী ভারতী-সম্পাদিকা সরলাদেবীকে কঠোর বিদ্রূপে ভরা যে-চিঠি লিখেছিলেন, তা প্রগতিশীলদের ছুঁৎমার্গী মানবপ্রেমের চেহারা খুলে দেয় আমাদের সামনে—

"যদি আমার বা আমার গুরুভ্রাতাদিগের কোনো একটি বিশেষ আদরের বস্তু ত্যাগ করিলে অনেক শুদ্ধসত্ত্ব এবং যথার্থ স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা আমাদের কার্যে সহায় হন, তাহা হইলে সে ত্যাগে আমাদের মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হইবে না।...তা এতদিন তো

কাহাকেও দেখি না—সে প্রকার সহায়তায় অগ্রসর। দু'একজন আমাদের hobby-র জায়গায় তাঁহাদের hobby বসাইতে চাহিয়াছেন, এই পর্যন্ত। যদি যথার্থ স্বদেশের বা মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়, শ্রীগুরুর পূজা ছাড়া কি কথা, কোনো উৎকট পাপ করিয়া খ্রীস্টিয়ানদের অনন্ত নরকভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি জানিবেন।"

ব্যঙ্গ ক্রমেই উন্মুক্ত ক্ষুরধার:

"তবে মানুষ দেখতে-দেখতে বৃদ্ধ হতে চলিলাম। এ সংসার বড়ই কঠিন স্থান। গ্রীক দার্শনিকের লণ্ঠন হাতে করিয়া অনেকদিন হইতেই বেড়াইতেছি! আমার গুরুঠাকুর সর্বদা একটি বাউলের গান গাহিতেন—সেইটি মনে পড়িল—'মনের মানুষ হয় যে-জনা, নয়নে তার যায় গো জানা; সে দু'এক জনা, সে রসের মানুষ উজান-পথে করে আনাগোনা।'...

"তারপর যে-সকল দেশহিতৈষী মহাত্মা গুরুপূজাটি ছাড়লেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, তাঁদের সম্বন্ধেও আমার এইটুকু খুঁত আছে। বলি, এত দেশের জন্য বুক ধড়পড়, কলিজা ছেঁড়-ছেঁড়, প্রাণ যায়-যায়, কণ্ঠে ঘড়-ঘড় ইত্যাদি—আর একটি ঠাকুরেই সব বন্ধ করে দিলে? এই যে প্রবল তরঙ্গশালিনী নদী, যার বেগে পাহাড়-পর্বত যেন ভেসে যায়—একটি ঠাকুরে একেবারে হিমালয়ে ফিরিয়ে দিলে!...তৃষ্ণার্তের এত জলের বিচার, ক্ষুধায় মৃতপ্রায়ের এত অন্নবিচার, এত নাক সিঁটকানো? কে জানে কার কি মতিগতি? আমার যেন মনে হয়, ওসব লোক গ্লাসকেসের ভিতর ভাল; কাজের সময় ওরা যত পিছনে থাকে, ততই কল্যাণ। 'প্রীত ন মানে জাত কুজাত। ভুখ ন মানে বাসী ভাত।' আমি তো এই জানি।"

শ্রীরামকৃষ্ণের উপরে ম্যাক্সমূলার একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—তার পরে একটি গ্রন্থও। প্রবন্ধ এবং গ্রন্থটি ভারতে মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ঐ চাঞ্চল্যের বড় অংশে ছিল শ্রদ্ধার তরঙ্গ, আবার কিয়দংশে বিরাগ ও ঈর্ষার বিপরীত ঘূর্ণিপাক। ম্যাক্সমূলারের উক্ত গ্রন্থ 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি'র উপর স্বামীজী একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন—অনবদ্য সে রচনা। সাধুরীতির দৃঢ়পিনদ্ধ ভাষাগঠনের মধ্যে কখনও সম্ভ্রম-গাম্ভীর্য, কখনও বিদ্রূপের চাবুক। বিদ্রূপাংশেই আমরা এখানে দৃষ্টি দেব।

প্রবন্ধের গোড়ায় ম্যাক্সমূলার-প্রমুখ ভারততত্ত্ববিদ্‌দের জীবনব্যাপী সাধনার ফলে ভারতবর্ষ কিভাবে পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পুনরায় হৃত আসন ফিরে পেয়েছে, তার বিবরণ দেবার পরে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আংলোইণ্ডিয়ান গবেষণার বিকৃত রূপের একটি নমুনা স্বামীজী দিয়েছেন:

"কিছুদিন হইল, কোনো প্রসিদ্ধ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কর্মচারীর লিখিত 'ভারতাধিবাস' নামধেয় পুস্তকে এরূপ এক অধ্যায় দেখিয়াছি—'দেশীয় পরিবাররহস্য।' মনুষ্যহৃদয়ে রহস্যজ্ঞানেচ্ছা প্রবল বলিয়াই বোধহয় ঐ অধ্যায় পাঠ করিয়া দেখি যে,

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-দিগ্‌গজ তাঁহার মেথর, মেথরানী, ও মেথরানীর জারঘটিত ঘটনাবিশেষ বর্ণনা করিয়া স্বজাতিবৃন্দের দেশীয়-জীবন-রহস্য-সম্বন্ধে উগ্র কৌতূহল চরিতার্থ করিতে বিশেষ প্রয়াসী, এবং ঐ পুস্তকের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজে বিশেষ সমাদর দেখিয়া লেখক যে সম্পূর্ণরূপে কৃতার্থ, তাহাও বোধ হয়। 'শিবা বঃ সন্তু পন্থানঃ'—আর বলি কি? তবে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে' ইত্যাদি।"

একটু টীকা দরকার। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলতে তখনকার দিনে ভারতপ্রবাসী ইংরেজ বোঝাত।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহির্বিশ্বে কেবল কতকগুলি অর্ধসত্য বিকৃত কথা কিভাবে ছড়িয়েছিল সে-বিষয়ে স্বামীজী লিখেছেন—'এই ভারতবর্ষ নরমাংসভোজী, নগ্নদেহ, বলপূর্বক বিধবাদাহনকারী, শিশুঘাতী, মূর্খ, কাপুরুষ, সর্বপ্রকার পাপ ও অন্ধতা-পরিপূর্ণ, পশুপ্রায় নরজাতিপূর্ণ বলিয়া পাশ্চাত্ত্য সভ্যজাতিরা ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই ধারণার প্রধান সহায় পাদরী-সাহেবগণ—ও বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখ হয়—কতকগুলি আমাদের স্বদেশী।' ম্যাক্সমূলারের 'রামকৃষ্ণ' গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পরে পাশ্চাত্ত্যের মানুষ জানল—কেবল প্রাচীন ভারত নয়, আধুনিক ভারতবর্ষও ধর্মের শ্রেষ্ঠ মানুষ সৃষ্টি করতে পারে। তাতে 'পূর্বোক্ত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভীষণ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল তাহা বলা বাহুল্য।'

ম্যাক্সমূলার কিরূপ কঠোর বিচারের মানদণ্ডে রামকৃষ্ণ-চরিত্র ওজন করে গ্রহণ করেছেন, স্বামীজী তার সারসংক্ষেপ করেছেন। তারপর ম্যাক্সমূলার কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্র সম্বন্ধে 'ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিগণের' 'দোষোদ্‌ঘোষণ'-চেষ্টার প্রকৃতি উন্মোচন করেছেন, তার উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—তাহা 'পরশ্রীকাতর ও ঈর্ষাপূর্ণ বাঙালীর বিশেষ মনোযোগের বিষয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগের একটি—সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বারা তিনি স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলেন। ম্যাক্সমূলার তার উত্তরে লিখেছিলেন—সন্ন্যাস গ্রহণ করে যদি কেউ স্ত্রীর সঙ্গে শরীরসম্বন্ধ না রেখে তাঁকে সাধনসঙ্গিনী করে নেন—সে তো অপূর্ব ব্যবস্থা; ইউরোপে ঐ চেষ্টা সফল না হলেও ভারতে 'ঐ প্রকার কামজিৎ অবস্থায় কালাতিপাত' করা সম্ভবপর, একথা বিশ্বাস করি।

স্বামীজী অধ্যাপকের ঐ মন্তব্যের উল্লেখ করে লিখেছেন—'অধ্যাপকের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তিনি বিজাতি, বিদেশী হইয়া আমাদের একমাত্র ধর্মসহায় ব্রহ্মচর্য বুঝিতে পারেন, এবং ভারতবর্ষে যে এখনও তাহা বিরল নহে, বিশ্বাস করেন। আমাদের ঘরের মহাবীরেরা বিবাহে শরীরসম্বন্ধ-বই আর কিছু দেখিতে পাইতেছেন না!! যাদৃশী ভাবনা যস্য ইত্যাদি।'

শ্রীরামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অপর অভিযোগ—'তিনি বেশ্যাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন না।'

ম্যাক্সমূলার অপূর্ব উত্তর দিয়েছিলেন—'শুধু রামকৃষ্ণ নহেন, অন্যান্য ধর্মপ্রবর্তকেরাও এ অপরাধে অপরাধী।'

শ্রীরামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ—মাতাল সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট ঘৃণা ছিলনা।

স্বামীজী লিখেছেন—'দারুণ অভিযোগই বটে। মাতাল, বেশ্যা, চোর, দুষ্টদেব—মহাপুরুষ কেন দূর-দূর করিয়া তাড়াইতেন না, আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছাঁদি ভাষায় সানাইয়ের পোঁ-র সুরে কেন কথা কহিতেন না। আবার সকলের উপর বড অভিযোগ—আজন্ম স্ত্রী-সঙ্গ কেন কবিলেন না!!!'

অহঙ্কারী সমালোচকদের বিরুদ্ধে স্বামীজীর প্রচণ্ড ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণের শেষ কিছু অংশ:

"যাঁহারা আপনাদিগকে মহাপণ্ডিত জানিয়া এই মূর্খ দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদেব প্রতি আমাদেব নিবেদন এই যে, যে-দেশের এক মূর্খ পূজারী সপ্ত সমুদ্রপার পর্যন্ত আপনাদের পিতৃপিতামহাগত সনাতন ধর্মের জয়ঘোষণা নিজ শক্তিবলে অত্যল্পকালেই প্রতিধ্বনিত করিল—সেই দেশের সর্বলোক-মান্য শূরবীর মহাপণ্ডিত আপনাবা—আপনারা ইচ্ছা করিলে আবও কত অদ্ভুত কার্য স্বদেশের, স্বজাতির কল্যাণেব জন্য করিতে পারেন। তবে উঠুন, প্রকাশ হউন, দেখান মহাশক্তির খেলা—আমরা পুষ্পচন্দন হস্তে আপনাদের পূজার জন্য দাঁড়াইয়া আছি—আমরা মূর্খ, দরিদ্র, নগণ্য, বেশমাত্রজীবী ভিক্ষুক—আপনারা মহাবল, মহাকুলপ্রসূত, সর্ববিদ্যাশ্রয়—আপনারা উঠুন, অগ্রণী হউন, পথ দেখান, জগতের হিতের জন্য সর্বত্যাগ দেখান—আমরা দাসের ন্যায় পশ্চাদ্‌গমন করি।"

'সংস্কারক' একটা বিচিত্র শব্দ—এর অধীনে জাতিসংগঠক থেকে জাতি-সংহারক—সবাই পড়েন। এ দেশের দুর্ভাগ্য, একালে সংস্কারক-'টাই' গলায় ঝুলিয়ে যাঁরা ঘোরাফেরা করেছেন, তাঁরা অধিকাংশই শেষোক্ত শ্রেণীর। রামমোহনের মনীষা বা প্রগতিশীলতা, বিদ্যাসাগরের সাহস বা হৃদয়বত্তা যাঁদের ছিল না, এমন ব্যক্তিরা পরবর্তীকালে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের ভূমিকায় অভিনয় করে গেছেন। তাঁরা 'ছি! ছি! এত্তা জঞ্জাল!' নামক নৃত্যনাট্যের কুশীলব। স্বামীজী, রামমোহন-বিদ্যাসাগরের ভক্ত ছিলেন, এদেশে সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজন আছে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু তীব্র বিরাগ বোধ করেছেন ঐ সকল জনগণ-বিচ্ছিন্ন পোশাকী হিতৈষীদের সম্বন্ধে। এই শ্রেণীর সংস্কারক তাঁর বহু বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়েছেন।

পাশ্চাত্ত্য পুঁথি পড়ে কিছু ব্যক্তি অবিলম্বে জ্ঞানোদ্বুদ্ধ হয়ে তার বিস্তারে সচেষ্ট

হয়েছিলেন। তাঁরাই ইংরেজের সাহায্যে এদেশে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করছিলেন। সেই শিক্ষার কিছু ফল, স্বামীজীর ভাষায়—

"বালক স্কুলে গেল। সে প্রথম শিখল—তার বাপ মূর্খ, দ্বিতীয়তঃ তার পিতামহ একটা পাগল, তৃতীয়তঃ প্রাচীন আচার্যগণ সব ভণ্ড, আর চতুর্থতঃ শাস্ত্র সব মিথ্যা। ষোল বৎসর বয়স হবার আগেই সে একটা প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন 'না'-এর সমষ্টি হয়ে দাঁড়াল।"

এহেন শিক্ষার যাঁরা অনুরাগী—তাঁদের বিষয়ে স্বামীজীর বক্তব্য সুমধুর হতে পারে না। এঁরা দেশ ও জাতির সংস্কারের নামে প্রায় একশ বৎসর ধরে কুৎসাবর্ষণ করে গেছেন। স্বামীজী তিক্ত ভাষায় সংস্কারসভাগুলির নাম দিয়েছেন—'কুৎসা-সমিতি।'—'সকল সমাজেই দোষ আছে, সকলেই তা জানে; আজকালকার ছোট ছেলে পর্যন্ত তা জানে। সেও মঞ্চে দাঁড়িয়ে হিন্দুসমাজের গুরুতর দোষ সম্বন্ধে আমাদের রীতিমতো বক্তৃতা শুনিয়ে দিতে পারে।' এই ধিক্কৃত দেশটির অবস্থা সেই জলে-ডোবা বালকটির মতো, তীরে দাঁড়িয়ে যার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা ঝাড়ছিলেন বিজ্ঞ ব্যক্তি, আর ছেলেটি বলেছিল—'মশায়, আগে জল থেকে তুলুন, তার পরে বাণী শোনা যাবে।'

স্বামীজী বললেন—'প্রায় একশ বছর ধরে সংস্কার-আন্দোলন চলছে, কিন্তু তার ফলে চরম নিন্দাপূর্ণ গরলবর্ষী সাহিত্য ছাড়া আর কি সৃষ্টি হয়েছে?' নিজেদের কীর্তি সম্বন্ধে সংস্কারকদের উচ্চভাষণকে ফাঁসিয়ে দিয়ে স্বামীজী প্রশ্ন করেছিলেন—কয়েকজন মানুষ হঠাৎ ঠিক করলে অধিকাংশ মানুষকে নিজেদের পথে চালাবে—এটা কি সংখ্যাগুরুর প্রতি সংখ্যালঘুর উৎপীড়ন নয়? আত্মসংস্কারই শ্রেষ্ঠ সংস্কার। শিক্ষা দিয়ে জনগণকে এমন অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে যাতে তারা নিজেদের উন্নতির ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিতে পারে। নচেৎ কয়েকজন বিধবার বিয়ে দিলেই জাতির সর্বসিদ্ধি ঘটে না। তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে অব্যর্থ শরক্ষেপ করেছিলেন—'বিধবাদের স্বামীর সংখ্যার উপরে জাতির উন্নতি নির্ভর করে না, তা করে জনগণের অবস্থার উন্নতির উপরে।' অথচ, স্বামীজীকে দিনের পর দিন সংস্কারসভার বাৎসরিক নামতা-পড়া শুনতে হয়েছিল 'গোঁফওয়ালা শিশুদের' মুখে। সংস্কারের ধারাপাত-পড়ার পিছনে যতখানি না ছিল মানবহিতৈষণা, তার থেকে অনেক বেশী হীনমন্যতা। এঁদের বিষয়ে স্বামীজীর আরও দু-এক মধুবচন—

"যারা অন্তর্বহিঃ সাহেব সেজে বসেছ এবং 'আমরা নরপশু, তোমরা হে ইউরোপী লোক, আমাদের উদ্ধার করো' বলে কেঁদে-কেঁদে বেড়াচ্ছ···[এবং] সাহেবদের কাছে নাকি-কান্না ধরো, 'আমরা অতি নীচ, আমরা অতি অপদার্থ, আমাদের সব খারাপ'

—[তোমাদের] একথা ঠিক হতে পারে, তোমরা অবশ্য সত্যবাদী—তবে ঐ 'আমরা'র ভেতর দেশসুদ্ধকে জড়াও কেন ? ওটা কোন্ দিশি ভদ্রতা হে বাপু ?"

স্বামীজীর ভয়ঙ্করতম একটি আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিলেন বোম্বাই সংস্কার-সভার অধিনায়ক সুবিখ্যাত মাধব-গোবিন্দ রানাডে। স্বামীজী এই আক্রমণ করেছিলেন একেবারে নিজের জীবনের শেষভাগে, এবং রানাডের জীবনশেষও হয়ে যায় স্বামীজীর রচনা প্রকাশিত হবার কয়েকদিনের মধ্যে। রানাডেকে স্বামীজী আক্রমণ করেছিলেন তাঁর সামাজিক সংস্কার-উৎসাহের জন্য নয়—রানাডের অত্যুৎসাহ পরিমাণবুদ্ধি হারিয়ে ভারতবর্ষের ধর্মাশ্রয় সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে স্পর্শ করেছিল বলেই স্বামীজীর আক্রমণ। এক্ষেত্রে রানাডের পিছনে অবশ্য প্রোটেস্টান্ট ক্রীশ্চান এবং বাঙালী সংস্কারসভাগুলির ছায়া ছিল। রানাডেকে লক্ষ্য করে স্বামীজী পিছনের ছায়া-কায়াগুলিকে ভেদ করতে চেয়েছিলেন।

স্বামীজীর রানাডে-আক্রমণের রচনাটি উত্তম ব্যঙ্গ-সাহিত্যের দৃষ্টান্ত।

'সামাজিক সম্মেলনে অভিভাষণ' নামক উক্ত রচনার সূচনা এইপ্রকার—

"ঘোর ঈশ্বর-নিন্দুক এক ইংরেজকে একদা বলতে শুনেছিলাম—'ঈশ্বর নেটিভদের সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বর ইউরোপীয়দের সৃষ্টি করেছেন—কিন্তু অন্য কোনো একজন সৃষ্টি করেছেন দো-আঁশলা জাতের।"

ভারতীয় সমাজসংস্কারক-সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিচারপতি মাধব-গোবিন্দ রানাডের ভাষণ পাঠান্তে স্বামীজীর প্রশ্ন—

"ঈশ্বর ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বর ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করেছেন—কিন্তু সন্ন্যাসীদের সৃষ্টি করেছেন কে ?"

এইরকম বিচিত্র জিজ্ঞাসার কারণ—শ্রীযুক্ত বিচারপতি রানাডের বিবেচনায় সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় সমাজে একটি অবাঞ্ছিত অস্তিত্ব।

স্বামীজী বললেন—তবু সন্ন্যাসীরা আছেন, সব ধর্মেই—হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, এমন কি সন্ন্যাসবিরোধী ইসলামেও। সন্ন্যাসীর প্রকারভেদেরও সীমা নেই—কেউ পুরো মাথা-কামানো, কেউ খানিক কামানো, কারও লম্বা চুল, কারও খাটো চুল, কেউ একেবারে জটাজুটধারী, কেউ চীরাম্বর, কেউ পীতাম্বর, কেউ কৃষ্ণাম্বর, কেউ নীলাম্বর, আবার কেউ সম্পূর্ণ দিগম্বর ; কেউ শরীরনিগ্রহের পক্ষপাতী, কেউ বলেন, শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্ ; অহিংস সন্ন্যাসী যেমন আছেন, হিংস্র নাগা সন্ন্যাসীও নেই তা নয়—ইত্যাদি।

সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিচারপতি রানাডে অভিযোগ করতে পেরেছেন, কারণ ঈশ্বরের অভিপ্রায় তিনি জেনে ফেলেছিলেন। রানাডের সেই দিব্যজ্ঞান-বাণী হল—ঈশ্বর মানুষকে নানাবিধ বৃত্তি দিয়েছেন, যাদের ব্যবহার না করলে বিশেষ অধর্ম

করা হয়। বংশবৃদ্ধি হয় যে-বৃত্তিতে, সেটির প্রয়োজনীয় চর্চা না করে সন্ন্যাসীরা তাই অধার্মিক। বিচারপতি রানাডের মতে, সন্ন্যাসীরা অবিবাহিত থাকায় 'বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতাসহ জীবনের সর্বাঙ্গীণ উপলব্ধিতে অসমর্থ।'

কথাটা রানাডের নিজস্ব নয়। সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে 'মান্ধাতার আমলের পচা মড়ার মতো ঐ আপত্তিটা ইউরোপে প্রোটেস্টান্টরা প্রথম ব্যবহার করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে বাঙালী সংস্কারকরা সেটি ধার নিয়েছেন, তারপর সেটিকে আঁকড়ে ধরেছেন ( রানাডে প্রমুখ ) বোম্বাই-নিবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ।'

বিচারপতি রানাডের শিভাল্‌রির বিশেষ প্রশংসা করেছেন স্বামীজী, কারণ বিচারপতির আক্রমণের লক্ষ্য কেবল পুরুষেরা, নারীরা নয়। বৈদিক অবিবাহিতা ব্রহ্মবাদিনীরা যদিচ রানাডে-আকাঙ্ক্ষিত 'জীবনের সর্বাঙ্গীণ উপলব্ধিতে অসমর্থ' এবং 'বংশবৃদ্ধিতে অনিচ্ছুক ছিলেন', তবু বিচারপতির সুবিচারপূর্ণ শৌর্য সন্ন্যাসিনীবৃন্দের প্রশংসা-বই নিন্দা করতে পারেনি। রানাডের সমাজসংস্কারের বাহু মাত্র পুরুষ-সন্ন্যাসীদের কণ্ঠধারণের জন্যই উদ্যত।

রানাডে বিবাহিত আর্য-ঋষিদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। 'সকল বিষয়ে চৌকস, সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, সোমরসপায়ী গৃহস্থ ঋষিগণে'র প্রতি অবশ্য শ্রীযুক্ত রানাডের অনুরূপ সম্ভ্রম স্বামীজীর ছিল না। উক্ত গৃহস্থ-ঋষিগণ, 'কতকগুলি অর্থহীন কিম্ভূতকিমাকার ভয়ানক অনুষ্ঠান' নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তাঁদের 'নীতিজ্ঞানও ঘোলাটে রকমের' ছিল, পুরোমাত্রায় নানাবিধ অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টায় তাঁরা 'অঢেল সোমপানের এবং যখন যেখানে সম্ভব পুত্রোৎপাদনের উদারতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন'—তাঁরা—না, 'অবিবাহিত ব্রহ্মচর্যপরায়ণ সন্ন্যাসী-ঋষিগণ, যাঁরা উচ্চ ধর্মনীতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রস্রবণ খুলে দিয়ে গিয়েছেন', তাঁরা অনুসরণীয়?—স্বামীজী প্রশ্ন করেছেন।

একেবারে একালের কথায় নেমে এসে স্বামীজী নিষ্ঠুরভাবে আত্মপ্রচার-পারদর্শী সমাজ-সংস্কারকগণের সঙ্গে সন্ন্যাসীদের নীরব নিঃস্বার্থ কাজের তুলনা করেছেন। যে-ইউরোপের আনুগত্য করেই রানাডে-প্রমুখের সন্ন্যাসী-বিদ্বেষ, সেই ইউরোপে অধিকাংশ বালক-বালিকার শিক্ষা সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরাই দিয়ে থাকেন, 'যাঁরা [ কিন্তু ] জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতার রসাস্বাদে অনিচ্ছুক।'

সন্ন্যাসীর পতন হয়, স্বামীজী স্বীকার করেছেন, কিন্তু সেইসঙ্গে উগ্রভাবে জানিয়েছেন—'যে কখনো উন্নত জীবনলাভের চেষ্টাই করেনি সেই কাপুরুষের তুলনায় ভ্রষ্ট সন্ন্যাসী তো বীর।' স্বামীজী ভ্রষ্ট গৃহস্থদের সংখ্যার হিসাব নিতেও বলেছেন।

জীবনের বৃত্তিসমূহের উপভোগের ব্যাপারে তথাকথিত ঐশ্বরিক নির্দেশ সম্বন্ধে স্বামীজীর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের উল্লেখ করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করা যায়:

"ঈশ্বর আমাদের প্রতিটি বৃত্তি দিয়েছেন কোনো না কোনো ব্যবহারের জন্য। সুতরাং সন্ন্যাসী যখন বংশবৃদ্ধি করছেন না তখন তিনি অন্যায় কাজ করছেন, তিনি পাপী। বেশ, কিন্তু ঈশ্বর তো কাম, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, প্রবঞ্চনা, চুরি-ডাকাতি-লুটপাটের বৃত্তিও আমাদের দিয়েছেন—তাদের প্রত্যেকটিই সংস্কৃত বা অসংস্কৃত সামাজিক জীবনরক্ষার পক্ষে প্রয়োজন—তাদের বিষয়ে কী বক্তব্য?—ওগুলোকেও কি জীবনের সব অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ের থিয়োরী অনুযায়ী পুরোদমে চালিয়ে যেতে হবে? সমাজসংস্কারক-দলের সঙ্গে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের যে-রকম বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, প্রভুর ইচ্ছা কী যখন তাঁরা ভালই জানেন, তখন নিশ্চয়ই ধরে নিতে পারি—উত্তরটা হাঁ-ই হবে।"

স্বামীজী 'সংস্কারক' নন—সংগঠক। কিংবা বলা যায়—তাঁর ভাষাতেই—তিনি আমূল সংস্কারে বিশ্বাস করতেন—বিশ্বাস করতেন যে, অসংস্কৃতদের থেকে সংস্কারকরা—যাঁরা অধিকাংশই উচ্চবিত্ত, জনগণের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, পরানুকরণকারী এবং খণ্ড স্বার্থের উপাসক—তাঁরা কম সংস্কারযোগ্য নন। পাঠক নিশ্চিন্ত হোন, এখানে আমি স্বামী বিবেকানন্দের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনায় বসিনি। কেবল একটি বিষয়ে সতর্ক করে দিতে পারি, উপরের লেখা থেকে যদি কেউ মনে করেন, স্বামীজী আমাদের সামাজিক অপরাধ সম্বন্ধে সহিষ্ণু ছিলেন, তিনি একেবারেই বিবেকানন্দকে চেনেননি। এক্ষেত্রে সংস্কারকদের থেকে কঠোরতর তাঁর মন। ভারতীয় সমাজের কূপমণ্ডূকতার তিনি নির্মম সমালোচক এবং ছুৎমার্গের বিরুদ্ধে কঠিনতম উক্তিগুলি তাঁরই। আমি এখানে কেবল ব্যঙ্গরসায়িত উক্তিগুলিই কিছু-কিছু উদ্ধার করব।

যেমন ধরা যাক, 'আর্যামি'র রূপ।—"আর্যবাবাগণের জাঁকই করো, আর প্রাচীন ভারতের গৌরবঘোষণা দিনরাতই করো, আর যতই কেন তোমরা 'ডম্‌ম্ম্‌' বলে ডম্ফই করো—তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছো? তোমরা হচ্ছ দশহাজার বছরের মমি!! যাদের 'চলমান শ্মশান' বলে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা-কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে।"

অথচ স্বামীজীর কালে চতুর্দিকে উচ্চবর্ণ নামক 'রক্তমাংসহীন কঙ্কালকুলে'র প্রেত-নৃত্যের বিপুল প্রদর্শনী। সে বিষয়ে স্বামীজীর আরও দু-এক লাইন কথা—

"আমাদের মতো দুনিয়ায় কেউ নেই, 'আর্যবংশ'!!! কোথায় বংশ তা জানি না। এক লাখ লোকের দাবানিতে ৩০০ মিলিয়ন কুকুরের মত ঘোরে—তারা আর্যবংশ!!!"

বামুনাইয়ের দু-একটি উপাদেয় স্কেচ স্বামীজীর চিঠিপত্রে পাওয়া যায়—

"বিমলা—কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের জামাতা—এক সুদীর্ঘ পত্রে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার হিন্দুধর্মে এখন যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি। আমাকে প্রতিষ্ঠা হইতে সাবধান হইবার জন্য অনেক সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন। এবং তাঁহার গুরু শশীবাবুর সাংসারিক দারিদ্র্যের কথা লিখিয়াছেন। শিব! শিব! যাঁহার বডমানুষ শ্বশুর তিনি কিছুই পারেন না, আর আমার তিনকালে শ্বশুর মোটেই নাই!! শশীবাবুর প্রণীত এক পুস্তক পাঠাইয়াছেন। উক্ত পুস্তকে সূক্ষ্মতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বিমলার ইচ্ছা যে, এতদ্দেশ হইতে উক্ত পুস্তক ছাপাইবার সাহায্য হয়। তাহার তো কোনো উপায় দেখি না, কারণ ইহারা বাংলা ভাষা তো মোটেই জানে না। তাহার উপর হিন্দুধর্মের সহায়তা কৃশ্চানরা কেন করিবে? বিমলা এক্ষণে সহজ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন—পৃথিবীর মধ্যে হিন্দু শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণমধ্যে শশী ও বিমলা—এই দুইজন ছাড়া পৃথিবীতে আর কাহারও ধর্ম হইতে পারেই না, কারণ তাহাদের 'ঊর্ধ্বস্রোতস্বিনীবৃত্তি' নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পডিয়াছে, এবং উক্ত দুইজনের কেবল উচ্চদিকে...। এই প্রকারে বিমলা এক্ষণে সনাতন ধর্মের যাহা আসল সার, তাহা খিঁচিয়া লইয়াছেন।

"ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান! ভালা মোর বাপ!! হে ভগবান্! এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভূতেও নাই—এখন ভাতের হাঁড়িতে। ...পূর্বে মহতের লক্ষণ ছিল 'ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মাণঃ।' এখন হচ্ছে, আমি পবিত্র আর দুনিয়া অপবিত্র—লাও রূপেয়া, ধরো হামারা পায়েরকা নীচে।"

পুনশ্চ—একই বিষয়ে—

"পুঁথি পড়ে বিমলা অবগত হয়েছেন যে, এ-দুনিয়াতে যত লোক আছে, তারা সকলে অপবিত্র এবং তাদের প্রকৃতিতে আসলে ধর্ম হবার জো-টি নেই, কেবল ভারতবর্ষের একমুষ্টি ব্রাহ্মণ যাঁরা আছেন, তাঁদেরই ধর্ম হতে পারবে। আবার তাঁদের মধ্যে শশী (সাণ্ডেল) আর বিমলাচরণ—এঁরা হচ্ছেন চন্দ্রসূর্যস্বরূপ। সাবাস, কি ধর্মের জোর রে বাপ! বিশেষ বাংলাদেশে ঐ ধর্মটা বড়ই সহজ। অমন সোজা রাস্তা তো আর নাই। তপ জপের সার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি পবিত্র আর সব অপবিত্র। পৈশাচিক ধর্ম, রাক্ষসী ধর্ম, নারকী ধর্ম। যদি আমেরিকার লোকের ধর্ম হতে পারে না, যদি এদেশে ধর্মপ্রচার করা ঠিক নয়, তবে তাহাদের সাহায্য গ্রহণে আবশ্যক কি? এদিকে অযাচিত বৃত্তির ধুম, আবার পুঁথিময় আক্ষেপ—আমায় কেউ কিছু দেয় না। বিমলা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যখন ভারতসুদ্ধ লোক শশী (সাণ্ডেল) আর বিমলার পদপ্রান্তে ধনরাশি ঢেলে দেয় না, তখন ভারতের সর্বনাশ

উপস্থিত। কারণ শশীবাবু সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা অবগত আছেন, এবং বিমলা তৎপাঠে নিশ্চিত অবগত হয়েছেন যে, তিনি ছাড়া এ-পৃথিবীতে আর কেহই পবিত্র নাই। এ রোগের ঔষধ কি? বলি শশীবাবুকে মালাবারে যেতে বলো। সেখানকার রাজা সমস্ত প্রজার জমি ছিনিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণগণের চরণার্পণ করেছেন; গ্রামে-গ্রামে বড-বড মঠ, চর্ব্য-চুষ্য খানা, আবার নগদ।...[ দেহ- ] ভোগের সময়ে ব্রাহ্মণেতর জাতের স্পর্শে দোষ নাই—ভোগ সাঙ্গ হলেই স্নান, কেননা ব্রাহ্মণেতর জাতি অপবিত্র—অন্য সময় তাদের স্পর্শ করতেও নাই। একশ্রেণীর সাধু-সন্ন্যাসী আর ব্রাহ্মণ-বদমাশ দেশটা উৎসন্ন দিয়েছে।...পয়সা নেবে, সর্বনাশ করবে, আবার বলে 'ছুঁয়ো না!'—আর কাজ তো ভারি—'আলুতে বেগুনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয়, তাহলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে?' '১৪ বার হাতে-মাটি না করলে ১৪ পুরুষ নরকে যায় কি ২৪ পুরুষ?'—এই সকল দুরূহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছেন আজ দু'হাজার বৎসর ধরে। এদিকে ¼th of the people are starving! ৮ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে ৩০ বৎসরের পুরুষের বে দিয়ে মেয়ের মা-বাপ আহ্লাদে আটখানা।...আবার ও-কাজে মানা করলে বলেন, আমাদের ধর্ম যায়। ৮ বৎসরের মেয়ের গর্ভাধানের যাঁরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের কোন্ দেশী ধর্ম? আবার অনেকে এই প্রথার জন্য মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ দেন। মুসলমানদের দোষ বটে!! সব গৃহ্যসূত্রগুলো পড়ে দেখ দেখি—'হস্তাৎ যোনিং ন গূহতি' যতদিন, ততদিন কন্যা—এর পূর্বেই তার বে দিতে হবে। সব গৃহ্যসূত্রেরই এই আদেশ।

"বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যাপার স্মরণ করো—'তদন্তরং মহিষীং অশ্বসন্নিধৌ পাতয়েৎ' ইত্যাদি। আর হোতা পোতা ব্রহ্মা উদ্‌গাতা প্রভৃতিরা বেভোল মাতাল হয়ে কেলেঙ্কারি করত। জানকী বনে গিয়েছিলেন, রাম একা অশ্বমেধ করলেন—হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেম বাবা!

"একথা সমস্ত ব্রাহ্মণেই আছে—সমস্ত টীকাকার স্বীকার করেছেন—না করবার জো-টি কি!"

"হে হরি! যে-দেশের বড়-বড় মাথাগুলো আজ দু'হাজার বৎসর খালি বিচার করছে—ডান হাতে খাব কি বাম হাতে; ডান দিক থেকে জল নেব কি বাঁ দিক থেকে; এবং ফট্ ফট্ স্বাহা, এবং ক্রাং ক্রুং হুঁ হুঁ করে—তাদের অধোগতি হবে না তো কার হবে? 'কালঃ সুপ্তেষু জাগর্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ' ( সকলে নিদ্রিত থাকলেও কাল জাগরিত থাকেন; কালকে অতিক্রম করা দুষ্কর )—তিনি জানাচ্ছেন। তাঁর চক্ষে কে ধূলো দেয় বাবা!"

সুতরাং স্বামীজীকে গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা কখনও ক্ষমা করেননি। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য নামে আসামের এক পণ্ডিত স্বামীজীর দোষাবলীর উপরে মিশনারী-ঢঙে কেতাব

লিখে ফেলেছিলেন। তার ভূমিকায় উক্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সরলভাবে জানান—স্বামীজী আমার পূর্বপুরুষদের যত গাল দিয়েছেন, আমি তো তার সামান্যই ফিরিয়ে দিতে পারলাম। টিকির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার জন্য সুবিখ্যাত শশধর তর্কচূড়ামণির ভক্ত-শিষ্য ছিলেন এই পণ্ডিত পদ্মনাথ, যাঁকে স্বামীজী কেবল ব্রাহ্মণবিরোধী কথাবার্তা বলেই জ্বালাননি—'ভট্চায্ কোথায় গেল? ভট্চায্ কোথায় গেল?' বলে প্রকাশ্য সভায় ডাকাডাকি করে মজা করেছিলেন। অন্যের কা কথা, স্বামীজীর কথাবার্তা, আচরণে কি ডন সোসাইটিখ্যাত সতীশ মুখোপাধ্যায় কম চটেছিলেন? তিনি প্রবন্ধ লিখে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন—বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী তো ননই, হিন্দুও নন, কারণ তিনি কালাপানির পারে গেছেন এবং সেখানে বলাই বাহুল্য ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট আহার্য গ্রহণ করেছেন। সতীশ মুখোপাধ্যায়ের তখনকার মত ছিল—হিন্দু হওয়া যে-সে ব্যাপার নয়, বহু জন্মের তপস্যার ফল—ম্লেচ্ছরা সেইরকম তপস্যা করে যদি কোনো গতিকে হিন্দুজন্ম পেয়ে যায় তাহলেই উদ্ধার, নচেৎ নয়। এক্ষেত্রে ম্লেচ্ছদেশে গিয়ে হিন্দুধর্ম প্রচারের কোনো সার্থকতাই থাকতে পারে না।

এবং খুবই কৌতুকের বিষয়, ম্লেচ্ছদেশে গিয়ে বিবেকানন্দ যে, জাত খুইয়েছেন—একথা প্রচারে ক্রীশ্চান মিশনারী এবং তাঁদের ভক্ত কিছু ব্রাহ্মের উৎসাহের অবধি ছিল না।

বিবেকানন্দ-নিন্দায় বৈষ্ণবরাও পশ্চাৎপদ হতে পারেন না, কারণ আচারসর্বস্বতার মতোই ভক্তির কাঁদুনিকেও তিনি সহ্য করতে পারতেন না, এবং ধর্মের নামে বৈষ্ণব বা শাক্ত কামাচারের তিনি ঘোর শত্রু ছিলেন। কৃষ্ণের তিনি মহাভক্ত—কিন্তু 'কেষ্ট-লীলা'র যে চেহারা বৈষ্ণব-বাবাজীদের হাতে পড়ে হয়েছে—তার ঘোর শত্রু ছিলেন। তাঁর মতে, ওঁদের যত উৎসাহ বস্ত্রহরণে, গোবর্ধন-ধারণে একটুও নয়। শোনা যায়, স্বামীজী ভারতে ফেরার পরে কোনো সংবাদপত্রের সম্পাদক তাঁকে বাড়ি-বয়ে উপদেশ শুনিয়েছিলেন—'নরেন, তুমি আমেরিকায় বেদান্ত শোনালে—কিন্তু কৃষ্ণলীলা শোনালে না?' স্বামীজী সুমিষ্ট সান্ত্বনা দিয়েছিলেন—'সেখানে পার্কে-পার্কে যে কেষ্টলীলা চলছে, তাতে অধিক প্রচারের দরকার নেই।' ভারতবর্ষেও এ-বিষয়ে তিনি মুখ বন্ধ করেননি। শিলঙে এ-সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তা নিয়ে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য মহা রাগারাগি করেছেন। স্বামীজী শ্রীচৈতন্যের একান্ত ভক্ত ছিলেন, কিন্তু বোষ্টমী নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে কদাপি ছাড়তেন না।—"সে বড় কর্মী, কিন্তু সঙ্গে ৭।৮টি স্ত্রীলোক বুড়ি, জয়রাধেকৃষ্ণই অধিক—রুচি ভাল, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা!"—স্বামীজী সকৌতুকে একবার লিখেছিলেন। অন্য একবার, জগন্নাথের রথযাত্রা-দর্শনে মুক্তিপ্রসঙ্গে—

"যদি কাঠের দোলায় ঠাকুর দেখে জীবের মুক্তি হত, তাহলে বছরে-বছরে কোটি জীবের মুক্তি হয়ে যেত—আজকাল আবার রেলে যাওয়ার যে সুযোগ!"

**বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে ফলাও অভিযোগ—তিনি গো-খাদক। গোমাতার ভক্ত সন্তানদের সঙ্গে স্বামীজীর এক মোলাকাতের কিছু বিবরণ :**

গোরক্ষণীসভার জনৈক উদ্যোগী-প্রচারক স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে উপস্থিত হইলেন। পুরা না হইলেও ইঁহার বেশভূষা অনেকটা সন্ন্যাসীর মতো—মাথায় গেরুয়ারঙের পাগড়ি বাঁধা—দেখিলেই বুঝা যায় ইনি হিন্দুস্থানী।…প্রচারক স্বামীজীকে অভিবাদন করিয়া গোমাতার একখানি ছবি উপহার দিলেন।…

স্বামীজী—আপনাদের সভার উদ্দেশ্য কি ?

প্রচারক—আমরা দেশের গোমাতাগণকে কসাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করে থাকি।…

স্বামীজী—এ অতি উত্তম কথা! আপনাদের আয়ের পন্থা কি ?…

প্রচারক—মারোয়াড়ী বণিকসম্প্রদায় এ-কার্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। তাঁরা এই সৎকার্যে বহু অর্থ দিয়েছেন।

স্বামীজী—মধ্যভারতে এবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছে। ভারত গভর্নমেণ্ট ৯ লক্ষ লোকের অনশনে মৃত্যুর তালিকা প্রকাশ করেছেন। আপনাদের সভা এই দুর্ভিক্ষ-কালে কোনো সাহায্যদানের আয়োজন করেছে কি ?

প্রচারক—আমরা দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য করি না। কেবলমাত্র গোমাতৃগণের রক্ষাকল্পেই এই সভা স্থাপিত।

স্বামীজী—যে-দুর্ভিক্ষে আপনাদের জাতভাই মানুষ লক্ষ-লক্ষ মৃত্যুমুখে পতিত হল, সামর্থ্য সত্ত্বেও আপনারা এই ভীষণ দুর্দিনে তাদের অন্ন দিয়ে সাহায্য করা উচিত মনে করেন নি ?

প্রচারক—না। লোকের কর্মফলে, পাপে, এই দুর্ভিক্ষে হয়েছিল। যেমন কর্ম তেমনি ফল হয়েছে।

প্রচারকের কথা শুনিয়া স্বামীজীর বিশাল নয়নপ্রান্তে যেন অগ্নিকণা স্ফুরিত হইতে লাগিল, মুখ আরক্তিম হইল। কিন্তু মনের ভাব চাপিয়া বলিলেন—যে সভাসমিতি মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে না, নিজের ভাই অনশনে মরছে দেখেও তার প্রাণরক্ষার জন্য একমুষ্টি অন্ন না দিয়ে পশুপক্ষী রক্ষার জন্য রাশিরাশি অন্ন বিতরণ করে, তার প্রতি আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই।…কর্মফলে মানুষ মরছে—এইরূপে কর্মের দোহাই দিলে জগতের কোনো বিষয়ের জন্য চেষ্টাচরিত্র করাটাই একেবারে বিফল বলে সাব্যস্ত হয়! আপনাদের পশুরক্ষা কাজটাও বাদ যায় না। ঐ কাজ সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে—গোমাতারা আপন-আপন কর্মফলেই কসাইদের হাতে যাচ্ছেন ও মরছেন, আমাদের ওতে কিছু করবার প্রয়োজন নেই।

প্রচারক একটু অপ্রস্তিভ হইয়া বলিলেন—হাঁ, আপনি যা বলছেন তা সত্য। কিন্তু শাস্ত্র বলে—গরু আমাদের মাতা।

স্বামীজী হাসিতে-হাসিতে বলিলেন—হাঁ, গরু আমাদের যে মা, তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছি—তা না-হলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন?

পাশ্চাত্ত্যদেশে বক্তৃতাকালে এহেন পশুপ্রেমিকদের বিষয়ে স্বামীজী বলেছিলেন:

"আমাদের দেশে নিরামিষভোজী নানা সম্প্রদায় আছে। তাদের কেউ-কেউ সকালে পিঁপড়ের জন্য সেরের পর সের চিনি মাটিতে ছড়িয়ে দেয়। এমন শোনা যায়, একবার যখন এই সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি পিঁপড়েদের চিনি দিচ্ছিল, তখন অন্য একজন এসে বে-খেয়ালে পিঁপড়েদের মাড়িয়ে ফেলে। তাতে পিপীলিকা-সেবক ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে চীৎকার করে উঠল—'হতভাগা, তুই প্রাণিহত্যা করলি?' এই বলে অপরাধী ব্যক্তিকে এমন এক প্রচণ্ড ঘুষি লাগাল যে, সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পেল।"

স্বামীজী আরও বেশি সময় নিয়ে সাহিত্যসাধনা কেন করেননি, এ দুঃখ ইদানীং অনেকে বোধ করছেন। তাঁদের দুঃখ বেড়ে যাবে, যদি তাঁরা 'ভাববার কথা' গ্রন্থভুক্ত কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার নক্‌শা এখনও না পড়ে থাকেন, এবং অতঃপর পড়ে ফেলেন! নক্‌শাগুলি চমৎকার—এবং নক্‌শার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যে-দোষ ঘটে থাকে—তার থেকে মুক্ত। বাংলাদেশে নক্‌শা-জাতীয় লেখা আগে অনেক হয়েছে, এবং সেগুলি সমকালীন মানুষকে প্রচুর আমোদ দিয়েছে, কিন্তু তাদের বিষয়ে ও ভঙ্গিতে সাময়িকতা এত বেশি ছিল যে, অধিকাংশের রসগ্রহণ করা বর্তমানে সম্ভব নয়। নক্‌শার বিষয় সাধারণতঃ 'সাময়িকই' হয়ে থাকে—স্বামীজীর নক্‌শার বিষয়ও তাই—কিন্তু রস-সাহিত্যের সাধারণ গুণ তার মধ্যে তিনি সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন বলে সেগুলি এখনও বহুলাংশে উপভোগ্য। এই নক্‌শাগুলির একটিতে অন্ততঃ স্বামীজী ভাষা নিয়ে যে-পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, তা মুজতবা আলীর মতো রসিক পণ্ডিত লেখককে বিশেষ মুগ্ধ করেছিল। ফার্সী-মেশানো বাংলায় লেখা সেই নক্‌শাটি কেবল বিষয়ের জন্য নয়, রচনারীতির জন্যও বাংলাসাহিত্যে গণ্য সৃষ্টি।

নক্‌শাগুলির বিষয়বস্তু আমাদের দেশের ধর্মীয় এবং সামাজিক অসঙ্গতি ও অত্যাচার—সেই সঙ্গে আচারসর্বস্বতা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি ইত্যাদি। সংখ্যায় এরা মাত্র সাতটি, তার মধ্যে দু'টি আবার কেবল কয়েক লাইনের। আকারে ছোট এবং সংখ্যায় অল্প হলে কি হবে, এদের শক্তি প্রচণ্ড—আগুনে বোমার মতো ধর্ম ও সমাজের অন্ধকার দিকগুলির উপর পড়ে জ্বালিয়েছে, পুড়িয়েছে।

শুরু করা যেতে পারে লখনউ-গল্পটি দিয়ে, যার মধ্যে স্বামীজী ভাষার পরীক্ষাকাজ চালিয়েছেন। সবটাই উদ্ধৃত করছি:

"লখনৌ শহরে মহরমের ভারী ধূম। বড় মসজেদ ইমামবারায় জাঁকজমক রোশনির বাহার দেখে কে। বে-সুমার লোকের সমাগম। হিন্দু, মুসলমান, কেরাণী, য়াহুদী, ছত্রিশ বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা, ছত্রিশ বর্ণের হাজার জাতের লোকের ভিড় আজ মহরম দেখতে। লখনৌ সিয়াদের রাজধানী, আজ হজরত ইমাম হাসেন হোসেনের নামে আর্তনাদ গগন স্পর্শ করছে—সে ছাতিফাটানো মর্সিয়ার কাতরানি কার হৃদয় ভেদ না করে। হাজার বৎসরের প্রাচীন কারবলার কথা আজ ফের জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এ দর্শকবৃন্দের ভিড়ের মধ্যে দূর গ্রাম হতে দুই ভদ্র রাজপুত তামাশা দেখতে হাজির। ঠাকুর-সাহেবদের—যেমন পাড়াগেঁয়ে জমিদারের হয়ে থাকে—'বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ।' সে মোসলমানি সভ্যতা, কাফ্-গাফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ-সমেত লস্করী জবানের পুষ্পবৃষ্টি, আবা-কাবা চুস্ত-পায়জামা তাজ-মোড়াসার রঙ্গ-বেরঙ্গ সহরপসন্দ ঢঙ—অতদূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর-সাহেবদের স্পর্শ করতে আজও পারেনি। কাজেই ঠাকুররা সরল-সিধে, সর্বদা শিকার করে জমামরদ কড়াজান্ আর বেজায় মজবুত দিল্।

"ঠাকুরদ্বয় তো ফটক পার হয়ে মসজেদ-মধ্যে প্রবেশোদ্যত, এমন সময়ে সিপাহী নিষেধ করলে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে যে, এই যে দ্বারপার্শ্বে মুরদ খাড়া দেখছ, ওকে আগে পাঁচ জুতো মারো, তবে ভিতরে যেতে পাবে। মূর্তিটি কার? জবাব এল—ও মহাপাপী ইয়েজিদের মূর্তি। ও হাজার বৎসর আগে হজরত হাসেন হোসেনকে মেরে ফেলে, তাই আজ এ রোদন, শোক-প্রকাশ। প্রহরী ভাবলে, এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজিদমূর্তি পাঁচ জুতার জায়গায় দশ তো নিশ্চিত খাবে। কিন্তু কর্মের বিচিত্র গতি, উল্টা সমঝ্‌লি রাম!—ঠাকুরদ্বয় গললগ্নীকৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজিদ-মূর্তির পদতলে কুমড়ো-গড়াগড়ি আর গদ্‌গদস্বরে স্তুতি—'ভেতরে ঢুকে আর কাজ কি, অন্য ঠাকুর আর কি দেখব? ভল্ বাবা অজিদ্, দেবতা তুঁহি স্থায়, অস্ মারো শারোকো কি অভি তক্ রোবত!' (ধন্য বাবা ইয়েজিদ্, এমনি মেরেচো শালাদের—কি আজও কাঁদছে!!)।"

ধর্মক্ষেত্রে এই ইয়েজিদ্‌রাই প্রণাম পায়; যেমন পায় গুডগুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্যরা (নাম বটে, উচ্চারণেও ঘৃণা)। কৃষ্ণব্যালের শরীর অস্থিচর্মসার, কারণ বছরে দেড়কুড়ি আণ্ডা-বাচ্ছা পয়দা করেন, কিন্তু তিনি মহাপণ্ডিত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর তাঁর নখদর্পণে, 'টিকি হতে আরম্ভ করে নবদ্বার পর্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বক-শক্তির গতাগতি বিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ', 'দুর্গাপূজার বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকা হতে মায় কাদা, পুনর্বিবাহ (দ্বিরাগমন), দশ বৎসরের কুমারীর গর্ভাধান পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে তিনি অদ্বিতীয়।' দেশে কিছু লেখাপড়ার চর্চা হলে লোকগুলো

চমচমে হয়ে উঠে জিনিসপত্র বুঝতে চেয়েছিল—কৃষ্ণব্যাল এগিয়ে এসে সব-কিছুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে—'তোমরা যেমন ছিলে তেমনি থাকো, নাকে সরষের তেল দিয়ে খুব ঘুমোও। কেবল আমার বিদায়ের কথাটা ভুলো না।' ফলে "লোকেরা বললে বাঁচলুম। কি বিপদই এসেছিল বাপু। উঠে বসতে হবে, চলতে ফিরতে হবে, কি আপদ !! বেঁচে থাক্ কৃষ্ণব্যাল, বলে আবার পাশ ফিরে শুলো! হাজার বছরের অভ্যাস কি ছোটে? শরীর করতে দেবে কেন? হাজার বৎসরের মনের গাঁট কি কাটে। তাই না কৃষ্ণব্যালদের আদর!"

কৃষ্ণব্যালের মতো ইয়েজ্বিদ্ হিন্দুধর্মে আরো অনেক আছে। আর আছে প্রভুর মন ভেজাবার সর্টকাট পন্থা আবিষ্কর্তার দল। যেমন আছেন ভক্তিপন্থী গায়কপ্রবর—'কর্মবাড়ির কড়ামাজার' মতো মধুর সুরে মন্দিরে যিনি গান করেন, যা স্বয়ং চোবেজীর দু' লোটা ভাঙের ঝিমুনিও চটিয়ে দেয়। 'নারদ, ভরত, হনুমান, নায়ক প্রভৃতি কলাবতগুষ্টির' সেই সপিণ্ডীকরণ-সঙ্গীতের বিরুদ্ধে আপত্তি জানালে গায়ক বলেন—'সুর-তানের আমার আবশ্যক কি হে! আমি ঠাকুরজীর মন ভিজুচ্চি।' আছেন রামচরণ—যিনি লেখাপড়া শেখেননি, ব্যবসা-বাণিজ্য করেন না, এবং নেশা-ভাঙ বা দুষ্টুমিগুলো ছাড়তে রাজি নন—জীবিকা কী প্রশ্ন করলে যিনি ত্বরিত উত্তর দেন—'আমি সকলকে উপদেশ করি।' কিংবা অনুরূপ চরিত্রের ভোলাচাঁদ, যাঁর ধারনা, বজ্জাতিগুলো বজায় রেখেও যদি তিনি বিটকেল আওয়াজ করে বলতে পারেন—'প্রভু আমি তোমার শরণাগত',—তাহলে প্রভু ধরা দেবেনই দেবেন।

কিংবা 'বেজায় বেদান্তী' ভোলাপুরী।—

"ভোলাপুরীর চারিদিকে যদি লোকগুলো অন্নাভাবে হাহাকার করে—তাঁকে স্পর্শও করে না। তিনি সুখ দুঃখের অসারতা বুঝিয়ে দেন। যদি রোগে শোকে অনাহারে লোকগুলো মরে ঢিপি হয়ে যায়, তাতেই তা তাঁর কি? তিনি অমনি আত্মার অবিনশ্বরত্ব চিন্তা করেন। তাঁর সামনে বলবান দুর্বলকে যদি মেরেও ফেলে; ভোলাপুরী 'আত্মা মরেনও না, মারেনও না'—এই শ্রুতিবাক্যের গভীর অর্থসাগরে ডুবে যান। কোনোপ্রকার কর্ম করতে ভোলাপুরী বড়ই নারাজ। পেড়াপীড়ি করলে জবাব দেন যে, পূর্বজন্মে ওসব সেরে এসেছেন। এক জায়গায় ঘা পড়লে কিন্তু ভোলাপুরীর আত্মৈক্যানুভূতির ঘোর ব্যাঘাত হয়—যখন তাঁর ভিক্ষার পরিপাটিতে কিঞ্চিৎ গোল হয়, বা গৃহস্থ তাঁর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী পূজা দিতে নারাজ হন—তখন, পুরীজীর মতে, গৃহস্থের মতো ঘৃণ্য জীব জগতে আর কেহই থাকে না, এবং যে

গ্রাম তাঁহার সমুচিত পূজা দিলে না, সে গ্রাম যে কেন মুহূর্তমাত্রও ধরণীর ভারবৃদ্ধি করে, এই ভাবিয়া আকুল হন।”

আর, সনাতন হিন্দুধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতার ছবি এঁকেছেন স্বামীজী—অনবদ্য সে রচনা, ইয়েজিদ-নক্‌শার পাশাপাশি তাকে দেখা যাক—

“সনাতন হিন্দুধর্মের গগনস্পর্শী মন্দির—সে মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত। আর সেথা নাই বা কি! বেদান্তীর নির্গুণ ব্রহ্ম হতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূয্যিমামা, ইঁদুর-চড়া গণেশ, আর কুচো দেবতা ষষ্ঠী, মাকাল প্রভৃতি—নাই কি! আর বেদ-বেদান্ত দর্শন পুরাণ তন্ত্রে তো ঢের মাল আছে, যার এক-একটি কথায় ভববন্ধন টুটে যায়! আর লোকেরই বা ভিড় কি, তেত্রিশ কোটি লোক সে দিকে দৌড়চ্ছে। আমারও কৌতূহল হল, আমিও ছুটলুম। কিন্তু গিয়ে দেখি, এ কি কাণ্ড! মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না, দোরের পাশে একটা পঞ্চাশ-মুণ্ডু, একশো-হাত, দু'শো-পেট, পাঁচশো-ঠ্যাঙওয়ালা মূর্তি খাড়া। সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম যে, ওই ভেতরে যে-সকল ঠাকুরদেবতা, ওদের দূর থেকে একটা গড় (প্রণাম) বা দুটি ফুল ছুঁড়ে ফেললেই যথেষ্টই পূজা হয়। আসল পূজা কিন্তু এঁর করা চাই—যিনি দ্বারদেশে! আর ঐ যে বেদ-বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, শাস্ত্রসকল দেখছ, ও মধ্যে-মধ্যে শুনলে হানি নাই, কিন্তু পালতে হবে এঁর হুকুম। তখন আবার জিজ্ঞাসা করলুম—তবে এ দেবদেবের নাম কি? উত্তর এল—এঁর নাম লোকাচার।”

স্বামী বিবেকানন্দকে যাঁরা অল্প জেনে অনেকটা জেনে ফেলেছেন মনে করেন, তাঁদের পক্ষে আহার এবং ঔষধ এই নক্‌শাগুলি।

# ছুরির অপর মুখ

এতক্ষণ যে-আলোচনা চলল, তার থেকে মনে হতে পারে, পৃথিবীতে হিন্দুরাই যত চোরদায়ে ধরা পড়েছে, বাকি সকলেই ধোয়া তুলসীপাতা। হিন্দুদের মধ্যে আবার বিশেষ পাপী মূর্তি-পূজকেরা, অর্থাৎ ইঁট-কাঠ-পাথর-পূজকের দল। স্বামীজী মধুর ঔদ্ধত্যের সঙ্গে প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—'যদি আমি সেই মূর্তি-পূজক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদতলে না বসতাম, তাহলে কোথায় যেতাম!'

এবং স্বামীজী হিন্দুদের চিকিৎসাভিলাষীদের (যে-চিকিৎসকেরা আবার অনেকে যমদূত) চেহারাও কিছু-কিছু খুলে ধরে বলেছেন—'হে বৈদ্য! আগে নিজের চিকিৎসার ব্যবস্থা করো!'

মূর্তিপূজার ব্যাপারটাই ধরা যাক। ঈশ্বর সম্বন্ধে লম্বা-লম্বা বহু শ্লোক লেখা হয়েছে, যার দ্বারা জানা গেছে যে, তিনি আকাশের জল থেকে বাগানের ফল সবই সৃষ্টি করেছেন—তিনি সর্বশক্তিমান বিভু—তাঁকে ইঁটে কাঠে পাথরে ঢোকানো—আরে ছি!

যেমন, শিক্ষিত-আধুনিক আলোয়ারের মহারাজা স্বামীজীকে প্রভূত 'ছি' শুনিয়েছিলেন। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর সঙ্গে মডার্ন মহারাজের সাক্ষাৎকারের ঘটনাটিতে নাটকীয় উপাদান যথেষ্ট। সূচনার সংলাপ এইপ্রকার:

মহারাজা। আপনি কাজকর্ম না করে ভিক্ষা করে বেড়ান কেন?

স্বামীজী। আপনি কাজকর্ম না করে সাহেবদের সঙ্গে শিকার করে বেড়ান কেন?

মহারাজা হতভম্ব। কিন্তু উত্তর একটা দিতে হয়।

মহারাজা। আমার ভাল লাগে।

স্বামীজী। আমারও ভাল লাগে।

অনেক কষ্টে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে মহারাজা নতুন আক্রমণের চেষ্টা করলেন।

মহারাজা। লোকে দেখি মূর্তিপূজা করে। আমার কিন্তু তাতে বিশ্বাস নেই, ইঁট কাঠ পাথরকে পূজো করতে পারি না—হায়, আমার কি হবে?

এবার স্বামীজী চুপ। কোনো উত্তর দিলেন না। অন্য কথা পাড়লেন। খানিক পরে দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবি দেখিয়ে দেওয়ানকে বললেন, 'ওটা কার ছবি?' দেওয়ান বললেন, 'মহারাজার।' স্বামীজী বললেন, 'ওটা নামিয়ে আনুন।' দেওয়ান কথামতো কাজ করলেন। ছবিটি হাতে নিয়ে স্বামীজী বললেন, 'দেওয়ানজী! এর উপরে থুতু ফেলুন!' কথা শুনে তাবৎ সকলে হতভম্ব। স্বামীজী আবার অনুরোধ

করলেন। যত অনুরোধ করেন, সবাই শিউরে-শিউরে ওঠে—সর্বনাশ। পাগল লোকটা বলছে কি। রাম কহো। মহারাজার ছবিতে থুতু।

এবার স্বামীজী বিমল হাস্য করলেন। পরে যা বললেন, তাতে সকলের প্রাণে স্বস্তিসঞ্চার হল।

স্বামীজী। আপনারা ও-কাজ করতে পারবেন না জানি, পারা সম্ভবও নয়, কারণ ওর মধ্যে মহারাজা সশরীরে না থাকলেও তাঁর ছায়া আছে, ওটা কাঠ-কাঁচ-কাগজের হলেও মহারাজের প্রতীক, সুতরাং ওতে থুতু ফেলা মানে মহারাজের গায়ে থুতু ফেলা। তেমনি—

মহারাজের দিকে ফিরে, বিমলতর হাস্য ক'রে, তিনি যোগ করলেন—

'মহারাজ। হিন্দু যখন মূর্তিপূজা করে, তখন সে বলে না, হে পাথর। তোমাকে আমি পূজা করছি ; হে ধাতু। আমার উপর সদয় হও—!'

স্বামীজীর বক্তব্য—তাহলেও মূর্তিপূজা ছি! অবশ্যই ছি! কিন্তু মূর্তিপূজার সমালোচকেরা যখন পায়রা-ঈশ্বরে, কিম্বা বাক্স-ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন? স্বামীজী বললেন—

"মূর্তিপূজা যদি করতেই হয়, তাহলে আমি জন্তু, বা বাড়ি-আকারের মূর্তির চেয়ে মানবাকার মূর্তির পূজা করব।...খ্রীস্টানরা ভাবে, ঈশ্বর ঘুঘুর রূপ ধরে এসে-ছিলেন, তাতে কোনই দোষ নেই, কিন্তু হিন্দুদের মৎস্যাবতার অত্যন্ত জঘন্য কুসংস্কার। ইহুদীরা ভাবে, যদি একটা সিন্দুকের আকারে কোনো প্রতীক তৈরী করে তার উপরে দুই দেবদূতকে বসিয়ে দেওয়া যায়, সেটা বহুত আচ্ছা, কিন্তু নর-নারীর মূর্তিতে যদি ঈশ্বরকে দেখা হয়—কি বিশ্রী। মুসলমানেরা মনে করে, প্রার্থনার সময়ে যদি তারা কাবার কালো পাথরযুক্ত মসজিদের কল্পনা ক'রে নেয় এবং পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, তাহলে সেটা বেশক্ বেশক্, কিন্তু যদি গির্জার আকারে কোনো প্রতীক কেউ ভাবে, সেটা হবে পৌত্তলিকতা।"

মানবস্বভাবের বিচিত্র রূপ স্বামীজীকে সর্বদা হাসিয়েছে! ঈশ্বর ঘুঘুর রূপ ধারণ করে—এটা খ্রীস্টানের কাছে ইতিহাস নয় পুরাণ, কিন্তু তিনি গরুর রূপ ধারণ করেন—সেটা ইতিহাস তো নয়ই, পুরাণ বললেও তাকে মর্যাদা দেওয়া হয়—ওটা নিছক কুসংস্কার। এমনি চলেছে হাজার-হাজার বছর। এক ধর্মের লোক খাড়া দাঁড়িয়ে উঠে বলে, আমার প্রফেট এইসব অলৌকিক কাণ্ড করেছেন, এটা সত্য ইতিহাস—কিন্তু তুমি যে বলছ তোমার প্রফেট ঐসব ব্যাপার করেছেন—ওটা স্রেফ গাঁজাখুরি।

অহিন্দুমহলে অতি ধিকৃত শিবলিঙ্গের কথাও স্বামীজী ভুলেছেন। শিবলিঙ্গকে

যৌনাঙ্গের প্রতীক বলা হয় ; কিন্তু তা যদি সত্য হয়ও, কথাটা ভারতের মানুষ এখন একেবারে ভুলে গেছে—এখন তা বিশ্বস্রষ্টার রূপ। যারা শিবলিঙ্গের উপাসনা করে, তাদের মনে যৌনাঙ্গের চিন্তা ওঠে না, কিন্তু অন্য ধর্ম বা জাতির লোকের মনে ঐ পবিত্র চিন্তা অবিলম্বে না উঠে পারে না। উল্টোদিকে শিবলিঙ্গপূজক হিন্দুজাতি অন্য ধর্মের উপাসনাবস্তুর মধ্যেও নানা বীভৎস বস্তু আবিষ্কার করে ফেলে অগোণে। যেমন, হিন্দুর কাছে খ্রীস্টানদের স্যাক্রামেন্টের থেকে বিকট জিনিস আর কিছু নেই। কোনো মানুষের সদ্‌গুণ পাবার জন্য তাকে মেরে তার রক্তমাংস খাওয়া, স্যাক্রামেন্ট যার প্রতীক-অনুষ্ঠান, নরমাংসভোজীদের রীতি। বুনো নরমাংসভোজীরা অনেক সময় কোনো বীর যোদ্ধাকে মেরে তার হৃৎপিণ্ড ভোজন করত তার বীরত্বগুণ পাবার জন্য। স্যার জন লুবকের মতো একনিষ্ঠ খ্রীস্টানও স্বীকার করেন, খ্রীস্টীয় স্যাক্রামেন্ট অসভ্যদের ঐ আচরণ থেকেই উৎপন্ন। কিন্তু ভক্ত খ্রীস্টান ওসব কথার ধারে-কাছে নেই। তারা ব্যাপারটাকে পরম পবিত্র বলেই জানে।

মজা এইখানেই। আমরা অপরের বিষয়ে যে-কোনো মন্দ কথা বিশ্বাস করতে রাজি, এবং আমার সম্বন্ধে তার যে-কোনো সমালোচনাই মিথ্যা! 'মূর্তিপূজা মন্দ—কেন? না, যেহেতু কয়েকশো বছর আগে ইহুদী-রক্তের কোনো ব্যক্তি তাকে মন্দ বলেছেন! তার মানে তিনি নিজের প্রতীকটি ছাড়া অন্য সব প্রতীককে নিন্দাবস্তু মনে করেছিলেন!!' স্বামীজী দাবড়ে বলেছিলেন,—'হাজার-হাজার মূর্তির পূজা করো ক্ষতি নেই, যদি তার দ্বারা একজন রামকৃষ্ণ পরমহংস তৈরী করতে পারো।'

স্বামীজী কৌতুকে সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন যখন তিনি মূর্তির সামনে হাঁটু গাড়তে অনিচ্ছুক পাশ্চাত্ত্যদেশীয়দের এক বিচিত্র পরিস্থিতিতে হাঁটুভাঙা অবস্থায় দেখেছেন :

"পাশ্চাত্ত্যদেশীয়রা বলিয়া থাকে, মূর্তির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসা বড়ই খারাপ। কিন্তু তাহারা একটি স্ত্রীলোকের সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে 'তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার জীবনের আলোক, তুমি আমার নয়নের দীপ, তুমি আমার আত্মার আত্মা' অনায়াসে বলিতে পারে। তাহাদের যদি চার পা থাকিত, তবে চার পায়েই হাঁটু গাড়িয়া বসিত।"

আর স্বামীজী বিষাদহাস্যের সঙ্গে বলেছেন—

"অপরের একটি সুন্দর ছবি পুড়লে আমরা সচরাচর দুঃখিত হই না, অথচ নিজের সুন্দর ছবিটি পুড়লে কষ্টের শেষ থাকে না। দুটোই সুন্দর ছবি!"

**পুতুল-পূজক হীদেন ভারতবাসীর অসভ্য অবস্থার কথা জানাতে খ্রীস্টান মিশনারীরা লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করে হাজার-হাজার বই ছাপিয়ে ইউরোপ, আমেরিকায়,**

প্রধানতঃ আমেরিকায়, ছড়িয়েছিলেন। সেইসব সচিত্র পুস্তকগুলি মিশনারী-সভ্যতার অকাট্য নিদর্শন। শ্রীমতী মেরী লুই বার্কের বিবেকানন্দ-বিষয়ক মহাভারতপ্রমাণ গ্রন্থে মিশনারীদের ঐসকল মুদ্রিত ভারতপ্রেমের চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে তাঁরা গোড়ার দিকে কি ধরনের প্রচার করতেন, তার কিছু-কিছু কাহিনী এদেশের লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। মিশনারী ও মাতালের মোলাকাতের উপভোগ্য ঘটনাটি অনেকেরই জানা আছে। নিজধর্মের জয়গান করার পরে উক্ত মিশনারী পরধর্মের কিছু সদর্প কুৎসা করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন। তাঁর মোট বক্তব্য ছিল—আমি যদি তোমার ভগবানকে গালাগালি দিই, তোমার ভগবান কী করিতে পারে? এই মিশনারীর বিশেষ রাগ ছিল হিন্দুর গাছ-ভগবান তুলসীর প্রতি। তিনি উক্ত ভগবানকে নিজের অস্থানে প্রয়োগ করেও স্বধর্মপ্রীতি দেখাতে উৎসাহিত ছিলেন। এক মাতাল, উক্ত মিশনারীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তুলসীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে, মানে জলবিছুটিকে, পবিত্র গঙ্গোদকে সিক্ত করে মিশনারীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল, এবং তার যথাপ্রয়োগে অস্থানে জ্বলতে-জ্বলতে, লাফাতে-লাফাতে, মিশনারী স্বীকার করেছিলেন—হাঁ হাঁ, তোমাদের গড্ কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ করিতে পারেন।

ভারতবর্ষে যে শ্রেণীর মিশনারী আসতেন তাঁদের অধিকাংশের চেহারাই এই রকম। রেভারেণ্ড লঙরা ছিলেন ব্যতিক্রম। মিশনারীরা ভারতের দুর্গম অঞ্চলে ঢুকে গিয়ে ধর্মপ্রচারের সাহস ও শক্তি দেখিয়েছিলেন নিঃসন্দেহে, যে-শক্তি, আমরা জানি, ইংরেজের টমি-গোরারা জলে-স্থলে-পাহাড়ে-পর্বতে-মরুভূমিতে লড়াইয়ের সময়ে দেখাত। উভয়ক্ষেত্রেই জিগীষার তাগিদ।

ইউরোপীয়রা কিভাবে হীদেনদের উদ্ধার করেছে, স্বামীজীর আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে তার কিছু রূপ দেখিয়ে দেওয়া যাক:

"স্পেনীয়রা সিংহলে গেল, সেখানে এক মন্দিরে পবিত্র বুদ্ধ-দন্ত রক্ষিত।

"স্পেনীয়রা ভাবল, তাদের ভগবান তো ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াই করতে এবং খুন করতে বলেছেন, সুতরাং—তারা বুদ্ধের দাঁতটিকে নিয়ে গিয়ে ধ্বংস করে ফেলল। যাই হোক, ওটা বুদ্ধের সত্যকার দাঁত নয়, পুরোহিতরা একটা প্রতীক তৈরী করে রেখেছিল—ফুটখানেক লম্বা। (সকলের হাসি)। স্পেনীয়রা দাঁতটাকে ভাঙবার পরে কয়েক শো বৌদ্ধকে ধর্মান্তরিত করল আর কয়েক হাজারকে করল লোকান্তরিত। এখানেই স্পেনীয়দের মিশনারী-ব্রতের ইতি।

"পর্তুগীজ-খ্রীস্টানেরা বোম্বাইয়ের বিরাট মন্দির দেখল—ত্রিমুখের আকারে তা নির্মিত। পর্তুগীজরা তা দেখল কিন্তু কোনো অর্থ করতে পারল না। অতএব সিদ্ধান্ত করল—ওটা শয়তানের মূর্তি। তখন তারা সৈন্যসামন্ত জুটিয়ে মন্দিরের

তিনটি মাথাকে ভেঙে ফেলল। দেখা গেল, শয়তান খুবই নিরীহ প্রাণী! হায়, এত দ্রুত সে, ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে!!"

স্বামীজী বলেছিলেন, পরের যুগের মিশনারীদের সুবিধা অনেক বেশি। সুসভ্য খ্রীস্টানদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে। মিশনারীরা নিরন্ন পিতামাতার কাছ থেকে নগদ পাঁচ শিলিং খরচ করে একটা-একটা হাতে-গরম হবু খ্রীস্টান কিনে ফেলেন।

মিশনারী প্রচার-পুস্তিকার একটি প্রিয় বিষয়—ভারতে নবজাত শিশুদের নদীতে ফেলে দেওয়া। আমেরিকায় স্বামীজীকে অগণ্যবার এ-বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ফিরিয়ে দিয়েছেন। যেমন—

প্রশ্ন—'একথা কি সত্য, আপনারা সদ্যোজাত শিশুকে গঙ্গায় ফেলে দেন?'

স্বামীজী—'মহাশয়া, আমি শুনেছি, থ্যাঙ্কস্‌-গিভিং-এ আপনারা নবজাত শিশু পরিবেশন করেন—সেকথা কি সত্য?'

প্রশ্ন—'একথা কি সত্য, আপনারা সদ্যোজাত শিশুকে গঙ্গায় ফেলে দেন?'

স্বামীজী—'হ্যাঁ মহাশয়। তবে আমি বেঁচে ফিরেছি।'

আতঙ্কিত মহিলার প্রশ্ন—'কি ভয়ঙ্কর। আপনাদের দেশে নাকি মেয়ে জন্মালেই তাকে কুমীরের মুখে ফেলে দেওয়া হয়!'

স্বামীজী (সৌজন্যে লুটিয়ে পড়ে)—নিশ্চয়, নিশ্চয়। সেই জন্যই তো এখন ভারতে প্রসবাদি-কর্ম পুরুষদেরই করতে হচ্ছে।'

প্রশ্ন যত উদ্ভট, স্বামীজীর বিদ্রূপ তত প্রখর। এই ধরনের এক প্রশ্নকারীকে স্বামীজী একবার এমন নাস্তানাবুদ ও হাস্যাস্পদ করে তুললেন যে, সে বেচারা লজ্জায় চেয়ারের পিছনে গিয়ে লুকোল। স্বামীজী সুস্নিগ্ধ সান্ত্বনা দিলেন—'আহা, আপনার কোনো দোষ নেই। আমিও লুকোতাম—যদি ঐ রকম প্রশ্ন করতাম!'

কিন্তু লজ্জিত নয়, গর্বে অলজ্জিত মানুষই তখন আমেরিকায় অধিক। সুতরাং দয়াবতী মহিলা এই পুরাতন প্রশ্ন না করে পারেন না—

'আচ্ছা স্বামীজী, ভাবতে তো কুমীরের মুখে শিশুদের ফেলে দেওয়া হয়—আমি শুনেছি, বিশেষভাবে বাচ্চা মেয়েদেরই ফেলে দেওয়া হয়—এ রকম বৈষম্য কেন?'

মহিলার কথা শুনে স্বামীজীও বেদনায় মুষড়ে পড়ে বললেন—'সত্যি, মেয়েদের উপরে কি অন্যায় নিষ্ঠুরতা। কিন্তু উপায়ই বা কি। কুমীরগুলো এমন পাজি যে, নরম মেয়ে-মাংস ছাড়া আর কিছু খেতে চায় না।'

'যেমন ধরো না'—স্বামীজী বলতে লাগলেন—'আমাকেও কুমীরের মুখে ফেলা হয়েছিল; কিন্তু বজ্জাতগুলো আমাকে কালো আর মোটা দেখে বিরক্ত হয়ে চলে

গেল। নিজের কালো মোটা চেহারা দেখে আমার যখন লজ্জা হয়, তখন আবার মনে ভাবি, মোটা বলেই তো কুমীর গিলতে পারেনি। তখন ঠাণ্ডা হই।'

'আমি আজো বেঁচে আছি'—স্বামীজী তাঁর সমস্ত ঐশ্বরিক মহিমা নিয়ে খাড়া হয়ে ওঠেন—দ্বিতীয় বুদ্ধের মতো দাঁড়িয়ে হাসতে থাকেন—খ্রীস্টান মিশনারীদের দিকে ইঙ্গিত করে সুবিশাল অহঙ্কারের সঙ্গে বলেন—

'I am the heathen they came to save!'

অহঙ্কারী হীদেনটি—সতীদাহের দেশের লোক—কি নির্লজ্জ!—বলে বসল—

সতীদাহ দুঃখের নিঃসন্দেহে, বীভৎস—কিন্তু আমরা ডাইনি পোড়াই না!

ডাইনি কারা?

বিবেকানন্দের প্রতিভা নতুন আবিষ্কারে উল্লসিত হয়ে ওঠে—

"তোমরা ইউরোপী, তোমরা নারী-পূজা করো, মানে নারীর যৌবনের পূজা করো। বার্ধক্যকে তোমরা সহ্য করতে পারো না। তোমাদের মেয়েরা মা-ডাক শুনলে চমকে যায়, পাছে কেউ বুড়ি ভাবে। যাদের রূপযৌবন চলে গেছে, তেমন মেয়েদের কোনো প্রয়োজন নেই তোমাদের কাছে—সেই অসহ্য আবর্জনাগুলোকে—ডাইনি নাম দিয়ে তোমরা পুড়িয়ে ফেলো—ঠিক তাই।"

হীদেন ভদ্রলোক আরো জানালেন—

"আমেরিকায় শিশুপাঠ্য বইয়ে ছবিতে দেখা যায়—হিন্দু-মা গঙ্গায় কুমীরের মুখে নিজের সন্তানকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন—মায়ের রঙ ঘোর কালো, কিন্তু শিশুটির রং শাদা করা হয়েছে যাতে মার্কিনীরা হতভাগ্য শ্বেত-শিশুটির প্রতি সমবর্ণের সহানুভূতি বোধ করতে পারে!—এবং সেই সহানুভূতির প্রেরণায় বাল্যকাল থেকেই মিশনারী ফাণ্ডে চাঁদা দিয়ে যেতে পারে!!"

স্বামীজী পুনশ্চ জানালেন—"একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে—একটা লোক নিজের হাতে তার স্ত্রীকে আগুনে পোড়াচ্ছে, যাতে মেয়েটি পেত্নী হয়ে স্বামীর শত্রুদের জ্বালাতে পারে। অধিকন্তু প্রত্যক্ষদর্শী সত্যবাদী মিশনারীদের বই ও বর্ণনা থেকে জানা গেছে—কলকাতার রাস্তায় ধর্মান্ধদের বুকের উপর দিয়ে রথ চলেছে (তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন) এবং ভারতের প্রত্যেক গ্রামে একটি করে পুকুর আছে, যা শিশুর হাড়ে বোঝাই।"

যত ভয়াবহ বর্ণনা—তত টাকা—মিশনারী-পকেটে। মাঝে-মাঝে একটু উল্টো উৎপত্তিও হয়। স্বামীজীর এক বন্ধুর বাড়ির চাকরানিকে পাগলাগারদে যেতে হল ঐসব বক্তৃতা শোনার ফলে। 'তার পক্ষে নরকাগ্নির ডোজ একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল।'

খ্রীস্টের প্রেম অপেক্ষা নরকের আগুনকে ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে মিশনারীরা বেশি

কাজে লাগিয়েছিলেন। চার্চের বাইরে চতুর্দিকে পাপের আঁস্তাকুড়। স্বামীজীর বাল্যকালে পাপের বার্তা নিয়ে জনৈক মিশনারী কিভাবে তাঁকে তাড়া করেছিলেন, তার চমৎকার বিবরণ তিনি দিয়েছেন। পাদরীকে দেখলেই স্বামীজী পালাতেন। অবশেষে একদিন পাদরী তাঁকে হাতে-নাতে পাকড়ালেন। তারপর উভয়ের সংলাপ—

পাদরী। তুমি ভয়ানক পাপী।

নরেন্দ্রনাথ। রাজি, তারপর—

পাদরী। কিন্তু তোমাকে আমার উত্তম-উত্তম জিনিস দিবার আছে—

নরেন্দ্রনাথ। যথা—

পাদরী। তুমি পাপী এবং তুমি নরকে যাইবে।

নরেন্দ্রনাথ। অতি চমৎকার। আর কিছু দেবার আছে ?

পাদরী। আর কি অধিক উত্তম দিবার থাকিতে পারে, কহো !

নরেন্দ্রনাথ। একটা প্রশ্ন করব ?

পাদরী। অবশ্য করিবে। প্রশ্ন করিয়া বার্তা জানিয়া লইবে।

নরেন্দ্রনাথ। আচ্ছা আপনি কোথায় যাবেন ?

পাদরী। আমি ? আমি তো অবশ্য স্বর্গে যাইবে।

নরেন্দ্রনাথ। তাহা হইলে আমি অবশ্যই নরকে যাইবে।

এই পাপ আর নবকের পাথর গলায় ঝুলিয়ে স্বর্গের দিকে ডানা মেলে দেওয়ার মতো বিচিত্র ব্যাপারে বিবেকানন্দের আস্থা কখনো ছিল না। যখন শুনতেন—'খ্রীস্টের রক্তের দ্বারা ত্রাণ'—শিউরে উঠতেন। স্বামীজী বলেছিলেন—আমাদের দেশেও ইহুদীদের মতো বলিদান আছে—তার সোজা অর্থ, মাংস খাবার সময়ে তাকে দেবতার সামনে উৎসর্গ করা হয়। ওটাও ভালো জিনিস নয়। কিন্তু কী ভয়ানক স্বার্থপরতা ঐ ইহুদী-ধারণা—মানুষের পাপ ঢুকিয়ে দেওয়া হল একটা ভেড়ার মধ্যে, এবং তারপর সেই ভেড়াটিকে বলি দিয়ে পাপমুক্তি ঘটল! যদি কেউ আমার কাছে এসে বলে—'আমার রক্তের দ্বারা ত্রাণলাভ করো'—আমি তাকে বলব, ভ্রাতঃ, আপনি আসুন। আমি নরকেই যাব। আমি এমন কাপুরুষ নই যে, নিরীহের রক্তের দ্বারা নিজের স্বর্গ চাইব। আমি নরকবাসের জন্য প্রস্তুত।

সংগ্রামস্পৃহা পাশ্চাত্ত্যবাসীর ধর্ম-ধারণায় ওতঃপ্রোত। স্বামীজী এক বিখ্যাত আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের মুখে শুনেছিলেন, তিনি বুদ্ধজীবনীর খুবই পক্ষপাতী, কেবল বুদ্ধের মৃত্যু-ঘটনাটিতে তাঁর আপত্তি। হায়! বুদ্ধ কেন ক্রুশে মরলেন না।

'কি বিচিত্র ধারণা! বড় হতে গেলে একটা মানুষকে খুন হতে হবে!!'—স্বামীজী হতাশ হাসির সঙ্গে বললেন।

এক বুদ্ধিমান ইংরেজ স্বামীজীর সঙ্গে প্রাচ্যের না পাশ্চাত্ত্যের, কোথাকার ধর্ম

শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে বহুক্ষণ তর্ক করার পরে উত্ত্যক্ত হয়ে শেষপর্যন্ত বলেছিলেন—'আপনাদের ধর্ম যদি এতই বড় তো আপনাদের ঋষিরা কেন ইংলণ্ডে আমাদের শিক্ষা দিতে আসেন নি?' অনিবার্য একটি উত্তরই স্বামীজী তাঁকে দিতে পেরেছিলেন—'তার কারণ, মহাশয়, আসবার মতো কোনো ইংলণ্ড যে তখন ছিলনা। তাঁরা কি বন-বাদাড়কে শেখাতে আসতেন?'

ইউরোপীয়দের আত্মম্ভরিতা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতা দেখে স্বামীজী চমকিত। ভারতীয়রা টুথব্রাস ব্যবহার করে না, ( সেকালে করত না ), গাছের ডাল দিয়ে দাঁতন করে—এটা ওঁদের কাছে অসহ্য বর্বরতা। সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন এক পাশ্চাত্ত্য-বাসী, ভারতীয়দের প্রভাতে ডাল ভেঙে দাঁতন করতে দেখে স্থির করে ফেললেন, "ভারতীয়গণ প্রভাতে উঠিয়া একটি চারাগাছ ভক্ষণ করে।'

টুথব্রাস-গরবীদের স্বামীজী সব্যঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলেন—ভারতীয়রা মুখ পরিষ্কার করতে অপরের চুল বা চামড়া ব্যবহার করে না।

বিখ্যাত আমেরিকান অজ্ঞেয়বাদী বক্তা ইঙ্গারসোল স্বামীজীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন—এবং তার দ্বারা আমেরিকান সভ্যতার বয়স নির্ণীত হয়েছিল—

"স্বামীজী, পঞ্চাশ বছর আগে আপনি এদেশে যদি প্রচার করতে আসতেন তাহলে আপনার গলায় দড়ি বেঁধে লটকে দিত। গ্রামাঞ্চলে আপনাকে জ্যান্ত পোড়াত বা পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলত।"

স্বামীজী তা জানতেন—নিষ্ঠুর বিদ্রূপ ফিরিয়েও দিয়েছেন—

"ভারতের নৃপতিশ্রেষ্ঠও কৃতার্থ হবেন যদি তিনি বানপ্রস্থী, বনবাসী, অকিঞ্চন, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য গ্রামবাসীদের উপর নির্ভরশীল কোনো প্রাচীন সাধুর বংশধর বলে নিজেকে প্রমাণ করতে পারেন।...আর রোমের পোপ পর্যন্ত খুশী হবেন যদি তিনি রাইন-নদীতীরবর্তী কোনো দস্যু-ব্যারনের সঙ্গে নিজ রক্তসম্পর্ক দেখাতে পারেন।"

ভারতবর্ষ ও তার সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের আরো অনেক বক্তব্যই স্বামীজীর কাছে উদ্ভট ঠেকেছে। যেমন, ভারতে আর্যোদয়-তত্ত্ব। ইউরোপীয় পণ্ডিতজনেরা শুনিয়েছেন—ঘোড়ার পিঠ চাপড়াতে-চাপড়াতে কিংবা গরুর ল্যাজ মূলতে-মূলতে একদিন আর্যরা ভারতে হাজির হয়েছিল। এই সঙ্গে আছে—দক্ষিণভারতের শূদ্রদের নিকেশ করেছিল আর্যরা সেখানে গিয়ে। এইসব তত্ত্বের পিছনে কতখানি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা আর কতখানি ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া কঠিন। ইউরোপীয়দের স্বভাব, নিজেদের কুকীর্তির মাপে অপরকে মাপা। "ইউরোপীয়রা যে-দেশে বাগ পান, আদিম মানুষকে নাশ করে নিজেরা সুখে বাস করেন। অতএব আর্যরাও তাই করেছে॥ ওরা হা-ঘরে। 'হা-অন্ন হা-অন্ন' ক'রে কাকে লুঠবে মারবে বলে ঘুরে বেড়ায়—আর্যরাও তাই করেছে॥...রামায়ণ কিনা

আর্যদের দক্ষিণী বুনো-বিজয় !! বটে। রামচন্দ্র আর্য রাজা, সুসভ্য ; লড়ছেন কার সঙ্গে—লঙ্কার রাবণ-রাজার সঙ্গে। সে…লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশি ছিল বরং, কম তো নয়ই। তারপর বানরাদি দক্ষিণী লোক বিজিত হল কোথায় ? তারা হল সব শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু মিত্র। কোন্ গুহকের, কোন্ বালির রাজ্য রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন—তা বলো না ?"

আর্যরা বাইরে থেকে এসেছে—প্রমাণ কোথায় ?—স্বামীজী জিজ্ঞাসা করেছেন। "কোন্ বেদে, কোন্ সূক্তে, কোথায় দেখেছ যে, আর্যরা বিদেশ থেকে এখানে এসেছে ?" কয়েকজন আর্য, ভারতের অধিকাংশ আদিবাসীকে মেরে শূদ্র করে ফেলেছিল—এই থিয়োরী শুনে স্বামীজী হেসে অস্থির—হুম্! তা করতে গেলে, অনার্যদের সংখ্যা যা শোনা যাচ্ছে, তাতে তারা আর্যদের চাটনি করে ফেলত।

স্বামীজীর আরও বিদ্রূপ—

"ওঁরা বলেন, ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়। আমেরিকান, ইংরেজ, ডাচ, পর্তুগীজ প্রভৃতিরা হতভাগ্য আফ্রিকানদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের ক্রীতদাস ক'রে যতদিন তারা বাঁচত ততদিন হাডভাঙা খাটুনি খাটাত। তাদের ছেলেদের এবং দোআঁশলা ছেলেদের একইভাবে দাস করে রাখা হত। দীর্ঘদিন ঐ অবস্থা চলেছিল। নিজেদের এই অপূর্ব আচরণের দৃষ্টান্তে তাদের মন মহালম্ফ দিয়ে কয়েক হাজার বছর পেছিয়ে গিয়ে কল্পনা করতে লাগল—ভারতেও একই জিনিস ঘটেছিল। আমাদের প্রত্ন-তাত্ত্বিক মহাশয়েরা স্বপ্নে দেখলেন—ভারত পূর্ণ ছিল কৃষ্ণচক্ষু আদিবাসীতে, সেখানে সমুজ্জ্বলকান্তি আর্যরা ভগবান-জানেন-কোথায়-নামক-স্থান থেকে এসে ভারতে উদিত হলেন। কারো-কারো মতে তাঁরা এসেছিলেন মধ্য-তিব্বত থেকে ; অন্যরা ওটাকে মধ্য-এশিয়া করতে চান। কিছু দেশপ্রেমিক ইংরেজ মনে করেন, আর্যরা সবাই ছিলেন লোহিত-কেশ ; অন্যরা নিজেদের বোধবৃত্তি অনুযায়ী তাঁদের কৃষ্ণকেশ না ক'রে পারেন না। লেখক যদি কৃষ্ণকেশ হন তাহলে আর্যরা কৃষ্ণকেশ, যদি তিনি লোহিতকেশ হন, তাহলে আর্যরা তাই। অধুনা আর্যদের সুইজারল্যাণ্ডের হ্রদতীর-বাসী প্রমাণ করার চেষ্টা চলেছে। ঐ হ্রদের জলে আর্যরা যদি উক্ত থিয়োরীসুদ্ধ ডুবে মরেন, আমি একটুও দুঃখিত হব না। সর্বনাশ, আবার কেউ-কেউ বলেন আর্যরা উত্তর মেরুতে বাস করতেন। ঈশ্বর আর্যদের এবং তাঁদের বাসস্থানকে আশীর্বাদ করুন!"

কিছু-কিছু ইউরোপীয় ভারততাত্ত্বিক সম্বন্ধে স্বামীজীর কথা শুনে বঙ্কিমচন্দ্র-কথিত 'স্পেশিয়েলে'র কথা মনে পড়ে। স্বামীজী বলেছেন—

"…তারপর কিছু পণ্ডিত এলেন, যাঁরা নামমাত্র সংস্কৃত জানতেন বা একেবারেই জানতেন না। তাঁরা সংস্কৃতের কাছ থেকে কিছুমাত্র আশা করতেন না, এবং

প্রাচ্যের সবকিছুকেই বিদ্রূপ করতেন।...এঁদের মহাসাহসের প্রধান উৎস—এঁরা এমন এক শ্রোতৃবৃন্দের সামনে বক্তৃতা শোনাতেন সংস্কৃত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাই যাঁদের প্রধানতম অধিকার। এই বিচক্ষণ পাণ্ডিত্য কি অপূর্ব খিচুড়িই বানিয়েছে !! অকস্মাৎ, এক শুভ প্রভাতে, উক্ত পণ্ডিতগণের শুভ প্রচেষ্টার ফলে, হিন্দুরা জাগরিত হয়ে দেখল—তার যা কিছু ছিল সবই গিয়েছে ; কোনো একটি অপরিচিত জাতি তার শিল্পের গৌরব ছিনিয়ে নিয়েছে ; অন্য একটি জাতি কেড়ে নিয়েছে তার স্থাপত্যগৌরব ; তৃতীয় জাতি হাতিয়ে নিয়েছে তার বিজ্ঞানের কৃতিত্বগুলিকে। শুধু তাই ? তার ধর্মও তার নয় ! হাঁ, হাঁ—পহ্লব-জাতীয় প্রস্তরখণ্ডের সঙ্গে তা ভারতে এসেছে !!"

আধুনিক পৃথিবীর ধর্মাচার্যরূপে বিবেকানন্দকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সর্বপ্রকার ধর্মের বিকৃতির জঞ্জাল ঠেলে ধর্মের মূল সত্যের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করতে হয়েছে। তাই মিরাকল বা সিদ্ধাই সম্বন্ধে স্বামীজীর মন খুবই কঠোর। এক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অপূর্ব সকৌতুক গল্পটি তাঁর স্মরণে ছিল :

দুই ভাইয়ের এক ভাই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়েন। বারো বছর পরে সেই সন্ন্যাসী জন্মভূমিতে ফিরে আসেন। গৃহী-ভাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—'দাদা, তুই এতদিনে কী পেলি ?' 'কী পেলুম দেখবি'—বলে সন্ন্যাসী ঘরসংসারে হাবুডুবু-খাওয়া ভাইয়ের হাত ধরে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে নদীর উপর দিয়ে গট্‌গট্ করে হেঁটে অপর পারে চলে গেলেন। গেরস্ত-ভাই তারপর খেয়া-নৌকায় আধ পয়সা দিয়ে নদী পার হলেন এবং সন্ন্যাসী-ভাইদের কাছে গিয়ে বললেন—'দাদা, তুই তা হলে বারো বছরে যা পেয়েছিস, তার দাম আধ পয়সা ?'

স্বামীজী বলেছেন, 'মিরাকলকে আমি ধর্মজীবনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা মনে করি।' হঠযোগীরা আপাতভাবে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাতে পারেন, তা তিনি অস্বীকার করেননি। তাঁরা মাসের পর মাস মাটি-চাপা থেকে বাঁচতে পারেন, মাটির উপরে থেকে দেড়শ বছর বাঁচাও তাঁদের পক্ষে অদ্ভুত ব্যাপার নয়। 'তাতে কি এসে গেল ? একটা বটগাছ কখনো-কখনো পাঁচ-হাজার বছর বেঁচে থাকে, কিন্তু সে বটগাছই থাকে।' সুতরাং আত্মার সন্ধান না করে যে হঠযোগী শুধু বাঁচতে চায়, সে স্বামীজীর কাছে 'স্বাস্থ্যবান জন্তু' ছাড়া কিছু নয়। অলৌকিক কাণ্ড সম্বন্ধে উৎসুক উৎসাহী পাশ্চাত্ত্যবাসীকে স্বামীজী চোখা উত্তর ফিরিয়ে দিয়েছিলেন—'তোমাদের বাইবেলে শয়তান ক্ষমতাবান—কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে তার প্রভেদ—সে পবিত্র নয়।'

ধর্মের নামে প্রেতচর্চা আর এক অদ্ভুত ব্যাপার। ভূতপ্রেত নামানো নিয়ে স্বামীজীর কিছু কৌতুককাহিনী আগে বলে এসেছি। 'স্পিরিট'-নামানো ইত্যাদি ব্যাপারকে তিনি সাধারণভাবে ধাপ্পাবাজি মনে করতেন। একবার এক মিডিয়াম স্বামীজীর মায়ের প্রেত নামিয়েছিল, যখন তাঁর মা সশরীরে বর্তমান! এবং তিনি

আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন যখন একবার প্রেতচর্চার আসরে তাঁর সামনে যীশুখ্রীস্ট আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রভুকে তিনি ভদ্রতাবশে 'হাউ ডু ইউ ডু' করেছিলেন, যদিও প্রেতবিদ্‌রা তাঁকে প্রভুর সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করতে দেয়নি। কিন্তু তিনি দুঃখিত না হয়ে পারেননি। যদি ওহেন সাধুব্যক্তি অমন স্থূল দেহে মৃত্যুর পরেও বর্তমান থাকেন, তাহলে আমার মতো হতভাগ্যদের অবস্থা কী দাঁড়াবে!!—স্বামীজী দুঃখে ভেবেছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন, গোটা ব্যাপারটিই মিথ্যা, এক জঘন্য ধরনের নাস্তিকতা—কিংবা অতি স্থূল জড়বাদ—যা নিজের পার্থিব কামনাকে নির্বিচারে সর্বশ্রেণীর মানুষের উপরে চাপিয়ে দেয়।

ইউরোপ, আমেরিকা, এবং ভারতবর্ষেও, ভূতপ্রেতচর্চার ব্যাপারে থিয়জফিস্টদের অবদান কম নয়, সুতরাং তাঁদের বিরুদ্ধে স্বামীজীর আক্রমণও কম হতে পারে না। থিয়জফিকে তিনি 'পৃথিবীর সবচেয়ে ওঁচা কুসংস্কার' মনে করতেন। তাঁর বিতৃষ্ণার শেষ ছিল না যখন দেখেছিলেন, থিয়জফি নামক আমেরিকান স্পিরিচুয়ালিজম্-এর কলম-চারাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে গিয়েছে ভারতীয় তরুণেরা—'টেবিলের ঠক্‌ঠকানি' ও 'মহাত্মা-বটিকা' ইত্যাদিতে মুগ্ধ হয়ে। অপরপক্ষে অবশ্য তিনি মেজাজ ঠাণ্ডা করে থিয়জফির ভালোত্ব কম দেখার চেষ্টা করেননি : 'থিয়জফি থেকে বিভিন্ন স্বর্গের ভূগোল এবং স্বর্গস্থ জনগণের সমাজরহস্য সাক্ষাৎভাবে জানা গেছে' 'পৃথিবীর টেবিল-ভূমিতে অঙ্গুলির সুচারু নৃত্যশিল্পও কম দেখা যাচ্ছে না।' স্বামীজীর ঘৃণাপূর্ণ পুলকের শেষ ছিল না, যখন দেখেছিলেন, 'মৃত আমেরিকান বা রাশিয়ানদের প্রেত ভারতের ধর্মগুরু হয়ে বসেছে' এবং 'পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষিত-সজ্জনেরা ধরে নিয়েছেন—হিন্দুধর্ম মানে মুহূর্তমধ্যে সকলের সামনে আমগাছ গজিয়ে তুলে ফল ফলিয়ে দেওয়া।'

কুসংস্কার, গোঁয়ার্তুমি, তৎসহ অতিপ্রাকৃতের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে পৃথিবী পূর্ণ পৃথিবীতে ফ্যানাটিকদের সীমাসংখ্যা নেই—সিগারেট-গোঁড়া, মদ-গোঁড়া, সম্প্রদায় গোঁড়া, লোকহিত-গোঁড়া, আরও কত। স্বামীজী দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন—

একটি মহিলার চুরিতে আপত্তি নেই, সুযোগ পেলেই অপরের হাতব্যাগ বা অন্য জিনিস সরিয়ে ফেলেন, কিন্তু ভদ্রমহিলা ভয়ানক ধূমপান-বিরোধী। তাঁর ধারণা, ধূমপান না করলেই পৃথিবী ভালো হয়ে যাবে, অবশ্য ছোটখাট হাতসাফাই বাদ।

মদ-ফ্যানাটিক লোকটির অপরকে ঠকাতে কোনো আপত্তি নেই, এবং তার সান্নিধ্যে কোনো মহিলার সম্মান নিরাপদ নয়। কিন্তু সেই নচ্ছারের ধারণা— পৃথিবীতে মদ খাওয়াই যত পাপের কারণ।

পুরুষ না হয়ে কোনো মহিলা মদ-ফ্যানাটিক হলে আরও বিপত্তি। তাঁর স্বামীর মদ-খাওয়া নিয়ে তিনি পৃথিবীতে প্রলয় আনেন। ভদ্রমহিলারা এক্ষেত্রে যেমন

অবুঝ, তেমনি হৃদয়হীন। এমনই এক মহিলা তাঁর স্বামীর মদ-খাওয়া নিয়ে স্বামীজীর কাছে প্রচণ্ড অভিযোগ করেন। স্বামীজী উত্তরে বলেন, 'মহাশয়া, আপনি থাকতে আপনার স্বামী মাতাল না হয়ে যান কোথায়? আপনার মতো দু'কোটি পত্নী যদি পৃথিবীতে থাকেন দু'কোটি স্বামীই মাতাল হয়ে পড়বে।'

স্বামীজী দেখেছেন, যারা ফ্যানাটিক তারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর আর স্বার্থপর। তারা যদি কোনো শুদ্ধি-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মানুষকে ভালবেসে তা করে না—মানুষের প্রতি ঘৃণাতেই তা করে। বিশেষতঃ স্বাধিকারপ্রমত্ত আধুনিক মহিলাগণ 'ক্ষমা' নামক কথাটা একেবারে ভুলেছেন, সহ্য করার শিক্ষা তাঁদের নেই, অপরের দুঃখ-যন্ত্রণা বুঝবার ধৈর্যও নেই। কারো মদ্যপানের বিরুদ্ধে তাঁরা যখন চেঁচান, ভেবে দেখেন না, ঐ পরিবেশে অন্য কেউ পড়লে হয়ত আত্মহত্যা করত।—'আমার এই বিশ্বাস হয়েছে, অধিকাংশ মদ্যপ তাদের পত্নীদের সৃষ্টি'—স্বামীজী বললেন।

আর স্বামীজীর ধারণা—অধিকাংশ ফ্যানাটিকই অজীর্ণ বা অন্য রোগগ্রস্ত। 'ক্রমে ডাক্তাররা একদিন আবিষ্কার করবেন—গোঁড়ামি এক ধরনের ব্যাধি।'

এক ভদ্রমহিলা স্বামীজীকে একটি বই পাঠিয়েছিলেন পড়বার জন্য। না, স্বামীজী বইটি শুধু পড়বেন তাই নয়, তাঁকে বইয়ের সব কথা বিশ্বাস করতেও হবে। বইটির মোট বক্তব্য—আত্মা বলে কিছু নেই, কিন্তু স্বর্গ আছে; সেখানে দেবদেবীরা আছেন; আর মর্তের প্রতিটি মানুষের মাথা থেকে একটি ক'রে আলোর রেখা বেরিয়ে স্বর্গের দিকে ছুটেছে।

কিন্তু অমন-সব ব্যাপার ঘটছে, মহিলা জানলেন কি করে?—স্বামীজীর প্রশ্ন।

মহিলা জানতেই পারেন, কেননা তিনি 'প্রেরণাপ্রাপ্ত।'

স্বামীজী উক্ত মহিলার প্রেরণাকে এবং প্রেরণার সৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে রাজি হলেন না। সুতরাং মহিলা স্বামীজীকে বললেন—

'আপনি অত্যন্ত বদ লোক। আপনার কোনো ভরসা নেই।'

এই এক ফ্যানাটিসিজম্।

# ধর্ম-রহস্য

তাহলে ধর্ম কোথায় ?

স্বামী বিবেকানন্দের উত্তর—ধর্ম তোমারই মধ্যে। ঈশ্বর তোমারই মধ্যে। তুমি যদি কীটও হও, তবু তুমি ঈশ্বর। কেউ বেশি ঈশ্বর, কেউ কম ঈশ্বর। কেউ বেশি-প্রকাশিত, কেউ কম প্রকাশিত। চরম প্রকাশের নাম যদি ঈশ্বর হয়, খানিক প্রকাশও ঈশ্বর না হয়ে যায় না।

কিন্তু আমরা নিজেকে ঈশ্বর বলে অনুভব করি না কেন? অজ্ঞানই তার কারণ। অজ্ঞানের অপর নাম মায়া।

মায়া কিভাবে অতিবড় সত্তাকেও আচ্ছন্ন ক'রে রাখে তা স্বামীজী দেবর্ষি নারদের মতিভ্রমের এক উপাদেয় গল্প দিয়ে বুঝিয়েছিলেন।—

কৃষ্ণের কাছে গিয়ে নারদ বললেন, 'প্রভু মায়া কাকে বলে আমাকে বুঝিয়ে দিন।' কৃষ্ণ তখন হাঁ-হুঁ কিছু করলেন না। কয়েকদিন পরে কৃষ্ণ নারদকে বললেন, 'চল হে, বেড়িয়ে আসা যাক।' যেতে-যেতে তাঁরা এক মরুভূমিতে পৌঁছলেন। সেখানে কৃষ্ণের তৃষ্ণা পেল। তিনি নারদকে বললেন, 'নারদ, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, জল খাওয়াতে পারো ?' 'এখনি জল নিয়ে আসছি প্রভু'—বলে নারদ ছুটলেন। কিছুদূর গিয়েই দেখেন একটা গ্রাম। সামনে যে-বাড়ী পেলেন, তার দরজায় নারদ ধাক্কা দিলেন। দরজা খুলে দিল অপরূপ সুন্দরী এক যুবতী—তাকে দেখেই নারদের মাথা ঘুরে গেল। মরি মরি! কে গো তুমি। তখন কোথায় রইল কৃষ্ণ আর তাঁর তেষ্টা। কৃষ্ণ হয়ত তেষ্টাতে শুকিয়ে মরছেন, মরুক-গে, নারদের সে-সব কথা ভাবার অবসর নেই, সামনে ভর-যুবতী, সাক্ষাৎ কর্তব্য তার সঙ্গে রসালাপ করা, নারদ তাই শুরু ক'রে দিলেন। যুবতীও সাড়া দিল ভালো-মতে। ব্যাপারটা ভালবাসায় দাঁড়িয়ে গেল। নারদ, যুবতীর পিতার কাছে গিয়ে কন্যার পাণি-প্রার্থনা করলেন, তা মঞ্জুর হল, বিয়ে-সাদি হয়ে গেল, ছানাপোনাও হল ক্রমে-ক্রমে। বার বছর বড় সুখে কাটল। তারপর বর্ষাকালে প্রলয়ঙ্কর বন্যা এল গ্রামে। বাড়িঘর হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল, গরু-বাছুর-মানুষ সব ভেসে বা ডুবে গেল বন্যার তোড়ে। নারদেরও একই হাল। প্রাণপণে তিনি এক হাতে পত্নীকে ধরে রইলেন, অন্য হাতে ধরলেন দুই শিশুকে, কাঁধেও রইল একটি শিশু। বন্যার মধ্যে তিনি নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে এগোবার চেষ্টা করতে লাগলেন। হঠাৎ এক জলের তোড় এসে তাঁর কাঁধের শিশুটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তার জন্য নারদ হায়-হায় করবার সময়ও পেলেন না, কেননা আর এক ঢেউয়ের ধাক্কায় ছিটকে বেরিয়ে গেল বাকি দুটি শিশু। রইল পড়ে বউটি। তাকে আঁকড়ে রইলেন প্রাণপণে। কিন্তু পরবর্তী প্রচণ্ড এক ঢেউ সেই প্রাণ-

তুল্য প্রেয়সীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, এবং অন্য এক ঢেউ নারদকে অনেক উঁচু ডাঙায় ছুঁড়ে তুলে দিল। সেখানে নারদ শোকে-দুঃখে আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদতে লাগলেন। কাঁদছেন—কাঁদছেন—এমন সময়ে অতি স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠস্বর শুনলেন তিনি—'বৎস, আমার তেষ্টার জলের কি হল?' নারদ তাকিয়ে দেখেন, প্রভু কৃষ্ণ মিটি-মিটি হাসছেন। নারদের ঘোর তখনো কাটেনি। জিজ্ঞাসা করলেন—'কি বলছেন?' কৃষ্ণ পূর্ববৎ মধুর স্বরে বললেন, 'কি নারদ, আধঘণ্টা হয়ে গেছে—এখনো জল দিলে না?' 'আধ ঘণ্টা'—নারদ ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন—'নাকি বারো বছর?'—নারদের মাথা আবার গুলিয়ে গেল! কৃষ্ণ বললেন, 'মায়া, বৎস মায়া।'

একই ধরনের আর একটি গল্প স্বামীজী বলেছেন:

অসুরনিধনের জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে একবার শূকররূপ ধরতে হয়েছিল। তিনি শূকররূপে পাতালে গিয়ে কাদা-পাঁকের মধ্যে বাস করতে লাগলেন। অসুর মারা হল, কিন্তু তার পরেও ইন্দ্র পাঁকের জগৎ ছেড়ে আসতে পারলেন না, কারণ তাঁর শূকরী জুটে গিয়েছিল এবং উক্ত শূকরী-ইন্দ্রাণী শূয়োরের পাল পেটে ধরেছিলেন। ইন্দ্র বেশ সুখে আছেন, কিন্তু ওধারে নেতৃহীন দেবতারা দুশ্চিন্তায় কাতর। তাঁরা ইন্দ্রের কাছে ছুটে এসে বললেন, 'মহারাজ, একি করছেন! আপনি আমাদের অধিপতি, আপনার শাসনে আমরা বাস করি, আপনি স্বয়ং দেবরাজ—আপনি পাঁকে পড়ে থাকবেন?' ইন্দ্র বললেন, 'আমি ওসব জানি না, আমি স্বর্গ চাই না, আমি এখানে বেশ আছি। আমার এই প্রেয়সী শূকরী আর আদুরে বাচ্চাগুলি থাকলে কিছুর দরকার নেই।' দেবতারা দেখলেন মহা বিপদ। এখন দেবরাজকে যেভাবে হোক পঙ্ককুণ্ড থেকে উদ্ধার করতে হবে। তাঁরা অতঃপর শূয়োরের বাচ্চাগুলিকে একে-একে নিকেশ করতে লাগলেন। সব কটাকে মেরে ফেলার পরে তাঁরা ইন্দ্রের শূকরী-প্রেয়সীকেও সাবাড় করলেন। তাতেও ইন্দ্রের পাঁকে লুটোপুটি থামল না। অগত্যা তাঁরা স্বয়ং ইন্দ্রের শূকর-দেহটিকে কেটে খণ্ড-খণ্ড ক'রে ফেললেন। ফলে ইন্দ্র খাঁচাছাড়া হয়ে পড়লেন। তখন তিনি হাসতে লাগলেন—'কী কাণ্ড! কী মায়া! কী স্বপ্ন! কী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন!—আমি দেবরাজ ইন্দ্র—আমি কিনা শূকরজন্মকে একমাত্র জন্ম ভাবছিলাম! শুধু তাই নয়, চাইছিলাম যে, সমস্ত জগৎ শূকরজগৎ হয়ে যাক!!'

এই স্বপ্ন, এই মায়াই মানুষকে আপেক্ষিক জগতে আবদ্ধ রাখে। পাপ, মায়ারই অপর রূপ। এই মায়াকে ছিন্ন করতে না পারলে মানুষ তার নিত্য স্বরূপ লাভ করবে না। ধর্মের যে-ভাষ্য আপেক্ষিকতাকে চরম সত্যের মূল্য দিতে চায়, স্বামীজী তাকে কখনো নিত্য-ধর্ম বলে স্বীকার করতে পারেন নি। 'আমার ধর্মই একমাত্র সত্য' যে বলে, সে নিতান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন। "একটা মানুষ দুটি-তিনটি মতবাদ হাজির ক'রে

দাবি করে—তার ধর্ম সমগ্র মানবসমাজকে পরিতৃপ্ত করতে পারবে। ঈশ্বর-সার্কাসের সেই মালিক নিজের ক্ষুদ্র খাঁচাটি হাতে ক'রে পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়ে বলে—ঈশ্বর, মানুষ, জীব, জন্তু—সবাইকে এর মধ্যে ঢুকতে হবে। তার জন্য মোটা হাতিটাকে যদি কেটে টুকরো-টুকরো করতে হয়, তাও সই।"

স্বামীজীর কথা শুনে আমাদের স্বতঃই সেই দৈত্যটির কথা মনে পড়ে, আগন্তুকদের ভূরিভোজে আপ্যায়িত ক'রে যে শুতে দিত আরামের খাটে। তারপর দেখত, অতিথিমহাশয় বিছানার চেয়ে মাপে ছোট কি-না? যদি ছোট হত, তাহলে দৈত্য আদরের অতিথিকে টেনে লম্বা করে দিত বিছানার মাপে, আর যদি লম্বা হত, ছেঁটে সমান করে দিত অবশ্যই।

"মোষ যদি ঈশ্বরের উপাসনা করতে চায়, সে ভগবানকে অতিবৃহৎ এক মোষ-রূপে কল্পনা করবে, তেমনি মাছও ভগবানকে ভাববে সুবৃহৎ মৎস্য।" আশি বছরের এক বৃদ্ধ একদা স্বামীজীকে বলেছিলেন—তিনি ভগবান্‌কে মেঘের উপর উপবিষ্ট দীর্ঘ দাড়িযুক্ত বৃদ্ধ ছাড়া ভাবতে পারেন না। "মরুভূমির দেশ আরবে জলের বড়ই অভাব, সেখানে গাছপালা প্রায় নেই, সুতরাং মুসলমানদের স্বর্গ এমন একটা জায়গা যেখানে চমৎকার বাগান আছে, তার পাশ দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে; মুসলমানের স্বর্গ জলে ভর্তি।" "যদি আমি দোকানদার হই, আমি ভাবব দোকানদারিই পৃথিবীর একমাত্র উচিত কর্ম; যদি চোর হই, তাহলে চুরি তাই; ডাকাত হলে ডাকাতি।" সবাই চায় অপরে তার গণ্ডীভুক্ত হোক। এই সূত্রে স্বামীজী একটি চমৎকার গল্প বলেছেন:

এক বজ্জাত লোক একবার অপকর্মের সময়ে হাতে-নাতে ধরা পড়ে। শাস্তির হিসেবে তার নাক কেটে দেওয়া হয়। ছি ছি। বোঁচা মুখ। লোকটার নিজের উপর ঘেন্না ধরে গেল, সে দুঃখে লজ্জায় পালিয়ে গেল বনের মধ্যে। সেখানে সাধু সেজে বাঘের চামড়া বিছিয়ে বসে রইল। যখনই কারো সাড়া পায় অমনি চোখ বুজে খাড়া হয়ে থাকে—যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন। সে ভেবেছিল, কেউ আর তার দিকে তাকিয়ে দেখবে না। কিন্তু ফল হল উল্টো। মহা সাধু মনে করে ক্রমে বহু লোক তাকে ভক্তি করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। ফলে তার অরণ্য-জীবন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে গেল। বহু বছর এইভাবে কাটল। এত বছরেও সাধু মুখ খোলেনি, পাছে কথা বললেই ধরা পড়ে যায়। এধারে কিন্তু মৌনী ধ্যানী সাধু সম্বন্ধে লোকজনের কৌতূহলের অন্ত নেই, বিশেষতঃ একটি ছোকরা তো নাছোড়বান্দা। সে সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে সাধু হতে চায়। ছোকরার তাগিদে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, সাধুর মুখ না খুললে নয়। একদিন বাধ্য হয়ে নীরবতা ভেঙে সে ছোকরা ভক্তটিকে বলল, আগামীকাল সকালে একটা ধারালো ক্ষুর নিয়ে আসবে—তোমার

দীক্ষা হবে। ছোকরার আনন্দের সীমা নেই। এতদিনে তার আশা পূরণ হবার মুখে—প্রভু মুখ খুলেছেন—তিনি এবার তাকে নিজের সম্প্রদায়ে গ্রহণ করবেন। পরদিন মহানন্দে সে ক্ষুর হাতে সাধুর কাছে হাজির হল। সাধু তাকে হাতে ধরে এমন গভীর বনের মধ্যে ঢোকালো যেখানে কোনো লোকজন আসার সম্ভাবনা নেই। তারপর একহাতে যুবকের ঘাড় ধরে অন্য হাতে ক্ষুর নিয়ে দ্রুত একটানে ঘ্যাচ্ ক'রে তার নাক কেটে ফেলল, এবং অতি গম্ভীর স্বরে বলল, 'বৎস, এই আমার দীক্ষারীতি। আমি এইভাবেই সম্প্রদায়ে ঢুকেছি। তোমাকেও ঢোকালাম। ভবিষ্যতে সুযোগ এলে তুমিও সযত্নে এইরূপে দীক্ষা দিয়ে শিষ্য সংগ্রহ করবে।' ছোকরার নাক কাটা গেল, লজ্জায় মাথা কাটা গেল। কিন্তু ব্যাপারটা ভাঙতেও পারল না। সুতরাং পরবর্তীকালে সেও সাধ্যমত এই পদ্ধতিতে দীক্ষা দিয়ে যেতে লাগল। তার ফল—একটা পুরো নাক-কাটা ধর্মসম্প্রদায়ের আবির্ভাব।

'ইনস্‌পিরেশন' বা প্রেরণার দাবি অনেকেই করে থাকেন—কিন্তু সত্য আর মিথ্যা প্রেরণা চেনার উপায় কি? স্বামীজী বলেছেন—লক্ষ্য করবে, প্রেরণার আগের মানুষ আর পরের মানুষের মধ্যে তফাত কতখানি। মনে রাখবে—সমাধি ও নিদ্রার মধ্যে যে তফাত, সত্য ও মিথ্যা প্রেরণার মধ্যে সে-ই তফাত। কোনো হতভাগা আহাম্মক দিব্যি লম্বা একটা ঘুম মারল—ঘুমের আগে সে যা ছিল, ঘুমের পরেও সে তাই রইল। কিন্তু সমাধির সমুদ্র থেকে যিনি উঠে এলেন তিনি ভিন্ন মানুষ—পূর্বের আকার তাঁর নেই—তিনি এখন নবজন্মের দিব্য পুরুষ! প্রেরণার অগ্নিদাহের পূর্বে যিনি ছিলেন নাজারেথের যীশু, তিনি পরে হলেন যীশুখ্রীস্ট।

যীশু আর কজন? যীশুর ভূমিকায় অভিনেতার সংখ্যাই বেশি। স্বামীজী জনৈক 'হনস্‌-বাবা' সম্বন্ধে লিখেছেন বিদ্রূপ ও কৌতুকের সঙ্গে:

"বৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয়কে তোমার কেমন মনে হল? নিশ্চয় চন্দ্রদেবতা ও সূর্যদেবতাসহ বিরাজমান 'হনস-বাবা'র মতো তিনি স্টাইলিশ নন। অন্ধনিশায় যখন অগ্নিদেবতা, ও তারকাদেবীরা ঘুমিয়ে থাকেন, তখন কে তোমার অন্তরলোককে আলোকিত করে? অহো, 'আলোকের বার্তা' নামক তত্ত্বটি কি মহান। এই মতটির অভাবে এই জগৎ যুগ-যুগ ধরে কী অন্ধকারেই না পড়েছিল। বুদ্ধ, কৃষ্ণ, খ্রীস্ট প্রভৃতির যত জ্ঞান, ভালবাসা, আর কাজ—সব বৃথা, বৃথা তাঁদের জীবন—কারণ তাঁরা তো 'রাত্রিকালে সূর্য, চন্দ্র যখন gone to the limbo, তখন কে অন্তরের আলোক জ্বালিয়ে রাখে'—তা আবিষ্কার করতে পারেননি। পরম সুস্বাদু—কি বলো?"

স্বামীজী অবশ্য হনস্‌-বাবাকে উক্ত আবিষ্কারের পুরো পেটেন্ট, তৎসহ উৎপাদন ও বন্টনের পুরো এজেন্সি, ছেড়ে দিতে রাজি হননি। রাত্রে সূর্য চন্দ্র তারকারা যখন

ঘুমিয়ে পড়ে, তখন কে চৈতন্যকে জাগিয়ে রাখে, তার একটি মহাকারণ আবিষ্কার ক'রে তিনি ভারি খুশি হয়েছিলেন—

"ক্ষুধা—আমার ক্ষুধা! তাই আমার চৈতন্যকে জাগিয়ে রাখে—আবিষ্কার করেছি এক্কেবারে!!"

স্বামীজী নূতন পুরাতন যে-কোনো কুসংস্কারের বিরোধী। পবিত্রতা সম্বন্ধে বিচিত্র ধারণাগত কুসংস্কার তিনি দেখেছেন সর্ব ধর্মের মানুষের মধ্যে। প্রাচীনত্ব অনেক সময়ে পবিত্রতার প্রতিশব্দ।—'আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভূর্জপত্রে লিখতেন; তারপর তাঁরা কাগজ-প্রস্তুতের প্রণালী শিখলেন; কিন্তু এখনো পর্যন্ত ভূর্জপত্র পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। প্রায় ন'দশ হাজার বছর আগে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা কাঠে-কাঠে ঘর্ষণ করে যে-প্রণালীতে অগ্নি উৎপাদন করতেন, সে প্রণালী আজও বর্তমান—যজ্ঞের সময়ে অন্য প্রণালীতে অগ্নি উৎপাদন চলবে না!...হিব্রুদের সম্বন্ধেও এইরূপ। তারা আগে পার্চমেণ্টে লিখত, এখন তারা কাগজে লিখে থাকে, কিন্তু পার্চমেণ্টে লেখা তাদের চোখে মহা পবিত্র আচার বলে পরিগণিত। এমন সকল জাতির সম্বন্ধেই। এখন যেসব ব্যাপারকে ধর্মের শুদ্ধাচার বলে বিবেচনা করছ তা প্রাচীনতর প্রথামাত্র।"

কুসংস্কার নিয়ে আরও ব্যঙ্গকৌতুক:

'মানুষের স্বভাবই এই—তারা তোমাকে যত কম বুঝবে, ততই তোমাকে মহৎ ও শ্রেষ্ঠ মনে করবে।...একদা জ্যামিতি সকল বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। আর অধিকাংশ লোক জ্যামিতির বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল। তারা মনে করত, জ্যামিতিবিদ্ একটি সমচতুর্ভুজ এঁকে তার চার কোণে জাদুমন্ত্র বললেই সমগ্র পৃথিবী ঘুরতে শুরু করবে, স্বর্গের দ্বার খুলে যাবে, আর ভগবান নেমে পড়ে লাফাতে শুরু করবেন ও মানুষের ক্রীতদাস হয়ে পড়বেন।"

ধর্মের কুসংস্কারের বিরোধিতা করতে গিয়ে বিজ্ঞানের কুসংস্কারের পক্ষপাতী হওয়ার প্রয়োজন স্বামীজী বোধ করেননি! তাহলেও তিনি শেষপর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অধিক সার্থকতা স্বীকার করেছেন। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিশ্বাস করে এবং বিজ্ঞানের প্রমাণ আসে বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকে। অপরদিকে অধিকাংশ ধর্মের ক্ষেত্রে বাইরের প্রমাণের উপর নির্ভরতা দেখা যায়। কেউ বলেন, জিহোবা একথা বলেছেন; কেউ বলেন, যীশু একথা বলেছেন; কেউ বলেন, বুদ্ধ একথা বলেছেন। স্বামীজীর প্রশ্ন—'এটা যদি জিহোবার আদেশ হয়, তাহলে যারা জিহোবাকে জানেনা বা মানেনা, তাদের কাছে ঐ আদেশ পৌঁছবে কি করে? যদি তা কেবল যীশুরই আদেশ হয়, তাহলে যে কখনো যীশুকে জানেনি, সে কিভাবে ঐ আদেশ পাবে? যদি তা বিষ্ণুর আদেশ হয়, তাহলে উক্ত মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত নন এমন ইহুদি কি ক'রে তা জানবে?' স্বামীজীর বক্তব্য—অমুক বলেছেন

বললেই কোনো জিনিস সত্য হয় না—ওটা বাইরের প্রমাণ—ভিতরের প্রমাণ নয়। জিহোবা যীশু বুদ্ধ বিষ্ণুর কথা তখনই সত্য হতে পারে যখন তা মঙ্গলের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। 'আমরা সবাই মুক্তি পাব; তাই আমাদের নিয়তি; তাকে আমরা চাই, বা না-চাই।' সুতরাং ধর্মাচার্যরা বলুন, বা না-বলুন, 'আমরা সবাই নিত্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত।'

বাইরের প্রমাণ আর ভিতরের প্রমাণ বলতে স্বামীজী কী বুঝেছেন, তা তাঁর কথাতেই দেখা যাক: "কোথাও এমন বিশ্বাস আছে—যখন কোনো মানুষ একটা পাথর ছোঁড়ে, সেটা যে নীচে পড়ে যায় তার কারণ, কোন দৈত্য সেটাকে তলা থেকে টানে। এই রকম অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা মানুষ দেয়। একটা ভূত পাথরটাকে টেনে নামায়, এটা বাইরের ব্যাখ্যা, ও-ব্যাখ্যা বস্তুটার ভেতরে নেই। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ যে-ব্যাখ্যা দেয় তা রয়েছে পাথরটার মধ্যেই। আধুনিক চিন্তাধারার মধ্যে সর্বত্র এই ভিতরের ব্যাখ্যা আবিষ্কারের প্রবণতা দেখা যায়।"

স্বামীজীর বিজ্ঞানপ্রীতি, কিংবা অদ্বৈতবেদান্তপ্রীতি তাঁকে অতঃপর বিশ্বজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো এক সৃষ্টিকর্তা-ভগবানকে কুসংস্কার বলে ঘোষণা করার সাহস দিয়েছে।—"একটি পুরণো ধর্মীয় ধারণা রয়েছে: এক সাকার ভগবান আ[গো]ন যিনি বিশ্বজগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।...তিনি নিজের ইচ্ছায় এই পৃথিবী [সৃ]ষ্ট করেছেন, এবং তিনি এই পৃথিবীর শাসক।...এই সর্বশক্তিমান ভগবান নাকি [সে]ম করুণাময়, যদিও পৃথিবীতে বৈষম্যের সীমা নেই!"

স্বামীজীর বক্তব্য—বিশ্বসৃষ্টির দায় কোনো সিংহাসনে উপবিষ্ট, দণ্ডধারী ঈশ্বরের উপর না চাপানোই ভালো। উক্ত ঈশ্বর একটা বড়ো-সড়ো মানুষ ভিন্ন আর কেউ নন। তাঁর উপর নির্ভর করার ফলে বিজ্ঞান ও যুক্তির ধাক্কায় ধর্ম ধ্বসে পড়ছে।

ভগবান বাইরে থেকে জগৎ বানিয়েছেন—এটা যদি বাইরের ব্যাখ্যা ছাড়া আ[র] কিছু না হয়, তাহলে খ্রীস্টীয় সৃষ্টিতত্ত্বের ঐ অংশটি স্বামীজীর কাছে কি গভীর হাসির বিষয় হবে, যা বলেছে—এই পৃথিবী ৬ হাজার বছর আগে তৈরী হয়েছিল। "সৃষ্টির মানে কি—'কিছু ছিল না'র ভিতর থেকে কিছু বেরিয়ে আসা? ৬ হাজার বছর আগে শ্রীভগবান শুভ প্রভাতে জেগে উঠে পৃথিবীটা তৈরী ক'রে ফেললেন? তার আগে তিনি কী করছিলেন—লম্বা নিদ্রা মারছিলেন?"

সাকার ভগবান যদি তাঁর 'ইচ্ছা'-কারখানা থেকে জগৎসৃষ্টি না ক'রে থাকেন, তাহলে তাঁর কাছে হাজার রকম প্রার্থনা হাজির করাও হাস্যকর। বিশেষতঃ স্থূল ঐহিক জিনিসের প্রার্থনা। আরও হাস্যকর তাঁর গুণাবলীর নামাবলী পড়ে (এবং নামাবলী পরে) তাঁর এই প্রকার খোসামোদ করা—

"হে ঈশ্বর! আপনি বাতাস বইয়ে দিন, বৃষ্টি ঝরিয়ে দিন, বাগানে ফল ফলিয়ে

দিন, ( কিংবা আমার বাল্যকালের প্রার্থনা )—হে ভগবান, আমার মাথাধরা সারিয়ে দিন—কী উদ্ভট !"

"এই পৃথিবী আমার ভোগের জন্য তৈরী হয়েছে—এটা নির্বোধের স্বার্থপর ধারণা। আহাম্মক বাপ-মা ছেলেদের প্রার্থনা করতে শেখায়—'হে প্রভু! তুমি আমারি তরে সূর্য তৈরী করেছ, চন্দ্র তৈরী করেছ'—যেন এইসব শিশুর জন্য চন্দ্র-সূর্যের খেলনা তৈরী করা ছাড়া প্রভুর আর কোনো কাজকর্ম নেই! তারপর আবার কতকগুলি লোক আছে যারা অন্যভাবে নির্বোধ। তারা আমাদের শেখায়—এইসব জন্তু-জানোয়ারকে তৈরী করা হয়েছে যাতে আমরা ওগুলিকে মেরে খেতে পারি—এই পৃথিবী মানুষের উপভোগের জন্য সৃষ্ট। পুরো আহাম্মকি। তাহলে তো একটা বাঘও বলতে পারে—'মানুষগুলো আমারই পেট ভরানোর জন্য জন্মেছে', এবং ভগবানের কাছে সে প্রার্থনা করতে পারে—'হে প্রভু, কি দুষ্ট সেই মানুষগুলি যারা আমার উদরপূর্তির জন্য আমার কাছে স্বেচ্ছায় হাজির হয় না। প্রভু, ওরা তোমার নিয়ম ভাঙছে। তুমি ওদের সুমতি দাও।' "

স্বর্গের দেবতারা, যাঁদের কাছে প্রার্থনাদি করা হয়, তাঁরা স্বামীজীর কাছে সব-সময়ে খুব বেশী মর্যাদা লাভ করেন নি। ঐসব দেবতা, আকাশের সুখের ওয়েটিং-রুমে বসে আছেন, খানাপিনা, নাচা-গানায় মোহিত হয়ে। এঁরা সৎকর্মের জন্য ঐ অবস্থা লাভ করেছেন—চিরদিন ওখানে থাকবেন এমন নয়। "দেবতাদের রাজা ইন্দ্র—তাঁর 'ইন্দ্রত্ব' একটা অবস্থার নাম—যে-অবস্থা হাজার হাজার মানুষ লাভ করেছে।" "জীবরা স্বর্গে যায়, সময়টা ভালই কাটায়; কেবল দুঃখ যখন দৈত্যরা মাঝে-মাঝে তাদের খেদিয়ে দেয়।...সব পুরাণেই দেখা যায়—দেব দৈত্যে মহা লড়াই, দৈত্যরা লড়ায়ে জেতে কখনো-কখনো। দেখা যায়, দৈত্যরা দেবতাদের মতো জ্ঞাতি করে না। যেমন ধরা যাক, সকল পুরাণের দেবতারা নারীলুব্ধ।" "পুরনো দেবতারা বিচিত্র, উদ্ভট, সশব্দ, যুদ্ধব্যস্ত, মদ্যপানে এবং গোমাংসভোজনে নিরত—মাংসপোড়ার গন্ধ এবং কড়া মদের উপচারে তাঁদের সমূহ উল্লাস! ইন্দ্র মাঝে-মাঝে এমন টানতেন যে, পপাত ধরণীতলে, মুখে বিজ্‌বিজ্‌ শুধু।"

জগতের অধিকাংশ ধর্ম সত্যান্বেষণ ছেড়ে যুক্তিবিরোধী বিচিত্র ধারণার মধ্যে ঘোরাফেরা করে; সমস্ত রকম গোঁড়ামি বজায় রেখেও হঠাৎ 'বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বে'র জন্য চেঁচামেচি শুরু ক'রে দেয়। স্বামীজী একটি কৌতুককাহিনী দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাতে চেয়েছেন—

"মদ খাওয়া ভারতে খুব পাপ কাজ। দুই ভাই এক রাত্রে ঠিক করল—গোপনে মদ খাবে। তাদের খুড়ো খুব রক্ষণশীল—পাশের ঘরেই তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। মদের ভাঁড় হাতে করেই তারা পরস্পর বলে নিল—'একদম চুপ, খুড়োর ঘুম ভেঙে যাবে।'

তারপর তারা খাওয়া শুরু করল—খেয়ে যাচ্ছে আর বলছে—'একদম চুপ, খুড়োর ঘুম ভেঙে যাবে।' ক্রমেই তাদের চেঁচানি বাড়তে লাগল—পরস্পর পরস্পরকে চেঁচিয়ে চুপ করাতে লাগল। ফলে খুড়োর ঘুম ভাঙল, তিনি এসে দেখলেন, দুজনে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে—'একদম চুপ, খুড়োর ঘুম ভেঙে যাবে।' "

স্বামীজী বললেন—আমরা সবাই ঐ মাতালগুলোর মতো—চোখ বুজে কেবল চেঁচিয়ে যাচ্ছি—বিশ্বভ্রাতৃত্ব চাই।

সব ধর্মেই 'প্রেরণা'র দাবিদার রয়েছে—সে সম্পর্কে স্বামীজীর মনোভাবের কথা আগেই বলেছি—এখানে ঐ বিষয়ে তাঁর একটি তামাশা-কাহিনী বলে নিতে পারি।—

স্বামীজীর এক বন্ধুর অতি সুন্দর একটি ছবি ছিল। এক ব্যক্তি, কিছুটা ধর্মঘেঁষা এবং অত্যন্ত ধনী—তাঁর নজর ছিল ছবিটির উপর। তিনি একদিন স্বামীজীর বন্ধুর কাছে এসে বললেন, 'আমি একটা বিশেষ প্রেরণা পেয়েছি—আমি ঈশ্বরের বাণী শুনেছি।' 'প্রভুর কী সে বাণী ?'—স্বামীজীর মোহিত বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন। ভদ্রলোক বললেন—'সে বাণী হল—অবশ্যই আমাকে ঐ ছবিটি দিতে হবে।' স্বামীজীর বন্ধু অতঃপর বিমোহিত। মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'ঠিক বলেছেন। আহা কি অপূর্ব! আমিও একই প্রেরণার বাণী পেয়েছি। ঈশ্বর ছবিটি আপনাকে দেবার জন্য আমাকে সত্যই আদেশ দিয়েছেন। আর হাঁ, আপনি নিশ্চয়ই চেকটাও এনেছেন।' 'চেক—কিসের চেক?'—সবিস্ময়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন। 'আ-হাঃ, তাহলে তো আপনার প্রাপ্ত বাণী ঠিক নয়! আমি বাণী শুনেছিলাম—এক লাখ ডলারের চেক যে-ভদ্রলোক আনবেন, তাঁকেই তুমি ছবিটা দিয়ে দেবে। আপনি মশাই আপনার পাওয়া বাণী খাঁটি প্রমাণ করতে আগে চেকটা আনুন।'

সুতরাং—বাণীর ধাক্কায় বাণীর পলায়ন।।

ধর্ম কোথায়? পুরনো প্রশ্নে আবার ফিরে আসছি। হাসির আঘাত দিয়ে বিদ্রূপের তরবারি চালিয়ে, স্বামীজী পথ পরিষ্কার করতে চেয়েছিলেন—সত্য-ধর্মের মন্দিরের। সৃষ্টির মায়া অচ্ছন্ন ক'রে রাখে সবকিছু—সত্যের সামনে ঝুলছে সেই যবনিকা—স্বামীজী বললেন—মায়া দিয়ে মায়াকে ভাঙো। অনেক গভীর উপমা ব্যবহার করলেন কথাটা বোঝাতে—তারপর হঠাৎ একটা গল্প মনে পড়ে যেতে হেসে ফেললেন—গল্পটাও বললেন এই সূত্রে—

হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের কাছে শৃগাল অশুচি জীব। কুকুরও তাই। এরা যদি খাবার ছুঁয়ে ফেলে তাহলে সে-খাবার ফেলে দিতে হয়। একবার একটি মুসলমানের ঘরে শৃগাল ঢুকে আহার্যের খানিক খেয়ে পালিয়ে যায়। লোকটি বড় দরিদ্র, অনেক কষ্টে কিছু ভালো খাবার বানাতে পেরেছিল—হায়, তাও নষ্ট ক'রে দিল হতচ্ছাড়া শিয়ালটা। খাবারটা ফেলে দিতে হয়—কিন্তু ফেলে দেয়-বা কি করে

—এত কষ্টের খাবার! কী করা যায়! এখন মোল্লা যদি কোনো পথ বাতলে দিতে পারেন। তখন সে মোল্লার কাছে গিয়ে ঘটনাটা বলে বিধান চাইলে। খুব দুঃখ করতে লাগল সেইসঙ্গে—'এত গরীব আমি—কত সাধ করে খাবার তৈরী করেছিলাম —একদিন ভালমন্দ কিছু পেটে যাবে—আর আমার বরাতে এই ঘটল! গরীবের নসিবই এই। এখন আপনি যা করেন।' মোল্লা লোকটির কথা শুনে একটু ভাবলেন; তারপর বললেন, মাত্র একটিই উপায় আছে—যদি তা করতে পারো সবদিক রক্ষা হয়।' 'কী—কী সে পথ, বলুন মোল্লা-সাহেব'—লোকটি ব্যাকুল হয়ে বলে। মোল্লা বললেন, 'তোমাকে প্রথমতঃ একটা কুকুর জোগাড় করতে হবে। তারপর সেই কুকুরটাকে নিয়ে গিয়ে যে থালা থেকে শিয়ালটা খেয়েছে—সেই থালার খাবার খানিকটা কুকুরকে খাওয়াতে হবে। তাহলেই কাম ফতে।' দরিদ্র লোকটি বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এক শেয়ালে রক্ষা নেই, তার উপর কুকুর! মোল্লা তখন ব্যাখ্যা ক'রে দেন—'শিয়াল কুকুরের নিত্য ঝগড়া। সুতরাং শিয়ালে-খাওয়া খাবার এবং কুকুরে-খাওয়া খাবার, দুই-ই যখন তোমার পেটে যাবে—তখন সেখানে ঝগড়া ক'রে তারা কাটাকাটি হয়ে সমান হয়ে যাবে, ফলে খাবার আর অপবিত্র থাকার সুযোগ পাবে না—বুঝলে বোকচন্দর?'

গম্ভীর সব বিষয় নিয়ে স্বামীজী যখন তামাশা করছিলেন তখন গভীরভাবে বিষণ্ণ ছিলেন। এই পৃথিবীতে ধর্মের কী চেহারা দাঁড়িয়েছে! ধর্ম—স্বামীজী বারবার বলতে থাকেন—এখন সৌখীন ভদ্রমহিলার ড্রইংরুমের জাপানী আসবাব। 'আমার প্রেয়সীর বসার ঘরে পৃথিবীর সবরকম সজ্জাদ্রব্য রয়েছে—কেবল একটি জাপানী ফুলদানীর অভাব। ওটি না থাকলে সমাজে মুখরক্ষা হয় না। ওটি ওঁর চাই-ই।' মানে ওঁর সাত-পাঁচ কাজ আছে—এ-পার্টি ও-পার্টি, কত সাংস্কৃতিক সভা ইত্যাদি—এই সঙ্গে একটু ধর্মের ট্র্যাঙ্কুলাইজার না হলে কি চলে?

এর মধ্যে—আধুনিক পৃথিবীতে—কোথায় সেই ব্যাকুলতা ঈশ্বরের জন্য, যা ধাবমান অগ্নির মতো তাড়িত ক'রে ফেরে মানুষকে? স্বামীজী এক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কথাবার্তা স্মরণ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন—'কোটিতে একজনও ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না।' স্বামীজীর বিস্ময়ের শেষ ছিল না—'সে কি? সত্য নাকি?' শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরে বলেন—'ধর্, এ-ঘরে একটা চোর রয়েছে, আর ও-ঘরে রয়েছে একতাল সোনা; চোর সেটা জানতে পেরেছে; দু'ঘরের মধ্যে রয়েছে একটা পাতলা পর্দা—এই অবস্থায় চোরটার মনের ভাব কি রকম হবে?'—'কেন, চোরটা সারারাত ছটফট করবে—একটুও ঘুমোতে পারবে না—কেবলই ভাববে কি ক'রে সোনার তালটা হাতানো যায়'—স্বামীজী স্বতঃই বলেছিলেন। তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন—তাহলে তুই কি মনে করিস—ঈশ্বরে বিশ্বাস করেও মানুষ তাঁকে পাবার জন্য উন্মাদ

না হয়ে পারে ? মানুষ যদি সত্যই বিশ্বাস করে—ঈশ্বর অমৃতসাগর, এবং সেখানে যাওয়া যায়—তাহলে সেখানে যাবার জন্য সে পাগলের মতো দৌড়বে না ?'

স্বামীজী জেনেছিলেন—ঈশ্বর কি বস্তু। তাই তিনি ঈশ্বরবিষয়ে বয়স্ক মানুষের বালোচিত প্রশ্নে হাসি সামলাতে পারেননি। ঈশ্বর কি শিশুর লোভের মেঠাই ? বাল্যকালে স্কুলে একবার একটা ছেলের সঙ্গে স্বামীজীর মারামারি হয়ে যায় মিষ্টি খাওয়া নিয়ে। সে ছেলেটির গায়ের জোর ছিল বেশি, জোর করে সে মিষ্টি ছিনিয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলে। তখন তাঁর মনে হয়েছিল—পৃথিবীতে অতবড় দুষ্ট আর কেউ নেই। বড় হয়ে যদি কোনোদিন হাতে ক্ষমতা পাই, আগে ওটাকে শায়েস্তা করব। স্বামীজী বললেন, শিশুর জগৎ এই খাওয়া-দাওয়া, খেলনা-খেলার জগৎ। পৃথিবী ঐ রকম খাওয়া-দাওয়া ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষায় ভরা বয়স্ক শিশুতে পূর্ণ। এরা ভাবে, ভবিষ্যতে পৃথিবীতে যদি সোনার দিন আসে তখন চারিদিকে কেবল থরে-থরে খাবার সাজানো থাকবে। আফিমখোর ভাবে—স্বর্গের মাটি আফিম দিয়ে তৈরী। রেড ইণ্ডিয়ানরা মনে করে—সুখের পৃথিবীতে কেবল চারিদিকে শিকারের বন। স্বর্গ সম্বন্ধে নরওয়েবাসীর ধারণা একই রকম। তারা মনে করে, স্বর্গ এক ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্রে, যেখানে সকলে ওডিন দেবতার সামনে খানিক বসে থাকে, তারপর বন্যবরাহ শিকার করে। শিকারের পরে পরস্পর যুদ্ধ করে এবং খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। আবার খানিক পরে জুড়েও যায়। তখন মস্ত এক ঘরে বসে শূকর-মাংস পুড়িয়ে খেয়ে সকলে আমোদ-প্রমোদ করে। পরদিন খেয়ে-ফেলা শূকরটি আবার বেঁচে ওঠে, যাতে তাকে পুনশ্চ শিকার করে খাওয়া-দাওয়া করা যায়। অর্থাৎ একটানা ভোগ চাই—সেজন্য শূকর মরবে—এবং বাঁচবে—এবং মরবে—এবং বাঁচবে। এইসব ইন্দ্রিয়জগতে মগ্ন মানুষ প্রশ্ন করে—ধর্ম আমাকে কী দেবে ? খাবার দেবে ? ব্রহ্মজ্ঞান পৃথিবীর কোন্ উপকার করবে ?

আমেরিকার বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী বক্তা রবার্ট ইঙ্গারসোলের সঙ্গে স্বামীজীর নিম্নোক্ত কথাবার্তা হয়েছিল :

ইঙ্গারসোল : আমি এই জগৎটাকে যথাসম্ভব ভোগ করবার পক্ষে। এই জগতের অস্তিত্বটাই একমাত্র নিশ্চিত—বাকি আর সব অনিশ্চিত। সুতরাং লেবুটা যতটা পারো নিংড়ে রস বার করে নাও।

স্বামীজী : আপনি যে উপায়ে লেবুটা নিংড়াবার কথা বলছেন, আমি তার চেয়ে ভাল উপায় জানি, আর তাতে বেশি রসও পাই। আমি জানি, আমার মৃত্যু নেই, তাই রস নিংড়াবার জন্য তাড়াহুড়া করি না—ধীরে সুস্থে বেশ মজা করে নিংড়াই। আমি স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পত্তির ধার ধারি না, তাই জগতের সব নরনারীকে ভালবাসতে পারি। মানুষকে ঈশ্বরবোধে ভালবাসতে পারলে কতটা সুখ হয় ভাবুন।

এইভাবে লেবুটা নিংড়ান তো—হাজার গুণ রস পাবেন—এক ফোঁটাও বাদ যাবে না।"

স্বামীজী দেখলেন—জীবন-মৃত্যুর দুই প্রাচীরে মাথা ঠুকে এধার-ওধার দৌড়াচ্ছে যারা, তারা তারই মধ্যে প্রাণপণ লোভে খাবলে-খাবলে খেয়ে নিতে চেষ্টা করছে। এরা ধর্মের নিত্যজীবন থেকে কত দূরে! খণ্ড সীমার মধ্যে যে-চেহারাটা সে পেয়েছে—তাকেই মাঝে-মাঝে আয়নায় দেখে নিয়ে মুগ্ধ হয়, গর্বিত হয়, ভাবে, কী ব্যক্তিত্ব আমার!—তারপর আতঙ্কিত হয় যখন শোনে—ধর্মের অর্থ নিখিল সত্তায় ব্যক্তি-সত্তার নিমজ্জন। হায়, তাহলে আমার ব্যক্তিত্বের কি হবে? 'ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য বস্তুটি কি?'—স্বামীজী প্রশ্ন করলেন।—'শিশুর গোঁফ নেই—বড় হলে তার গোঁফ-দাড়ি হবে—শিশুটি এক্ষেত্রে আপত্তি করতে পারে, আমার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে গেল। শরীরের নাম যদি ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য হয়—তাহলে একটা চোখ কানা হয়ে গেলে, বা একটা হাত কাটা পড়লেও তো বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যাবে! একটা মাতাল বলতে পারে, আমি মদ ছাড়ব না, তাতে আমার বৈশিষ্ট্য নষ্ট। চোর ভাবতে পারে, চুরি ছাড়ব না, তাতে ব্যক্তিত্ব হারিয়ে যাবে!'

স্বামীজী বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে ভাবলেন—'এরা জানে না, শরীরটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কুসংস্কার।' এই কুসংস্কারই ব্যক্তিত্ব নাম নিয়ে বরসজ্জায় হাজির হয় আমাদের কাছে। স্বামীজীর কাছে ঈশ্বরের শরীরও কুসংস্কার—কম কুসংস্কার নয় ঈশ্বরের গুণকল্পনা। আপেক্ষিক জগতে সাকার সগুণ ঈশ্বর তিনি মানতে রাজী ছিলেন, কিন্তু সগুণ অথচ নিরাকার ঈশ্বরের কল্পনা তাঁকে সদাই হাসিয়েছে। তাঁর মনোভাব—বাপু, ঈশ্বর যখন তোমাকে দু'হাত তুলে মাল দিচ্ছেন, আর দু'পায়ে তোমার শত্রুকে পিষছেন, তখন তাঁকে হাত-পা থেকে বঞ্চিত করাটা কি ভদ্রতা-সঙ্গত? ঈশ্বরক্ষমতায় যদি এত বিশ্বাস, তাহলে মেনে নাও না কেন—তোমাদের জন্য নিরাকার সরবরাহ-গহ্বর হওয়ার ক্ষমতা ঈশ্বরের যেমন আছে, তেমনি নিজের জন্য হাত-পা তৈরী করার ক্ষমতাও তাঁর আছে!

সুতরাং আপেক্ষিক জগতে স্বামীজী নতজানু হতেন সর্বত্র। যেখানেই যথার্থ অনুরাগের সঙ্গে ঈশ্বরকে স্মরণ করা হয়—সেখানেই ঈশ্বরের চিহ্ন। এক খ্রীস্টান মহিলার সঙ্গে গির্জার মধ্যে গিয়ে খ্রীস্টমূর্তির সামনে নত হয়ে তিনি বলেছিলেন—'এই একই প্রভুকে তুমি এবং আমি উভয়েই উপাসনা করি।'

তিনি বলেছিলেন—

"অতীতের সকল ধর্মকে আমি স্বীকার করি। ঐ সকল ধর্মের মানুষ ঈশ্বরকে যে-রূপে উপাসনা করেছে—তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি উপাসনা করি। মুসলমানের সঙ্গে আমি মসজিদে যাব; খ্রীস্টানের সঙ্গে গির্জায় গিয়ে ক্রুশচিহ্নের সামনে নতজানু

হব ; বৌদ্ধমন্দিরে গিয়ে প্রভু বুদ্ধের চরণাশ্রয় নেব ; আমি অরণ্যে গিয়ে হিন্দুর সঙ্গে ধ্যানলীন হয়ে সেই আলোকদর্শন করবার চেষ্টা করব, যা সকল হৃদয়কে আলোকিত করছে।

"আমি কিন্তু থামব না। ঐ সমস্ত-কিছু করার পরেও আমি হৃদয় উন্মুক্ত রাখব ভবিষ্যতের জন্য। ঈশ্বরের রচনা কি শেষ হয়ে গেছে? নাকি অবিচ্ছিন্নভাবে তিনি উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছেন? অপূর্ব সেই গ্রন্থ—যাতে মুদ্রিত রয়েছে পৃথিবীর সকল আধ্যাত্মিক প্রকাশ। বাইবেল, বেদ, কোরান এবং অন্য পবিত্র গ্রন্থগুলি ঐ মূল গ্রন্থের কিছু পৃষ্ঠা—আরও কত পৃষ্ঠা আছে উন্মোচিত হবার অপেক্ষায়—"

# বিচিত্র জীবন বিচিত্র পৃথিবী

জীবন বিচিত্র, পৃথিবী বিচিত্র—একথা সেই বিবেকানন্দের চেয়ে বেশি কে জানেন যিনি মায়ার ছাল ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাওয়ার চেষ্টা করে গেছেন সারাক্ষণ। সবাইকে তিনি দেখতে পারতেন তাদের আসল চেহারায়। যদি দেখতেন, নিজের লেজ কেটে কেউ পরের লেজে হাত দিচ্ছে, তখন হ্যাঁচকা টানে তার খোলসটা খুলে দিতেন আর উপভোগ করতেন উদোম নাচ।

এহেন বিবেকানন্দ ইংরেজের আসল চেহারা একবার দেখাচ্ছিলেন আমেরিকায় এক সভাস্থলে। ইংরেজ মুখে ভালবাসার কথা বলেও কিভাবে অপরের গলা কেটে রক্ত খায়, সেই কথা বলার সময়ে, তারা যে অল্পদিন মাত্র সভ্য হয়েছে, তাও বলতে ছাড়েননি।—'আঃ—হাঃ—ঐ ইংরেজেরা। এই তো কিছুদিন আগেও তারা বন্য ছিল! তাদের মেয়েদের জামার মধ্যে পোকা কিলবিল করে বেড়াত। গায়ের বিকট দুর্গন্ধ ঢাকতে তারা প্রচুর সেন্ট ঢালত।' এসব কথা শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে এক শ্রোতা বলে উঠল—'আপনি কী বকছেন? অল্পদিন আগে? বাজে কথা। ও অন্ততঃ পাঁচশো বছর আগেকার ব্যাপার—।' স্বামীজী তাতে মধুরতম উত্তর দিয়েছিলেন—'কিন্তু আমি কি বলিনি মাত্র কিছুদিন আগে? মানবজীবনের প্রাচীনত্বের তুলনায় কয়েকশো বছর আর এমন কি?—ঠিক নয়?'

পরাধীন ভারতের ছেলেরা শতাধিক বৎসর ধরে ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ে জেনেছিল—হিংস্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মপ্রাণ খ্রীস্টানরা ক্রুজেড লড়েছিল। স্বামীজী উল্টো কথাই শোনালেন। আসলে সভ্য ছিল মুসলমানেরাই—বর্বর ছিল খ্রীস্টানরা, যারা যুদ্ধকালে 'খাবার না পেলে মুসলমান ধরেই খেয়ে ফেলত।' এমনকি তাঁর মারফত এই প্রসিদ্ধির কথা জানা গেল যে, 'সিংহ-হৃদয়' মহাত্মা 'রাজা রিচার্ড মুসলমান-মাংসে বিশেষ খুশি ছিলেন।'

সব দেশে ধর্মের আজগুবিগুলি বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার এক ঢেউ উঠেছে, স্বামীজী বললেন। পরাধীন দুর্বল মানুষ যখন ও-চেষ্টা করে, তবু সহ্য করা যায় কিন্তু সভ্যতাভিমানীরা যদি তা করে? অনেক খ্রীস্টান পাদরী তাই করছিলেন, যখন দেখছিলেন—বিজ্ঞানের ধাক্কায় তাঁদের ধর্মভিত্তি টলোমলো। খ্রীস্টান ধর্মের এহেন এক শশধর তর্কচূড়ামণি স্বামীজীকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন—ইহুদী-নেতা মুসা লোহিতসাগর পায়ে হেঁটে পার হয়েছিলেন, আর পিছনে ধাবমান মিশরী ফৌজ জলে-কাদায় ডুবে গিয়েছিল—এসব জিনিসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর। এই প্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পরক্ষণে যখন দেখা গেল ধোপে টিকছে না, তখন এঁরা বলে বসলেন—'ওটা আমি বিশ্বাস করি। আমার মন সাক্ষ্য দেয়!' এরকম ব্যক্তিদের

সম্বন্ধে স্বামীজী বিতৃষ্ণায় বলেছিলেন—'ওঁদের আবার মনু! ছটাকও নয়, আবার মণ!'

স্বামীজী এই তামাসা দেখলেন—পাশ্চাত্ত্যদেশ যীশুখ্রীস্টের নির্বৈর ও বৈরাগ্যের উপদেশ নিল না, নিল ভারতবর্ষ, এবং সে প্রত্যাখ্যান করল কৃষ্ণের মহা রজোগুণের এই বাণী—'মহা উৎসাহে কার্য করো, শত্রুনাশ করো, দুনিয়া ভোগ করো!' ঐ বাণী উল্টো-পক্ষে পাশ্চাত্ত্যদেশ নিয়ে নিয়েছে। তার ফলে স্বামীজীকে হিন্দু-নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে 'খ্রীস্টান' ইউরোপের এই অপূর্ব পরিহাস শুনতে হয়েছিল—'হিন্দুরা করেছে কি? একটা জাতিকেও জয় করেনি।'

ইতিহাসের আরও পরিহাস স্বামীজী ভারতে দেখেছেন। ভারতে উচ্চবর্ণের কাছে নিম্নজাতির মানুষ 'চলমান শ্মশান'—অকস্মাৎ সে 'চলমান প্রাসাদ' হয়ে পড়ে যদি 'কোনো পাদরী এসে মন্ত্র আউড়ে তার মাথায় খানিকটা জল ছিটিয়ে দেয়, আর সে একটা জামা পরতে পায়, যত ধুলধুলে ছেঁড়াই হোক তা। এখন সে গোঁড়া হিন্দুর বাড়িতেও প্রবেশাধিকার পেয়ে যায়।' স্বামীজী বলছেন, 'আমি তো এমন লোক দেখিনা যে, তাকে এখন একখানা চেয়ার এগিয়ে না-দিতে বা তার সঙ্গে সপ্রেম করমর্দন না-করতে সাহস করে। এর থেকে অদৃষ্টের পরিহাস আর কি হতে পারে?'

জীবনের কত পরিহাস, প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্ত্যে! স্বামীজী দেখলেন, ভারতে বিধবার অশ্রুতে পৃথিবী সিক্ত, পাশ্চাত্ত্যে আকাশ-বাতাস পূর্ণ কুমারীর দীর্ঘশ্বাসে। একদিকে রয়েছে বিধবা-সমস্যা, অন্যদিকে ওল্ডমেড-সমস্যা। পাশ্চাত্ত্যে অজস্র মেয়ের বিয়ে হয় না, তারা বুড়িয়ে শুকিয়ে যায়, পৃথিবীকে তারা শত্রু মনে করে, ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর তাদের স্বভাব। অপরপক্ষে হিন্দুবিধবারা শরীরের প্রলোভনে ধরা দিয়ে নিজের ও সমাজের কোন্ সর্বনাশ ডেকে আনে, বিদ্যাসাগর মর্মন্তুদ ভাষায় তার বর্ণনা করেছেন। বিবেকানন্দের বেদনাতিক্ত বিদ্রূপে পাশ্চাত্ত্যের কুমারী মেয়েদের লজ্জা ও যন্ত্রণার রূপ ফুটেছে। ইংলণ্ডে থাকাকালে একটি চাঞ্চল্যকর মামলাসূত্রে সংবাদপত্র থেকে তিনি জেনেছিলেন—অজস্র সদ্যোজাত শিশুকে গলা টিপে মেরে টেমসের জলে ফেলে দেওয়া হয়। ও-পাপ যারা করে তারা অধিকাংশই কুমারী। স্বামীজী বলেছিলেন—'The water of Thames has turned into babies soup.'—টেমসের জল শিশুমাংসের ঝোলে পর্যবসিত হয়েছে।

বাপ-মা বিয়ে দেয়, তাতে কবিতা নষ্ট, স্বামীজী স্বীকার করেছেন—কিন্তু তাতে স্বস্তিও আছে। অপরপক্ষে, চেষ্টা করে যাদের স্বামী যোগাড় করতে হয়, তাদের প্রাণান্ত প্রয়াস—কিভাবে রূপযৌবনকে বেঁধে রেখে ঐ সংগ্রহকাজ তারা চালিয়ে যেতে পারে। এই পাশ্চাত্ত্য-মহিলারা সৌন্দর্যের দায় মেটাতে শরীরের উপর অকথ্য

উৎপীড়ন করেন, সেটা দোষের নয়, কিন্তু অবশ্যই দোষী চীনের মেয়েরা—কেন তারা কাঠের জুতো পরে পা ছোট করে !!

ভারতীয় নারীদের অবস্থা অতি শোচনীয়—স্বামীজী পাশ্চাত্ত্যে সর্বত্র শুনেছেন। অবাক হয়ে ভেবেছেন—হায়, যত দুঃখ সবই মেয়েদের, পুরুষদের কোনো দুঃখই নেই। ভারতে ছোট-ছোট মেয়েদের ধরে-ধরে বিয়ে দেওয়া হয়, কি অন্যায় !—মর্মপীড়িত মহিলা স্বামীজীকে তীব্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—

মহিলা—এইসব ছোট-ছোট মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয় কাদের সঙ্গে ?

স্বামীজী—কেন, বুড়োদের সঙ্গে।

মহিলা—তাহলে ছোকরাদের কি গতি হয় ? তাদেব কি বিয়ে হয় না ?

স্বামীজী—হয়ত হয়। সেক্ষেত্রেও বালিকাদের কষ্ট পেতে অসুবিধে নেই—আমরা যে জন্মবৃদ্ধ ! )

পাদরীকুলের সাহায্যকারিণী এক বদান্য মহিলা ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসীদের উপর বড বিরূপ। ভারতে, আরে ছি ছি, লাখে-লাখে সন্ন্যাসী ঘুরে বেড়াচ্ছে উপার্জনের চেষ্টামাত্র না করে !

মহিলা ( তিক্তভাবে স্বামীজীকে )—আপনাদেব দেশের অত সাধু-সন্ন্যাসীর ভরণপোষণ করে কারা ?

স্বামীজী ( স্নিগ্ধ স্বরে )—তাঁরাই মহাশয়া, আপনাদের দেশেও যাঁরা পাদরী-পুরুতদের পুষে থাকেন—মহিলাগণ।

মানবজীবনের গভীরতর অসঙ্গতির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে স্বামীজী বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই দেখলেন, পৃথিবীতে কয়েকটা সুবর্ণগোলক গড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই নিয়ে সকলের কাড়াকাড়ি। যে সেটি পেয়ে গেল, সে হয়ে দাঁড়াল ধনী, তারপর তার বৈঠকখানা সদাই পূর্ণ, উমেদারে। উমেদারেরা বিশেষ কিছু পাচ্ছে না, তবু অবিরাম আসছে। সব কিছুর শেষ আছে, আশা যে অশেষ !

ধনীই কি সুখী ? সামান্য দান করেই দানফলের হিসেব নিতে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। "বিশ ডলার দান করে নিজের নাম প্রকাশিত দেখবার জন্য সানফ্রান্সিস্কোর সমস্ত সংবাদপত্র কিনতে সে ছোটে।" সেইসঙ্গে আবার সে ধননাশের আতঙ্কে অস্থির। "রোমের এক বিরাট ধনী ব্যক্তি যখন জানলেন, তাঁর সম্পত্তির মধ্যে মাত্র দশলক্ষ পাউণ্ড অবশিষ্ট আছে, তখন তিনি 'তাহলে কাল আমি কি করব' ভেবে আত্মহত্যা করলেন।"

ধনের অসুখের সঙ্গে ভিক্ষার লজ্জাও স্বামীজী দেখেছিলেন। অথচ স্বামীজী স্বয়ং ভিখারী, তাঁর তো লজ্জা নেই। তখন তিনি বাধ্য-ভিখারী ও স্বেচ্ছা-ভিখারীদের তফাতটা দেখিয়ে দিলেন। স্বেচ্ছা-ভিখারী যেন অনেকটা অভিনেতার মতো, মঞ্চে

ভিখারীর ভূমিকায় নেমেছে। 'এর সঙ্গে তুলনা করো রাস্তার বাস্তব ভিক্ষুকের। পরিবেশ দৃশ্যতঃ উভয়ক্ষেত্রে এক, উভয়ের ভাষাও এক। কিন্তু তবু কি প্রভেদ! ভিক্ষুকের কাজকে একজন উপভোগ করছে, আর অন্যজনকে বিঁধছে তার কাঁটা। তফাত হচ্ছে কোথায়? একজন বদ্ধ, অন্যজন মুক্ত। অভিনেতা জানে, তার ভিক্ষুক-বৃত্তি সত্য নয়, অভিনয়ের জন্যই ঐ সাজ। অপরদিকে আসল ভিখারী জানে, এই আমার বরাত; একে চাই বা না-চাই—দায় টেনে চলতেই হবে।'

স্বামীজী বলে চললেন—'এক টুকরো রুটি না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব, আর এক সম্ভ্রান্ত মহিলা পাগল হয়ে যাবেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত হীরার পিনটি না পেলে।' স্বামীজী দেখলেন, পত্নী তার স্বামীকে ব্যাকুল হয়ে প্রেম নিবেদন করছে—'আহা প্রাণনাথ, তোমায় কত ভালবাসি, তোমার বিহনে আমার সব অন্ধকার,' তারপরেই, 'স্বামীর মৃত্যু হওয়া মাত্র, সিন্দুকের চাবির সন্ধানে উক্ত প্রেমিকা অনুরূপ আবেগে ধাবমান।' স্বামীজী আমেরিকার পথে চলতে-চলতে চমকে ফিরে তাকালেন—কি কাণ্ড, পাগড়ি ধরে টানে কে? পাগড়ি টানছে সুসভ্য আমেরিকান! স্বামীজী নিজেকে সামলে নিলেন—বেশী চমকাবার দরকার নেই, ওটা অজ্ঞানের অসভ্যতা। অজ্ঞানের অধিক বর্বরতা তিনি দেখেছেন—লণ্ডনে পথ দিয়ে চলবার সময়ে, তাঁর প্রাচ্য পোষাক দেখে কয়লাগাড়ির গাড়োয়ান কয়লা ছুঁড়ে মেরেছিল—কালা আদমীর গায়ে কয়লার ছাপ পড়ে কিনা দেখবার জন্য। কিন্তু তিনি হেসে ফেলেছিলেন জ্ঞানের লজ্জা দেখে—যারা পাগড়িতে টান দিয়েছে বা কয়লা ছুঁড়েছে তারা স্বামীজী ভাল ইংরেজি জানেন দেখে খুবই সঙ্কুচিত!!

ইউরোপীয়দের এ চেহারা স্বামীজী ভারতে থাকাকালে যথেষ্ট দেখেছেন। রাজপুতনায় স্বামীজী ট্রেনে করে আসছেন। সেই কামরায় দুজন ইংরেজ ছিলেন, যাঁরা স্বামীজীকে অশিক্ষিত ধরে নিয়ে ইংরেজিতে তাঁকে লক্ষ্য করে প্রচুর ঠাট্টা-তামাশা করছিলেন। স্বামীজী চুপচাপ শুনে গেছেন। কিছুপরে ট্রেন এক স্টেশনে থামলে স্বামীজী স্টেশন মাস্টারের কাছে ইংরেজিতে এক গ্লাস খাবার জল চাইলেন। সাহেবরা তা শুনে মহা অপ্রস্তুত—তাহলে তো লোকটা ইংরেজি জানে, সব কথার মানে বুঝেছে! তাঁরা তখন অপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—তিনি তাঁদের কথা বুঝতে পেরেও প্রতিবাদ না করে চুপ করে ছিলেন কেন? স্বামীজীর মধুকণ্ঠে বললেন, 'নির্বোধ লোকের সংসর্গে আসা আমার জীবনে তো এই প্রথম নয়। আমি ঢের বেকুফ দেখেছি।' স্বামীজীর সুস্বাস্থ্য উক্ত দুই ইংরেজকে অতঃপর না-রাগতে উৎসাহ দিয়েছিল।

স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনের অনুরূপ একটি ঘটনা:

আবুরোড স্টেশনে স্বামীজীকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছেন এক ভারতীয়

রেলকর্মচারী। ট্রেন ছাড়ার আগে তিনি কামরায় বসে স্বামীজীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। সেটা অসহ্য লাগল জনৈক সাহেব রেলকর্মচারীর। তিনি এসে ভারতীয় রেল্‌কর্মচারীকে নেমে যেতে বললেন। ভারতীয়টি তাতে রাজি না হওয়ায় উভয়ের মধ্যে ঘোর ঝগড়া বেধে গেল। স্বামীজী তখন উভয়কে থামাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাতে সাহেব গেলেন চটে। চড়ে উঠে স্বামীজীকে বললেন, 'তুম্‌ কাহে বাত কর্‌তে হো?' তখন স্বামীজী নিজ মূর্তি ধরলেন।

স্বামীজী (প্রচণ্ড ধমক দিয়ে)—তুম্‌ তুম্‌ করছ কাকে? উচ্চশ্রেণীর যাত্রীর সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয় জানো না?

সাহেব কর্মচারী (থতমত খেয়ে, গুটিয়ে গিয়ে)—আমি দুঃখিত। আমি ও-ভাষাটা (হিন্দি) ভালো জানি না। আমি শুধ্‌ এই লোকটাকে...(...I only wanted this man...)

স্বামীজী (পুনশ্চ ধমকে)—তুমি বললে হিন্দী ভালো জানো না। এখন দেখছি তুমি তোমার নিজের ভাষাও জানো না। 'লোকটা' কি? 'ভদ্রলোকটি' বলতে পারো না? (Now I see that you do not even know your own language. This 'man' of whom you speak is a gentleman.)

পূর্ব প্রসঙ্গে ফেরা যাক। স্বামীজী সভ্যতার নজরকে বলিহারি করলেন। একটি দুঃখী মেয়ে তার কষ্টের প্রতি অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের অনেক চেষ্টা করেছিল—ব্যর্থ হয়ে দেহের ব্যবসায়ে নেমে পড়ল—আর তখনি সে নজরে পড়ে গেল এক পরম ধর্মশীলা মহিলার। তিনি তাকে বডই গালমন্দ করতে লাগলেন। তাতে মেয়েটি বলল, কি করব বলুন, এই একটি মাত্র উপায়েই আপনাদের করুণালাভ করতে পারি। এখন অতি অবশ্যই আমি 'হোম'-এর আশ্রয় ও সাহায্য পেয়ে যাব।

আমাদের তথাকথিত ভালো মানুষগুলি পাপসন্ধানে কি-রকম অসুস্থ আনন্দ পান, সে বিষয়ে স্বামীজী অধিকন্তু একটি গল্প বলেছিলেন (যেটি আসলে রামকৃষ্ণের গল্প), তার মোট কথাটা এই:

এক গাঁয়ে এক মস্ত সাধু ছিলেন, গাছতলায় থেকে সারাক্ষণ জপ-তপ, প্রাণায়ামাদি করতেন, সামান্য ফল দুধ খেতেন এবং লোকশিক্ষা দিতেন। তিনি যে খুবই পবিত্র, এই ধারণা তিনি অন্যের মনে সদাই জাগাতেন। গাঁয়ে একটি মন্দ মেয়ে ছিল—সাধু তার কাছে গিয়ে নিয়মিত শোনাতেন—তাকে নরকে যেতেই হবে। মেয়েটির উপায় ছিল না, পেটের দায়, কিন্তু আতঙ্কেরও শেষ ছিল না। সে কেবল ভগবানের কাছে কেঁদে পড়ত—'প্রভু দয়া করো। উপায় নেই বলেই এই পাপকাজ করছি।' তারপর ঘটনাচক্রে ঐ সাধু ও ঐ মন্দ মেয়েটি একই দিনে মরল। দেবদূতেরা

এসে মন্দ মেয়েটিকে স্বর্গে নিয়ে চলল, আর যমদূতেরা ধরল সাধুকে। সাধু এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারস্বরে প্রতিবাদ জানালে যমদূতেরা বলল, 'বাপু, মেয়েটি মন্দ কাজ করত কিন্তু তার মন পড়ে ছিল ভগবানের দিকে, আর তুমি সারাক্ষণ ধর্মকাজ করেছ কিন্তু মন ছিল মন্দে লেপ্টে। তুমি কেবল পাপ দেখেছ, পাপ খুঁজেছ, পাপ ভেবেছ—সুতরাং এখন সেইখানে চলো যেখানে কেবল পাপই আছে।'

আরও বিচিত্র পরিহাস আছে। একটি সন্ন্যাসী সত্যই পাপ থেকে পরিত্রাণ চান —সত্যই তিনি স্থির হয়ে বসতে চান শান্তির আসনে—তিনি চল্লিশ বছর হিমালয়ে ঘুরেছেন অস্থির হয়ে—সেই বাসনায়!! এবং একটি হরিণ, স্বামীজী বললেন, 'বৈজ্ঞানিকেরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন, প্রতিদিন ৬০।৭০ মাইল দৌড়য় মিথ্যা ভয়ে।'

এইসূত্রে এসে যায় স্বামীজীর বলা ঈশপের গল্পটি :

এক বৃহৎ সুন্দর হরিণ হ্রদের জলে নিজের ছায়া দেখে খুব খুশি হয়ে নিজের শাবককে রাজকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'দ্যাখ্ দ্যাখ্, আমাকে দ্যাখ্। আমার শিংগুলো কী শক্ত আর বড়ো! এই শিং দিয়ে ঢুঁ দিলেই মানুষ অক্কা পেয়ে যাবে।' ঠিক তখনি দূরে শিকারীর শিঙা শোনা গেল। শুনেই হরিণ দৌড়তে আরম্ভ করল—দৌড় দৌড়—অনেক দূরে গিয়ে থামল। বহু কষ্টে তার বাচ্চা সেখানে পৌঁছল। হাঁপাতে-হাঁপাতে সে মাকে বলল, 'মা তুমি পালিয়ে এলে কেন—তোমার শিঙে যখন অত জোর?' হরিণ বলল, 'বৎস, কথা তো তাই। কিন্তু যখন শিকারীর শিঙা শুনি, কি-যে হয়, আমার জ্ঞান থাকে না—আমি দৌড়তে থাকি।'

একই ইনস্টিনকট-এর তাগিদ সর্বত্রই। 'নিষ্ঠাবান অদ্বৈতবাদী সর্বজীবে নারায়ণ দেখেন, তিনি রাস্তায় ভাবতে-ভাবতে চলছেন, ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান, এমন সময়ে একজন তাঁকে ধাক্কা দিল, তিনি চিতপাত হয়ে পড়লেন, আর 'মাথায় ঝাঁ করে রক্ত চড়ে গেল, হাত মুষ্টিবদ্ধ, রাগে পাগল, সদসৎ বিচার লুপ্ত—শিবের বদলে ধাক্কা-দেওয়া লোকটির মধ্যে দেখতে পেলেন ভূত।'

স্বামীজী আরও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন : 'ভারতে যদি কোনো পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি বেদান্তে বিশ্বাস করেন, তিনি বলবেন, অবশ্যই, বেদান্ত আমার জীবন। যদি বলি, আপনি সর্ববস্তুর অভেদ, সর্বজীবের সাম্য মানেন? তিনি বলবেন, নিশ্চয়ই। তারপরেই যদি কোনো নীচুজাতের মানুষ এই পুরোহিতের দিকে এগিয়ে আসে, অমনি তিনি লাফিয়ে সরে যাবেন, পাছে স্পর্শদোষ ঘটে যায়। তখন যদি প্রশ্ন করা যায়, ও কি, আপনি তো বলছিলেন, আত্মায় পার্থক্য নেই, সবাই এক। তাতে তিনি বলবেন, আহা, ও-জিনিস গৃহস্থের পক্ষে তত্ত্বকথা। আগে বনে যাই, তারপরে সব এক দেখব।'

একই ব্যাপার ইউরোপেও, স্বামীজী বললেন। সেখানকার ধনী ব্যক্তিরা খ্রীস্টান

হিসাবে মানবভ্রাতৃত্বে নিতান্তই বিশ্বাস করেন কিন্তু ঐ বিশ্বাস ঘোষণার পরেই ইতরসাধারণ সম্বন্ধে যাচ্ছেতাই গালমন্দ করতে তাঁদের বাধা নেই।

নিজ বুদ্ধিতে অতিবিশ্বাসের অনেক কাহিনীই স্বামীজী বলতেন। রাজপুতনায় এক মস্ত বেদান্তী পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হচ্ছিল। পণ্ডিত ধারালো গলায় বললেন, 'দেখুন, আমি বেদান্তী। আমি অবতারাদি মানি না। আমরা সকলেই ব্রহ্ম। সুতরাং অবতারও যা, আমিও তাই। আমিই অবতার।'

স্বামীজী ঝটিতি বললেন, 'ঠিক ঠিক। ষোল আনা খাঁটি কথা। আপনি অবশ্যই অবতার। তবে হিন্দুরা মৎস্য, কূর্ম, বরাহকেও অবতার বলে। ওদের মধ্যে আপনি কোন্‌টি হতে চান?'

সকলের অট্টহাসিতে পণ্ডিতের প্রতিবাদ ডুবে গেল।

ঠিক এর উল্টো রূপও আছে। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ মাদ্রাজে গেছেন, জ্ঞানবুদ্ধিতে সকলকে চমকিত করেছেন। কিন্তু মাদ্রাজের কিছু চিন্তা-জ্যোতিষ্ক ঠিক করলেন—স্বামীজীকে কোনঠাসা করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে এক ঘরোয়া সভায় তাঁকে ডাকা হয়েছে। স্বামীজী নিজেকে অদ্বৈতবাদী বলেন। এই পণ্ডিত-ঘোঁটের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রশ্ন করা হল—'আপনি বলছেন আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে এক। তাহলে তো আপনার দায়িত্ব বলে কিছু রইল না। যখন আপনি কোনো পাপ করবেন, কি ন্যায় পথ থেকে ভ্রষ্ট হবেন, তখন আপনাকে বাধা দেবার তো কিছু রইল না।' তৎক্ষণাৎ স্বামীজী বিধ্বংসী উত্তরটি দিলেন: 'যদি সত্যই বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের সঙ্গে আমি এক, তাহলে পাপের পথে যাবো কি করে? এক্ষেত্রে বাধা দেবার প্রশ্নই ওঠে না।'

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) একবার স্বামীজীর সেবাধর্ম সম্বন্ধে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, 'ওসব তো জাগতিক ব্যাপার। সুতরাং মায়ার অন্তর্গত। বেদান্তের লক্ষ্য—মায়া খণ্ডন করে মুক্তিলাভ করা। সেক্ষেত্রে এইসব সেবাকর্মের বাসনা কেন?'

স্বামীজীর উত্তর ছুরির মতো কেটে ঢুকেছিল—'মুক্তির ধারণাটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয়? বেদান্ত কি বলেনি—আত্মা নিত্যমুক্ত। তাহলে আত্মার মুক্তি কথাটা উঠছে কেন?'

মানুষের অভ্যাস, নিজের দোষের সাফাই গাওয়া, এবং নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে গুরুতর ধারণা করে বসা। শেষোক্ত বিষয়ে স্বামীজী সুপরিচিত কৌতুকজনক গল্পটি অনেকবার বলেছেন: একটা সহৃদয় মশা অনেকক্ষণ ষাঁড়ের শিঙের উপর বসেছিল। শেষে ভাবল, :আহা, আমি বসে আছি, আমার ভারে ষাঁড়ের না-জানি কত কষ্ট হচ্ছে। তখন সে অনুতপ্ত গলায় বলল, 'ভাই ষাঁড়, বহুক্ষণ তোমার শিঙে বসে থেকে

তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছি, মাপ করো ভাই, আমি এখন উড়ে যাচ্ছি।' ষাঁড় শুনে বলল, 'কি বললে ? তুমি আমার শিঙে বসেছিলে, তাই নাকি ? যা' হোক তোমাকে দুঃখ করতে হবে না। তুমি সপরিবারে আমার শিঙে এসে বসবাস করো।'

কোনো এক বিচিত্র সূত্রে ঐ ক্ষুদ্র তুচ্ছ মশাটি দিগ্বিজয়ী গ্রীক সম্রাটের সঙ্গে বাঁধা পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত মশার সুবিবেচক অহঙ্কার ও দিগ্বিজয়ীর দর্পিত আস্ফালনের মধ্যে কোনো তফাত ছিল না।

দিগ্বিজয়ী সম্রাট ভারতে এসে ভারতীয় সাধুর সন্ধানে ব্যস্ত হলেন। অনেক খোঁজখবরের পরে তিনি এক সাধুর কাছে গেলেন, যিনি একটা পাথরের উপর বসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে সম্রাট বড়ই সন্তুষ্ট হলেন। সাধুকে নিজের দেশে নিয়ে যেতে চাইলেন। সাধু বললেন, না, আমি এই বনে বেশ আছি। সম্রাট বললেন, আমি সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট—আপনাকে আমি অজস্র ধন-ঐশ্বর্য, পদমর্যাদা দেব। সাধু শুনে হেসে ফেললেন। সম্রাট বললেন, আপনাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে। সাধু বললেন, যাব কেন ? সম্রাট বললেন, এইজন্য যে, আপনি যদি না যান, তাহলে আপনাকে মেরে ফেলব।

সাধু এতাবৎ মৃদু-মৃদু হাসছিলেন, এবার হা-হা করে হেসে ফেললেন। বললেন, তুমি এতক্ষণ ধরে যেসব কথা বলেছ, তার মধ্যে শেষের কথাগুলি চূড়ান্ত মূর্খামির। তুমি আমাকে মারবে—যে আমাকে সূর্য শুষ্ক করতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না, বারি সিক্ত করতে পারে না, তুমি আমাকে মারবে—অবিনাশী আত্মাকে মারবে!—হাঃ হাঃ হাঃ!

মানুষের বিচিত্র বাসনার বিপত্তি সম্বন্ধে স্বামীজী একবার একটি বড় মজার গল্প শুনিয়েছিলেন ঃ

এক গরীব লোকের ব্যাকুল প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবতা তাঁকে বর দান করে-ছিলেন—'এই নাও পাশা। যে-কোনো প্রার্থনা করে তিনবার এই পাশা ফেললে তা পূরণ হবে, কিন্তু মনে রেখো, মাত্র তিনবারই।' লোকটি আহ্লাদে আটখানা হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল—কী বর চাওয়া যায়! স্ত্রী বললে, 'ধনদৌলত চাও।' স্বামী বললে, 'দেখ, আমাদের দুজনেরই নাক খাঁদা, লোকে বড্ড ঠাট্টা-তামাশা করে। অতএব গোড়ায় সুন্দর নাক চাওয়া যাক।' স্ত্রীর কিন্তু তাতে মত নেই, ফলে জোর তর্ক। শেষে স্বামী রেগে বললে, 'আমি আর-কিছু চাই না, আমাদের কেবল সুন্দর নাক হোক।' এই কথা বলে যেই-না পাশা ফেলা অমনি দুজনের সর্বাঙ্গে রাশি-রাশি নাক গজিয়ে উঠল। কী বিপদ! তাড়াতাড়ি দ্বিতীয়-বার পাশা ফেলে সে বলল, 'সব নাক চলে যাক।' অমনি সব নাক চলে গেল, পুরনো খাঁদা নাক অবধি রইল না। সর্বনাশ! উপায় ? তারা ভাবলে, এবার

যদি পাশা ফেলে আমরা সুন্দর দুটি নাক চেয়ে নিই, তাহলে লোকে অবশ্য খাঁদা নাকের বদলে কি করে অমন সুন্দর নাক হল জিজ্ঞাসা করবে, তখন তাদের সব কথা বলতে হবে, তাতে তারা বুঝবে আমরা কত আহাম্মক! ফলে আরও বেশি ঠাট্টা-তামাশা করবে। বলবে, এরা এমন গর্দভ যে, তিনটে বর পেয়েও নিজেদের অবস্থা ফিরিয়ে নিতে পারলে না। কাজ নেই বাবা ভালো নাকে, আমাদের আগেকার অবস্থাই ভাল। লোকটি তৃতীয়বার পাশা ফেলে নিজেদের হারানো খাঁদা নাক ফিরিয়ে আনলে।

মানুষ সত্যই কি চায়? 'সে এক টুকরো রুটির দাস, এক ঝলক শ্বাসবায়ুর দাস, সাজ-পোশাকের দাস, দেশের দাস, দেশপ্রেমের দাস, নাম-ধাম খ্যাতির দাস।' সে ভোগ করতে চায়। যদি সে ধনী হয়, ভোগ্যবস্তু অনেক থাকা সত্ত্বেও সে অতৃপ্ত, অবিরত চেষ্টা করছে কিভাবে স্নায়ুর উত্তেজনা বাড়ানো যায়; কিংবা হয়ত তার ভোগের সামর্থ্যই নেই; কিংবা সে কাঁদছে, উত্তরাধিকারী নেই বলে—কে তার এত সম্পদ ভোগ করবে! আর যদি সে দরিদ্র হয়, যখন এক টুকরো রুটি যোগাড় করতে পারছে না, তখন তার পিছনে ছুটছে এক দঙ্গল ছেলেপুলে। তার অন্ততঃ উত্তরাধিকারীর অভাব নেই।

স্বামীজী প্রশ্ন করলেন—যার স্বাস্থ্য আর সামর্থ্য আছে, সেও কি পুরো ভোগ করতে পারে? সম্পন্ন স্বাস্থ্যবান মানুষ কি একটা কুকুরের মতো মাংসের হাড় চিবোতে পারে আনন্দে? একটা কুকুর যখন মাংস খায়—সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে তা খায়। তার সবটাই শরীর। মানুষের ক্ষেত্রে অপরপক্ষে মন নামক বস্তুটা তার খাদ্যসুখের মাঝখানে জিজ্ঞাসার আকারে উপস্থিত।

সুখ এত দুর্লভ বলে সুখের দোকানদারি এত বেশি। বস্টনে থাকাকালে এক ছোকরা স্বামীজীর হাতে একবার একটা কাগজের টুকরো গুঁজে দেয়—সেই কাগজটিতে হস্তাক্ষরে লেখা ছিল—'পৃথিবীর যত সুখ আর সম্পদ তোমারই জন্য অপেক্ষা করছে। কেবল তুমি জানো না, কি করে তাকে পেতে হয়। আমি তোমাকে সে পথ দেখিয়ে দিতে পারি। চার্জ—পাঁচ ডলার।'

স্বামীজী হাসলেন। বেচারা পাঁচ ডলারের বিনিময়ে অপরকে পৃথিবীর সম্পদের পথ বাতলে দেবে—কিন্তু এমন মহাবার্তার হ্যাণ্ডবিলটা ছাপাবার সামান্য পয়সাও জোগাড় করতে পারেনি !!

পৃথিবীতে সুখ-দুঃখ সমপরিমাণ, কেউ তার হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে না, বড় জোর চাকাটাকে এধার থেকে ওধারে গড়ানো যায়। অবস্থাটা, স্বামীজী বললেন, দান্তের নরকের কৃপণের ভাগ্যের মতো, যাকে সোনার পাত দিয়ে পাগড় মোড়ার শাস্তি

দেওয়া হয়েছিল, কেননা সে বড় সোনা ভালবাসে। কিন্তু যতই সে চেষ্টা করেছে ততই হড়কে নেমে এসেছে সোনার পাত।

কৃপণ তুচ্ছ অবজ্ঞেয় মানুষ। স্বামীজী হাসতে লাগলেন আদর্শবাদী স্বাপ্নিকদের কথা ভেবে, যাঁরা পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য, মিলেনিয়্যাম, আনতে চেয়েছেন, যাঁদের মনোগত বাসনা, এ-জগতের সব লোকের বাড়ি সোনার পাতে মুড়ে দেবেন। এই ছেলেভুলানো ছড়া শুনে স্বামীজীর স্ফূর্তির সীমা নেই—আহা। ওঁদের কি মহা-প্রাণতা! কেবল, উক্ত মিলেনিয়্যামবাদীরা সবাই ভাবেন, অবতীর্ণ স্বর্গরাজ্যের এক নম্বর অমৃত তাঁরাই চাটবেন। স্বর্গরাজ্যের অপূর্ব স্বার্থহীন পরিকল্পনা বটে!

সুতরাং স্বামীজীর কিছু-বিষণ্ণ, কিছু-তিক্ত প্রশ্ন—পচা ঘা-কে ফুল দিয়ে ঢাকা যায়? মৃতদেহ প্রার্থনা পূরণ করতে পারে? পাগলাগারদ স্থিতপ্রজ্ঞের বাসস্থান হয়? নাগরদোলা থামে? কুকুরের লেজ সোজা হয়?

মানুষ খ্যাতির দাস, সবাই জানে, কিন্তু খ্যাতিলোভ কি উদ্ভট আকার ধরতে পারে, স্বামীজীর কথা থেকে তা জানতে পারি ঃ

"চীনে মারা না গেলে কেউ খেতাব পায় না। সুতরাং সেখানে মানুষ সারাজীবন খেটে গেল—মারা যাবার পরে খেতাব পাবার জন্য! সেখানে অধিকন্তু, কোনো মানুষ ভাল কাজ করলে তার মৃত বাবা বা ঠাকুর্দার উপর সম্মান খেতাব আরোপ করা হয়। ঐ উদ্দেশ্যেই কত লোক খেটে মরে। কোনো-কোনো মুসলমান-সম্প্রদায়ের মানুষ পরিশ্রম করে যাতে তার মৃত্যুর পরে কবরের উপর সৌধ নির্মিত হতে পারে। এমন সম্প্রদায়ের কথাও জানি যারা শিশু জন্মালেই তার জন্য সমাধিস্তম্ভ তৈরী করে ফেলে। শিশুর পিতার পক্ষে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যত বৃহৎ আর সুন্দর হবে সমাধিস্তম্ভ, পিতা ততই ধনী বলে পরিগণিত হবেন। অন্য অনেক মানুষ আছে যারা সারাজীবন যতরকম বজ্জাতি সম্ভব করে গেল, তারপর একটা মন্দির তৈরী করল কিংবা পাদরী-পুরুতকে টাকা দিয়ে স্বর্গের পাশপোর্ট যোগাড় করে ফেলল।"

স্বামীজী দেখলেন, কেউ আর্তনাদ করছে—'সোলন! সোলন!' আবার কেউ বলছে—'আমার হীরেটা এনে আমার বুকের উপর রাখো।'

নিজ ঐশ্বর্য ও আধিপত্যে পরম সুখী রাজা ক্রিসাস, মহাজ্ঞানী সোলনকে বলেছিলেন—আমার দেশ বড় সুখের দেশ। আমি বড় সুখী, আমার থেকে সুখী কেউ নয়।

সোলন বললেন—বিশেষ সুখী লোক তো আমি দেখি না। সুখী—চরম সুখী—কেউ আছে নাকি? চরম সুখী কেউ হয় না।

ক্রিসাস সগর্বে বললেন—আপনি অত্যন্ত বাজে কথা বলছেন। জগতে আমিই সর্বাপেক্ষা সুখী।

সোলন—মহারাজ অপেক্ষা করুন, হঠাৎ সিদ্ধান্ত করবেন না।

ক্রিসাস কিছুদিন পরে পারসিকদের হাতে পরাজিত হলেন। তারা তাঁকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবার সিদ্ধান্ত করল। চিতা প্রস্তুত। দাউ-দাউ করে জ্বলছে। ক্রিসাসকে সেখানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন—'সোলন! সোলন!'

শেষ মুহূর্তে ক্রিসাসের জ্ঞানোদয় হয়েছিল। অনেকের ক্ষেত্রে তাও হয় না।

এক দিগ্বিজয়ী সম্রাট সারা পৃথিবীটাকে জয় করেছেন কিন্তু মৃত্যুকে জয় করতে পারে নি। মৃত্যুকাল এলে অনুচরদের আদেশ দিলেন, আমার সামনে ধনরত্নভরা কলসী সাজিয়ে দাও। সব সেরা হীরেটা বুকের উপর রাখো। সেই অবস্থায় তিনি কাঁদতে লাগলেন—এবং মরলেন—'ঠিক যেন কুকুরের মতো'—স্বামীজী বলেছেন।

এক বৃদ্ধ সৈনিক ষাট বৎসর কারারুদ্ধ ছিল। নূতন সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের সময়ে তাকে মুক্তি দেওয়া হল। বহু বৎসরের অন্ধকার-জীবনের পরে মুক্তির আলোক তার অসহ্য লাগল। সে ছটফট করে চেঁচিয়ে বলল—হয় আমাকে কারাগারে নিয়ে যাও, না হয় মেরে ফেলো।

স্বামীজী বললেন, 'যতই যা করো, ভগবানকে ঠকাতে পারবে না।' কী নিরর্থক পরিশ্রমে মানুষ ব্যাপৃত থাকতে পারে, স্বামীজী তা সবিস্ময়ে দেখেছেন: 'ঈশ্বর নেই, একথা প্রমাণ করবার জন্য একজন একটি বৃহৎ বই লিখলেন। আর একজন ততোধিক বৃহৎ বই লিখলেন—তিনি আছেন তা প্রমাণের জন্য।' যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য দীর্ঘ পরিশ্রম করলেন, তিনি কিন্তু গ্রন্থরচনার বাইরে নাস্তিক ছাড়া কিছু নন। আর যিনি নাস্তিকতা প্রচার করেছেন তিনি কদাপি খেয়াল করে দেখেননি—আস্তিক বলে কথিত লোকগুলি বস্তুতঃ নাস্তিক; তাদের একমাত্র কাজ 'আহার, নিদ্রা ও বংশবৃদ্ধি!' এইসব লোকজনের জন্যই ধর্ম প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'গির্জাগুলি ভদ্রমহিলাদের ভালো-ভালো পোশাক পরে বাহার দেবার জায়গা। গির্জা এখন ধর্ম-বিবাহের স্থান নয়—বিবাহপূর্ব কন্যাপ্রদর্শনীর স্থান।...তদুপরি ওখানে সেনানিবাসে সৈন্যদের কসরতের মতো ব্যাপারও ঘটে থাকে—হাত তোলো, হাঁটু গাড়ো, বই হাতে করো—সব ধরা-বাঁধা। দু'মিনিট ভক্তি, দু'মিনিট তত্ত্ববিচার, দু'মিনিট প্রার্থনা—আগে থেকে ঠিক করা আছে!'

তারপর? লোকটা বুড়ো বয়সে মরছে—যমরাজ এসে গেছেন—কান টেনে বলছেন, 'চলো হে! যাবার সময় হয়েছে।' লোকটি কাতর হয়ে রিকোয়েস্ট

করল, 'স্যার, আর একটু টাইম দিন, আমার হরিশ পাসটা করে নিক, ওকে অফিসে ঢুকিয়ে দিই—'

স্বামীজী অট্টহাস্য করতে লাগলেন। এখন তিনি গোটা চোখ খুলে পৃথিবীর মৃত্যুভীত বৃদ্ধ-বালকদের দেখছেন।—মিশরের ফারাওগণ—বহু শোষণের ধনপুঞ্জের উপর আসীন—মরবার আগে নিজেদের 'মমি' তৈরীর ব্যবস্থা করে গেছেন, কেননা তাঁদের এই বিশ্বাস যে, মানুষ মরবার পরে সূক্ষ্মশরীর নিয়ে যখন ঘুরে বেড়ায় তখন তাতে আঘাত লাগে যদি তার শবদেহ আহত হয়; ধনরত্ন মুড়ে তাই শবদেহকে মমি করে রাখার ব্যবস্থা; তাকে স্থাপন করা হয়েছে সুবিশাল পিরামিডের অগম্য অভ্যন্তরে —'সেই পিরামিড খুঁড়ে, নানা কৌশলে জটিল রাস্তার রহস্য ভেদ করে, রত্নলোভে দস্যুরা সে রাজশরীর চুরি করছে।'

মানুষ শরীরে বাঁচতে চায়—মড়া-শরীরেও। একালেও নাস্তিক মহাবিপ্লবীর মৃতদেহকে আরকে ভিজিয়ে প্রদর্শনীর বস্তু করা হচ্ছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রসিকতা, মহাভারতীয় রসিকতাটিকে, স্বামীজী বার-বার স্মরণ করেছেন—'অপরকে মরতে দেখলেও মানুষ ভাবে সে চিরজীবী।'

ঐ রসিকতার পরম রসিক বিবেকানন্দ মৃত্যুর সামনে উদ্‌ভাসিত আনন্দে বলতে পেরেছিলেন—'কালী, তুই প্রলয়রূপিণী। আয় মাগো, আয় মোর পাশে।' ঝলসে উঠেছিল তাঁর বিদ্রূপের খড়্গ—'মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।।'

তবু—একটু পরিশিষ্ট আছে—। বিদ্রূপের সঙ্গে সহানুভূতি ছিল। মানুষের মুক্তি চাই, কিন্তু সে মুক্তি কোথায়? সে যে নিজ সীমায় আবদ্ধ—সে যে নিয়তিবদ্ধ।

আপেলের মাটিতে পড়া, মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব, ইত্যাদি বোঝাবার পরে বুদ্ধিমান শিক্ষক অত্যন্ত চালাকির প্রশ্ন করলেন—

'আচ্ছা, আপেল পড়ে, কিন্তু পৃথিবী পড়ে না কেন?'

স্তব্ধ ক্লাস। সবাই নিরুত্তর। শেষে একটি ছাত্রী উঠে প্রতিপ্রশ্ন করল—

'কোথায় পড়বে?'

এবার নিরুত্তর শিক্ষক।

একটি অসাধারণ রসময় বাক্যে স্বামীজী গোটা ব্যাপারটিকে প্রকাশ করেছেন—

'নিজের আত্মার বাইরে কেউ লাফ দিতে পারে না।'

# কিছু সরস রচনা

এবার স্বামীজীর রচনার কিছু রসপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করব, যার দ্বারা তিনি যে, হাস্যরসের সাহিত্যিকও ছিলেন তা অল্পবিস্তর বোঝা যাবে।

## —গৌরচন্দ্রিকা—

স্বামীজীর সেরা রসসাহিত্য 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের অনবদ্য সূচনাংশে দেখা যায়, তিনি মহা আহ্লাদে গা-ঝাড়া দিয়ে সাহিত্যিক-অভিধা ফেলে দিচ্ছেন—কিন্তু, এমন ভাষায় ও ভঙ্গিতে সে কাজ করছেন, যা জাতসাহিত্যিকই করতে পারেন। উদ্বোধন-সম্পাদককে সম্বোধন করে স্বামীজী আরম্ভ করেছেন—

"স্বামীজী! ওঁ নমো নারায়ণায়!—'মো' কারটা হৃষীকেশী ঢঙে উদাত্ত করে নিও ভায়া। আজ সাতদিন হল আমাদের জাহাজ চলেছে, রোজই তোমায় কি হচ্ছে না হচ্ছে খবরটা লিখব মনে করি, খাতাপত্র কাগজ-কলমও যথেষ্ট দিয়েছে, কিন্তু ঐ বাঙালী 'কিন্তু' বড়ই গোল বাধায়। এক নম্বর, কুঁড়েমি। ডায়েরী না কি তোমরা বলো, রোজ লিখব মনে করি, তারপর নানা কাজে সেটা অনন্ত 'কাল' নামক সময়েতেই থাকে, এক পা-ও এগুতে পারে না। দুয়ের নম্বর—তারিখ প্রভৃতি মনেই থাকে না। সেগুলো সব তোমরা নিজ গুণে পূর্ণ করে নিও। আর যদি বিশেষ দয়া করো তো মনে করো যে, মহাবীরের মতো বার তিথি মাস মনে থাকতেই পারে না—রাম হৃদয়ে বলে। কিন্তু বাস্তবিক কথাটা হচ্ছে এই যে, সেটা বুদ্ধির দোষ এবং ঐ কুঁড়েমি। কি উৎপাত। 'ক সূর্যপ্রভবো বংশঃ'—থুড়ি হল না—'ক, সূর্যপ্রভববংশচূড়ামণি-রামৈকশরণো বানরেন্দ্রঃ'—আর কোথায় আমি দীন, অতি দীন! তবে তিনি [হনুমান] শত যোজন সমুদ্র পার এক লাফে হয়েছিলেন, আর আমরা কাঠের বাড়ির মধ্যে বন্ধ হয়ে, ওছল-পাছল ক'রে, খোঁটা-খুঁটি ধরে চলৎশক্তি বজায় রেখে সমুদ্র পার হচ্ছি। একটা বাহাদুরি আছে—তিনি লঙ্কায় পৌঁছে রাক্ষস-রাক্ষসীর চাঁদমুখ দেখেছিলেন, আর আমরা রাক্ষস-রাক্ষসীর দলের সঙ্গে যাচ্ছি। খাবার সময়ে সে শত ছোরার চক্‌চকানি আর শত কাঁটার ঠক্‌ঠকানি দেখে-শুনে তু-ভায়ার তো আক্কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে-থেকে সিঁটকে ওঠেন, পাছে পার্শ্ববর্তী রাঙাচুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ঘ্যাচ্ করে ছুরিখানা তাঁরই গায়ে-বা বসায়। ভায়া একটু নধরও আছেন কি না। বলি হ্যাঁ গা, সমুদ্র পার হতে হনুমানের সী-সিক্‌নেস্ হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েছ? তোমরা পোড়ো-পণ্ডিতমানুষ, বাল্মীকি-আল্মীকি কত [illegible]ান; আমাদের 'গোঁসাইজী' তো কিছুই বলছেন না। বোধহয় হয়নি। তবে ঐ যে—কার মুখে প্রবেশ করেছিলেন—সেইখানটায় একটু সন্দেহ হয়। তু-ভায়া বলছেন,

জাহাজের গোড়াটা যখন হুস্ করে স্বর্গের দিকে উঠে ইন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, আবার তৎক্ষণাৎ ভুস্ ক'রে পাতালমুখো হয়ে বলিরাজাকে বাঁধবার চেষ্টা করে—সেই সময়টা তাঁরও বোধহয় যেন কার মহা বিকট বিস্তৃত মুখের মধ্যে প্রবেশ করছেন। মাফ ফরমাইয়ো ভাই। ভাল লোককে কাজের ভার দিয়েছ। রাম কহো। কোথায় তোমার সাত দিন সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা দেবো; তাতে কত রঙ-চঙ মসলা বার্নিস থাকবে, কত কাব্যরস ইত্যাদি, আর কি না—আবোল-তাবোল বকছি। ফল কথা, মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে, এখন খপ করে স্বভাবের সৌন্দর্যবোধ কোথা পাই বলো। 'কাঁহা কাশী, কাঁহা কাশ্মীর, কাঁহা খোরাশান গুজরাত' আজন্ম ঘুরছি। কত পাহাড়, নদ-নদী, গিরি, নির্ঝর, উপত্যকা, অধিত্যকা, চিরনীহারমণ্ডিত মেঘমেখলিত পর্বতশিখর, উত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গকল্লোলশালী কত বারিনিধি, দেখলুম, শুনলুম, ডিঙুলুম, পার হলুম। কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রামঘড-ঘড়ান্বিত ধূলিধূসরিত কলকাতার বড রাস্তার ধারে, কিংবা পানের পিকবিচিত্রিত দেওয়ালে, টিকটিকি ইঁদুরছুঁচো-মুখরিত একতলা ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় প্রদীপ জ্বেলে, আঁব কাঠের তক্তায় বসে, থেলো হুঁকো টানতে-টানতে কবি শ্যামাচরণ হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতির যে হুবহু ছবিগুলি চিত্রিত করে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন—সে দিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা। শ্যামাচরণ ছেলে-বেলায় পশ্চিমে বেডাতে গিয়েছিলেন—যেথায় আকণ্ঠ আহার করে এক ঘটি জল খেলেই ব্যস্, সব হজম, আবার খিদে—সেখানে শ্যামাচরণের প্রাতিভ দৃষ্টি এইসকল প্রাকৃতিক বিরাট ও সুন্দর ভাব উপলব্ধি করেছে। তবে একটু গোল যে, ঐ পশ্চিম—বর্ধমান পর্যন্ত নাকি শুনতে পাই।

"তবে একান্তই তোমাদের উপরোধ, আর আমিও যে একেবারে 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস' নহি, সেটা প্রমাণ করবার জন্য শ্রীদুর্গা স্মরণ করে আরম্ভ করি—তোমরাও খোঁটা-খুঁটি ছেড়ে দিয়ে শোনো—"

শেষের দিকে পাঠক লক্ষ্য করেছেন—স্বামীজী এক বাঙালী কবির চেহারা এঁকেছেন। বেচারা কবি শ্যামাচরণ—স্থুল কল্পনাবিলাসী। ভারসাম্য রাখতে স্বামীজী মার্জিতরুচি বাঙালী কবিদের কথাও লিখেছেন। এঁদের কথা এসে গিয়েছিল মেয়েলি চেহারা ও হাব-ভাবের সিংহলীদের বিষয় বলতে গিয়ে।—

"ওরা নিজের দেশকে বলে—সিংহল। লঙ্কা বলবে না। বলবে কোত্থেকে? ওদের না কথায় ঝাল, না কাজে ঝাল, না প্রকৃতিতে ঝাল!! রাম বলো—ঘাঘরা-পরা, খোঁপা-বাঁধা, আবার খোঁপায় মস্ত একখানা চিরুনী-দেওয়া মেয়েমানুষি চেহারা। আবার—রোগা-রোগা, বেঁটে-বেঁটে, নরম-নরম শরীর। এরা রাবণ কুম্ভকর্ণের বাচ্ছা? গেছি আর কি! বলে—বাংলাদেশ থেকে এসেছিল—তা ভালই

করেছিল। ঐ যে একদল দেশে উঠেছে, মেয়েমানুষের মতো বেশভূষা, নরম-নরম বুলি কাটেন, এঁকে-বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাসেন হোসেন' করেন—ওরা কেন যাক না বাপু সিলোনে ?"

—বাঙালীর ছবি—

গৌরচন্দ্রিকায় বাঙালী-কবির চেহারা দেখা গেল। বাঙালী সামাজিক মানুষের কথা বাদ যায় কেন ? বাঙালী সামাজিকের ছবিটা খুব সুন্দর হয়ে ধরা পড়েনি স্বামীজীর চোখে।

স্বামীজী স্বয়ং বাঙালী, বাঙালীর কল্পনাশক্তি ও আত্মত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা তিনি করেছেন, কিন্তু বাঙালীর হীনতা ও দীন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাঁর সহিষ্ণুতা ছিল না। বহু তিক্ত কথা সে বিষয়ে বলেছেন। "পল্লীগ্রামের একই পুষ্করিণীতে স্নান, জলশৌচ এবং সেই পুকুরের জলই পান করা-প্রথার উপর তিনি ভারী বিরক্ত ছিলেন। প্রায়ই বলিতেন, 'যাহাদের মস্তিষ্ক মলমূত্রে পরিপূর্ণ, তাহাদের আশাভরসা আর কোথায় ?' " পাড়াগাঁয়ের পরচর্চা সম্বন্ধেও তাঁর ঘৃণাপূর্ণ মন। পাড়াগেঁয়ে লোকদের চেয়ে শহুরে লোকেরা যে এ-ব্যাপারে মূলে ভিন্নকিছু তা নয়, তবে শহরে খরচ বেশি বলে বেশি খাটতে হয়, তাই "বড়ে টেপা, তামাক খাওয়া ও পরনিন্দা করবার আর সময় থাকে না। নইলে শহুরে ভূতগুলো ঐ বিষয়ে পাড়াগেঁয়ে ভূতের ঘাড়ে চড়ে বেড়াত।" 'ভয়ানক স্বার্থপরতা' বাঙালীর বিশেষ গুণ, স্বামীজীর মতে। বাঙালীরা "সকল হিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কামুক ও অপদার্থ।" "গোলাম কীটগুলো, এক পা নড়বার ক্ষমতা নেই—স্ত্রীর আঁচল ধরে, তাস খেলে, গুড়ুক ফুঁকে জীবন-যাপন করে, আর যদি কেউ ঐগুলোর মধ্যে এক পা এগোয় সবগুলো কেঁউ-কেঁউ করে তার পিছু লাগে।"

আর একটি বাঙালী-চিত্র নিয়ে উদ্ধৃত করছি। পাঠক লক্ষ্য করবেন, কত অল্পে, কয়েকটি টানেই স্বামীজী ছবি সম্পূর্ণ করতে পারতেন। এ ক্ষমতা খাঁটি সাহিত্যিকের —তাঁর রচনার অন্যত্রও এর পরিচয় দেখা যাবে।—

"বাঙালীরা কি বলে না-বলে, ওসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে নিতে হয় নাকি ? ওদের দেশে বারো বছরের মেয়ের ছেলে হয়।...লণ্ডনে কতকগুলো কাফ্রির মতো—আবার টুপি-টাপা মাথায় দিয়ে ঘুরছে দেখতে পাই। কালো হাতে খানা ছুঁলে ইংরেজরা খায় না—এই আদর। ঝি-চাকরের দলে ইয়ার্কি দিয়ে দেশে গিয়ে বড়লোক হয়!! রাম। রাম। আহার—গেঁড়ি-গুগলি ; পান—প্রস্রাব-সুবাসিত পুকুরজল ; ভোজন-পাত্র—ছেঁড়া কলাপাতা এবং ছেলের মলমূত্র-মিশ্রিত ভিজে মাটির মেজে ; বিহার—

পেত্নী-শাঁকচুন্নির সঙ্গে ; বেশ—দিগম্বর [ বা ] কৌপীন ইত্যাদি—মুখে যত জোর।"

হঠাৎ-সাহেব বাঙালীরা আরও কিছু মধুভাষণ পেয়েছেন।—

"ঐ টুপিপরা হতভাগাদের দেখলে গা জ্বলে যায়। ভূত-কালো, আমার সাহেব ! ভদ্রলোকের মত দেশী কাপড়-চোপড় পর্ বাপ, তা না ঐ জানোয়ারী রূপ।"

—মাদ্রাজী-চিত্র—

স্বামীজীর মাদ্রাজী-ভক্ত বাঙালী-ভক্তের তুলনায় সংখ্যায় কম নয়। সুতরাং মাদ্রাজীদের তিনি বঞ্চিত করতে পারেন না তাঁর মনোযোগ থেকে। মাদ্রাজীরা প্রথমতঃ আচারপরায়ণ—তদুপরি তাদের আরো দুটি বিশেষ গুণ—এক, মহাবীর-ভাব, দুই, প্রজাবৃদ্ধিতে অসীম উৎসাহ। প্রথমটির বিষয়ে স্বামীজীর বক্তব্য—তারা "কুকুরের ডাকে মূর্ছা যায় ;" দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে—"প্রত্যেক [ মাদ্রাজী ] ছাত্রের আশেপাশে তার বংশধররা 'বাবা খাবার দাও, বাবা খাবার দাও' করে উচ্চ চিৎকার তুলছে।"

মাদ্রাজীদের আকার ও আচারের কথাচিত্র—

"মাদ্রাজ মনে পড়লে খাঁটি দক্ষিণদেশ মনে পড়ে। যদিও কলকেতার জগন্নাথের ঘাটেই দক্ষিণদেশের আমেজ পাওয়া যায়, ( সেই থর-কামানো মাথা, ঝুঁটি-বাঁধা, কপালে অনেক চিত্রবিচিত্র, শুঁড়-ওলটানো চটিজুতো, যাতে কেবল পায়ের আঙ্গুলটি ঢোকে, আর নস্যদরবিগলিত নাসা, ছেলেপুলের সর্বাঙ্গে চন্দনের ছাপ লাগাতে মজবুত ) উড়ে বামুন দেখে। গুজরাতি বামুন, কালো কুচকুচে দেশস্থ বামুন, ধপ্-ধপে ফর্সা বেরাল-চোখো চৌকা-মাথা কোকনস্থ বামুন—যদিও ইহাদের সকলের একপ্রকার বেশ, সকলেই দক্ষিণী নামে পরিচিত—কিন্তু ঠিক দক্ষিণী ঢঙ মাদ্রাজিতে। সে রামানুজী তিলকপরিব্যাপ্ত ললাটমণ্ডল—দূর থেকে, যেন ক্ষেত চৌকি দেবার জন্য কেলে হাঁড়ি চুণ মাখিয়ে পোড়াকাঠের ডগায় বসিয়েছে ( যে-রামানুজী তিলকের সাগরেদ রামানন্দী তিলকের মহিমা সম্বন্ধে লোকে বলে, 'তিলক তিলক সবকোই কহে পর রামানন্দী তিলক, দিখত গঙ্গা-পারসে যম গোদ্বারকে খিড়ক্।' আমাদের দেশে চৈতন্যসম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গে ছাপ-দেওয়া গোঁসাই দেখে মাতাল চিতেবাঘ ঠাওরেছিল—এ মাদ্রাজি তিলক দেখে চিতেবাঘ গাছে চড়ে। ), আরে সে তামিল-তেলেগু, মলয়ালম বুলি, যা ছয় বৎসর শুনেও এক বর্ণ বোঝবার জো নাই, যাতে দুনিয়ার রকমারি 'ল'-কার ও 'ড'-কারের কারখানা ; সেই 'মুড়গ্‌তন্নির রসম'-সহিত ভাত 'সাপড়ান'—যার এক এক গরসে বুক ধড়্‌পড়্ করে ওঠে (এমনি ঝাল আর তেঁতুল ! ) ; সে 'মিঠে নিমের পাতা, ছোলার দাল, মুগের দাল' ফোড়ন, দধ্যোদন ইত্যাদি ভোজন ; আর সে রেড়ির তেল মেখে স্নান, রেড়ির তেলে মাছ ভাজা—এ না হলে কি দক্ষিণ মুলুক হয় ?"

## —সিংহলী অহিংসা—

নরম-নরম মেয়েলি চেহারা ও বেশভূষার সিংহলীদের কিছু কথা আগে উপস্থিত করেছি—এখানে আরও কিছু দেওয়া যাক। সিংহলীরা বৌদ্ধ এবং অহিংস, সংশোধনসহ। সিংহলে 'যত কসাই সব বৌদ্ধ ছিল।' সিংহলী অহিংসার আরও কিছু নমুনা স্বামীজী দিয়েছেন। এর মধ্যে অতি সরস, অতি চমৎকার একটি গল্প আছে।—

"সিলোনময় নেড়া-মাথা, করোয়াধারী, হলদে চাদর-মোড়া, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ছড়িয়ে পড়ল। জায়গায়-জায়গায় বড়-বড় মন্দির উঠল—মস্ত-মস্ত ধ্যানমূর্তি, জ্ঞানমুদ্রা-করে প্রচারমূর্তি, কাত হয়ে শুয়ে মহানির্বাণমূর্তি—তার মধ্যে। আর দেয়ালের গায়ে সিলোনিরা দুষ্টুমি করলে—নরকে তাদের কি হাল হয় তাই আঁকা; কোনোটাকে ভূতে ঠেঙাচ্ছে, কোনোটাকে করাতে চিরছে, কোনোটাকে পোড়াচ্ছে, কোনোটাকে তপ্ত তেলে ভাজছে, কোনোটার ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছে—সে মহা বীভৎস কারখানা। এ 'অহিংসা পরমোধর্মে'র ভেতরে যে এমন কারখানা কে জানে বাপু। চীনেও ঐ হাল, জাপানেও ঐ। এদিকে তো অহিংসা, আর সাজার [শাস্তির] পরিপাটি দেখলে আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যায়। এক 'অহিংসা পরমোধর্মে'র বাড়িতে ঢুকেছে—চোর। কর্তার ছেলেরা তাকে পাকড়া করে বেদম পিটছে। তখন কর্তা দোতলার বারাণ্ডায় এসে, গোলমাল দেখে খবর নিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'ওরে মারিস নি, মারিস নি—অহিংসা পরমো ধর্মঃ।' বাচ্ছা-অহিংসারা মার থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে 'তবে চোরকে কি করা যায়?' কর্তা আদেশ করলেন, 'ওকে থলিতে পুরে জলে ফেলে দাও।' চোর জোড়হাত করে, আপ্যায়িত হয়ে বললে, 'আহা, কর্তার কি দয়া!' বৌদ্ধরা বড় শান্ত, সকল ধর্মের উপর সমদৃষ্টি—এই তো শুনেছিলুম। বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকেরা আমাদের কলকেতায় এসে রঙ-বেরঙের গাল ঝাড়ে, অথচ আমরা তাদের যথেষ্ট পূজো করে থাকি। [সিংহলের] অনুরাধাপুরে প্রচার-করছি একবার, হিঁদুদের মধ্যে, বৌদ্ধদের নয়, তাও খোলামাঠে, কারুর জমিতে নয়—ইতিমধ্যে দুনিয়ার বৌদ্ধ ভিক্ষু, গৃহস্থ, মেয়ে, মদ্দ, ঢাক ঢোল কাঁসি নিয়ে এসে সে-যে কী বিটকেল আওয়াজ আরম্ভ করলে তা আর কি বলব। লেকচার তো অলমিতি হল, রক্তারক্তি হয় আর কি। অনেক করে হিঁদুদের বুঝিয়ে দেওয়া গেল যে, আমরা নয় একটু অহিংসা করি এসো—তখন শান্ত হয়।"

## —ফরাসী ও ফরাসী-ইতর ইউরোপীয় ভোগবিলাস—

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বামীজী ফরাসী-সভ্যতার খুবই তারিফ করেছেন। প্রাচীন গ্রীক মরে যেন ফরাসী হয়েছে, তিনি বলেছেন। "সদা আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি ছ্যাবলা,

আবার অতি গম্ভীর, সকল কাজে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিরুৎসাহ ; কিন্তু সে নৈরাশ্য ফরাসী-মুখে বেশিক্ষণ থাকে না।”

বিলাসকলার ক্ষেত্রে ফরাসী ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির, বিশেষতঃ ফরাসী ও জার্মানের যে সরস তুলনা করেছেন, তারই সামান্য উদ্ধৃত করছি :

“[একদিকে] কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্বকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্পবিলাস—আর একদিকে হিরণ্যকেশ, দীর্ঘাকার, দিঙ্‌নাগ জার্মানীর স্থূল হস্তাবলেপ। ..ফরাসীর বলবিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ ; জার্মানির রূপবিকাশ-চেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসী-প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর ; জার্মান-প্রতিভার মধুর হাস্যবিমণ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর। জার্মান, ফরাসীর নকলে বড়-বড় বাড়ি, অট্টালিকা বানাচ্ছেন, বৃহৎ-বৃহৎ মূর্তি, অশ্বারোহী, রথী, সে প্রসাদের শিখরে স্থাপন করছেন, কিন্তু জার্মানের দোতলা বাড়ি দেখলেও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়—এ বাড়ি কি মানুষের বাসের জন্য, না হাতি উটের ‘তবেলা’ ? আর ফরাসীর পাঁচতলা হাতি ঘোড়া রাখবার বাড়ি দেখে ভ্রম হয় যে, এ-বাড়িতে বুঝি পরীতে বাস করবে !”

“আমাদের দেশে এই পারি নগরীর বদনাম শুনতে পাওয়া যায়—এ পারি মহা কদর্য বেশ্যাপূর্ণ নরককুণ্ড। অবশ্য একথা ইংরেজরাই বলে থাকে।...

“কিন্তু লণ্ডন, বার্লিন, ভিয়েনা, নিউইয়র্কও ঐ বারবনিতাপূর্ণ। তবে তফাত এই যে, অন্য দেশের ইন্দ্রিয়চর্চা পশুবৎ—পারিসের, সভ্য পারির ময়লা সোনার পাতমোড়া। বুনো শোরের পাঁকে লোটা আর ময়ূরের পেখমধরা নাচে যে-তফাত, অন্যান্য শহরের পৈশাচিক ভোগ আর এ পারির বিলাসের সেই তফাত।

“ভোগবিলাসের ইচ্ছা কোন্ জাতে নেই বলো ? নইলে দুনিয়ায় যার দু-পয়সা হয়, সে অমনি পারি-নগরের অভিমুখে ছোটে কেন ? রাজা-বাদশাহ চুপিসাড়ে নাম ভাঁড়িয়ে এ বিলাসবিবর্তে স্নান করে পবিত্র হতে আসেন কেন ? ইচ্ছা সর্বদেশে, উদ্যোগের ত্রুটি কোথাও কম দেখি না ; তবে এরা সুসিদ্ধ হয়েছে, ভোগ করতে জানে, বিলাসের সপ্তমে পৌঁচেছে।

“তাও অধিকাংশ কদর্য নাচ-তামাশা বিদেশীর জন্য। ফরাসী বড় সাবধান, বাজে খরচ করে না। এই ঘোর বিলাস, এইসব হোটেল, কাফে, যাতে একবার খেলে সর্বস্বান্ত হতে হয়—এসব বিদেশী আহাম্মক ধনীদের জন্য। ফরাসীরা বড় সুসভ্য, আদবকায়দা বেজায়, খাতির খুব করে, পয়সাগুলি সব বার করে নেয়, আর মুচকে-মুচকে হাসে।

“[ তবে ] এরা আমোদপ্রিয়, কোনো বড় সামাজিক ব্যাপার নর্তকীর নাচ না হলে সম্পূর্ণ হয় না। যেমন আমাদের বে, পুজো, সর্বত্রে নর্তকীর আগমন। ইংরেজ ওলবাটা-মুখ, অন্ধকার দেশে বাস করে, সদা নিরানন্দ—ওদের মতে এ বড় অশ্লীল,

কিন্তু থিয়েটারে হলে আর দোষ নেই। এ কথাটাও বলি যে, এদের নাচটা আমাদের চোখে অশ্লীল বটে, তবে এদের সয়ে গেছে। নেংটি নাচ সর্বত্রে, ও গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু ইংরেজ আমেরিকান দেখতেও ছাড়বে না, আর ঘরে গিয়ে গাল দিতেও ছাড়বে না।"

## —এ দুনিয়ার সভ্যতার মজাদারি—

সভ্যতার অনেক মজার ছবি ইতিপূর্বে উপস্থিত করেছি। এখানে আরও কিছু দেখব। প্রথমে প্রাচীন সভ্যতার বিবেকানন্দীয় বর্ণনা লক্ষ্য করা যাক। সত্যযুগের যে বর্ণনা তিনি করেছেন, তা পড়ে সাধুজনেরা ভির্মি না যান!—

"অনেক পুরাণো কালের...অর্থাৎ সত্যযুগের [ কাহিনী ]। আপামর-সাধারণ [ তখন ] এমনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, পাছে ভেতরে একখান ও বাহিরে আর একখান হয় বলে, কাপড় পর্যন্ত পরতেন না; পাছে স্বার্থপরতা আসে বলে বিবাহ করতেন না; এবং ভেদবুদ্ধিরহিত হয়ে কোঁৎকা লোড়া-লুড়ির সহায়ে সর্বদাই 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ' বোধ করতেন।" "সে প্রাতঃস্মরণীয়াদের কালের মেয়ে এজন্মে তো আর একসঙ্গে অনেক বর বে করতে পায় না, কাজেই হয় বেশ্যা।"

সত্যযুগ থেকে বর্তমান কলিযুগে মানবসমাজ পৌঁছেছে দেবাসুরের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। কখনো দেবতার জয়, কখনো অসুরের জয়, ইত্যাদি। 'মহাসংঘর্ষ, জেতাজেতি, মেশামেশি' থেকে বর্তমান সমাজের জন্ম। সামাজিক বিবর্তনের সরস বর্ণনা স্বামীজী দিয়েছেন—শেষপর্যন্ত তা সরস কান্নায় পৌঁছেছে—

"একদল লোক ভোগোপযোগী বস্তু তৈয়ার করতে লাগল—হাত দিয়ে বা বুদ্ধি করে। একদল সেইসব ভোগ্যদ্রব্য রক্ষা করতে লাগল। সকলে মিলে সেইসব বিনিময় করতে লাগল। আর মাঝখান থেকে একদল ওস্তাদ এ-জায়গার জিনিসটা ও-জায়গায় নিয়ে যাবার বেতনস্বরূপ সমস্ত জিনিসের অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে শিখলে। একজন চাষ করলে, একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিনলে। যে চাষা চাষ করলে সে পেলে ঘোড়ার ডিম; যে পাহারা দিলে সে জুলুম করে কতকটা আগ-ভাগ নিলে; অধিকাংশ নিলে যে···বয়ে নিয়ে গেল। যে কিনলে সে সকলের দাম দিয়ে মলো!! পাহারাওয়ালার নাম হল রাজা, মুটের নাম হল সওদাগর। এ দু'দল কাজ করলে না—ফাঁকি দিয়ে মুড়ো মারতে লাগল। যে জিনিস তৈরী করতে লাগল, সে পেটে হাত দিয়ে 'হা ভগবান' ডাকতে লাগল।"

'রসনার রসকথা' অধ্যায়ে খাদ্য-ব্যাপারে অনেক সরস রচনার নমুনা দিয়েছি। খাদ্যবস্তু নয় কেবল, কিভাবে বিভিন্ন জাতির মানুষ আহারাদি করে, (বাঙালী, উড়িয়া, তেলেঙ্গি, মালাবারির সাপড়ানো থেকে, দুই কাটির খেলায় চীনেদের ভাত

খাওয়া পর্যন্ত ) তারও মনোরম বিবরণ রয়েছে, যদিও সেগুলি আর উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। কিন্তু শরীরশুদ্ধির নানাদেশীয় ব্যবস্থার কিন্তু পরিচয় না দিলে খুবই অন্যায় হবে।—

"দেখ শরীর নিয়ে প্রথম।...দুনিয়ায় এমন জাত কোথাও নেই যাদের শরীর হিঁদুদের মতো সাফ। হিঁদু ছাড়া কোনো জাত জলশৌচাদি করে না। তবু পাশ্চাত্ত্যদের, চীনেরা কাগজ ব্যবহার করতে শিখিয়েছে, কিছু বাঁচোয়া। স্নান নেই বললেই হয়! এখন ইংরেজরা ভারতে এসে স্নান ঢুকিয়েছে দেশে। তবুও যেসব ছেলেরা বিলেতে পড়ে এসেছে তাদের জিজ্ঞাসা করো যে, স্নানের কী কষ্ট! যারা স্নান করে—সে সপ্তায় একদিন—সেদিন ভেতরের কাপড় আণ্ডারওয়ার বদলায়। অবশ্য এখন পয়সাওয়ালাদের ভেতর অনেকে নিত্যস্নায়ী। আমেরিকানরা একটু বেশি; জর্মান কালেভদ্রে; ফরাসী প্রভৃতি কস্মিনকালেও না!!! স্পেন, ইতালি অতি গরম দেশ—সে আরও নয়; রাশীকৃত লসুন খাওয়া, দিনরাত ঘর্মাক্ত, আর সাতজন্মেও জলস্পর্শ না! সে গায়ের গন্ধে ভূতের চৌদ্দপুরুষ পালায়—ভূত তো ছেলেমানুষ। 'স্নান' মানে কি—মুখটি ধোয়া, হাত ধোয়া—যা বাইরে দেখা যায়, আবার কি! পারিস, সভ্যতার রাজধানী পারিস, রঙ-চঙ ভোগবিলাসের ভূস্বর্গ পারিস, বিদ্যা-শিল্পের কেন্দ্র পারিস—সেই পারিসে এক বৎসর এক বড় ধনী-বন্ধু নিমন্ত্রণ করে আনলেন, এক প্রাসাদোপম মস্ত হোটেলে নিয়ে তুললেন, রাজভোগ খাওয়াদাওয়া কিন্তু স্নানের নামটি নেই। দু'দিন ঠায় সহ্য ক'রে শেষে আর পারা গেল না। শেষে বন্ধুকে বলতে হল—দাদা, তোমার এ রাজভোগ তোমারই থাকুক, আমার এখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' হয়েছে। এই দারুণ গরমী কাল, তাতে স্নান করবার জো নেই, হন্যে কুকুর হবার জোগাড় হয়েছে। তখন বন্ধু দুঃখিত হয়ে চটে বললেন যে, এমন হোটেলে থাকা হবে না, চলো, ভাল জায়গা খুঁজে নিই গে। ১২টা প্রধান-প্রধান হোটেলে খোঁজা হল—স্নানের স্থান কোথাও নেই। আলাদা স্নানাগার সব আছে, সেখানে গিয়ে ৪।৫ টাকা দিয়ে একবার স্নান হবে। হরিবোল হরি। সেদিন বিকালে কাগজে পড়া গেল—এক বুড়ি স্নান করতে টবের মধ্যে বসেছিল, সেইখানেই মারা পড়েছে! জন্মের মধ্যে একবার বুড়ির চামড়ার সঙ্গে জলস্পর্শ হতেই কুপোকাত!!"

শরীর-সম্বন্ধীয় নানা আচারের অনেক উপাদেয় বর্ণনা স্বামীজীর রচনায় মিলবে। ভারতে ঢেঁকুর না তুললে নিমন্ত্রক খুশী হন না, আর পাশ্চাত্ত্যে সেটা বেআদবী, সেখানে 'ভদ্রসমাজে থুতু ফেলা বা কুলকুচো করা বা দাঁত খোঁটা ইত্যাদি করলে তৎক্ষণাৎ চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি', এবং—

"ইংলণ্ডে আমেরিকায় মলমূত্রের নামটি আনবার জো নেই মেয়েদের সামনে।

পাইখানায় যেতে হবে চুরি করে।...মেয়েরা মলমূত্র চেপে মরে যাবে তবুও পুরুষের সামনে নামটি আনবে না। ফরাসী দেশে অত নয়...জার্মানদের আরও কম।

"ইংরেজ আমেরিকানরা কথাবার্তায় বড় সাবধান, মেয়েদের সামনে। ঠ্যাঙ পর্যন্ত বলবার জো নেই। ফরাসীরা আমাদের মত মুখ-খোলা। জার্মান, রুশ প্রভৃতি সকলের সামনে খিস্তি করে।

"কিন্তু প্রেম-প্রণয়ের কথা অবাধে মায় ছেলে ভায়ে বোনে বাপে—চলেছে। বাপ, মেয়ের প্রণয়ীর কথা নানারকম ঠাট্টা ক'রে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করছে। ফরাসী মেয়ে তায় অবনতমুখী, ইংরেজ মেয়ে ব্রীড়াশীলা, আর মার্কিনের মেয়ে চোটপাট জবাব দিচ্ছে। চুম্বন, আলিঙ্গনটা পর্যন্ত দোষাবহ নয়, অশ্লীল নয়।"

কাপুড়ে সভ্যতা সম্বন্ধে স্বামীজীর উপভোগ্য রচনার সামান্য অংশ :

"সকল দেশেই কাপড়ে-চোপড়ে কিছু না কিছু ভদ্রতা লেগে থাকে। 'ব্যাতন না জানলে বোদ্র অবোদ্র বুজব ক্যাম্‌নে?' শুধু ব্যাতন নয়, 'কাপড়' না দেখলে ভদ্র অভদ্র বুঝবো ক্যাম্‌নে?...

"ঠাণ্ডা দেশমাত্রেই সর্বদা সর্বাঙ্গ না ঢেকে কারু সামনে বেরুবার জো নেই।... পাশ্চাত্ত্য দেশের মেয়েদের পা দেখানো বড়ই লজ্জা, কিন্তু গলা ও বুকের খানিকটা দেখানো যেতে পারে। আমাদের দেশে মুখ দেখানো বড়ই লজ্জা ; কিন্তু সে ঘোমটা টানার চোটে শাড়ি কোমরে উঠুন, তায় দোষ নেই। রাজপুতানার ও হিমাচলের অষ্টাঙ্গ ঢেকে তলপেট দেখানো।

"পাশ্চাত্ত্যদেশের নর্তকী ও বেশ্যারা লোক ভোলাবার জন্য অনাচ্ছাদিত। এদের নাচের মানে তালে-তালে শরীর অনাবৃত করে দেখানো। আমাদের দেশের আদুড় গা ভদ্রলোকের মেয়ের—নর্তকী বেশ্যা সর্বাঙ্গ ঢাকা।...

"এক চীন ছাড়া সর্বদেশেই এ লজ্জা সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত বিষয় দেখেছি—কোনো বিষয়ে বেজায় লজ্জা, আবার তদপেক্ষা অধিক লজ্জার বিষয়ে আদতে লজ্জা নেই। চীনে মেয়ে-মদ্দে সর্বদা আপাদমস্তক ঢাকা। চীনে কনফুছের চেলা, বুদ্ধের চেলা, বড় নীতিদুরস্ত। খারাপ কথা, চাল, চলন—তৎক্ষণাৎ সাজা। কৃশ্চান পাদরী গিয়ে চীনে ভাষায় বাইবেল ছাপিয়ে ফেললে। এখন বাইবেল-পুরাণ হচ্ছেন হিঁদুর পুরাণের চৌদ্দপুরুষ—সে দেবতা মানুষের অদ্ভুত কেলেঙ্কারী পড়ে চীনে তো চটে অস্থির। বললে, 'এই বই কিছুতেই এদেশে চালানো হবে না, এ-তো অতি অশ্লীল কেতাব।' তার উপর পাদরিনী বুকখোলা সান্ধ্যপোষাক পরে, পর্দার বার হয়ে, চীনেদের নিমন্ত্রণে আহ্বান করলেন। চীনে মোটা বুদ্ধি বললে—'সর্বনাশ। এই খারাপ বই পড়িয়ে, আর এই মাগীদের আদুড় গা দেখিয়ে, আমাদের ছোঁড়া বইয়ে দিতে এ ধর্ম এসেছে।' এই হচ্ছে চীনের কৃশ্চানের উপর মহা আক্রোশ। নতুবা

চীনে কোনো ধর্মের উপর আঘাত করে না। শুনছি যে, পাদরীরা এখন অশ্লীল অংশ ত্যাগ করে বাইবেল ছাপিয়েছে। কিন্তু চীনে তাতে আরো সন্দিহান।”

## —চরিতচিত্রণ—

দু'চার আঁচড়েই স্বামীজী ছবি ফোটাতে পারতেন, একথা আগেই বলেছি। সম্প্রদায়, জাতি, দেশ, সভ্যতার রূপ অতি অল্পাকারে তিনি ফুটিয়েছেন। মানুষের ছবিও যথেষ্ট পেয়েছি তাঁর রচনায়। রেখাচিত্র হিসাবে সেগুলি উচ্চশ্রেণীর—নানা রসের মিশাল তাতে আছে। আমরা এখানে প্রধানতঃ হাস্যরসাশ্রিত চরিতচিত্রগুলিকে উপস্থিত করব, কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখব—শ্রীরামকৃষ্ণ, পওহারী বাবা, বা ম্যাক্স-মূলার প্রভৃতির চরিত্রচিত্রণ যেখানে তিনি করেছেন, সেখানে পেয়েছি অতি গভীর রঙে ও রসে গরীয়ান সৃষ্টিকে।

স্বামীজীর বিখ্যাত শিষ্য, 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকার সম্পাদক, সমকালীন ভারতীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য পুরুষ আলাসিঙ্গা পেরুমলের ছবিটি গোড়ায় দেখা যাক। স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্ত্যযাত্রা করেছেন—সেই সময়ে মাদ্রাজ থেকে কলম্বো পর্যন্ত পথে আলাসিঙ্গা জাহাজে স্বামীজীর সঙ্গী হন। স্বামীজী সে বিষয়ে বলছেন—

“আলাসিঙ্গা তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট কিনে শুধু-পায়ে জাহাজে চড়ে বসল। আলাসিঙ্গা বলে, সে কখনো-কখনো জুতো পায়ে দেয়।...আলাসিঙ্গা পেরুমল, এডিটার ব্রহ্মবাদিন্, মাইসোরি রামানুজী রসম-খেকো ব্রাহ্মণ, কামানো মাথায় সমস্ত কপাল জুড়ে 'তেঙ্গালে' তিলক, 'সঙ্গের সম্বল গোপনে অতি যতনে' এনেছেন কি দুটো পুঁটুলি! একটায় চিড়া-ভাজা, আর একটায় মুড়ি-মটর। জাত বাঁচিয়ে ঐ মুড়ি-মটর চিবিয়ে, সিলোনে যেতে হবে। আলাসিঙ্গা আর একবার সিলোনে গিয়েছিল। তাতে বেরাদারি লোক একটু গোল করবার চেষ্টা করে, কিন্তু পেরে ওঠেনি। ভারতবর্ষে ঐটুকুই বাঁচোয়া। বেরাদারি যদি কিছু না বললে তো আর কারো কিছু বলবার অধিকার নেই। আর সে দক্ষিণী বেরাদারি—কোনোটায় আছেন সবশুদ্ধ পাঁচশ, কোনোটায় সাতশ, কোনোটায় হাজারটি প্রাণী—কনের অভাবে ভাগনিকে বে করে। যখন মাইসোরে প্রথম রেল হয়, যে-যে ব্রাহ্মণ দূর থেকে রেলগাড়ী দেখতে গিছল, তারা জাতচ্যুত হয়। যাই হোক, এই আলাসিঙ্গার মতো মানুষ পৃথিবীতে অতি অল্প। অমন নিঃস্বার্থ, অমন প্রাণপণ খাটুনি, অমন গুরুভক্ত, আজ্ঞাধীন শিষ্য জগতে অল্প হে ভায়া। মাথা-কামানো, ঝুট-বাঁধা, শুধু-পায়, ধুতি-পরা মাদ্রাজী ফার্স্ট ক্লাসে উঠল—বেড়াচ্ছে-চেড়াচ্ছে, খিদে পেলে মুড়ি-মটর চিবোচ্ছে!”

আলাসিঙ্গার ছবি কৌতুক ও শ্রদ্ধায় মেশানো। পাদরী বোগেশের ছবিতে কেবল অনুকম্পা—

"জাহাজে দুই পাদরী উঠেছেন। একটি আমেরিকান, সস্ত্রীক, বড় ভাল মানুষ, নাম বোগেশ। বোগেশের সাত বৎসর বিয়ে হয়েছে ; ছেলে মেয়েতে ৬টি সন্তান—চাকরেরা বলে খোদার বিশেষ মেহেরবানি—ছেলেগুলোর সে অনুভব হয়না বোধহয়। একখানা কাঁথা পেতে বোগেশ-ঘরণী ছেলেপিলেগুলোকে ডেকের উপর শুইয়ে চলে যায়। তারা নোংরা হয়ে কেঁদে-কেটে গড়াগড়ি দেয়। যাত্রীরা সদাই সভয় ; ডেকে বেড়াবার জো নেই, পাছে বোগেশের ছেলে মাড়িয়ে ফেলে। বোগেশের একটি এঁড়ে-লাগা ছেলের বড় অযত্ন। বেচারা সারাদিন ডেকের কাঠের উপর গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বুড়ো কাপ্তেন মাঝে-মাঝে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে চামচে করে সুরুয়া খাইয়ে যায়, আর পা-টি দেখিয়ে বলে, কী রোগা ছেলে, কী অযত্ন! খুব ছোটোটিকে একটি কানাতোলা চৌকো চুবড়িতে শুইয়ে বোগেশ আর বোগেশের পাদ্রিনী জড়াজড়ি হয়ে কোণে চার ঘণ্টা বসে থাকে। তোমার ইউরোপীয় সভ্যতা বোঝা দায়। আমরা যদি বাইরে কুলকুচো করি, কি দাঁত মাজি, বলে—'কি অসভ্য, ও কাজগুলো গোপনে করা উচিত।' আর জড়াজড়িগুলো গোপনে করলে ভাল হয় নাকি? তোমরা আবার এই সভ্যতার নকল করতে যাও! যা হোক, প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মে উত্তর ইউরোপের যে কি উপকার করেছে, তা পাদ্রি-পুরুষ না দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে না। যদি এই দশ ক্রোর ইংরেজ সব মরে যায়, খালি পুরোহিতকুল বেঁচে থাকে, বিশ বৎসরে আবার দশ ক্রোরের সৃষ্টি!"

সমকালীন ইউরোপের সবচেয়ে বড় গায়িকা মাদাম কালভে স্বামীজীর একান্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত চরিত্রচিত্র স্বামীজীর লেখায় আছে। সমকালীন (এবং সর্বকালীন?) ইউরোপের সবচেয়ে বড় অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ডের রেখাঙ্কনও স্বামীজীর রচনায় মেলে। দ্বিতীয় প্রসঙ্গটিকেই হাজির করব। জানানো যায়, ইংরেজ সাহিত্যিক ক্রিস্টোফার ইশারউড বিবেকানন্দ ও বার্নহার্ডের সাক্ষাৎকার নিয়ে একটি অতি উপাদেয় লেখা লিখেছেন।

বার্নহার্ড সম্বন্ধে স্বামীজীর রচনা—

"পাশ্চাত্ত্যদেশের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মাদাম সারা বার্নহার্ড।…মাদাম বার্নহার্ড বর্ষীয়সী, কিন্তু সেজে মঞ্চে যখন ওঠেন, তখন যে-বয়স, যে-লিঙ্গ অভিনয় করেন, তার হুবহু নকল!—বালিকা, বালক, যা বলো তাই, হুবহু! আর সে আশ্চর্য আওয়াজ! এরা বলে তাঁর কণ্ঠে রূপার তার বাজে! বার্নহার্ডের অনুরাগ বিশেষ ভারতবর্ষের উপর। আমায় বারংবার বলেন, তোমাদের 'েট্রেজ'াসিএন, ত্রেসিভিলিজে'—অতি প্রাচীন, অতি সুসভ্য। এক বৎসর ভারতবর্ষ সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয়

করেন। তাতে মঞ্চের উপর বেলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া করে দিয়েছিলেন—মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা,—বেলকুল ভারতবর্ষ॥ আমায় অভিনয়ান্তে বললেন, 'আমি মাসাবধি প্রত্যেক মিউজিয়ম বেড়িয়ে ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোশাক, রাস্তা, ঘাট, পরিচয় করেছি।' বার্নহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল—সে মঁ র‍্যাভ, সে মঁ র‍্যাভ—সে আমার জীবনস্বপ্ন। আর প্রিন্স অব অয়েলস্ তাঁকে বাঘ, হাতী শিকার করাবেন প্রতিশ্রুত আছেন। তবে বার্নহার্ড বললেন—সে দেশে যেতে গেলে দেড় লাখ দু'লাখ খরচ না করলে কি হয়? টাকার অভাব তাঁর নাই—লা দিভিন সারা॥—দৈবী সারা।—তাঁর আবার টাকার অভাব কি।—যাঁর স্পেশাল ট্রেন ভিন্ন গতায়াত নেই। সে ধূম বিলাস, ইউরোপের অনেক রাজা-রাজড়া পারে না। যাঁর থিয়েটারে মাসাবধি আগে থেকে দুনো দামে টিকিট কিনে রাখলে তবে স্থান হয়, তাঁর টাকার বড় অভাব নেই, তবে সারা বার্নহার্ড বেজায় খরচে। তাঁর ভারতভ্রমণ কাজেই এখন রইল।"

বার্নহার্ডের ভারতবর্ষ সংক্রান্ত যে-অভিনয় স্বামীজী দেখেছিলেন, যে-অভিনয়ের সময়ে তাঁকে দর্শকাসনে দেখতে পেয়ে আকৃষ্ট হয়ে বার্নহার্ড উদ্যোগী হয়ে আলাপ করেছিলেন—সেই অভিনয়ের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কয়েক লাইনের মধ্যে স্বামীজী সরস শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন—

"ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড এখানে 'ইৎশীল' অভিনয় করছেন। এটি ফরাসী-ধাঁচের বুদ্ধজীবনী। এর মধ্যে দেখা যায়, গণিকা ইৎশীল বোধিদ্রুমমূলে আসীন বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করতে সচেষ্ট, আর বুদ্ধ তাকে জগতের অসারতা উপদেশ করছেন। সে কিন্তু সারাক্ষণ বুদ্ধের কোলে বসেই আছে! যা হোক, শেষ রক্ষাই রক্ষা—গণিকা বিফল হল। মাদাম বার্নহার্ড ইৎশীল সেজেছেন।"

সমকালীন ইউরোপের আর এক বিখ্যাত ব্যক্তি পিয়ের হিয়াসান্থের কথাচিত্র কম উপাদেয় নয়। এঁর দুই জীবন—পূর্বে সন্ন্যাসীর, পরে গৃহীর। বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী—সুতরাং ভঙ্গব্রত পিয়ের হিয়াসান্থের কথা বলবার সময়ে কলমে ঘৃণারস ভরে দেবেন, তাই স্বাভাবিক। তা কিন্তু করেননি। কৌতুক নেই তা নয়, কিন্তু করুণাও আছে, ঠিকভাবে বলতে গেলে সহানুভূতি, সেই সঙ্গে সম্ভ্রমের ছোঁয়াও—

"কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পথের সঙ্গী আর এক দম্পতি—পেয়র হিয়াসান্থ এবং তাঁর সহধর্মিণী। পেয়র অর্থাৎ পিতা হিয়াসান্থ ছিলেন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের এক কঠোর তপস্বী-শাখাভুক্ত সন্ন্যাসী। পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বাগ্মিত্বগুণে এবং তপস্যার প্রভাবে ফরাসী দেশে এবং সমগ্র ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে ইঁহার অতিশয় প্রতিষ্ঠা ছিল। মহাকবি ভিক্তর হ্যুগো দুজন লোকের ফরাসী ভাষার প্রশংসা করতেন—তার মধ্যে পেয়র হিয়াসান্থ একজন। চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পেয়র হিয়াসান্থ এক আমেরিক

নারীর প্রণয়াবদ্ধ হয়ে তাকে করে ফেললেন বে—মহা হুলস্থুল পড়ে গেল। অবশ্য ক্যাথলিক-সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁকে ত্যাগ করলে। শুধু পা, আলখাল্লা-পরা তপস্বীবেশ ফেলে পেয়র হিয়াসান্থ গৃহস্থের হ্যাট কোট বুট পরে হলেন মস্যিয় লয়জন্। আমি কিন্তু তাঁকে তাঁর পূর্বের নামেই ডাকি। সে অনেক দিনের কথা—ইউরোপ-প্রসিদ্ধ হাঙ্গাম—প্রোটেস্টান্টরা তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করলে—ক্যাথলিকরা ঘৃণা করতে লাগল। পোপ, লোকটার গুণাতিশয্যে তাকে ত্যাগ করতে না চেয়ে বললেন, 'তুমি গ্রীক ক্যাথলিক পাদ্রী হয়ে থাকো ( সে পাদ্রী একবার বে করতে পায়, কিন্তু বড় পদ পায় না ), কিন্তু রোমান চার্চ ত্যাগ করো না।' কিন্তু লয়জন-গেহিনী তাঁকে টেনে হিঁচড়ে পোপের ঘর থেকে বার করলে। ক্রমে পুত্র, পৌত্র হল।...তাঁর গেহিনী বোধহয় অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, লয়জন-বা দ্বিতীয় মার্টিন লুথার হয়, পোপের সিংহাসন উল্টে ফেলে দেয় ভূমধ্যসাগরে। সে সব তো কিছুই হল না—হল, ফরাসীরা বলে, ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ। কিন্তু মাদাম লয়জনের সে নানা দিবাস্বপ্ন চলেছে!! বৃদ্ধ লয়জন অতি মিষ্টভাষী, নম্র, ভক্তপ্রকৃতির লোক। আমার সঙ্গে দেখা হলেই কত কথা—নানা ধর্মের, নানা মতের। তবে ভক্ত মানুষ—অদ্বৈতবাদের ( দিকে ) একটু ভয় খাওয়া আছে। গিন্নীর ভাবটা বোধহয় আমার উপর কিছু বিরূপ। বৃদ্ধের সঙ্গে যখন আমার ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাসের চর্চা হয়—স্থবিরের প্রাণে সে চিরদিনের ভাব জেগে ওঠে—আর গিন্নীর বোধহয় গা কন্‌কন্ করে। তার উপর মেয়ে-মদ্দ সমস্ত ফরাসীরা যত দোষ গিন্নীর উপর ফেলে; বলে, 'ও মাগী আমাদের এক মহাতপস্বী সাধুকে নষ্ট করে দিয়েছে।' গিন্নীর কিছু বিপদ বৈকি।—আবার বাস হচ্ছে পারিসে ক্যাথলিকের দেশে। বে-করা পাদ্রীকে ওরা দেখলে ঘৃণা করে; মাগ ছেলে নিয়ে ধর্মপ্রচার—এ ক্যাথলিক আদপে সহ্য করবে না। গিন্নীর আবার একটু ঝাঁজ্ আছে কি না! একবার গিন্নী এক অভিনেত্রীর উপর ঘৃণা প্রকাশ করে বললেন, 'তুমি বিবাহ না করে অমুকের সঙ্গে বাস করছ, তুমি বড় খারাপ।' সে অভিনেত্রী ঝট্ করে জবাব দিলে, 'আমি তোমার চেয়ে লক্ষ গুণে ভাল। আমি একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাস করি, আইনমতো বে না-হয় নাই করেছি; আর তুমি মহাপাপী—এত বড় একটা সাধুর ধর্ম নষ্ট করলে!! যদি তোমার প্রেমের ঢেউ এতই উঠেছিল, তা না-হয় সাধুর সেবাদাসী হয়ে থাকতে। তাকে বে করে, গৃহস্থ করে উৎসন্ন কেন দিলে?'...

"যাক, আমি সমস্ত শুনি, চুপ করে থাকি। মোদ্দা, বৃদ্ধ পেয়র পিয়াসান্থ বড়ই প্রেমিক, আর শান্ত; সে খুশি আছে তার মাগ ছেলে নিয়ে—দেশসুদ্ধ লোকের তাতে কি? তবে গিন্নীটি একটু শান্ত হলেই বোধহয় সব মিটে যায়।"

'চরিত্র চিত্রণ' শেষ করা যাক স্বামীজী-রচিত খেয়ালী সভার বর্ণনা দিয়ে। এর

মূল ইংরাজি, কিন্তু অনুবাদেও রস সম্পূর্ণ নষ্ট হয়নি, এমনই লেখার স্বাদুতা।

রচনাটিতে চরিত্র অনেকগুলি এবং তাঁদের কেউ-কেউ রীতিমতো বিখ্যাত। রচনার ( বা পত্রের ) বিষয়—প্যারিসে লেগেট-ভবনে একটি 'খেয়ালী সভা'—যাতে উপস্থিত-দের মধ্যে ছিলেন—ধর্মপ্রবক্তারূপে খ্যাতনামা স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ ; দার্শনিক পণ্ডিতরূপে সুপরিচিত অধ্যাপক উইলিয়ম জেমস ; সমাজতাত্ত্বিকরূপে অনুরূপ খ্যাত স্কচ অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডেস ( যিনি পরে ভারতে এসেছিলেন, জগদীশ বসুর জীবনী লিখেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল ) ; বিশ্ববিখ্যাত বেহালা-বাদক ওলিবুলের বিধবা পত্নী মিসেস বুল, যিনি আমেরিকা ও ইউরোপের বিদগ্ধ-মণ্ডলীর একাংশে সুপরিচিত ; সিস্টার নিবেদিতা—মননশীলতা, বাগ্মিতা ও রচনা-শক্তির জন্য যিনি খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে উঠছেন ; আমেরিকান সোসাইটি-মহিলা জোসেফিন ম্যাকলাউড—প্যারিসের সর্বশেষ ফ্যাশানের পোষাক না পরলে যাঁর মান-মর্যাদা ধূলিসাৎ হয়ে যায় ; এবং জনৈক ভারতীয় সূর্যোপাসক, ও তাঁর শিষ্য—যাঁদের নাম এই রচনায় বলা হয়নি। খেয়ালী সভায় স্বামীজী, তাঁর রচনা অনুযায়ী, পর্যবেক্ষকের ভূমিকা নিয়েছিলেন, এবং সকৌতুকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের খেয়াল ও বাতিকের রূপটি এক-এক টানে ফুটিয়েছেন। আমরা দেখতে পাই—দর্শনের অধ্যাপক মনোজীবী উইলিয়ম জেমস ব্যাধির কারণে এখন শরীরদর্শনে ব্যস্ত। দেখা যায়, প্যাট্রিক গেডেসের সমাজদর্শন নানা জটিল প্যাঁচে এমনই জড়ানো যে, সামাজিকের সাধ্য নেই তার গাঁট খোলে। মিসেস বুলের স্বভাব সবকিছুকে তুলনামূলক ধর্ম ও দর্শনতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করে ফেলা। এবং ভগিনী নিবেদিতার কাছে সর্বরোগহর দুটি ঔষধ—চাটনী ও কালী। হাসির বিষয় নির্বাচনে স্বামীজী কতখানি বেপরোয়া তা নিবেদিতার ভাবভঙ্গি নিয়ে তাঁর তামাশা থেকে বোঝা যায়। নিবেদিতাকে 'কালী' ধরিয়েছিলেন স্বামীজীই, এবং কুটীরশিল্প হিসাবে যদি ভারতীয় ফলের চাটনি তৈরী করে বিদেশের বাজারে ছাড়া যায় তাহলে কিছুটা আর্থিক সুরাহা হতে পারে—এই সাজেশনও তাঁরই। কিন্তু তাহলেও—ঐসব জিনিস তিনিই নিবেদিতাকে ধরিয়েছেন—হলই বা—তা বলে হাসব না—তা কি হয় ? জো, অর্থাৎ জোসেফিন ম্যাকলাউডের পোষাক-বাহার নিয়ে তামাশাও আছে, সেই সঙ্গে জো-র অগ্নি-উপাসনার প্রতি .পক্ষপাত নিয়েও। ভারতে থাকাকালে মিস ম্যাকলাউড, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যেতেন শিবনারায়ণ স্বামীর অগ্নিযজ্ঞ দেখতে।

এখানে জানাতে পারি, লুই বার্কের ধারণা, সত্যই ও-রকম কোনো খেয়ালী সভার অনুষ্ঠান হয়নি। গোটা ব্যাপারটি স্বামীজীর বানানো।

স্বামীজী মিসেস লেগেটকে লিখেছিলেন—

"এ বাড়িতে আমাদের খেয়ালীদের একটা কংগ্রেস হয়ে গেল।

"প্রতিনিধি এসেছিলেন নানা দেশ থেকে—দক্ষিণে ভারতবর্ষ থেকে উত্তরে স্কটল্যাণ্ড পর্যন্ত—ইংলণ্ড ও আমেরিকা তারই ধার ঘেঁষে।

"সভাপতি নির্বাচনে অত্যন্ত অসুবিধা হয়েছিল, কারণ ডাঃ জেমস যদিও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তিনি বিশ্বসমস্যা সমাধান অপেক্ষা তাঁর শ্রীঅঙ্গে মিসেস মেল্টন (হাত-ঘষা চিকিৎসক) কর্তৃক উৎপাদিত স্ফোটকগুলি সম্পর্কে অধিক মনোযোগী ছিলেন।

"আমি জো-র নাম প্রস্তাব করেছিলাম কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ তাঁর নতুন গাউন এসে উপস্থিত হয়নি—এবং, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য সুবিধাজনক একটি কোণ নির্বাচন করে প্রস্থান করলেন।

"মিসেস বুল তৈরীই ছিলেন কিন্তু মার্গট (নিবেদিতা) প্রতিবাদ জানালেন—সেক্ষেত্রে সমাবেশটি তুলনামূলক দর্শনের ক্লাসে পর্যবসিত হয়ে যাবে।

"আমরা এই রকম সংকটাবস্থায় আছি—হঠাৎ এক কোণ থেকে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলেন বেঁটে চওড়া গোলপানা একটি মূর্তি—বিনা ভূমিকায় ঘোষণা করে দিলেন—কেবল সভাপতি নির্বাচনের সমস্যা নয়, জীবনসমস্যার সমাধান পর্যন্ত হয়ে যাবে যদি আমরা সকলে চন্দ্রদেবতা ও সূর্যদেবতার উপাসনা আরম্ভ করে দিই। তাঁর ভাষণ পাঁচ মিনিটের, কিন্তু সেটি অনুবাদ ক'রে শোনাতে সেখানে উপস্থিত তাঁর শিষ্যের লেগে গেল ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তার ফাঁকে উক্ত গুরুদেব আপনার বৈঠকখানার কম্বল-কার্পেটাদি টেনে স্তূপাকার করে ফেলেছিলেন—তাঁর শুভ বাসনা শ্রীমুখে তা বলেও ফেললেন—তিনি তখনি সেখানে অগ্নিদেবতার শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিয়ে ফেলবেন।

এই সন্ধিক্ষণে জো উঠে বাধা দিলেন, জেদ ক'রে বললেন, তিনি তাঁদের বৈঠকখানায় অগ্নি-যজ্ঞ হতে দিতে বিশেষ অনিচ্ছুক। ভারতীয় ঋষি তা শুনে দু'চোখে আগুন ছুটিয়ে তাকালেন; যাকে অগ্নি-উপাসনায় সম্পূর্ণ দীক্ষিত বলে তাঁর সুনিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছিল, তার এহেন আচরণে তাঁর বিরক্তির সীমা ছিল না।

"তখন ডাঃ জেমস তাঁর স্ফোটকের পরিচর্যা থেকে খাস্ এক মিনিট সময় বাঁচিয়ে তারই মধ্যে ঘোষণা করলেন—অগ্নিদেবতা এবং তাঁর ভ্রাতৃগণ সম্বন্ধে অতীব চিত্তাকর্ষক তাঁর কিছু বক্তব্য ছিল, তা তিনি বলতেনও, যদি-না মেল্টনীয় স্ফোটকের বিবর্তনের চিন্তায় তিনি সম্পূর্ণ নিমগ্ন থাকতেন। তদুপরি, তাঁর মহান আচার্য হার্বার্ট স্পেনসার তাঁর পূর্বে উক্ত বিষয়ে কোনো সন্ধানকার্য চালাননি, সুতরাং এক্ষেত্রে মহামূল্য নীরবতাকেই তিনি দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করে থাকবেন।

"'চাটনিই আসল বস্তু'—দরজার কাছ থেকে একটা স্বর শোনা গেল। আমরা সবাই পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি—মার্গট। 'বস্তুটি হল চাটনি'—মার্গট বললেন—

'চাটনি এবং কালী—জীবনের সর্ব দুঃখ দূর করবে, তা সকল মন্দকে গিলতে এবং সকল ভালকে উপভোগ করেতে সাহায্য করবে।' বলতে-বলতে তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন, সদাপে জানালেন, আর একটি কথাও তিনি মুখ থেকে খসাবেন না, কারণ তিনি তাঁর বক্তৃতাকালে সমাবেশের অন্তর্গত এক পুং-প্রাণীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, এক ব্যক্তি জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল, সুতরাং সে ভদ্রমহিলার প্রাপ্য সম্মান ভদ্রমহিলাকে দিচ্ছিল না—এবং, মার্গট যদিও নরনারীর সমানাধিকারে বিশ্বাস করেন তবু, নারীজাতির প্রতি উক্ত বিরক্তিকর লোকটির যথাবিহিত সৌজন্যের অভাবের কারণ তিনি জানতে চান। তখন সকলে সমবেতভাবে একবাক্যে বললেন, তাঁরা মার্গটকে অখণ্ড অবিভক্ত নিতান্ত মনোযোগ দিয়েছেন; সর্বোপরি দিয়েছেন তাঁর প্রাপ্য সমানাধিকার, কিন্তু বৃথা, এই বিদ্‌ঘুটে সমাবেশের সঙ্গে মার্গটের কোনো সম্পর্কই থাকতে পারে না—মার্গট বসে পড়লেন।

"তখন উঠে দাঁড়ালেন বস্টনের মিসেস বুল। তিনি বোঝাতে শুরু করলেন—নরনারীর সত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে যথাযথ বোধের অভাব থেকে কিভাবে জগতের সকল সমস্যার উৎপত্তি। তিনি বললেন—'সঠিক মানুষদের মধ্যে যথার্থ বোঝাপড়া—নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্কের আদর্শকে উন্নত রেখে প্রেমের মধ্যে মুক্তি এবং ঐ মুক্তির মধ্যে মাতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব, পিতৃত্ব, ঈশ্বরত্ব ও স্বাধীনতার সন্ধান, স্বাধীনতার মধ্যে প্রেম এবং প্রেমের মধ্যে স্বাধীনতা—এইগুলির মধ্যেই আছে সর্বব্যাধির একমাত্র ঔষধ।'

"এই কথায় স্কচ-প্রতিনিধি [ প্যাট্রিক গেডেস ] প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললেন—যেহেতু শিকারী ছাগপালককে তাড়া করেছে, ছাগপালক তাড়া করেছে মেষপালককে, মেষপালক তাড়া করেছে কৃষককে, এবং কৃষক তাড়া করেছে জেলেকে, তাড়া করে তাকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে—এখন আমরা গভীর সমুদ্র থেকে জেলেকে উঠিয়ে এনে কৃষকের উপর ফেলতে চাই, কৃষককে চাই মেষপালকের উপর ফেলতে, ইত্যাদি ; এমন করলেই জীবনের জাল সম্পূর্ণ বোনা হবে এবং আমরা সুখী হবো।'

"স্কচ-প্রতিনিধিকে তাঁর তাড়া-করা-কাণ্ডে আর বেশি এগোতে দেওয়া হয়নি—মুহূর্তমধ্যে সকলেই খাড়া দাঁড়িয়ে উঠল এবং কতকগুলি বিশৃঙ্খল চীৎকার গণ্ডগোলের মধ্য থেকে শোনা গেল—'সূর্যদেবতা এবং চন্দ্রদেবতা' ; 'চাটনি এবং কালী' ; 'দাম্পত্য-সম্পর্ক, মাতৃত্ব প্রভৃতির যথার্থ বোঝাপড়ার স্বাধীনতা' ; 'কদাপি না—জেলেকে তীরে ফিরে যেতেই হবে', ইত্যাদি। পরিস্থিতি যখন এইরূপ, জো ঘোষণা করলেন, তখনকার মতো তাঁর শিকারী হতে এবং পাগলামি না থামালে সকলকে তাড়া করে ঘরের বার করে দিতে উগ্র আকাঙ্ক্ষা জাগছে।

"সুতরাং শান্তি ও নীরবতা ফিরে এল, এবং অবিলম্বে ব্যাপারটা আপনাকে লিখে জানাতে বসলাম।"

## —জাহাজে হাঙর-শিকার—

বাংলাসাহিত্যের অন্যতম সম্পদ বর্ণনাটি। এমন জীবন্ত, প্রাণোচ্ছল, রসান্বিত বর্ণনা ক্বচিৎ পাওয়া যায়। এটি পড়লেই মনে হয়, লেখক-মানুষটি কী স্ফূর্তিবাজ, এবং কী শক্তিশালী! জাহাজ থেকে হাঙর শিকার করা হচ্ছে, তাতে প্যাসেঞ্জারদের উৎসাহের সীমা নেই, শেষে অনেক চেষ্টার পরে হাঙর শিকার হল—এই ব্যাপারটিকে স্বামীজী কয়েক পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন—ঠিকভাবে বলতে গেলে, গোটা ব্যাপারটিকে একেবারে পাঠকের চাক্ষুষ করিয়ে দিয়েছেন। বাস্তবরস, কৌতুকরস এবং গতি-শীলতা লেখাটির প্রধান গুণ—সেই সঙ্গে চিত্ররস। সংক্ষেপে বলা যায়, এখানে আমরা বাংলাসাহিত্যের সেরা চলচ্চিত্রকে পেয়েছি।

বর্ণনাটি এই—

"সকালবেলা খাবার-দাবার আগেই শোনা গেল যে, জাহাজের পেছনে বড়-বড় হাঙর ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। জল-জ্যান্ত হাঙর পূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি—গতবারে আসবার সময়ে সুয়েজে জাহাজ অল্পক্ষণই ছিল, তাও আবার শহরের গায়ে। হাঙরের খবর শুনেই আমরা তাড়াতাড়ি উপস্থিত। সেকেণ্ড কেলাসটি জাহাজের পাছার উপর—সেই ছাদ হতে বারান্দা ধরে কাতারে-কাতারে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে, ঝুঁকে হাঙর দেখছে। আমরা যখন হাজির হলুম, তখন হাঙর-মিঞারা একটু সরে গেছেন। মনটা বড়ই ক্ষুণ্ণ হল। কিন্তু দেখি যে, জলে গাঙ্‌ধাড়ার মতো একপ্রকার মাছ ঝাঁকে-ঝাঁকে ভাসছে। আর একরকম খুব ছোট মাছ জলে থিক্-থিক্ করছে। মাঝে-মাঝে একএকটা বড় মাছ, অনেকটা ইলিশমাছের চেহারা, তীরের মতো এদিক-ওদিক ক'রে দৌড়ুচ্ছে। মনে হল, বুঝি উনি হাঙরের বাচ্ছা। কিন্তু জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম—তা নয়। ওঁর নাম বনিটো। পূর্বে ওঁর বিষয়ে পড়া গেছল বটে, এবং মালদ্বীপ হতে উনি শুঁটকিরূপে আমদানি হন, হুড়ি চড়ে—তাও পড়া ছিল। ওঁর মাংস লাল ও বড় সুস্বাদ—তাও শোনা আছে। এখন ওঁর তেজ আর বেগ দেখে খুশী হওয়া গেল। অত বড় মাছটা তীরের মতো জলের ভিতর ছুটছে; আর সে সমুদ্রের কাচের মতো জল, তার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গি দেখা যাচ্ছে। বিশ মিনিট, আধ ঘণ্টাটাক, এইপ্রকার বনিটোর ছুটোছুটি আর ছোট মাছের কিলিবিলি তো দেখা যাচ্ছে। আধ ঘণ্টা, তিন কোয়ার্টার—ক্রমে তিতিবিরক্ত হয়ে আসছি, এমন সময় একজন বললে—'ঐ ঐ!' দশ-বার জনে বলে উঠল, 'ঐ আসছে! ঐ আসছে!!' চেয়ে দেখি, দূরে একটা প্রকাণ্ড কালো বস্তু ভেসে আসছে, পাঁচ-সাত ইঞ্চি জলের নীচে। ক্রমে বস্তুটা এগিয়ে আসতে লাগল। প্রকাণ্ড থ্যাবড়া মাথা দেখা দিলে; সে গদাইলস্করি চাল; বনিটোর সোঁ সোঁ তাতে নেই; তবে একবার ঘাড় ফেরালেই একটা মস্ত চক্কর হল। বিভীষণ মাছ! গম্ভীর চালে আসছে। তার

আগে-আগে দু'একটা ছোট মাছ; আর কতকগুলো ছোট মাছ তার পিঠে গায়ে পেটে খেলে বেড়াচ্ছে। কোনো কোনোটা বা জেঁকে তার ঘাড়ে চড়ে বসেছে। ইনিই সসাঙ্গোপাঙ্গ হাঙর। যে-মাছগুলি হাঙরের আগে-আগে যাচ্ছে তাদের নাম আড়কাটি মাছ—পাইলট ফিস্। তারা হাঙরকে শিকার দেখিয়ে দেয়, আর বোধহয় প্রসাদটা-আসটা পায়। কিন্তু হাঙরের সে মুখব্যাদান দেখলে তারা যে বেশি সফল হয়, তা বোধ হয় না। যে মাছগুলি আশে-পাশে ঘুরছে, পিঠে চডে বসছে, তারা হাঙর-'চোষক'। তাদের বুকের কাছে প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা ও দুই ইঞ্চি চওডা চ্যাপটা গোলপানা একটি স্থান আছে।…সেই জায়গাটা ঐ মাছ, হাঙরের গায়ে দিয়ে চিপ্‌সে ধরে।…এরা নাকি হাঙরের গায়ের পোকা-মাকড খেয়ে বাঁচে। এই দুই প্রকার মাছ পরিবেষ্টিত না হয়ে হাঙর চলেন না। আর এদের, নিজের সহায়-পারিষদ্-জ্ঞানে কিছু বলেনও না।…

"সেকেণ্ড কেলাসের লোকগুলির বড়ই উৎসাহ। তাদের মধ্যে একজন ফৌজি—তার তো উৎসাহের সীমা নেই। কোথা থেকে জাহাজ খুঁজে একটা ভীষণ বঁড়শির জোগাড় করলে। সে 'কুয়োর ঘটি তোলার' ঠাকুরদাদা। তাতে সেরখানেক মাংস আচ্ছা দড়ি দিয়ে জোর করে জড়িয়ে বাঁধলে। তাতে একটা মোটা কাছি বাঁধা হল। হাত-চার বাদ দিয়ে, একখানা মস্ত কাঠ ফাত্‌নার জন্য লাগানো হল। তারপর, ফাত্‌না-সুদ্ধ বঁড়শি ঝুপ্ করে জলে ফেলে দেওয়া হল। জাহাজের নীচে একখানি পুলিশের নৌকা আমরা আসা পর্যন্ত পাহারা দিচ্ছিল—পাছে ডাঙার সঙ্গে আমাদের কোনরকম ছোঁয়াছুঁয়ি হয়। সেই নৌকার উপর আবার দুজন দিব্বি ঘুমুচ্ছিল, আর যাত্রীদের যথেষ্ট ঘৃণার কারণ হচ্ছিল। এক্ষণে তারা বড় বন্ধু হয়ে উঠল। হাঁকাহাঁকির চোটে আরব মিঞা চোখ মুছতে-মুছতে উঠে দাঁড়ালেন। কি একটা হাঙ্গামা উপস্থিত বলে কোমর অ'াটবার জোগাড় করছেন, এমন সময়ে বুঝতে পারলেন যে অত হাঁকাহাঁকি কেবল তাঁকে কড়িকাষ্ঠরূপ হাঙর ধরবার ফাতনাটিকে টোপ-সহিত কিঞ্চিৎ দূরে সরাইয়া দিবার অনুরোধধ্বনি। তখন তিনি নিঃশ্বাস ছেড়ে, আকর্ণবিস্তার হাসি হেসে, একটা বল্লির ডগায় করে ঠেলেঠুলে ফাতনাটাকে তো দূরে ফেললেন, আর আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে, পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে, বারাণ্ডায় ঝুঁকে, ঐ আসে ঐ আসে—শ্রীহাঙরের জন্য 'সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং' হয়ে রইলাম; এবং যার জন্য মানুষ ঐ প্রকার ধড়্‌ফড়্ করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হতে লাগল—অর্থাৎ 'সখি, শ্যাম না এলো!' কিন্তু সকল দুঃখেরই একটা পার আছে। তখন সহসা জাহাজ হতে প্রায় দু'শ হাত দূরে, বৃহৎ ভিস্তির মুষকের আকারে কী একটা ভেসে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে 'ঐ হাঙর! ঐ হাঙর!' রব। 'চুপ্ চুপ্—ছেলের দল! হাঙর পালাবে! বলি, ও হে! সাদা টুপিওয়ালা একবার নাবাও না, হাঙরটা যে ভড়কে যাবে'—

ইত্যাকার আওয়াজ যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে, তাবৎ সেই হাঙর, লবণসমুদ্রজন্মা —বঁড়শিসংলগ্ন শোরের মাংসের তালটি উদারাগ্নিতে ভস্মাবশেষ করবার জন্য, পালভরে নৌকার মতো সোঁ করে সামনে এসে পড়লেন। আর পাঁচ হাত— এইবার হাঙরের মুখ টোপে ঠেকেছে! সে ভীম পুচ্ছ একটু হেললো—সোজা গতি চক্রাকারে পরিণত হল। যাঃ, হাঙর চলে গেল যে হে! আবার পুচ্ছ একটু বাঁকল, আর সেই প্রকাণ্ড শরীর ঘুরে বঁড়শিমুখে দাঁড়াল। আবার সোঁ করে আসছে—ঐ হাঁ ক'রে, বঁড়শি ধরে-ধরে! আবার সেই পাপ লেজ নড়ল, আর হাঙর শরীর ঘুরিয়ে দূরে চলল। আবার ঐ চক্র দিয়ে আসছে, আবার হাঁ করছে—ঐ টোপটা মুখে নিয়েছে, এইবার—ঐ ঐ চিতিয়ে পড়ল; হয়েছে, টোপ খেয়েছে—টান্ টান্ টান্—চল্লিশ-পঞ্চাশ জনে টান্, প্রাণপণে টান্! কী জোর মাছের! কী ঝটাপট—কী হাঁ! টান্ টান্! জল থেকে এই উঠল—ঐ যে জলে ঘুরছে, আবার চিতুচ্ছে—টান্ টান্! যাঃ টোপ খুলে গেল—হাঙর পালাল। তাই তো হে, তোমাদের কী তাড়াতাড়ি বাপু! একটু সময় দিলে না টোপ খেতে! যেই চিতিয়েছে অমনিই কি টানতে হয়? আর —গতস্য শোচনা নাস্তি—হাঙর তো বঁড়শি ছাড়িয়ে চোঁ-চা দৌড়। আড়কাঠি-মাছকে, উপযুক্ত শিক্ষা দিলে কিনা তো খবর পাইনি—মোদ্দা, হাঙর তো চোঁ-চা। আবার সেটা ছিল 'বাঘা'—বাঘের মতো কালো-কালো ডোরা-কাটা। যা হোক, 'বাঘা' বঁড়শি-সন্নিধি পরিত্যাগ করবার জন্য স-'আড়কাঠি'-'রক্তচোষা' অন্তর্দধে।

"কিন্তু নেহাত হতাশ হবার প্রয়োজন নেই—ঐ যে পলায়মান 'বাঘা'র গা ঘেঁষে আর একটা প্রকাণ্ড 'থ্যাবড়া-মুখো' চলে আসছে! আহা, হাঙরদের ভাষা নেই! নইলে 'বাঘা' নিশ্চিত পেটের খবর তাকে দিয়ে সাবধান করে দিতো। নিশ্চিত বলত—'দেখো হে, সাবধান, ওখানে একটা নূতন জানোয়ার এসেছে, বড় সুস্বাদ সুগন্ধ মাংস তার, কিন্তু কি শক্ত হাড়! এতকাল হাঙরগিরি করছি, কত রকম জানোয়ার —জ্যান্ত, মরা, আধমরা—উদরস্থ করেছি, কতরকম হাড়গোড়, ইট-পাথর, কাঠ-কুটরো পেটে পুরেছি, কিন্তু এ হাড়ের কাছে আর সব মাখম হে মাখম!! এই দেখো না—আমার দাঁতের দশা, চোয়ালের দশা কি হয়েছে'—বলে, একবার সেই আকটি-দেশ-বিস্তৃত মুখ ব্যাদান ক'রে আগন্তুক হাঙরকে অবশ্যই দেখাত। সেও প্রাচীন বয়স-সুলভ অভিজ্ঞতা সহকারে—চ্যাং মাছের পিত্তি, কুঁজো ভেটকির পিলে, ঝিনুকের ঠাণ্ডা সুরুয়া ইত্যাদি সমুদ্রজ মহৌষধির কোনো-না-কোনোটা ব্যবহারের উপদেশ দিতই দিত। কিন্তু যখন ওসব কিছুই হল না তখন হয় হাঙরদের অত্যন্ত ভাষার অভাব, নতুবা ভাষা আছে কিন্তু জলের মধ্যে কথা কওয়া চলে না! অতএব যত-দিন না কোনোপ্রকার হাঙুরে অক্ষর আবিষ্কার হচ্ছে, ততদিন সে ভাষার ব্যবহার কেমন করে হয়?—অথবা 'বাঘা' মানুষ-ঘেঁষা, মানুষের ধাত পেয়েছে, তাই

'থ্যাবড়া'কে আসল খবর কিছু না বলে, মুচকে হেসে, 'ভাল আছো তো হে' বলে সরে গেল।—'আমি একাই ঠকবো ?'

আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়ে, পাছু-পাছু যান গঙ্গা···—শঙ্খধ্বনি তো শোনা যায় না, কিন্তু আগে-আগে চলেছেন 'পাইলট ফিস্', আর পাছু-পাছু প্রকাণ্ড শরীর নাড়িয়ে আসছেন 'থ্যাবড়া'; তাঁর আশে-পাশে নেত্য করছেন 'হাঙর-চোষা' মাছ। আহা, ও-লোভ কি ছাড়া যায় ? দশ হাত দরিয়ার উপর ঝিক্-ঝিক্ করে তেল ভাসছে, আর খোসবু কতদূর ছুটেছে তা 'থ্যাবড়াই বলতে পারে। তার উপর সে কি দৃশ্য—সাদা, লাল, জরদা—এক জায়গায়। আসল ইংরেজি শুয়ারের মাংস, প্রকাণ্ড কালো বড়শির চারিধারে বাঁধা, জলের মধ্যে রঙ-বেরঙের গোপিমণ্ডলমধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্ছে !!

"এবার সব চুপ—নোড়-চোড না, আর দেখো তাড়াতাড়ি করো না! মোদ্দা, কাছির কাছে-কাছে থেকো। ঐ—বঁড়শির কাছে-কাছে ঘুরছে, টোপটা মুখে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখছে—দেখুক! চুপ চুপ। এইবার ঠিক হল—ঐ যে আড়ে টোপ গিলছে। চুপ—গিলতে দাও। তখন—'থ্যাবড়া' অবসরক্রমে, আড় হয়ে, উদরস্থ করে যেমন চলে যাবে অমনি পড়ল টান্। বিস্মিত 'থ্যাবড়া' মুখ ঝেড়ে, চাইলে সেটাকে ফেলে দিতে—উল্টো উৎপত্তি !! বঁড়শি গেল বিঁধে—আর ওপরে ছেলে বুড়ো জোয়ান—দে টান্, কাছি ধরে দে টান্! ঐ, হাঙরের মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠল—টান্ ভাই টান্। ঐ যে—প্রায় আধখানা হাঙর জলের উপর। বাপ্, কি মুখ। ওর যে সবটাই মুখ আর গলা হে। টান্—ঐ, সবটা জল ছাড়িয়েছে—ঐ যে বঁড়শিটা বিঁধেছে—ঠোঁট এফোঁড়-ওফোঁড়—টান্। থাম্ থাম্—ও আরব পুলিশ-মাঝি, ওর ল্যাজের দিকে একটা দড়ি বেঁধে দাও তো, নইলে যে এতবড় জানোয়ার টেনে তোলা দায়। সাবধান হয়ে-হয়ে ভাই; ও ল্যাজের ঝাপটায় ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙে যায়। আবার টান্—কি ভারী, হে! ওমা ওকি ? তাই তো হে—হাঙরের পেটের নীচে দিয়ে ও ঝুলছে কি ? ও যে নাড়ি-ভুঁড়ি। নিজের ভারে নিজের নাড়ি-ভুঁড়ি বেরুল যে। যাক্, ওটা কেটে দাও, জলে পড়ুক, বোঝা কমুক্! টান্ ভাই টান্! এ যে রক্তের ফোয়ারা হে! আর কাপড়ের মায়া করলে চলবে না—টান্! এই এলো। এইবার জাহাজের উপর ফেলো। ভাই, হুঁশিয়ার, খুব হুঁশিয়ার, তেড়ে এক কামড়ে একটা হাত ওয়ার—আর ঐ ল্যাজ, সাবধান। এইবার, এইবার দড়ি ছাড়ো—ধুপ্! বাবা, কি হাঙর! কি ধপাৎ করেই জাহাজের উপর পড়ল। সাবধানের মার নেই—ঐ কড়িকাঠখানা দিয়ে ওর মাথায় মারো—ওহে ফৌজিম্যান, তুমি সেপাইলোক, এ তোমারি কাজ।—'বটে তো।' রক্তমাখা গায় কাপড়ে, ফৌজি-যাত্রী কড়িকাঠ উঠিয়ে দুম্‌দুম্ দিতে লাগল হাঙরের মাথায়। আর মেয়েরা—

'আহা কি নিষ্ঠুর, মেরো না' ইত্যাদি চীৎকার করতে লাগল—অথচ দেখতেও ছাড়বে না। তারপর সে বীভৎস কাণ্ড এইখানেই বিরাম হোক। কেমন ক'রে সে হাঙরের পেট চেরা হল, কেমন রক্তের নদী বইতে লাগল, কেমন সে হাঙর, ছিন্ন-অন্ত্র, ভিন্ন-দেহ, ছিন্ন-হৃদয় হয়েও কতক্ষণ কাঁপতে লাগল, নড়তে লাগল, কেমন ক'রে তার পেট থেকে অস্থি চর্ম মাংস, কাঠ-কুটরো একরাশ বেরুল—সে সব কথা থাক। এই পর্যন্ত যে—সেদিন আমার খাওয়া-দাওয়ার দফা মাটি হয়ে গিয়েছিল। সব জিনিসেই সেই হাঙরের গন্ধ বোধ হতে লাগল।"

## সেরা সরস রীতি

বিবেকানন্দের রসিকতা কেবল বিষয়ে নয়, রীতিতেও। তাঁর বাগ্‌রীতির অন্তর্নিহিত সরসতার আলোচনা ভিন্ন তাঁর রসিকতার হিসাব সম্পূর্ণ হবে না।

অর্থাৎ বিবেকানন্দের স্টাইলের প্রসঙ্গ এসে যাচ্ছে।

এখানে একটু ভূমিকা করে নিতে হবে। ভরসা করি, রসিক পাঠক এই ভূমিকাকে বাহুল্য বিবেচনা করবেন না। এখানে বাংলা গদ্যসাহিত্যের একাংশে বিবেকানন্দের বিশেষ দানের দুটো কথাও এসে যাবে।

বিবেকানন্দ বাংলাসাহিত্যের জন্য কতখানি করে গেছেন—তা সবে কিছুটা শিক্ষিত সজ্জন বাঙালী বুঝতে আরম্ভ করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে কিছুদিন আগেও বিবেকানন্দ পদাতিকদের দলভুক্ত হয়ে নামোল্লেখের মহাগৌরব পেয়ে ধন্য হচ্ছিলেন। কিন্তু এখন সাহিত্যের বড়জাতের ঐতিহাসিকরাই বলে ফেলেছেন, না, আর পাঁচজনের মতো তিনি কিছু ধর্মসাহিত্য লিখেছেন, এটাই সব কথা নয়—মাত্র কয়েকশো পৃষ্ঠা বাংলা রচনার মধ্যে তিনি যে-রীতির প্রবর্তন করেছিলেন, তাই বাংলাসাহিত্যের চলিত রীতির প্রথম আদর্শ রূপ।

কথাটা আরও পরিষ্কার করে বলি। চলিত রীতির ক্ষেত্রে ভবানীচরণ বা প্যারীচাঁদের অগ্রণী ভূমিকা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। আরও উল্লেখযোগ্য কালীপ্রসন্নের হুতোমী রচনা। কিন্তু সর্বপ্রকার সাহিত্যে ঐ রীতি অনুসরণীয় নয়। হুতোমী রীতিকে অবশ্য বহুমান দিতে হবে। ভাল্‌গার ভঙ্গির মধ্যে কী প্রচণ্ড প্রাণশক্তি না হুতোমী রীতিতে ছিল। একথা সত্য, বাংলাসাহিত্যে সেরা চলিত রীতি চালাবার নিজস্ব অধিকার যাঁর ছিল, তিনি সে অধিকার গ্রহণ করেননি—তিনি আর কেউ নন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট প্রতিভা এবং তাঁর গদ্যরীতির ব্যাপক বহনক্ষমতা শিষ্ট সাহিত্যে চলিত গদ্যের স্বীকৃতিকে পেছিয়ে দিয়েছিল—রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের দ্বিধাও এক্ষেত্রে কম দায়ী নয়।

প্রমথ চৌধুরী—রবীন্দ্রনাথের প্রীতিভাজন জামাতা—চলিত গদ্য (?) লিখে এবং, তার পক্ষে প্রচার করে, তাঁর মহাকবি শ্বশুরকে স্বপথে আনতে পেরেছিলেন, সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর এই দূতীয়ালীর কৃতিত্ব অবশ্যই লেখা থাকবে। কিন্তু তিনি বাংলাসাহিত্যে প্রথম উৎকৃষ্ট চলিত গদ্যলেখক বলে যে-গৌরব পাচ্ছেন, সেটা তাঁর প্রাপ্য নয়। আর সেটা চলতি গদ্য কিনা সন্দেহের বিষয়। প্রমথ চৌধুরীর অনুকরণে বলা যায়—ও হল অচলিত চলিত গদ্য। বস্তুতঃ তাঁর গদ্যের 'চলিত' অংশ কেবল ক্রিয়াপদে—বাকি অংশে তা বাংলাদেশে চলিত নয়, কিংবা সংশোধন করে বলা যায়, চৌধুরীমহাশয়ের নিজের বাড়ি এবং কুটুম্ববাড়ির বাইরে চলিত নয়। প্রমথ চৌধুরীর

প্রভাবের ফল হয়েছিল বাংলাগদ্যে মারাত্মক। বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যন্ত সজীব, গতিশীল, মাত্র ক্রিয়াপদে সাধু গদ্যরীতির পরিবর্তে অত্যন্ত লতানো কিংবা অত্যন্ত বাঁকানো যে-গদ্যরীতি কয়েক দশক ধরে বাংলাসাহিত্যে চলল—তা পড়ে মনে হয়, সাহিত্যিক নামধেয় বেশ-কিছু ব্যক্তি এই পর্বে সারাক্ষণ রঙ্গমঞ্চের ড্রইংরুমে বসে পিছনের প্রমপ্ট্ শুনে কথা বলে গেছেন—তাঁরা স্বাভাবিক হতে ভুলে গিয়েছিলেন একেবারে।

প্রমথ চৌধুরীর এক-দেড় দশক আগে বিবেকানন্দের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে। তিনি সাধুভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চলিতভাষায় কেবল লেখেননি—চলিতভাষার পক্ষে এক ক্ষুদ্র রচনায় যা লিখেছিলেন, পরবর্তীকালে ঐ বিষয়ে অজস্র বকুনির মধ্যে তার অতিরিক্ত কথা বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিবেকানন্দই প্রথম গদ্যসাহিত্যের সর্ববিধ প্রয়োজনপূরণের উপযোগী রীতি আনেন। নিতান্ত লঘু চপল বিষয় থেকে গুরুতর দার্শনিক বা ঐতিহাসিক বিষয় প্রকাশ করবার সামর্থ্য সেই রীতির ছিল।

সে সামর্থ্য কিভাবে বিবেকানন্দের রীতিতে আছে, তা দেখিয়ে দেবার সুযোগ এখানে নেই। কোন্ ঐতিহাসিক কারণে বিবেকানন্দের রীতি অবিলম্বে বাংলা-সাহিত্যে অনুসৃত হয়নি, (যা এখন হবার মুখে), তা বিশ্লেষণের স্থানও এ নয়। আমার উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ—রসিক বিবেকানন্দকে উপস্থিত করা—এবং সেই উদ্দেশ্য-পূরণের জন্য কেবল তাঁর বক্তব্যের রস দেখালেই চলবে না—রীতির রসও দেখাতে হবে। সেইটুকুই মাত্র দেখাতে চাইছি।

স্বামীজীর বাগ্‌রীতি ও রচনারীতির মধ্যে আশ্চর্য উজ্জ্বল সরসতা এবং গতিবেগ ছিল, যা তাঁর ব্যক্তিত্বেরই রূপ। জগৎ-নাট্যমঞ্চের এক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হয়েও বিবেকানন্দ অভিনয় করে যাননি। তিনি যা বলেছেন, করেছেন, তার মধ্যে তাঁর জীবন ও ভাবনা সাক্ষাৎ ব্যক্ত হয়েছে। এইজন্য বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে 'মানুষটাই স্টাইল'—এই তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ সমর্থক-প্রমাণ বিবেকানন্দ রেখে গেছেন।

বাগ্‌রীতির মধ্যে গভীরতার সঙ্গে তরলতা, গাম্ভীর্যের সঙ্গে উৎফুল্ল লঘুতা স্বামীজী কেমন স্বচ্ছন্দে মেলাতে পারতেন—তাঁর চলিত ক্রিয়াপদ পর্যন্ত প্রয়োজনে কিছুক্ষণের জন্য 'সাধু'-ভূমিকা নিয়ে, পরে সকৌতুকে তাকে ত্যাগ করতে পারত—তার একটি দৃষ্টান্ত অন্তত দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। জাহাজে করে স্বামীজী য়ুরোপ যাচ্ছেন—ভাগীরথী পেরিয়ে জাহাজ সাগরে পড়ল—তারপর—

"কি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলজল তরঙ্গায়িত, ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে-তালে নাচছে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল—সেই বিভূতিভূষণা, 'সেই গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেঃ।' সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবর্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা জলের উপর, একবার কালো জলের উপর উঠছে। ঐ—সাদা

জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সামনে-পেছনে-আশে-পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গআভা, নীল পট্টবাস-পরিধান। কোটি-কোটি অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়েছিল ; আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী ; মহা গর্জন, বিকট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাস—দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েছে। তার মাঝে আমাদের অর্ণবপোত ; পোতমধ্যে যে-জাতি সসাগরা ধরাপতি, সেই জাতির নর নারী—বিচিত্র বেশভূষা, স্নিগ্ধ চন্দ্রের ন্যায় বর্ণ, মূর্তিমান আত্মনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়, কৃষ্ণবর্ণের নিকট দর্প ও দম্ভের ছবির ন্যায় প্রতীয়মান—সগর্ব পাদচারণ করিতেছে। উপরে বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমূতমন্দ্র, চারিদিকে শুভ্রশির তরঙ্গকুলের লম্ফঝম্প, গুরুগর্জন, পোতশ্রেষ্ঠের সমুদ্রজল-উপেক্ষাকারী মহাযন্ত্রের হুহুঙ্কার—সে এক বিরাট সম্মিলন—তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া ইহাই শুনিতেছি। সহসা এ সমস্ত যেন ভেদ করিয়া বহু স্ত্রী-পুরুষ-কণ্ঠের মিশ্রণোৎপন্ন গভীর নাদ ও তার সম্মিলিত 'রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভস্' মহাগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। চমকিয়া চাহিয়া দেখি—

"জাহাজ বেজায় দুলছে, আর তু-ভায়া দু'হাত দিয়ে মাথাটি ধরে অন্নপ্রাশনের অন্ন পুনরাবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।"

সমুদ্রের ঝড় স্বামীজীর কবিব্যাধি এনেছিল। কিন্তু একই জিনিস অন্যত্র সমুদ্র-ব্যাধি বা সী-সিকনেস সৃষ্টি করেছিল, সেটা তাঁর নজর এড়ায় কি করে ? সুতরাং ভাবঘন ভাষার পরেই চটুল ভাষা এসে গেল নাটকীয় চমক ও কৌতুক সৃষ্টি ক'রে। তিনি আরও দেখলেন, সেকেণ্ড ক্লাসে যে-দুটি বাঙালী ছেলে পড়তে যাচ্ছে, তাদের অবস্থা তাঁর তু-ভায়ায় চেয়ে খারাপ। 'যাত্রীদের মধ্যে তারা দুটি আর আমরা দুজন ভারতবাসী—আধুনিক ভারতের প্রতিনিধি।' স্বামীজী ইতিমধ্যে তাঁর বিখ্যাত 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধ আরম্ভ করেছিলেন ; সে প্রবন্ধ শেষ করার জন্য তু-ভায়া নিয়মিত তাগিদ দিচ্ছিলেন। সমুদ্রপীড়ার চেহারা দেখে স্বামীজী ঐ প্রসঙ্গ ধরে রসিকতার সুযোগ পেয়ে গেলেন : "আমি সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞসা করলুম, [ স্বামীজী লিখেছেন, ] 'ভায়া, বর্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ ?' ভায়া একবার সেকেণ্ড-ক্লাসের দিকে চেয়ে, একবার নিজের দিকে চেয়ে, দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন—'বড়ই শোচনীয়, বেজায় গুলিয়ে যাচ্ছে।'"

স্বামীজীর বাগ্‌রীতির বেশ-কিছু নমুনা ইতিপূর্বে পাঠক পেয়েছেন, এখানে আরও কিছু উপস্থিত করা যাক।—

ভ্রমণ উন্মাদ গঙ্গাধর-মহারাজ সম্বন্ধে স্বামীজী লিখলেন—'লাসা না দেখিলে গঙ্গাধরের রক্ত শীতল হইবে না।' নিজেকে এ-ব্যাপারে ছেড়ে দিচ্ছেন না—'পায়ে

চক্কর থাকলে ভবঘুরে হয়, আমার পা তাহলে চক্করময়।' স্বামীজীর ভাষায়—'ঠাণ্ডার পো' পালিয়ে যায় ধীরে, এবং কলকাতায় 'পিলেগ আউছন্তি।' 'ভারতের প্রণম্য ও পবিত্র গাভী'; 'শশীর ঘণ্টানাড়া ও ক্লিংফট্', বোম্বায়ের এক 'উড়ধামারা রামকৃষ্ণ-শিষ্য।' হরমোহন মিত্রের প্রচারপুস্তিকার 'লর্ড রামকৃষ্ণ' বিষয়ে তাঁর প্রশ্ন—'ইংলিশ লর্ড না ডিউক?' মাদ্রাজে আছে হাতীর চেয়ে সূক্ষ্মবুদ্ধি বৃহস্পতিরা কিংবা দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গে আছে 'দশ বৎসরে বেটা-বিউনিরা।' রাজাকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দকে) তাঁর 'বহুত দণ্ডবৎ, লাট্টিবৎ, ইষ্টিকবৎ, ছতরীবৎ' প্রণাম, আর নিজের কাণ্ড দেখে বিস্ময়—'মধো, তোর পেটে এত?' বাঙালের গানের গলা নিয়ে ঠাট্টা—'মা-গঙ্গাব জল পেটে না পড়লে গলা মিষ্টি হয় না।' বাঙাল-মাঝির নৌকা নিয়ে কৌতুক—তাতে চড়লে 'সামান্য তুফানেই দ্যাবতার নাম স্মরণ।' হঠাৎ-অবতারদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা—'কোন্ অবতার তুমি হে বাপু। কূর্ম না বরাহ?' সারদানন্দ, তাঁর মতে, ইংরেজী পড়েন 'চণ্ডীপাঠের মতো ক'রে।' হঠাৎ-জ্ঞানলিপ্সুদের তিনি সমঝে দেন—'জ্ঞান জিনিসটা এমন নয় যে তাকে 'ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বে' বলে জাগিয়ে দেওয়া যাবে।' অতি ব্যাকুল সাধকদের উদ্দেশ্যে বলেন—'ইঁদুরের গর্তে গুহার সাধ মিটিয়ে নিও।' অথবা তাঁর গুরুতর জিজ্ঞাসা—সমুদ্রলঙ্ঘনের সময়ে হনুমানের সী-সিকনেস্ হয়েছিল কি? কিংবা তাঁর অনুরূপ গভীর সিদ্ধান্ত—মা-গঙ্গা যেবার কলকাতার কাছে শুকিয়ে যান তখন নিশ্চয় বারবেলা ছিলনা, নচেৎ মাতা আবার জলময়ী হলেন কিভাবে? মনোরম কিছু শব্দপ্রয়োগ—'গরমের চোটে তরলমূর্তি,' 'শীতের গুঁতোয় পেট-ভায়া দুরন্ত,' 'জার্মান উচ্চারণে জিভ জখম,' 'ইংলণ্ড কি যমল্যাণ্ড জানি না।' নিজের সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'কপর্দকশূন্য হিন্দুরাজা', আলাসিঙ্গার সম্বন্ধে, 'সে বলে, সে কখনো-কখনো জুতা পায়ে দেয়', ইংরেজদের সম্বন্ধে, তাদের 'ওলবাটা মুখ।'

আরও কিছু উদ্ধৃত করা যাক, একটু বিস্তৃতভাবে। সাধুসেবা করে কি হল, বলরামবাবুর এই আপশোসের উত্তর—'তাকাইলেই দখিতে পাইবেন—ছিলেন গরু, হইয়াছেন মানুষ, হইবেন দেবতা এবং ঈশ্বর।' আপাত রূঢ়ভাষীদের প্রতি সাবধান-বাক্য—'কান দুটো কিন্তু মুখ একটা। কথার ছাল ছাড়াইয়া লইবার অন্তর্দৃষ্টি সকলের হয় না।' 'কথা কানে হাঁটে, মনে রাখিবে।' স্বামীজীর সাফল্যে ঈর্ষাকাতর জনৈক ব্যক্তি সম্বন্ধে—'ভায়ার মনে আগুন জ্বলল...আমি দেখে শুনে অবাক। বল্ বাবা, আমি কি তোর অন্নে ব্যাঘাত করেছি?...ভায়া, সব যায়, ঐ পোড়া হিংসেটা যায় না।...আমাদের জাতের ঐটে দোষ—খালি পরনিন্দা, আর পরশ্রীকাতরতা, হামবড়া—আর কেউ বড় হবে না।' ঐ দোষ সম্বন্ধে স্বগোষ্ঠীকে সতর্কবাণী—'আমাদের ভিতর যিনি পরস্পরের গুজুগুজু নিন্দা করবেন বা শুনবেন, তাকে সরিয়ে

দেওয়া উচিত। ঐ গুজুগুজু সকল নষ্টের গোড়া।' 'ঐটা ভায়া, একেবারে ত্যাগ দিও। মনে অনেক জিনিস আসে, তা ফুটে বলতে গেলেই ক্রমে তিল থেকে তাল হয়ে দাঁড়ায়। গিলে ফেললেই ফুরিয়ে যায়।' 'দল ভাঙবার মূলমন্ত্র—ও কী জানে? সে কী জানে? তুই আবার কী করবি?—আর তার সঙ্গে ঐ একটু মুচকে হাসি।' সুতরাং—উঠে পড়ে লেগে যাও দিকি। গপ্প মারা, ঘণ্টা নাড়ার কাল গেছে হে বাপু, কার্য করিতে হইবেক।' 'কোনো চিঠি বাজার-গুজব করিসনি, খবরদার। চ্যাংড়ামো নাকি? যা করতে বলছি পার তো করো, না পারো তো মিছে ফেচাং করো না।' 'সমাজকে, জগৎকে electrify করতে হবে। বসে বসে গপ্পবাজি আর ঘণ্টানাড়ার কাজ? ঘণ্টানাড়া গৃহস্থের কর্ম,...তোমাদের কাজ distribution and propagation of thought currents. শশী প্রভৃতি যে ধূমখেত মাচাচ্ছে, এতে আমি বড়ই খুশী। ধূমক্ষেত্র মাচাতে হবে, এর কমে চলবে না। কুছ পরোয়া নেই। দুনিয়াময় ধূমক্ষেত্র মেচে যাবে, বাহ্‌ গুরুকা ফতে! আরে দাদা, শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি—ঐ বিঘ্নের গুঁতোয় বড়লোক তৈরী হয়ে যায়।...বলি মোহন, মিশনারী-ফিশনারীর কর্ম কি এ-ধাক্কা সামলায়? এখন মিশনারীর ঘরে বাঘ সেঁধিয়েছে। এখানকার দিগ্‌গজ-দিগ্‌গজ পাদরীতে ঢের চেষ্টা-বেষ্টা করলে—এ গিরিগোবর্ধন টলাবার যো কি?' 'আজকাল গোঁড়া ব্যাটাদের ত্রাহি-ত্রাহি এদেশে। আমাকে ব্যাটারা যমের মতো দেখে। বলে, কোথা থেকে এ-ব্যাটা এল, রাজ্যির মেয়ে-মদ্দ ওর পিছু-পিছু ফেরে—গোঁড়ামির জড় মারবার জোগাড়ে আছে। আগুন ধরে গেছে বাবা! গুরুর কৃপায় যে আগুন ধরে গেছে, তা নিববার নয়। কালে, গোঁড়াদের দম নিকলে যাবে। কি বাঘ ঘরে ঢুকিয়েছেন তা বাছাধনেরা টের পাচ্ছেন।' 'এদেশে কার্যের বিরাম নাই—সমস্ত দেশ দাবড়ে বেড়াচ্ছি। যেখানে তাঁর তেজের বীজ পড়বে, সেখানেই ফল ফলবে—অদ্য বাব্দশতান্তে বা।' 'দাদা, কুকুর বেড়ালের ঝগড়া দেখে মানুষে কি দুঃখু করে?...দাদা, আজ ৬ মাস ধরে বলছি যে, পর্দা উঠছে, সূর্যোদয় হচ্ছে। পর্দা উঠছে ধীরে-ধীরে—slow but sure—কালে প্রকাশ।...হাল ছেড়ো না, টিকে ধরে থেকো—পাকড় ঠিক বটে, তাতে ভুল নেই—তবে পারে যাওয়া আজ আর কাল—এই মাত্র। দাদা, লীডার কি বানাতে পারা যায়, লীডার-জন্মায়। বুঝতে পারলে কি না। লীডারি করা আবার বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ—হাজারো লোকের মন জোগানো। Jealousy, selfishness আদপে থাকবে না—তবে লীডার।... Love conquers in the long run—দিক্ চলবে না—wait wait—সবুরে মেওয়া ফলবেই ফলবে।' 'অতি গম্ভীরবুদ্ধি ধারণ করো।' 'বালবুদ্ধি জীবে কে বা কি বলিতেছে, তাহার খবরমাত্রও লইবে না। উপেক্ষা, উপেক্ষা, উপেক্ষা ইতি।' 'ভায়া, ঐ তেজে একবার মহোৎসব করো দিকি। রৈ রৈ হয়ে যাক। ওয়া বাহাদুর।

সাবাস! নিধে পেলার দল প্রেমের তরঙ্গে ভেসে চলে যাবে।' 'হেঁজিপেঁজিদের সঙ্গে মেশবারও আবশ্যক নাই। ওদের কাছে ভিক্ষেও করতে হবে না। ঠাকুর সব জোটাচ্ছেন এবং জোটাবেন। ভয় কিরে ভাই! সকল বড় কাজ মহাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে।...বিমূঢ়মতি অনাত্মদর্শী তমসাচ্ছন্নবুদ্ধি জীবকে বালচেষ্টা করিতে দাও। গরম ঠেকলেই আপনি পালিয়ে যাবে। চাঁদে থুতু ফেলবার চেষ্টা করুক। শুভং ভবতু তেষাম্। যদি তাদের মধ্যে মাল থাকে, সিদ্ধি কে বারণ করতে পারে? যদি ঈর্ষাপরবশ হয়ে আস্ফালন মাত্র করে তো সব বৃথা যাবে।' 'তোমার শান্তির দরকার কি বাবাজি? সব ত্যাগ করেছ, এখন শান্তির ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও তো বাবা। কোন চিন্তা রেখো না। নরক, স্বর্গ, ভক্তি বা মুক্তি সব ডোণ্ট কেয়ার।' 'আপনার ভাল কেবল পরের ভালয় হয়; আপনার মুক্তি এবং ভক্তিও পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও।' 'দাদা, গর্জে-গর্জে মধুপানে লেগে যাও দিকি।' 'তোরা এক-একটা মানুষ হ' দিকি রে বাবা!' 'ভায়া, পরের ভরসা করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে; আপনার পায়ের জোর বেঁধে চলাই বুদ্ধিমানের কার্য।' 'তুমি ইদিক-ওদিক যাওয়াটা বড় একটা ত্যাগ কর। ঘর জাগিয়ে বসে থাকো।' 'তাঁর আশ্রিতের কি নাশ আছে রে বোকারাম!' 'তৈরী রান্নায় একটু নুন-তেল দিতে যদি না পারো, তাহলে কেমন করে বিশ্বাস হয় যে তোমরা সব জোগাড় করবে?' 'এদের দেশের বাঘ-ভাল্লুকে পাদরী-পণ্ডিতদের মুখ হতে রুটি ছিনিয়ে নিয়ে খেতে হবে—এই বোঝ। অর্থাৎ বিদ্যের জোরে এদের দাবিয়ে দিতে হবে, নইলে ফু করে উড়িয়ে দেবে। এরা না বোঝে সাধু, না বোঝে সন্ন্যাসী, না বোঝে ত্যাগ-বৈরাগ্য। বোঝে বিদ্যের তোড়, বক্তৃতার ধূম, আর মহা উদ্যোগ।' 'আমরা খুব বড়, খুব বড়!—পাগল! আমরা ক্লীব—তা ছাড়া আর কি।' 'আমি বাংলাদেশ জানি, ইণ্ডিয়া জানি। লম্বা কথা কইবার এক এক জন, কাজের বেলায়—০।' 'চৌরস বুদ্ধি চাই, তবে কাজ হয়। যে-গ্রামে বা শহরে যাও, যেখানে দশজন লোক পরমহংসদেবকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে, সেখানেই একটা সভা স্থাপন করিবে। এত গ্রামে-গ্রামে কি ভেরেণ্ডা ভাজলে নাকি? হরিসভা প্রভৃতিগুলোকে ধীরে-ধীরে 'স্বাহা' করতে হবে।' 'আমার পুরনো বোল—Struggle, struggle up to light—onward!' 'মাস্টার-মহাশয় কতদিন মুখে বোজলা দিয়ে থাকবেন? বোজলাতেই যে জন্ম গেল দেখছি।' 'পড়াশোনাটা বিশেষ করা চাই, বুঝলে শশী? মেলা মুখ্যু-ফুখ্যু জড়ো করিসনে বাপু। দু'চারটে মানুষের মতো এককাট্টা কর্ দেখি। একটা মিউও যে শুনতে পাইনি।' 'দলের বীজ ঐ ঘণ্টাপত্র। আমি হাজারবার ঠুকেছি, এবারও ঠুকলাম। ফল কিছু হয় না। আমার নামে যদি তোমাদের দলবাঁধার সহায়তা হয় তাহলেই আমি লীডার বটি,

নইলে আমি কেউ নই। এই সত্য বটে। আমি ওতে নাই। আমি যে রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য এবং তোমরাও যে তাই, এইটি বই লিখে ছাপতে যত্ন তো যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু আমি যে ৬ বৎসর ঘণ্টা-পত্র ত্যাগ করার জন্য বলছি, তাতে কারুর কান পাতা নাই।' 'আমি কারো চেলা-পত্র নই, যারা আমার মনের মতো কার্য করবে, আমি তাদের চেলা।' 'হুটকোর দেনা শোধ হয়ে গেছে, এখন মাথা মুড়িয়ে নিতে বলবে। আমি আধা জলে-স্থলে লোক চাই না।' 'যাদের মনের ঠিকানা করতে ৬ মাস লাগে, তাদের আমার দরকার নাই।' 'তোরা আপনার কাজ করে যা। মানুষের মুখ কী দেখিস, ভগবানের মুখ দেখ।' 'শুধু বৈরাগ্যির কি আর কাল আছে? লিখে-পেলা সকলেই কি রামকৃষ্ণ পরমহংস হয় রে ভাই?' '[ অমুক ] লোকগুলোকে টাকাকড়ির কাছে একদম বিশ্বাস করবে না; [তোমাদের] অত কাঞ্চন ত্যাগ করতে হবে না।' 'মধো, যা বলি করে যা, ওস্তাদি চালাসনি আমার ওপর।' 'ইংরেজ-বাচ্ছা কোনো কাজে হাত একবার দিলে আর ছাড়ে না। আমেরিকানরা চট্‌পটে কিন্তু অনেকটা খড়ের আগুনের মতো।' 'নিউইয়র্ক এবার তোলপাড়। আসছে গরমিতে লণ্ডন তোলপাড়। বড়বড় হাতী দিগ্‌গজ্‌ ভেসে যাবে।...তোরা কোমর বেঁধে লেগে যা দেখি—হুহুঙ্কারে দুনিয়া তোলপাড় করে দেখ। এই তো সবে সন্ধ্যা রে ভাই!' 'ছেলের বে-র বিপক্ষে শিক্ষা দিবে। বালকের বে কোনো শাস্ত্রে নাই। ছেলের বে বন্ধ করতে পারলেই মেয়ের বে আপনা হতে বন্ধ হয়ে যাবে। মেয়েকে তো আর মেয়ে বে করবে না।' 'দোষ দেখা বড়ই সহজ, গুণ দেখাই মহাপুরুষদের ধর্ম।' 'বড়-মানুষেরা কোন্ কালে কোন্ দেশে কার কি উপকার করেছে? সকল দেশেই বড়-বড় কাজ গরীবরা করে।' 'দেশে কি মানুষ আছে? দেশের লোকগুলো বালক, ওদের সঙ্গে বালকের ন্যায় ব্যবহার করতে হবে। ওদের বুদ্ধিসুদ্ধি দশবছরের মেয়ে বে করে খরচ হয়ে গেছে।' 'ভয় কি? কার ভয়? ছাতি বজ্র করে লেগে যাও।' 'তাহাকে আমার লক্ষ সাবাস—ওহি মরদকা কাম। ...সাবাস্ বাহাদুরোঁ।' 'আরম্ভ অতি সুন্দর হয়েছে। ঐ ঢোলে চল। ঈর্ষা-সর্পিণী যদি না আসে তো কোন ভয় নাই।' 'বাঃ বাঃ সাবাস। ঐ রকম চাই। এক একটা নক্ষত্রের মতো ছুটে পড় দিকি!' 'যার ভালবাসায় ছোটো-বড় আছে, সে কখনো অগ্রণী হয় না; যার প্রেমের বিরাম নাই, উচ্চ-নীচ নাই, তার প্রেম জগৎ জয় করে।' 'মহা তেজ, মহা বীর্য, মহা উৎসাহ চাই। মেয়ে-নেকড়ার কি কাজ?' 'ভয় খাও কেন? ঝট্ করে কি দানা মরে? এই তো বাতি জ্বলল, এখনও সারারাত্রি গাওনা আছে।' 'শুধু নেগেটিভ ধর্মে কি কাজ হয়? পাথরে ব্যভিচার করে না, গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, বৃক্ষেরা চুরি-ডাকাতি করে না, তাতে আসে যায় কি? তুমি চুরি করো না, মিথ্যা কথা কও না, ব্যভিচার করো না, চার ঘণ্টা ধ্যান করো, আট

ঘন্টা ঘন্টা বাজাও—মধু, তাতে কার কি ?' 'শরীর তো যাবেই, কুঁড়েমিতে কেন যায় ? It is better to wear out than to rust out. মরে গেলেও হাড়ে-হাড়ে ভেল্কি খেলবে, তার ভাবনা কি ? দশ বৎসরের ভেতর ভারতবর্ষটাকে ছেয়ে ফেলতে হবে—এর কমে হবেই না। তাল ঠুকে লেগে যাও—ওয়া গুরুকী ফতে। টাকা-ফাকা সব আপনা-আপনি আসবে। মানুষ চাই, টাকা চাই না। মানুষ সব করে, টাকায় কি করতে পারে !' 'সিদ্ধি হউক না হউক—একটা বিষম গোলমাল করো। রামকৃষ্ণ-সভা একদম জেঁকে যাক। হুজ্জুকের উপর হুজ্জুক—বিরাম না হয়—এই হল secret.' 'বেদ, কোরান, পুরাণ, পুঁথি-পাতড়া এখন কিছুদিন শান্তিলাভ করুক—প্রত্যক্ষ ভগবান দয়া-প্রেমের পূজা হোক দেশে।' 'টাকাকড়ি বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত দাদার ভরসা হলেই সর্বনাশ আর কি !...একটা পয়সা আনবার কেউ নেই, একটা প্রচার করবার কেউ নেই, বিষয় রক্ষা করবার বুদ্ধি কারু নেই, এক লাইন লিখবার ক্ষমতা কারুর নেই—সব খামকা মহাপুরুষ।' 'আসল কথা, ঐ কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই ; কাপুরুষের উদ্ধার হয় না—এ নিশ্চিত। আর সব সয়, ঐটি সয় না। এক ঘা খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে—তবে মানুষ।' 'আমি চাই তোমরা মরেও যাও তবু লড়তে হবে।' 'বিদ্যাবুদ্ধি বাড়ার ভাগ—উপরে চাকচিক্য মাত্র ; সমস্ত শক্তির ভিত্তি হচ্ছে হৃদয়।' 'আত্মার অধিবাস হৃদয়ে, মস্তিষ্কে নয়।' 'হৃদয়ের নিকট সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন্ নামক যে প্রধান কেন্দ্র, সেথায় আত্মার কেল্লা।' 'আমাদের mission হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ চাষাভূষোর জন্য। আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে তো ভদ্রলোকের জন্য। ঐ চাষাভূষোরা ভালবাসা দেখে ভিজবে।' 'রাই কুড়িয়ে বেল। যখন প্রধান কাজ হয়, ভিত্তিস্থাপন হয়, রাস্তা তৈরি হয়, তখন অমানুষ বলের আবশ্যক হয়।—[ আর ] যখন হাজার-হাজার লোকের উপকার হয়, ঢাক-ঢোল বেজে ওঠে, দেশসুদ্ধ বাহবা দেয়—তখন বালকেও কাজ করতে পারে, আহাম্মকেও কলে একটু বেগ দিতে পারে।' 'এখন ২।১০টা সিংহের প্রয়োজন—তখন শত-শত শৃগালেরাও উত্তম কাজ করতে পারবে।' 'চালাকির দ্বারা কোনো মহৎকার্য হয় না।' 'চিন্তিত হয়ো না। বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে ; কাঠ নেড়ে দিলে বেশি জ্বলে ; সাপের মাথায় আঘাত লাগলে তবে সে ফণা ধরে। যখন হৃদয়ের মধ্যে মহা যাতনা উপস্থিত হয়, চারিদিকে দুঃখের ঝড় ওঠে, বোধ হয় যেন এ-যাত্রা আলো দেখতে পাব না, যখন আশা-ভরসা প্রায় ছাড়ে-ছাড়ে, তখনই এই মহা আধ্যাত্মিক দুর্যোগের মধ্য হতে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মজ্যোতি স্ফূর্তি পায়।'

পাঠকদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা ভেবে দেখা দরকার, কারণ সহাস্য বিবেকানন্দ-সন্ধান থেকে বোধহয় আমরা কিছুটা সরে গিয়েছি। চলিত গদ্যের এক সেরা বাঙ্গালী লেখককেই দেখছি এখানে—দেখছি বাংলা ভাষার

অসাধারণ শক্তিরূপকে—দেখছি বিপুল প্রাণপ্রবাহ, যাকে স্বামীজী চলিত ভাষার মধ্যে নির্গলিত করতে পেরেছেন। এ-জিনিস বাংলায় সম্ভব—বিবেকানন্দের রচনা পড়বার আগে বোঝা সম্ভব ছিল না। এ ভাষার ব্যাপক প্রকাশক্ষমতা থাকলেও স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী প্রধানতঃ গতিশীল শক্তিরূপই বেশী ব্যক্ত হয়েছে। কখনো চাবুকের মতো তা কেটে বসেছে, কখনো খড়্গের মতো ছিন্ন করেছে, কখনো মুগুরের মতো গুঁড়িয়ে দিয়েছে, আবার কখনো গড়-গড় করে গড়িয়ে নেমেছে পাথরের মতো, কিংবা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে পাহাড়ে বন্যার বেগে। তাঁর গদ্যে কখনো হাসির বিদ্যুৎ-চমক, কখনো-বা সমুদ্রস্তনিত স্বর ( দৃষ্টান্ত, 'হে ভারত ভুলিও না' )। একই সঙ্গে দাবড়ানি, থাবড়ানি, পিঠ-চাপড়ানি। বয়স্যের মতো রহস্য করেছেন, চ্যাংড়ার মতো ফাজলামি ক'রছেন, আবার বিশ্বরসিকের উদার হাসি হেসেছেন—একই ভাষায়।

বাংলার এই শ্রেষ্ঠ চলিত গদ্য-লেখকের ভাষাশক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে যদি মূল বিষয় থেকে কিছুটা সরে যাই, তাহলে সহৃদয় পাঠক অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করবেন কিংবা তাঁদের কাছে ক্ষমা চাওয়াটা কি তাঁদের রসবোধের. সম্বন্ধে কটাক্ষ হয়ে দাঁড়াবে না—যখন তাঁরা ভালই জানেন—মানুষটা যে রসিক তা বোঝা যায় তাঁর অভিব্যক্তির ক্ষমতা থেকেই, এবং রসিকতা কেবল পেটে কিল-মেরে হাসি-ফাটানো নয়, তা সর্বাঙ্গীণ জীবনবোধের এক বিশিষ্ট প্রকাশ, জীবনের নানারূপের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে তা আত্মপ্রকাশ করে, ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট হাসাবার ব্যবসা তা নয়। সুতরাং কোনো মানুষকে সুরসিক হিসাবে দেখাতে হলে তাঁকে আরও পাঁচটা রূপের সঙ্গে জড়িয়ে দেখাতে হবে—দেখিয়ে দিতে হবে যে, হাস্যরস তাঁর ক্ষেত্রে বাকি আটটা রসের মতোই স্থায়ী রস—মাঝে-মাঝে আবির্ভূত-হওয়া সঞ্চারী রস নয়। বিবেকানন্দ-হিমালয়ে গভীর অরণ্য, উন্মত্ত ঝঞ্ঝা, সঘন মেঘ, বিপুল তুষার এবং আলোকিত শুভ্রতা—সবই আছে।

# ভ্রাতা ও ভগিনী-কথা

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে একটি পৃষ্ঠা উড়ে এসেছিল স্বামীজীর জীবনে—'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?'

স্থান অবশ্য বিজন সমুদ্রতট নয়—চিকাগো শহরের একটি অভিজাত পল্লী। প্রশ্নকর্ত্রী নির্জনলালিতা রহস্যময়ী তরুণী নন—মধ্যবয়সী মর্যাদাময়ী সহৃদয়া আমেরিকান মহিলা। প্রশ্নের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অবশ্য নবকুমার না হয়েও নবকুমার-জাতীয়—পরের জন্য কাষ্ঠাহরণ করতে সুদূর মহাদ্বীপে উপস্থিত—এক তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসী! এই কুমার তাপস এখন পথ হারিয়েছেন আমেরিকার জন-অরণ্যে, তিনি যেতে চান ধর্মমহাসভায়।

ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে রোমান্টিক। রোমান্টিক কথাটা আমার নয়, স্বামী বিবেকানন্দের সুবিখ্যাত ইংরেজী জীবনীতে এইসূত্রে ঐ কথাটাই ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্নকর্ত্রী মিসেস হেল তাঁর বাড়ির দরজা স্বামীজীর জন্য খুলে দিয়েছিলেন। অতঃপর মিসেস হেল হয়ে গেলেন স্বামীজীর মা ( 'মাদার চার্চ' ), কর্তা বৃদ্ধ জর্জ হেল স্বামীজীর পিতা ( 'ফাদার পোপ' ), উক্ত পরিবারের কন্যাগুলি তাঁর স্নেহের ভগিনী এবং চিকাগোর হেল-ভবন কিছু সময়ের জন্য স্বামীজীর আমেরিকান হেডকোয়ার্টার।

হেল-পরিবারে আশ্রয়লাভের পরে রামকৃষ্ণানন্দ-স্বামীকে লেখা এক চিঠিতে হেল-কন্যাদের চমৎকার ছবি দিয়েছিলেন স্বামীজী, সেইসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য কোর্টশিপ-পদ্ধতি বিষয়ে কিছু আমোদজনক সংবাদও :

"ঐ যে ডবলিউ জি হেল-এর ঠিকানায় চিঠি দাও, তাদের কথা কিছু বলি। হেল আর তার স্ত্রী, বুড়ো-বুড়ী। আর দুই মেয়ে, দুই ভাইঝি, এক ছেলে। ছেলে রোজগার করতে দোসরা জায়গায় থাকে। মেয়েরা ঘরে থাকে। এদের দেশে মেয়ের সম্বন্ধেই সম্বন্ধ। ছেলে বে করে পর হয়ে যায়—মেয়ের স্বামী ঘনঘন স্ত্রীর বাপের বাড়ি যায়। এরা বলে, 'Son is son till he gets a wife—the daughter is daughter all her life.' চারজনেই যুবতী—বে-থা করেনি। বে হওয়া এদেশে বড়ই হাঙ্গামা। প্রথম, মনের মতো বর চাই। দ্বিতীয়, পয়সা চাই। ছোঁড়া-ব্যাটারা ইয়ার্কি দিতে বড়ই মজবুত—ধরা দেবার বেলা পগার পার। ছুঁড়িরা নেচে-কুঁদে একটা স্বামী যোগাড় [করার চেষ্টা] করে—ছোঁড়া-বেটারা [সেই] ফাঁদে পা দিতে বড়ই নারাজ। এইরকম করতে-করতে একটা 'লভ্' হয়ে পড়ে—তখন সাদি হয়। এই হল সাধারণ। তবে হেলের মেয়েরা রূপসী, বড়মানুষের ঝি, ইউনিভার্সিটি গার্ল—নাচতে গাইতে পিয়ানো বাজাতে অদ্বিতীয়া—অনেক ছোঁড়া ফেঁ-ফেঁ করে—তাদের বড় পসন্দয় আসে না। তারা বোধহয় বে-থা করবে না—তার উপর আমার সংস্রবে ঘোর

বৈরিগ্যি উপস্থিত। তারা এখন ব্রহ্মচিন্তায় ব্যস্ত।

"মেরি ও হ্যারিয়েট হল মেয়ে—আর হ্যারিয়েট [ ম্যাককিণ্ড্‌লি ] আর ইসাবেল [ ম্যাককিণ্ড্‌লি ] হল ভাইঝি। মেয়ে-দুটির চুল সোনালী অর্থাৎ ব্লণ্ড, আর ভাইঝি দুটি ব্রানেট অর্থাৎ কালো-চুল। জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—এরা সব জানে। ভাইঝিদের তত পয়সা নেই—তারা একটা কিণ্ডারগার্টেন স্কুল করে।…মেয়েরা আমাকে দাদা বলে, আমি তাদের মাকে মা বলি। আমার মালপত্র সব তাদের বাড়িতে—আমি যেখানেই থাকি না কেন, তারা সব ঠিকানা করে।"

নারীপ্রগতির দেশ আমেরিকায় গিয়ে স্বামীজী মুক্তির যে উদার ছবিটি দেখে-ছিলেন, তা সুন্দরতর মধুরতর ঠেকেছিল হেল-কন্যাদের জীবনসৌন্দর্যের আলোকে। আমেরিকান মহিলাদের সম্বন্ধে স্বামীজী অতঃপর ঐ চিঠিতে সাধারণভাবে যা বলেছেন, তার শ্রেষ্ঠ অংশ বিশেষভাবে সত্য হেল-কন্যাদের সম্বন্ধেই: 'এদের মেয়ে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম বাবা! আমাকে যেন বাচ্ছাটির মত ঘাটে-মাঠে, দোকানে-হাটে নিয়ে যায়, সব কাজ করে, আমি তার সিকির সিকিও করতে পারিনি। এরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—আমি এদের পুষ্যিপুত্তুর—এরা সাক্ষাৎ জগদম্বা, বাবা! এদের পূজা করলে সর্ব সিদ্ধিলাভ হয়।' খেতড়ির রাজাকে লেখা এক চিঠিতে স্বামীজী মার্কিন নারীদের বিষয়ে ভারতে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে লিখেছিলেন: "কত শত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দেখেছি। কত শত জননী দেখেছি যাঁদের নির্মল চরিত্রের, নিঃস্বার্থ অপত্যস্নেহের বর্ণনা করবার ভাষা আমার নেই। কত শত কন্যা ও কুমারী দেখেছি, যারা 'ডায়ানা দেবীর ললাটস্থ তুষারকণিকার ন্যায় নির্মল'।"

'দেবী-ললাটের তুষারকণিকার মতো নির্মল' শত-শত কন্যার মধ্যে চারটিকেই আমরা বর্তমানে বিশেষভাবে চিনতে চাইছি। এঁরা সত্যই স্বামীজীর ভগিনী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমেরিকায় কঠোর সংগ্রামের দিনগুলিতে, অত্যুচ্চ প্রশংসা বা অকারণ কুৎসার মধ্যে, স্বামীজীর অতীব প্রয়োজন ছিল এমন একটি সম্পর্কের, যেখানে অতি সম্ভ্রমের, ভক্তির ব্যবধান নেই—শ্রদ্ধা আছে কিন্তু ভালবাসাকে আচ্ছন্ন করেনা তা—দাবি আছে কিন্তু স্বার্থের দাবি নয়—এবং রয়েছে আদর আবদার খুনসুটি—যে-জিনিসগুলি আদর্শ ভগিনীত্ব মাত্র দিতে পারে—এবং তা দিয়েছিলেন হেল-ভগিনীগণ। হেল-পরিবারের এই চার কন্যার বিস্তৃততর পরিচয় শ্রীমতী লুই বার্ক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে দিয়েছেন। দুই ভাইঝি—হ্যারিয়েট ম্যাককিণ্ড্‌লি ও ইসাবেল ম্যাককিণ্ড্‌লির কিণ্ডারগার্টেন স্কুল চিকাগোর অভিজাত সমাজে সুপরিচিত ছিল। মিস ইসাবেলের 'প্রকৃষ্ট মন', 'অপূর্ব কর্মবোধ' এবং 'দীপ্ত বাক্যবিনিময় ক্ষমতা'র কথা সমকালীন সংবাদপত্র থেকে উদ্ধৃত করে মিসেস বার্ক দেখিয়েছেন। তিনি ঐ

চার বোনের যে ছবি ছেপেছেন তার থেকে তাঁরা কত সুন্দরী ছিলেন বোঝা যায়—সে সৌন্দর্যের সঙ্গে মর্যাদা ও শালীনতার সমন্বয় ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে ইসাবেল ম্যাককিণ্ড্লির একেবারে 'ক্ল্যাসিক্যাল সৌন্দর্য'—পৃথিবীর সর্বোত্তমা মর্মর-সুন্দরী ভেনাস ডি মিলোর সঙ্গে তাঁর মুখাবয়বের অদ্ভুত সাদৃশ্য সম্বন্ধে স্থানীয় সকলেই সচেতন ছিলেন। সংবাদপত্রে ইসাবেলের মুখের যে স্কেচ বেরিয়েছিল (যার প্রতিচ্ছবি মিসেস বার্ক তাঁর বইয়ে দিয়েছেন), তার দ্বারাও ঐ সাদৃশ্য স্পষ্ট বোঝা যায়। প্যারিসের লুভারে ভেনাস ডি মিলো দেখার পরে স্বামীজী মেরী হেল্সকে ঐ বিষয়ে স্নেহে-কৌতুকে লিখেছিলেন: "তোমরা ঐ যে কা বলো—ভেনাস না কি—তা আমি দেখেছি। তোমাদের কথাই ঠিক, ইসাবেলের মুখ অনেকটা ঐ মূর্তির মতো। ইসাবেলের হাতগুলি অবশ্য অনেক উত্তম, কারণ মূর্তি তো ঠুঁটো—অন্ততঃ আমাদের গাঁইয়া চোখে তাই মনে হয়। যাই হোক বাপু, ইসাবেল সুন্দর কারণ সে ভেনাসের মতো; আর ভেনাস সুন্দর কারণ সে ইসাবেলের মতো। সব জড়িয়ে ইসাবেল অনেক অনেক বেশি সুন্দর—ঐ ঠুঁটো ব্যাপারটির ছাড় ধরেও!!"

পরে আর একবার দুষ্টুমি করে স্বামীজী লিখেছিলেন: "সেই যে মহিলাটি—ফ্লোরেন্সের কোনো এক মূর্তির মতো যাঁর চেহারা—আহাঃ—তাঁর নামটি আবার ভুলে গেছি—তিনি আছেন কেমন? মূর্তিটির সঙ্গে তুলনা করতে গেলেই—মহিলার হস্তদ্বয়ের প্রতি আমার অনন্ত আশীর্বাদ।"

১৮৯৪ সালে চিকাগোয় থাকাকালে স্বামীজী আধ্যাত্মিক ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে হেল-কন্যাদের দ্বারা চালিত হতেন। তাঁর পোশাক-আশাক, আদব-কায়দা, চলা-ফেরা—সব ব্যাপারে মেয়েগুলি কর্তৃত্ব করত, আর স্বামীজী হতাশ আত্মসমর্পণের আনন্দ উপভোগ করতেন। তাই বলে, ভাই ও বোনদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি কম হত না—কেননা স্বামীজী অনেক সময়েই বেহিসেবী এবং অবিবেচক। একবার একটা দামী পাইপ কিনে ফেলে ছোট ছেলের মতো ভয়ে-ভয়ে ইসাবেলাকে লিখেছেন: 'গতকাল ১৩ ডলার দিয়ে একটা পাইপ কিনেছি—দোহাই, ফাদার পোপকে কথাটি বলো না যেন!' খরচের হিসাব দিচ্ছেন জবরদস্ত অভিভাবিকাদের: 'লীন-এ যে একশো ডলার পেয়েছি, তা পাঠালাম না, কারণ নতুন গাউন তৈরী ইত্যাদি বাজে ব্যাপারে খরচ হবে।' 'কোটের খরচ পড়বে ৩০ ডলার।'

বোনদের তত্ত্বাবধানে পোশাক-বিপত্তিও ঘটত: "অবশেষে কমলারঙটি মিলেছে—এবং একটা কোট বানানো গেছে। তবে গ্রীষ্মের উপযোগী এই রঙের কাপড় এখনো মেলেনি। তুমি যদি সন্ধান পাও, খবর দিও। নিউইয়র্ক থেকে তা দিয়ে পোশাক বানিয়ে নেব। তোমার ডিয়ারবর্ন অ্যাভিনিউয়ের মাপ-কানা দর্জিমহাশয় একজন সন্ন্যাসীর পক্ষেও অচল!"

পোশাকের ব্যাপারে আরও কৌতুক ঃ "এনিস্কোয়ামে যখন আমি ভিজে একসা —তখন আমার পরনে ছিল তোমার সেই বড়-পছন্দের চমৎকার কালো স্যুটটি। সেটি কিন্তু কোনোভাবে নষ্ট হতে পারে না—কারণ আমার সুগভীর ব্রহ্মজ্ঞান ওর মধ্যে ভিজে ঢুকে গেছে।"

হেল-কন্যারা নিজেরা সুন্দরী ছিলেন, এবং তাঁদের দাদার অসাধারণ সুন্দর চেহারা নিয়েও তাঁদের গর্বের শেষ ছিল না। দাদাটিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে সমাজে হাজির করতে চাইতেন। আমেরিকায় শরীরচর্চার হাজার কায়দা-কানুন ও সরঞ্জাম সম্বন্ধে রামকৃষ্ণানন্দকে স্বামীজী লিখেছিলেন—"এরা বিরোচনের জাত ; শরীর হল এদের ধর্ম, তাই মাজা, তাই ঘষা—তাই নিয়ে আছে। নখ কাটবার হাজার যন্ত্র, চুল কাটবার দশ হাজার, আর কাপড়-পোষাক, গন্ধ-মশলার ঠিক-ঠিকানা কি।...ঐ যে ভোগ—ঐ ওদের ভগবান। টাকার নদী, রূপের তরঙ্গ, বিদ্যার ঢেউ, বিলাসের ছড়াছড়ি।" সুতরাং ভারতের পথের ধূলোর সন্ন্যাসীকেও এখানে সভ্য-সুজন হতে হয়। আনন্দে কাঁদো-কাঁদো হয়ে স্বামীজী মেরীকে লিখেছিলেন—"ভালো কথা, মিসেস শেরম্যান আমাকে রাজ্যের জিনিস উপহার দিয়েছেন—তার মধ্যে আছে নখ কাটার যন্ত্র, চিঠি-রাখার সরঞ্জাম, হাত-ব্যাগ ইত্যাদি। আমি আপত্তি জানিয়েছিলাম, বিশেষতঃ ঝিণুকের হাতলওয়ালা অতি শৌখীন নখকাটার যন্ত্রটির বিষয়ে, কিন্তু তাঁর উপরোধে পড়ে নিতে হল, যদিও জানিনা ঐ পরিষ্করণ-যন্ত্রটি নিয়ে কী করব। ঈশ্বর ওগুলিকে আশীর্বাদ করুন। মিসেস শেরম্যান উপদেশ দিয়েছেন—আমি যেন এই আফ্রিদি-পোশাকে কদাপি সোসাইটিতে না যাই। হা ভগবান্! আমি হলুম গিয়ে এখন সোসাইটিম্যান!!"

নখকাটার সরঞ্জাম সম্বন্ধে আতঙ্ক প্রকাশ করলেও নখ-পালিশের বাহুল্যকে স্বামীজী ঠেকাতে পারেননি, বিশেষত তাঁর স্নেহের ভগিনীরা যখন নাপিতানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। মহেন্দ্রনাথকে স্বামীজী গল্পটি বলেছিলেন ঃ

"চিকাগোতে জর্জ হেলের বাড়িতে আছি। হাতের নখ, পায়ের নখ বড় হয়েছে। হেলের মেয়েদের কাছে পেনসিল-কাটা একটা ছুরি চাইলাম। তারা বললে, কী করবেন? আমি বললুম, নখ কাটব। এই তো হেলের মেয়েদের হুড়োহুড়ি লেগে গেল। এক মেয়ে পিছন দিকে পা মুড়ে, থ্যাবড়ানি খেয়ে গালচেতে বসল ; অতি সন্তর্পণে, ভক্তি ক'রে, পায়ের বুট খুললে, তারপর মোজা খুললে, তারপরে—নখকাটা—এই নখ কাটে তো এই নখ কাটে—কখনো পা-টা নিজের হাঁটুর উপর রেখে ধীরে-ধীরে নখ কাটছে—কখনো পা-টা গালচের উপর রেখে হুমড়ি খেয়ে নখ চাঁচছে—কতরকম কাটোয়ারি যে, সে দেখাতে লাগল। আমি তো আকণ্ঠ বন্ধনে পড়লুম, ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি। শেষ হলে দু'পায়ে মোজা জুতো পরিয়ে দিলে।

তারপর যন্ত্রপাতি গুটিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—দাম দিন ; আমরা আমেরিকান, দাম না পেলে কোনো কাজ করি না ; নাপিতের দোকানে গেলে দু-তিন ডলার দিতে হত ; আমি ঘরে বসে কেটেছি—দিন আমাকে এক ডলার। আমি বললুম, এই-যে আমার পা ছুঁয়েছ এবং নখ কাটবার অধিকার পেয়েছ, এর দরুণ আমাকে কী দেবে বলো? আমার পা ছোঁয়া কি আর যার-তার সাধ্য? পোপদের পা ছুঁতে হলে কত টাকা দিতে হয় বলো? এধারে পয়সা পেলে না, উল্টে পোপের দৃষ্টান্ত শুনে মেয়েটি বললে, অ্যাঁ, কাজও করব, আবার ঘর থেকে টাকাও দেবো? সে আর বেশী জবাব করতে না পেরে হাততালি দিয়ে নাচতে-নাচতে অপর ঘরে চলে গেল।"

'ক্লাসিক দেবতার মতো মুখমণ্ডল-সমন্বিত স্বামী বিবেকানন্দে'র মস্তকশীর্ষের কুঞ্চিত কেশ-প্রাচুর্যের বিশেষ অনুরাগী এই ভগিনীগণ। ভারতবর্ষে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের 'মুণ্ডিত মস্তক, তরুতলে শয়ন, ভিক্ষান্ন ভোজন'—কিন্তু আমেরিকায় ওসব ব্যাপার চলে না। [ পাশ্চাত্ত্যে মস্তকমুণ্ডন ভয়ানক কাণ্ড। অখণ্ডানন্দ বলেছেন—"নিবেদিতা ভাবতে প্রথম নেড়া মাথা দেখে চীৎকার করে ওঠে—'Horrible! Convict!' কেননা ওদের দেশে জেল-কয়েদীদের মাথা কামায়।" তবে মুণ্ডিত মস্তক বাদ দিয়ে বাকি দুটি জিনিস পাশ্চাত্ত্যে চলে—গ্রীষ্মাবাসরূপে তাঁরা মাঝে-মাঝে বৃক্ষতল আশ্রয় করেন এবং অবশ্যই স্ত্রী-পুরুষে কৌপীনবস্ত হন সমুদ্র-তীরে। ]—সুতরাং স্বামীজীকে মাথা-ভরা চুল রাখতে হয়েছিল সেখানে, এবং ভগিনীগণ অবশ্যই তার গুণগান করতেন। তা যে করতেন তা বোঝা যায় স্বামীজীর পরবর্তী চিঠিতে কিছু সরস উল্লেখ থেকে : "কথায়-কথায় বলি, আমি খুশী যে, দিন-দিন মাথার চুল পেকেই চলেছে। এর পরে তোমাব সঙ্গে দেখা হবার আগেই আমার মাথাটি হয়ে দাঁড়াবে একটি পূর্ণ বিকশিত শ্বেতপদ্ম"—স্বামীজী বড় আনন্দে লিখেছিলেন। "শুভ্রকেশ আমার বড পছন্দ"—স্বামীজী পুনশ্চ লিখেছেন, কারণ তা তাঁকে বৃদ্ধ ঋষিত্ব দিয়ে ফেলতে পারে, যা বয়সে এবং চেহারায় না থাকার জন্য তাঁকে আমেরিকায় বডই ভুগতে হয়েছিল। তিক্ত পরিহাসের সঙ্গে লিখেছিলেন—"গোছায়-গোছায় চুল পাকছে, সারা মুখে বলিরেখা বাড়ছে, মাংস ঝরে যাওয়ায় কুড়ি বছর বয়স বেশি দেখাচ্ছে।...আমি মস্ত দাড়ি রাখছি, তা এখন পেকে শাদা হাওয়ার দিকে। পাকা দাড়ি বেশ একটা ঋষি-ঋষি চেহারা দেয়—তা আমেরিকান কুৎসা-কারীদের হাত থেকে বাঁচায়। হে শ্বেতশ্মশ্রু! কি পরিমাণেই না আপনি ঢাকিয়া রাখিতে পারেন! আপনি ধন্য! ধন্য! জয় দাড়ি কি জয়!'

হেল-পরিবারে কাটানো দিনগুলি রসে-রহস্যে ভরা ছিল। স্বামীজী যখন বাইরে থাকতেন, তখন সরস চিঠি পাঠানোর দায় ছিল তাঁর। হেসে, বা না-হাসিয়ে তিনি

থাকতে পারতেন না। সুতরাং চিকাগো বিশ্বমেলার সুবিখ্যাত সভাপতি, বিরাট ধনী ব্যবসায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট-সদস্য, ভূতপূর্ব মন্ত্রী, মাননীয় মিঃ ডবলিউ পামার স্বামীজীর বর্ণনায় গাম্ভীর্য হারিয়ে উপভোগ্য চরিত্র হয়ে উঠেছেন—বিশেষতঃ তাঁর 'তরল অনল' স্কচ হুইস্কি-প্রীতির জন্য। স্বামীজী হেল-ভগিনীদের লিখেছিলেন—

—"বুড়ো পামারের সঙ্গে বেশ জমেছে। সদানন্দ সজ্জন বৃদ্ধ।...আমার সম্বন্ধে এখানে সব চেয়ে মজার যে খবর বেরিয়েছে তা হল—সাইক্লোনিক-হিন্দু এখানে হাজির; তিনি মিঃ পামারের অতিথি; মিঃ পামার হিন্দু হয়ে পড়েছেন; তিনি ভারতে যাচ্ছেন, কেবল তাঁর বিশেষ দাবি—ভারতে দুটি সংস্কার প্রবর্তন করতে হবে —এক, জগন্নাথের রথ টানবে তাঁর লগ-হাউস-ফার্মের পারচেরন্-জাতীয় অশ্ব, দুই, পবিত্র হিন্দু গোমাতা-কুলের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে তাঁর জার্সি-গাভীদের।"

বস্টন থেকে স্বামীজী মেরী হেলকে এক চিঠিতে স্ফূর্তি করে লিখেছিলেন—তিনি 'ভ্যাগাবণ্ডামি' (Vagabondising) করে যাচ্ছেন। এই সূত্রে এব্-হিউ নামক লেখকের লেখা তিব্বতের ভ্যাগাবণ্ড লামাদের জীবন-কাহিনীর উল্লেখ করেছিলেন মহা খুশিতে। "ঐসব লামারা"—স্বামীজী জানিয়েছেন—"অদ্ভুত লোক; যথেচ্ছ হাজির হয়; ডাকা হোক-না-হোক, যে-কোনো লোকের টেবিলে বসে পড়ে; তারা যে-কোনো জায়গায় বাস করে এবং যখন ইচ্ছা চলে যায়। এমন কোনো পর্বত নেই যাতে তারা ওঠেনি, এমন নদী নেই যাকে পেরোয় নি, এমন জাতি নেই যাকে তারা জানে না, এবং এমন ভাষা নেই যাতে তারা কথা বলে না। এব্-হিউয়ের ধারণা, যে-শক্তিবলে গ্রহগুলি সদা-ঘূর্ণায়মান, ঈশ্বর নিশ্চয় সেই শক্তিকে এদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন।" লামাদের এই বর্ণনা সানন্দে উদ্ধৃত করার পরে—(স্বামীজীর আনন্দের কারণ, ঐ বর্ণনায় তিনি নিজ জীবনচ্ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন) স্বয়ং লামা তিনি, নিজের বিষয়ে কিছু লিখেছেন: "আজ এই ভ্যাগাবণ্ড লামাটি চিঠির পাতায় আঁচড় কাটার বাসনায় আক্রান্ত হয়ে একটি দোকানে পদব্রজে ঢুকে পড়ে লেখার যাবতীয় উপকরণযুক্ত একটি সুন্দর পোর্টফোলিও কিনে ফেলেছেন, যেটি কট্ করে বন্ধ হয়, যাতে ছোট্ট কাঠের দোয়াতদানি পর্যন্ত রয়েছে। শুভ সংকল্প, এখন টিকলে হয়।"

হেল-কন্যাদের কাছে লেখা আর একটি কৌতুকময় চিঠির অংশ:

"দ্যাখো কী সদাপে আওয়ান আমি—সবই ভগিনী জেনীর শিক্ষার ফল। উনি লাফাতে-ঝাঁপাতে, খেলতে-দৌড়তে, শয়তানের মতো দিব্যি গালতে, মিনিটে পাঁচশো করে ইতর শব্দ ছোটাতে ওস্তাদ। ধর্ম নিয়ে ওঁর মাথাব্যথা নেই—ওই যা একটু-আধটু।...দূর ছাই, সব ভুলে যাই—আমি সমুদ্রে ডুব গালছি একেবারে মাছের মতো—তার সবটুকু উপভোগ করছি। আর—হ্যারিয়েট আমাকে কী যে ছাইভস্ম

একটা [ ফরাসী ] গান শিখিয়েছিল—'প্রান্তর মাঝে...' জাহান্নামে যাক। এক ফরাসী পণ্ডিতকে ওটা শোনাতে তাঁর হাসি শুরু হল—বেদম হাসি—সে আর থামে না—আমার অপূর্ব অনুবাদ শুনে তাঁর পেট ফাটার যোগাড়। তোমরা ঐরকম ভাবে আমাকে ফরাসী শিখিয়েছ? তোমরা হলে একদঙ্গল বেকুফ আর হীদেন—বুঝলে?

"[ কেমন, এই গ্রীষ্মে ] ডাঙ্গায় তোলা মস্ত মাছের মতো খাবি খাচ্ছ তো! বেশ হয়েছে—গরমে ভাজা হচ্ছ। আহা! এখানে কেমন সুন্দর ঠাণ্ডা! ঠাণ্ডা শতগুণে বেড়ে যায় যখন ভাবি, তোমরা চার বুড়ী গরমে হাঁপাচ্ছ, সেদ্ধ হচ্ছ, ভাজা হচ্ছ, আহা-হা—এখানে কি তোফা ঠাণ্ডা উপভোগ করছি—আ হা হা হা!"

নিজের উপভোগকে স্বামীজী অতঃপর আরও শীতল মধুর করে তুললেন, একটি হ্রদের তলায় ডুব দিয়ে চুপ করে বসে থাকার স্বপ্ন সৃষ্টি করে।—"একবার ভেবে নাও—প্রতিদিন দুপুরের ভরা গরমে হ্রদের জলে ডুব দিয়ে তলিয়ে যাচ্ছ—যাচ্ছ তো যাচ্ছ, নামতে-নামতে একেবারে তলায় পৌঁছে গেছ—কী সুন্দর শীতল সে জায়গাটি—তোমার উপরে নীচে চতুর্দিকে অপার স্নিগ্ধ শীতলতা—সেখানে পড়ে আছ চুপটি করে, নিশ্চল হয়ে, আচ্ছন্ন হয়ে, ঘুমোচ্ছ না কিন্তু, স্বপ্নজড়িত অর্ধচেতন এক অপূর্ব রসাবেশ—"

এই পর্যন্ত বেশ চলছিল—কিন্তু স্বামীজী শেষরক্ষা করতে চাইলেন না—ঠাণ্ডা জলে লম্বা ডুব মারার সুখের মতো একটা অসুখের দিকও আছে। ভগিনীগণের কল্পিত ঈর্ষার জ্বালার উপর স্নিগ্ধ প্রলেপ দেবার জন্য ঠাণ্ডা জলের ব্যাধির কথা অতঃপর দাদাকে বলতে হল—"ঈশ্বর রক্ষা করুন! [ ঠাণ্ডা জলে ডুবে ] কয়েকবার আমার পেশীতে এমন খ্যাঁচ্ ধরেছে যে, তাতে হাতীও অক্কা পাবে। সুতরাং ঠাণ্ডা জল থেকে তফাতে থাকতেই হবে—।"

ভারতে ফিরে কাশ্মীরে গিয়ে স্বামীজী আর একটি সকৌতুক চিঠি মেরীকে লিখেছিলেন। কাশ্মীর ভূস্বর্গ—সুতরাং স্বর্গলোক থেকে উক্ত পত্র প্রেরিত। তবে স্বর্গবাসের মেয়াদ মাত্র মাসখানেক।—"তারপর সৎকর্মের সঞ্চয় শেষ হয়ে যাবে—এই স্বর্গ থেকে পুনরায় মর্তে পতন। তারপর আবার কর্মফল সঞ্চয়—মন্দ কর্মের জন্য যেতে হবে চীন-নরকে—চীনের ক্যান্টন প্রভৃতি শহরের দুর্গন্ধ-নরকে ডুবব কুকীর্তির জন্যই—তারপর কি জাপানে অন্তঃশুদ্ধি?—তারপর পুনশ্চ স্বর্গলাভ—আমেরিকার যু—ক্ত—রা—ষ্ট্রে॥"' \

স্বদেশ-মুগ্ধ, বিদেশ-বিতৃষ্ণ আমেরিকার সোসাইটি-মহিলাদের প্রতি বিশেষ খোঁচা ছিল উপরের অংশে। অন্য একটি চিঠিতে লিখেছিলেন সদুঃখে—'কত না সুন্দর-সুন্দর জিনিস তোমাকে পাঠাতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু হায়, শুল্কের কথা মনে পড়লে আমার আকাঙ্ক্ষা নারীর যৌবন এবং ভিখারীর স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যায়।'

এই চিঠিরই শেষের দিকে স্বামীজী কাশ্মীর-বর্ণনা করেছিলেন কাশ্মীর-প্রীতির সঙ্গে সাহিত্যিক ইয়ার্কি মিশিয়ে—

"আহা মেরী, যদি তুমি কাশ্মীর দেখতে—শুধু কাশ্মীরটি! অপূর্ব সুন্দর হ্রদগুলি, পদ্মে আর রাজহংসে ভরা (রাজহংস অবশ্য নেই, কেবল পাতিহাঁস—ওটা কবির স্বাধীনতা!), বৃহৎ কৃষ্ণ ভ্রমররাজি পবন-আন্দোলিত কমলদলে অধিষ্ঠান করতে চাইছে (আমি বলতে চাই, পদ্মগুলি মাথা নেড়ে চুম্বনে আপত্তি জানাচ্ছে—ইতি কবিতা)..."

চমৎকার বর্ণনায় ভরা বেশ-কিছু চিঠি স্বামীজী হেল-পরিবারে লিখেছেন—প্রায় সব চিঠির মধ্যেই তাঁর সুখের দিনগুলির স্মৃতির সুর জড়িয়ে ছিল! নিউইয়র্কে স্বামীজী বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন—'নিউইয়র্কবাসীরা লোক ভাল, কেবল, তাদের মগজের চেয়ে টাকা বেশি'- তাঁর মনে হয়েছিল। এহেন নিউইয়র্ক থেকে কিছু টাকা যোগাড় করতে পেরে আহ্লাদে লিখেছিলেন—"চিকাগোয় পাওয়া যায় না, এমন কিছু জিনিস যদি নিউইয়র্ক বা বস্টন থেকে তোমাব জন্য নিয়ে যাবার দরকার থাকে, সত্বর লিখবে। আমার এখন পকেট-ভর্তি ডলার—যা চাইবে এক মুহূর্তে পাঠিয়ে দেবো। এতে অশোভন হবে কদাপি মনে করবে না, আমার কাছে বুজরুক নেই—আমি যদি তোমার ভাই তো ভাই-ই।"

এই ভাইকে বক্তৃতা করে রোজগার করতে হয়, সেটা তাঁর মোটে ভাল লাগে না, 'জঘন্য বিরক্তিকর'; সুতরাং—"১৯ তারিখ পার হলেই এক লাফে বস্টন থেকে চিকাগোয়...তারপরে প্রাণভরে নিশ্বাস নেবো, টানা বিশ্রাম, দু'তিন সপ্তাহের, গ্যাঁট হয়ে শুধু গল্প কবব, আর টাইপ টানব।"

মেরী হেলের কাছে লেখা চিঠিতে স্বামীজী একবার হেল-ভগিনীদের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছিলেন, খাঁটি সাহিত্যিকের ভঙ্গিতে। তাঁর ঐ সাহিত্য-উদ্বেগের মূলে ছিল অন্যতম ভগিনী হ্যারিয়েট হেলের শুভ বিবাহ-সংবাদ। পাত্রীকে পৃথকভাবে স্বামীজী অভিনন্দন জানিয়েছিলেন: "আমি অতীব সুখী যে অবশেষে তুমি আইবুড়ি-আশ্রমের সুখনীড় সম্বন্ধে তোমার মত পরিবর্তন করেছ। এখন তুমি একেবারে ঠিক পথ ধরেছ—বিয়েই শতকরা ৯৯ জন মানুষের সর্বোত্তম লক্ষ্য। জীবনে যখন আমরা ভারবহন করতে এবং সহ্য করতে বাধ্য, তখন আপস করে চলাই জীবনের রীতি—এই চিরন্তন সত্যটিকে মানুষ যখন শিখে নিয়ে মেনে চলতে প্রস্তুত হবে, তখনই সে সব চেয়ে সুখী হবে।" স্বামীজী আরও বলেছিলেন—"সর্বাঙ্গসুন্দর জীবন" কথাটা স্ববিরোধী; সর্বোচ্চ আদর্শের অকৃতার্থতাকেই পদে-পদে লক্ষ্য করতে হয়; সুতরাং সেটা জেনেই জীবনের পথে অগ্রসর হতে হবে।—"তোমাকে যতটুকু জানি—তোমার মধ্যে রয়েছে সহ্য করার, ক্ষমা করার প্রভূত শক্তি; সুতরাং সহজেই ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি—

তোমার দাম্পত্যজীবন হবে পরম সুখময়।" শকুন্তলার প্রতি ঋষি কণ্বের উপদেশ উদ্ধৃত করে স্বামীজী স্নেহের বোন হ্যারিয়েটকে গৃহবধূর করণীয় কর্তব্যের রূপ নির্দেশ করেছিলেন এবং প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন—"তুমি সারাজীবন উমার মতো শুদ্ধ পবিত্র থাকো—তোমার স্বামীর জীবন হোক উমাগতপ্রাণ শিবের মতো।"

হ্যারিয়েট হেলকে লেখা স্বামীজীর চিঠিটি সাহিত্যের সম্পদ। যদি কেউ তাঁর স্নেহপাত্রীর শুভবিবাহে আশীর্বাদ-পত্র পাঠাতে চান, তাহলে স্বীকার করে বা না করে এই চিঠি টুকে পাঠাতে পারেন। খুবই বিচিত্র কথা, সংসারীর কর্তব্য সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ উপদেশ-কথা সন্ন্যাসীর কাছ থেকেই পাওয়া গেছে—কণ্ব থেকে বিবেকানন্দ তার প্রমাণ। কিন্তু স্বামীজীর ঐ আশীর্বাদী-পত্রের পিছনে কিছু বিষাদহাস্যও ছিল। হেল-পরিবারের চার মেয়ে সম্বন্ধে একদা তিনি লিখেছিলেন—তাঁর সংস্রবে তারা ব্রহ্মচিন্তায় ব্যস্ত—সেই ব্রহ্মের গৃহলীলা নিশ্চয় তাঁর পছন্দের বস্তু হতে পারে না। বিবাহ যেখানে পৃথিবীর শতকরা নিরানব্বই জন মানুষের জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্য সেখানে স্বামীজী বাকি একজনের অন্তর্ভুক্ত। স্বতঃই, কিছু মানবিক দুর্বলতায় [।] তিনি স্বপক্ষের সংখ্যাবৃদ্ধি চাইছিলেন—সেই রামকৃষ্ণ-কথিত শনিবাবের ভূতের সঙ্গী-সন্ধান। মেরীকে স্বামীজী এই সূত্রে লিখেছিলেন—তাঁর আনন্দ পূর্ণাঙ্গ হবে, যদি তিনি অন্য তিন বোন সম্বন্ধেও অনুরূপ সংবাদ পান।—"স্নেহের মেরী, আমি জীবনে এই মহৎ শিক্ষালাভ করেছি···তোমার আদর্শ যত উচ্চ, তোমার দুঃখও তত বেশী। এই পৃথিবীতে বা এই জীবনে আদর্শকে কখনও লাভ করা যাবে না। পরিপূর্ণতাকে পৃথিবীতে যে চায় সে উন্মাদ।" হ্যারিয়েট বেহিসেবী কল্পনাবিলাস বা ভাবপ্রবণতাকে পরিহার করেছে; তার "সেইটুকু ভাবাবেগ আছে যা থাকলে জীবন মধুর হয়, সেইটুকু সাধারণ বুদ্ধি ও হৃদয়ের কোমলতা আছে যা জীবনের অবশ্যম্ভাবী কাঠিন্যগুলিকে নরম করে দিতে পারে।" হেল-ভগিনীদের অন্য একজন, হ্যারিয়েট ম্যাককিণ্ডলির মধ্যেও এই গুণগুলি আছে। তা নেই—স্বামীজী দেখেছিলেন—দুজনের মধ্যে। সেই দুইজন, মেরী হেল ও ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলির সামনে, তাদের চরিত্রচিত্র স্বামীজী তুলে ধরেছিলেন—সেইসঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন আত্ম-উন্মোচনে রক্তাক্ত একটি রচনাকে।—

"মেরী, তুমি হলে টগ্‌বগে তেজী ঘোড়া—অপূর্ব অদ্ভুত। মহারাণী হতে পারো তুমি—দেহে মনে সে ঐশ্বর্য তোমার আছে। দুরন্ত দুঃসাহসী বীর বেপরোয়া স্বামীর পাশে জ্বলে উঠবে তুমি—কিন্তু প্রিয় ভগিনী, গৃহিণীরূপে তুমি—নিতান্ত মন্দ। দৈনন্দিন জগতের বাস্তববাদী, সুখাভিলাষী, পরিশ্রমী কিন্তু মন্থরগতি স্বামীর জীবন তুমি একেবারে শেষ করে দেবে। ভগিনী, উপন্যাসের চেয়ে বাস্তবজীবনে রোমান্স বেশি, একথা যদিও সত্য, কিন্তু মনে রেখো, তাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কদাচিৎ।

তাই আমার উপদেশ, যতদিন না তুমি তোমার আদর্শকে বাস্তব ভূমিতে নামিয়ে আনতে পারছ, ততদিন তোমার বিয়ে করা উচিত হবে না।...

"জগতে দু'রকমের মানুষ আছে। এক রকমের মানুষ—শক্ত-স্নায়ু, শান্ত-স্বভাব, প্রকৃতিবশ—তারা বেশি কল্পনার প্রশ্রয় দেয় না, তারা সৎ, সহৃদয়, মধুরস্বভাব। পৃথিবী তাদেরই জন্য—তারা সুখী হতে জন্মেছে। আর একদল মানুষ আছে যাদের স্নায়ু উত্তেজনাপ্রবণ, যারা নিদারুণ কল্পনাপ্রিয়, তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন—এই মুহূর্তে হয়ত তরঙ্গশীর্ষে, পরমুহূর্তে ঢেউয়ের তলায়। সুখ এদের জন্য নয়। প্রথম শ্রেণীর মানুষের জীবন ঢিমে সুখ-সুরের তারে বাঁধা, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ উন্মাদনা ও বেদনার মধ্যে ধাবমান। কিন্তু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই প্রতিভার জন্ম। প্রতিভা এক ধরনের পাগলামি—এই সাম্প্রতিক মতবাদের মধ্যে কিছুটা সত্য আছে।

"এখন এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষেরা যদি বড হতে চায় তাহলে নিজেদেরই তাদের রণক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিতে হবে সংগ্রামের জন্য এবং শেষ না-হওয়া পর্যন্ত লডাই চালিয়ে যেতে হবে। কোনো সাংসারিক দায়দায়িত্ব নয়, বিবাহ নয়, সন্তান নয়, একটি ভিন্ন অন্য আসক্তি নয়—সে আসক্তি তাদের নিজস্ব আদর্শ সম্বন্ধে—তারই জন্য তাদের বাঁচা এবং মরা। আমি নিজে এই শ্রেণীর মানুষ। বেদান্তকে আমি আদর্শ করেছি—তার জন্য লড়াইয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছি। এই একই ধাতুতে গডা তুমি ও ইসাবেল। কিন্তু একথা রূঢ় হলেও আমাকে বলতে হবে—তোমরা বৃথা নষ্ট করছ তোমাদের জীবন। হয় কোনো একটা আদর্শের পতাকা তুলে ধরো ; রণক্ষেত্র পরিষ্কার ক'রে জীবন পণ ক'রে লক্ষ্য-পথে এগিয়ে যাও ; নচেৎ তোমরা তোমাদের আদর্শকে নামাও, মনে সন্তোষ আনো, বাস্তববাদী হও, বিয়ে করো, সুখী হও। ভোগ কিংবা যোগ। হয় এই পৃথিবীকে উপভোগ করো, নচেৎ তাকে ছেড়ে দিয়ে যোগী হও। কেউই দুটিকে একসঙ্গে পায়নি। হল তো হল এখনি, নচেৎ কদাপি নয়। দ্রুত সিদ্ধান্ত করো।... হয় সুখী হও, নয় মহৎ হও। তুমি বা ইসাবেল সম্বন্ধে আমার কোনো সমবেদনা নেই—তোমরা না এটায়, না ওটায়।...খানাপিনা, সাজসজ্জা, সামাজিক কায়দা-কানুনের আহাম্মকির জন্য জীবন দেওয়া যায় না, বিশেষতঃ তোমার মতো জীবন, মেরী। তুমি তোমার চমৎকার মাথা আর শক্তিতে মরচে পড়তে দিচ্ছ—ক্ষমা নেই তার। বিরাট হবার উচ্চাশা তোমাকে রাখতে হবে। আমি জানি, এই কড়া কথাগুলোকে তুমি ঠিক অর্থে নেবে, কারণ তুমি জানো, আমি তোমাদের নিজের বোনের মতো, কি তারো চেয়ে বেশি ভালবাসি। অনেক দিন ধরেই এই কথাগুলো বলবার ইচ্ছা ছিল।...হ্যারিয়েটের কাছ থেকে আনন্দসংবাদ পাবার পরে তা বলবার তাগিদ বোধ করলাম। তুমি বিয়ে করছ, এ সংবাদ পেলে আমি অত্যন্ত আনন্দবোধ করব।"

বলাবাহুল্য শনিবারের ভূত শনিবারের ভূতকে পায়নি। হেল-কন্যার সকলেই বিয়ে করেছিলেন—কতদূর সুখী হয়েছিলেন জানি না। কিন্তু এটুকু জানি, স্বামীজী মেরী হেলের যত গুণগানই করুন, স্বামীজীকে সম্পূর্ণ বুঝবার সাধ্য মেরীর ছিল না। মেরী যতক্ষণ আধ্যাত্মিকতার জ্যোৎস্নালোকিত শ্বেতশিবরূপী বিবেকানন্দকে দেখে-ছিলেন, ততক্ষণই খুশী ছিলেন, কিন্তু যে-মুহূর্তে সেই শিব রুদ্র-ভয়ঙ্কর হয়েছেন, প্রভাতী শিশির যখন শুকিয়ে গেছে মধ্যমার্তণ্ডরোষে, তখন মেরী আতঙ্কিত আক্ষেপে সরে গিয়েছেন—না, সে প্রসঙ্গের অবতারণার প্রয়োজন এখানে নেই—আমরা হাসি-রসেই ডুবতে চাইছি,এবং মজার কথা, হেল কন্যাদের বিয়ে-ব্যাপারটা সে পক্ষেও কম উপাদান যোগান দিচ্ছে না। স্বামীজী তাঁর এই বোনদের সঙ্গে তাদের বিয়ে-ব্যাপারেও গভীর পরামর্শে বসেছিলেন, শেষপর্যন্ত এই বোঝাপড়া হয়েছিল—ভগিনীগণকে যদি একান্তই বিয়ের যূপকাষ্ঠে বলি পড়তে হয় তাহলে মূল্যটা বড় আকারে আদায় করে নিতে হবে। টাকা, টাকা চাই সন্ন্যাসীর—নিজের জন্য নয়—ভারতের জন্য। এখন, টাকা আমেরিকাতে মিলছে না। উপায়? অনেক আলোচনার পরে এই সিদ্ধান্ত হয়ে-ছিল—টাকা যোগাড়ের সবচেয়ে সহজ উপায় হেল-কন্যাদের পক্ষে—ধনী বর বিয়ে করা। সাধারণ ধনী নয়—একেবারে কোটিপতি। সে রকম বর সন্ধানের গুরুদায়িত্ব কিছুটা স্বামীজীকেও নিতে হয়েছিল। তবে দেশ যেহেতু আমেরিকা, নিজেদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের দায় মেয়েদের নিজেদেরই। ইসাবেলকে স্বামীজী খোঁচা দিয়ে লিখলেন:

"কোটিপতি কেউ আসছে না—হাজারীও নয়। দুঃখিত—নিতান্ত দুঃখিত। আমি তো যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, কিন্তু আমার ক্লাসগুলি যে মেয়েতে ভর্তি। মেয়ে তো আর মেয়েকে বিয়ে করতে পারে না। যা হোক, ধৈর্য ধরো। আমি চোখ খোলা রাখব—কোনো সুযোগই ফসকাতে দেব না। তোমার বরাতে যদি কেউ না জোটে তা কিন্তু আমার কুঁড়েমির জন্য হবে না, মনে রেখো।"

হেল-পরিবারের চার কন্যা যতক্ষণ পাত্রস্থ হয়নি ততক্ষণ বাড়ির গৃহিণীর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। 'সপ্তাহ কয়েক আগে মাদার চার্চের কাছে চিঠি লিখেছিলাম—আজ পর্যন্ত জবাব পাইনি'—স্বামীজী লিখলেন—'ভয় হয়, তিনি সদলবলে সন্ন্যাস নিয়ে কোনো ক্যাথলিক-মঠে ঢুকে পড়েছেন। চার-চারটে আইবুড়ো মেয়ে যে-কোনো মাকে মঠে ঠেলে দিতে পারে।'

অল্পদিন পরেই একজনের অর্থাৎ হ্যারিয়েট হেলের গতি হল, যার বিষয়ে আমরা আগে বলেছি। এঁর স্বামী কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিমাণে ধনী নন। তাতে স্বামীজীর হতাশার শেষ রইল না—হায় হায়, মেয়েটা সন্ন্যাসিনীও হল না, কিংবা বড় মাপের চাঁদা দেবার মতো বরও জোটাতে পারল না, তাহলে করল কি। খুব রাগ করেই লিখলেন মেরীর কাছে:

"হ্যারিয়েট তার মুনিষ্‌ পাকড়াবার পরে বেশ চালাকি ক'রে চুপচাপ। কিন্তু দয়া করে বলুন আপনারা—আমার টাকা কোথায়? ওকে আর ওর স্বামীকে একথা স্মরণ করিয়ে দিও।...মিঃ উলীকে জানাবে—তিনি বোনটিকে পেয়েছেন কিন্তু বোনের দাদাকে পাওনা মিটিয়ে দেননি। তাঁকে জানাবে—এই মোটা কালো, অদ্ভুত সাজ-পরা ভূতটি বৈঠকখানায় বসে ধূমপান করতে করতে অনেক সমাগত প্রলোভনকে ভয় পাইয়ে ভাগিয়েছে—এটাই তাঁর পক্ষে হ্যারিয়েট-প্রাপ্তির অন্যতম কারণ। সুতরাং আমি এই ব্যাপারে আমার বৃহৎ ভূমিকার উপযুক্ত মূল্য চাই। মেরী, আমার জন্য জোরসে ওকালতি করো—করবে তো?"

হ্যারিয়েট সম্বন্ধে আশা তিনি একেবারে ছাড়েননি: 'আমি অপেক্ষা করব। মিঃ উলী কোটিপতি হলেই টাকা দাবি করব।' কিন্তু নিকট-ভবিষ্যতে তিনি মিঃ উলীর কোটিপতি হবার সম্ভাবনা দেখেননি।—'হ্যারিয়েট যদিও কোটি-গুণের একজনকে পেয়েছে কিন্তু সেইসঙ্গে কয়েক কোটি রূপেয়া-গুণ থাকলে আরো মানানসই হত। সুতরাং তুমি যেন একই ভুল করে বসো না।'

ভুল করার সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। আমেরিকার অভিজাত মেয়েদের চোখের সামনে তখন ধনী ব্যবসায়ী আমেরিকানরা ঘুরছিল না—নিঃস্ব অভিজাত বিদেশী তরুণেরা তাদের মনোলোকে আলোকসম্পাত করছিল, যারা বিবাহোত্তরকালে স্বীয় টাইটেল-যোগে মার্কিন 'দামী'কে ইউরোপীয় 'নামী' করে তুলতে পারবে। স্বামীজী মজা করে নিউইয়র্ক থেকে একবার লিখলেন:

"খুবই দুঃখের কথা, এই শীতে কেউ টোপ খেল না। এদিকে শীতের পর শীত চলে যাচ্ছে—আশাও ক্ষীণ হচ্ছে ক্রমে। এখানে আমার বাসার কাছে ওয়ালডর্ফ হোটেল। এটি টাইটেলধারী কিন্তু নিঃস্ব ইউরোপীয় পুরুষদের মহা আড্ডাস্থল। এই প্রদর্শনী থেকে ধনী ইয়াঙ্কি উত্তরাধিকারিণীরা তাঁদের সওদা করেন। বোঝাই গুদোম—স্টকে এত মাল যে, ইচ্ছেমতো বাছতে অসুবিধে নেই। এমন অনেকে আছেন যাঁরা একদম ইংরেজী বলতে পারেন না। আবার অনেকে—দু'একটা ইংরাজী শব্দ আধো-আধো ভাবে বলেন, যা বোঝার সাধ্য কারো নেই। চমৎকার ইংরাজী বলেন, এমন লোকও আছেন। কিন্তু বোবা বাছাদের তুলনায় এঁদের আশা ভরসা কম, কারণ যেসব ব্যক্তি গড়গড় করে ইংরেজী বলতে পারেন তাঁদের ইয়াঙ্কি-কন্যারা যথেষ্ট 'বিদেশী' মনে করেন না।"

স্বামীজীর ভয়, হেল-কন্যারা পাছে এহেন বরবাজার থেকে পরম গুরু খরিদ করে বসেন। উল্টোদিকে ফোঁপরা লাখোপতি জোটার ভয়ও আছে। মেরীকে সাবধান করতে একটি গল্প শোনালেন—এক ঘটকের চতুরালির মজার কাহিনী। স্বামীজী তখন ভারতে ফিরে এসেছেন, টাকার ভয়ানক দরকার, 'সৃষ্টি ও সংগঠনের কাজ

করতে-করতে জরাগ্রস্ত, বৃদ্ধ ও উগ্রস্বভাব' হয়ে উঠেছেন, বুঝে নিয়েছেন যে, হেল-বোনেরা তাঁর পথে কেউ আসছেন না ; এখন ভগ্নীপতিদের কাছ থেকে টাকাও যদি না-আসে তাহলে তো ঝাড়ে-মূলে নাশ। সুতরাং গল্পটি তাঁকে বলতে হল :

"এক জোড়া তরুণ-তরুণীর স্বামী-স্ত্রী হবাব পথে কোনো বাধাই ছিল না, সবই অনুকূল, কেবল কন্যার পিতাব ধনুর্ভঙ্গ পণ—কোটিপতির হাতে ছাড়া কন্যা সম্প্রদান করবেন না। ফলে বেচারাদের আশা-ভরসার ইতি। তখন এক চতুর ঘটক কার্যোদ্ধারে এগিয়ে এল। পাত্রকে সে জিজ্ঞাসা করল—দশ লাখ টাকা পেলে সে কি তার নাকটা কেটে দেবে ? পাত্র বলল—না, কদাপি না। ঘটক তখন কন্যার পিতার কাছে গিয়ে বলল, পাত্রের কাছে এমন সম্পদ আছে যার দাম বহু লক্ষ টাকা। তখন স্বতঃই বিয়ে হয়ে গেল।"

স্বামীজী অতঃপর লিখেছেন : "দোহাই বাপু, তুমি যেন ঐ রকম কোটিপতি জুটিয়ে ফেলো না। বুঝতে পারছি, তোমার কোটিপতি জুটবে না—সুতরাং আমারও টাকা মিলবে না—সুতবাং আমার ভয়ানক দুশ্চিন্তা থাকবে—সুতবাং আমাকে দারুণ খেটে যেতে হবে, আব তা নিষ্ফল হবে—সুতবাং আমার রোগ বাডবে। কী অপূর্ব, কী অপূর্ব বুদ্ধি আমার।—আমার রোগের কারণটা আবিষ্কার করে ফেলেছি। নিজের গুণে মোহিত হয়ে যাই—আহা।"

স্বামীজী অপরাজেয় যোদ্ধা। অতএব মেরীকে পুনশ্চ লিখলেন : 'ফিলাডেলফিয়ায় যাচ্ছ জেনে খুশী—কিন্তু সেবারের মতো খুশী নই—সেবার দিগন্তে কোটিপতি দেখা দিয়েছিল।' আবার লিখলেন, অনেকটা গোয়েন্দা-কাহিনীর খল-নায়কের ভঙ্গীতে—'কোটিপতি যোগাড় করতে তুমি পারলে না। এক্ষেত্রে তার অর্ধেক বা অর্ধেকের অর্ধেক-এর জন্য চেষ্টা করো না কেন ? আরে, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। আমাদের টাকা চাই। লোকটি [ বিয়ের পরে ] মিশিগান হ্রদে ডুবে মরুক, কোন আপত্তি নেই।'

বর-পাকড়ানোর সূত্রে তাতার-পাকড়ানোর পুরনো গল্পটা এসো গেল। না, ঠিকভাবে বলতে গেলে, গল্পটা এসেছিল বুয়োর-যুদ্ধে ইংরেজের দুর্দশা প্রসঙ্গে।—

"ইংরেজদের জন্য দুঃখ হয়—তারা দক্ষিণ আফ্রিকায় তাতার পাকড়েছে। তাঁবুর বাইরে পাহারাদার এক সৈনিক চীৎকার করে বলল, 'একটা তাতার পাকড়েছি।' তাঁবুর ভিতর থেকে আদেশ এল—'তাকে ভিতরে নিয়ে এসো।' 'সে আসবে না', সৈনিক জানাল। তখন ভিতর থেকে কড়া নির্দেশ—'তাহলে তুমি চলে এসো।' অতঃপর সৈনিকের কাতর উত্তর—'সে আমাকেও যেতে দিচ্ছে না।'"

গল্পটি বলে স্বামীজী মেরীকে জিজ্ঞাসা করলেন দুষ্টবুদ্ধির সঙ্গে—'তুমি বাপু

এইরকম তাতার পাকড়াওনি তো ?' *

স্বামীজীর সব আশায় জলাঞ্জলি পড়ল যখন শুনলেন, মেরী ইতালিতে গেছেন এবং সেখানে বর-লাভ হয়েছে। ছদ্ম দুঃখে হায়-হায় করে লিখলেন—

"তাহলে তুমি ভেনিসে আনন্দ উপভোগ করছ। বৃদ্ধটি নিশ্চয় তোফা চমৎকার! তবে বৃদ্ধ শাইলকের বাড়িও ছিল ভেনিসে—তাই নয় কি ?"

'চিত্তাকর্ষক পত্রালাপ' শিরোনামায় স্বামীজীর রচনাবলীর মধ্যে কতকগুলি কবিতা রয়েছে—সেগুলি স্বামীজী ও মেরীর পত্র-কবিতা। কৌতুকরসাশ্রিত এই কবিতাগুলি স্বামীজী ও মেরীর সম্পর্কের উপর বর্ণময় রশ্মিপাত করেছে। মেরী স্বামীজীর আপসহীন প্রকৃতির সমালোচনা করায় স্বামীজী তার চড়া উত্তর দিয়েছিলেন, যার মধ্যে সন্ন্যাসের অগ্নিঝলক দেখা গিয়েছিল। তাতে পাছে বোনটি আহত হয়, তাই সান্ত্বনা দিয়ে স্বামীজী পরে লিখে পাঠান—

শোন আমার বোনটি মেরী,
দুখ পেয়ো না—যদিও ভারী
চড় খেয়েছ, তবুও জানো,
জানো বলেই বলিয়ে নাও—
আমি তোমায় ভালবাসি,
ভালবাসি প্রাণের চেয়ে—

এখানেই স্বামীজী থামতে পারেননি—জ্বলন্ত ভাষায় বেদান্তসত্যকে উন্মোচন করেছিলেন, জানিয়েছিলেন—সর্প যখন পদাহত তখনি সে ফণা ধরে, অগ্নি যখন

* এই সূত্রে দুটি চলতি রসিকতা মনে পড়ে যাচ্ছে।

১। মা ছেলেকে ধমক দিয়ে বললেন, বাছা, ও কী করছ ? বেড়ালটার লেজ ধরে টানছ কেন ? ছেলে বলল, সে কি মা—আমি তো শুধু লেজ ধরে আছি, বেড়ালটাই তো টানছে।

২। তিনজন স্কাউটকে স্কাউট-মাস্টার সকালে পথে ছেড়ে দিয়ে বললেন, সারাদিন সৎ কাজ করবে, সন্ধ্যায় ফিরে কী করলে হিসাব দেবে। সন্ধ্যায় তারা ফিরে এলে স্কাউট-মাস্টার একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কী ভাল কাজ করেছ ? সে উদ্দীপ্ত হয়ে বলল—এক অন্ধ বৃদ্ধাকে ধরে রাস্তা পার করে দিয়েছি।—বা বা চমৎকার কাজ!—মাস্টারমশায় তারিফ করলেন। তারপর দ্বিতীয় জনকে জিজ্ঞাসা করলেন—বৎস, তুমি কী করেছ ? সে বলল, আমিও ঐ কাজে সাহায্য করেছি। পূর্বের উচ্ছ্বাস না থাকলেও মাস্টারমহাশয় মোটামুটি খুশীভাব দেখিয়ে বললেন, বেশ করেছ। তারপর তৃতীয় জনকে শুধোলেন—তুমি ?—সে বলল—আমিও স্যার একই কাজে হাত লাগিয়েছি। মাস্টারমশায় একটু বিরক্ত হয়ে বললেন—তোমরা তিনজনে মাত্র একটাই কাজ করলে ? তখন তিনজনই সমস্বরে বলল—কি করব স্যার, বুড়িটা যে রাস্তা পার হতে চাইছিল না!"

তাতার পাকড়ানোর গল্পের অনুরূপ গল্প—এদেশের চলতি প্রবাদ 'হাম তো ছোড়তা লেকিন কমলি নেহি ছোড়তা'র পেছনে রয়েছে।

সমুদ্যত তখনি তার শিখা লক্‌লক্‌ করে, সিংহ যখন দীর্ণবক্ষ তখনি মর্মান্তিক চীৎকারে পূর্ণ করে মরুপ্রান্তর, মেঘরাশি যখন বিদ্যুতের বাণবিদ্ধ তখনি বজ্রস্বরে উন্মোচন করে মহাবন্যা—তেমনি দারুণ আঘাত পেলেই মাত্র মানুষের আত্মার দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়—তখনি মানুষ জানে—অভেদই একমাত্র সত্য, ভেদ মিথ্যা মায়া, ইত্যাদি।

স্বামীজীর এই দার্শনিক কবিতা তাঁর ভগিনীকে বিশেষ বিচলিত করেছিল মনে হয় না। দাদার কাব্যাসক্তি, সেইসঙ্গে কাব্যশক্তির অভাব সম্বন্ধে নিজের ধারণা ভগিনী অতঃপর ছন্দে গেঁথে পাঠিয়েছিলেন—

'কবি হব আমি' এই সাধনায়
সন্ন্যাসী মহাবীর
সুর ভেঁজে যান প্রাণ পণ রেখে
নিতান্ত অস্থির।

ভাবে ও বচনে অজেয় যে তিনি
সন্দেহ কিছু নাই,
গোল এক শুধু ছন্দ নিয়েই
কেমনে যে সামলাই!

কোনো ছত্রটি অতি দীর্ঘ যে
কোনটি অতীব হ্রস্ব,
রূপ মেলে নাকো ভাবের সহিতে
বেড়ে যায় কবি-ভস্ম।

মহাকাব্য না গীতিকাব্য সে
কিংবা চৌদ্দপদী—
সেই ভাবনায় খেটে-খেটে হায
ধরে অজীর্ণ ব্যাধি।

যতদিন থাকে ঐ কবি-ব্যাধি
অরুচি খাদ্যে তাঁর
বিশেষতঃ যদি নিরামিষ হয়,
লিয়ন* বাঁধুনী যার।

ওসব চলে না, চলিতে পাবে না
স্বামীজী ব্যস্ত অদ্য,
সযতনে রাঁধা খানা পড়ে থাক
তিনি লিখিছেন পদ্য।

*লিয়ন ল্যাণ্ডস্‌বার্গ ; স্বামীজীর শিষ্য।

একদিন তিনি সুখাসীন হয়ে
একান্ত ভাবমগ্ন
সহসা আলোক আসিয়া তাঁহার
চারিপাশে হল লগ্ন।

'আলোক এসে গেল' স্বামীজীর কাছে, সুতরাং তাঁর শব্দ জ্বলতে লাগল অঙ্গারের মতো, এবং সেই জ্বলন্ত অঙ্গার বর্ষিত হল মেরীর উপর—অন্ততঃ মেরীর তাই অভিযোগ। দাদার প্রাণে যদি দুঃখ দিয়ে থাকেন, তার জন্য মেরী বারংবার ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু সুমিষ্ট বিদ্রূপ করতেও ছাড়লেন না—

যে-কটি ছত্র পাঠায়েছ তুমি
তোমার ভগিনীগণ
নিশ্চয় জেনো স্মরণ রাখিবে
বাঁচিবে যতক্ষণ।
কারণ তাদের দেখায়ে দিয়েছ
অতীব পরিষ্কার
'যাহা কিছু আছে সব কিছু তিনি'
ইহাই সত্য সার।

অর্থাৎ সব-কিছু ভগবান—মেরী স্বামীজীর বেদান্তের মূল অর্থ করলেন। শুনে স্বামীজী তাজ্জব বনলেন। বেদান্তের সহজ কথাটাও কী না দুর্বোধ অভারতীয়দের কাছে। মেরী বেদান্তের কথা কম শোনেননি, তবু, স্বামীজী হতাশ হয়ে ভাবলেন—সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাবা? বেদান্ত একথা বলে না—'সবাই ঈশ্বর'; বেদান্ত বলে—'ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, বাকি সব মিথ্যা' এবং 'এ পৃথিবীটা স্বপ্ন, যদিও তাকে সত্য মনে হয়। যথার্থ আমি, তিনি ছাড়া আর কিছু নয়, বস্তুর পরিবর্তন হয় না কখনো—কখনই হয় না।' কথাগুলো স্বামীজী বিস্তৃতভাবে মুক্তছন্দে মেরীকে লিখে পাঠালেন। স্বামীজীর কথা মেরী এতৎসত্ত্বেও বুঝলেন না। স্বামীজীর কথামতো ভগবান যদি একমাত্র সত্য হন, এবং বাকি সব-কিছু মিথ্যা হয়, যদি পৃথিবী স্বপ্ন হয়, তাহলে 'সবই ভগবান' নয় কেন? সুতরাং চটুল ছন্দে তাঁর বিদ্রূপ—

বুঝতে পেরেছি অতি সহজেই
তফাতটা কোথা রইল—
তৈল-আধার পাত্রের সাথে
পাত্র-আধার তৈল।
সে তো সোজা অতি, সোজা প্রস্তাব,
একটি প্রত্যবায়—
প্রাচ্য যুক্তি বুঝিতে সাধ্য
শক্তি নাহিক হায়।

মেরী তাঁর খ্রীস্টীয় বিশ্বাসের কথা যথাসম্ভব ঘোষণা করতেও ছাড়লেন না এই সঙ্গে। কিছু পরে স্বামীজীকে রণে ক্ষান্তি দিতে হল। তারই মধ্যে কয়েক ছত্রে তিনি মেরীর ছবি যেটুকু এঁকেছিলেন, তাই দিয়েই প্রসঙ্গ শেষ করি—

মেজাজটা খর, বালা অপূর্ব
প্রকৃতির কিবা খেয়াল মরি!
সুন্দরী নারী—সন্দেহ নেই—
তুর্লভাস্থা কুমারী মেরী।
গভীর আবেগ ঠেলে-ঠুলে ওঠে
চাপা দিতে তার সাধ্য নাই,
দেখতেই পাই মুক্ত-সত্তা
আগ্নেয় তার স্বভাবটাই।*

আপসের সংঘর্ষ ছিল ধর্মবিশ্বাস নিয়েই। স্বামীজী কিন্তু তাঁর চিকাগোর হেড-কোয়ার্টারে কোনো ব্রহ্মমন্দির স্থাপন করতে পারেননি। হেল-পরিবার 'ক্রীশ্চান-সায়েন্সে'র ভক্ত—শেষপর্যন্ত তাই ছিল। স্বামীজী অপরের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করতেন না, কিন্তু ব্রহ্মকুণ্ডে আহুতি দিতে-দিতে 'হরি ওম্। হরি ওম্। শিব। শিব।' বলতেও ছাড়তেন না। একটা মধুর বিবাদ চলত হিন্দু-বেদান্তী দাদা এবং ক্রীশ্চান সায়েন্টিস্ট বোনদের মধ্যে।

ক্রীশ্চান-সায়েন্স মত কী, সে সম্বন্ধে রামকৃষ্ণানন্দকে স্বামীজী একবার লিখে পাঠিয়েছিলেন: "ক্রীশ্চান সায়েন্স—এরাই হচ্ছে আজকালকার [ আমেরিকায় ] বড় দল—সর্ব ঘটে। বড়ই ছড়াচ্ছে—গোঁড়া [ মিশনারী ] ব্যাটাদের বুকে শেল বিঁধছে। এরা হচ্ছে বেদান্তী, অর্থাৎ গোটাকতক অদ্বৈতবাদের মত যোগাড় করে, তাকে বাইবেলের মধ্যে ঢুকিয়েছে আর সোঽহং সোঽহং বলে রোগ ভাল করে দেয়—মনের জোরে।...ঠিক আমাদের কর্তাভজা। বল্ 'রোগ নেই'—ব্যস, ভাল হয়ে গেল, আর বল্ 'সোঽহং', ব্যস্—চরে খাও গে। দেশ ঘোর মেটিরিয়ালিস্ট। এই কৃশ্চিয়ান দেশের লোক—ব্যামো ভাল করো, আজগুবি করো, পয়সার রাস্তা করো—তবে ধর্ম মানে, অন্য কিছু বড় বোঝে না।"

ক্রীশ্চান-সায়েন্সের খিচুড়িতে বেদান্তের মসলাগন্ধ শুঁকে স্বামীজী নাক সিঁটকে হাসতেন। মেরীরা ক্রীশ্চান-সায়েন্স মতানুযায়ী স্বামীজীর অসুখ হওয়াটা পছন্দ করতেন না। আর, তাঁরা উচ্চস্বরে মনঃশক্তিতে রোগ নিরাময়ের গুণগান করতেন। স্বামীজী মেরীকে উসকে লিখলেন: 'আমার শরীরটা ঘূর্ণীদোলায় ঘুরছে; বেশ কিছু মাস ধরে তা আমাকে বোঝাতে চাইছে—সে রীতিমতো বর্তমান। তবে ভয়ের

* 'চিন্তাকর্ষক পত্রালাপে'র বেশি অংশের কাব্যানুবাদ একদা করেছিলুম—তা বর্তমানে 'বাণী ও রচনা'র অন্তর্ভুক্ত। উদ্ধৃত অনুবাদ বর্তমান লেখককৃত।

কিছু নেই—মানসিক শক্তির দ্বারা আরোগ্যকারিণী আমার চারিটি ভগিনী আছেন—অতএব ডুবছি না। যা হোক, তোমার বছরে-একটা চিঠিতে তুমি আমার কথা এত বেশি বলো কেন—আর, চিকাগোর কোনো ফুটন্ত পাত্রের চারপাশ ঘিরে বিজ্-বিজ্ করে মন্ত্রোচ্চারণরত চার ডাইনির কথা এত কম বলো কেন?'

চিকাগোর চার ডাইনিকে স্বামীজী আরও খুঁচিয়েছেন। আমেরিকার গ্রীনএকারে স্বামীজী গিয়েছিলেন এক ধর্মীয় সমাবেশে যোগ দিতে, যেখানে নানা বিচিত্র মতের বিচিত্র নরনারী জুটেছিল। দলে ক্রীশ্চান সায়েনটিস্টরাও ছিলেন। তাঁদের বিষয়ে রঙ্গ করে স্বামীজী হেল-ভগিনীদের কাছে চিঠি লিখে পাঠান:

"এটা একটা মস্ত সরাইখানা ও খামারবাড়ি—এখানে ক্রীশ্চান সায়েনটিস্টরাও তাঁদের অধিবেশন বসিয়েছেন।…জায়গাটি নিঃসন্দেহে সুন্দর আর শীতল—এবং চিকাগোর অনেক পুরনো বন্ধুবান্ধব এখানে রয়েছেন। মিসেস মিলস, মিস স্টকহ্যাম প্রভৃতি কিছু মহিলা ও পুরুষ নদীর ধারে মুক্তভূমিতে তাঁবু খাটিয়ে বাস করছেন। তাঁরা খুব স্ফূর্তিতে আছেন এবং কখনো সারাদিন তাঁরা তোমরা যাকে বৈজ্ঞানিক পোশাক বল, তাই পরে থাকেন। প্রায় প্রতিদিন বক্তৃতা হয়। জনৈক মিঃ কলভিন বস্টন থেকে এসেছেন। তিনি প্রতিদিন বক্তৃতা করেন; শোনা যাচ্ছে প্রেতাবিষ্ট হয়ে তিনি তা করেন। 'ইউনিভার্সাল ট্রুথ' পত্রিকার সম্পাদিকা এখানে গেঁড়ে বসেছেন। তিনি উপাসনা পরিচালনা করছেন এবং সর্বপ্রকার ব্যাধি নিরাময়ের জন্য পাঠ দিচ্ছেন। শীঘ্রই তাঁরা অন্ধকে চক্ষুদানাদি করবেন, আশা রাখি।…

"স্টেনের মিঃ উড এখানে রয়েছেন—তিনি তোমাদের সম্প্রদায়ের অন্যতম আলোকবর্তিকা। তবে মিসেস 'হোয়ারল্‌পুলের' দলভুক্ত হতে তাঁর বিশেষ আপত্তি। তাই নিজেকে দার্শনিক-রাসায়নিক-ভৌতিক-আধ্যাত্মিক-এবং-কি-নয়-ব্যাধির মনঃশক্তিযোগে আরোগ্যকারী বলে ঘোষণা করেছেন। গতকাল এখানে ভয়ানক ঝড় হয়ে গেছে—তাঁবুগুলির উত্তম-মধ্যম 'চিকিৎসা' তা করেছে। বৃহৎ যে তাঁবুটির তলায় তাঁদের বক্তৃতাদি হত, 'চিকিৎসা-প্রভাবে' সেটির আধ্যাত্মিকতা এমনই বেড়ে গিয়েছিল যে, তা একেবারে মরদৃষ্টির পারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল এবং প্রায় দু'হাজার চেয়ার আধ্যাত্মিক ভাবাবেগে নৃত্য করছিল মাঠের চতুর্দিকে।"

না, ধর্মধারণার গভীরতার জন্য হেল-কন্যাদের প্রতি স্বামীজীর ভালবাসা নয়, ধর্মবোধের ক্ষেত্রে তাঁদের অগভীর বলেই তিনি মনে করতেন, যদিও মেরীর বুদ্ধি-শক্তির বিষয়ে তাঁর ভাল ধারণা ছিল, যেজন্য তিনি গুরুতর সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে বেশ কয়েকটি চিঠি তাঁকে লিখেছেন—হেলকন্যাদের প্রতি স্বামীজীর ভালবাসার পিছনে ছিল মেয়েগুলির চরিত্র, অর্থাৎ তাদের আন্তরিক পবিত্রতা।—"বৌদ্ধদের এক উদার প্রার্থনায় আছে, জগতের সকল পুণ্যাত্মাকে আমি প্রণিপাত

করি—সেই প্রার্থনার যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করি যখন আমি সেই পবিত্র মুখগুলিকে দেখতে পাই যাদের উপরে প্রভু নিজের হাতে অভ্রান্ত অক্ষরে লিখে রেখেছেন—এরা আমারই”—স্বামীজী লিখেছিলেন। ‘ভ্রাতা বিবেকানন্দে’র তাই নিরন্তর প্রার্থনা—“এই বীভৎস পৃথিবীর কর্দম ও ধূলিকণা যেন কখনো তোমাদের স্পর্শ না করে। ফুলের মতো তোমরা ফুটেছ—সেইভাবেই থাকো এবং চলে যাও।” স্বামীজী ভাবতেন, ‘যে-কোনো কারণেই হোক’ এই চারজনকেই তিনি ‘সব চেয়ে ভালবাসেন।’ “আমার আর একটিমাত্র ইচ্ছা আছে—মৃত্যুর আগে তোমাদের চার বোনের সঙ্গে একবার দেখা করা”—স্বামীজীর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, স্বামীজী তাঁর বোনগুলির সঙ্গে যখন ভ্রাতৃস্নেহের লীলায় মেতে ছিলেন, তখন বাইরে যদিও মনে হত, তাঁদের সঙ্গে একই ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু মনের গভীরে তিনি জানতেন, এরা ‘শিশুমাত্র’, এরা ‘সেই উৎসের সন্ধান পায়নি যা যুক্তিকে অযুক্তিতে পরিণত করে, মরকে অমর করে, জগৎকে শূন্যে পর্যবসিত করে, মানুষকে ঈশ্বর ক’রে তোলে।’ তবু স্বামীজী কি সত্যই চাইতেন—হেলকন্যারা, তাঁর সুখী, সুন্দরী বোনগুলি সেই যন্ত্রণা পাক, যা কেবলই জ্বালায়, পোড়ায়, তৃষ্ণানিবারণের মধ্যেই অনন্ত তৃষ্ণায় মানুষকে চির-অধীর করে রাখে? মনের গভীরে স্বামীজী নিশ্চয় তাই চাইতেন, আর বাইরের জগতে হাসতে-হাসতে পথ হাঁটবার সময়ে তাঁর মনে হত—কী দরকার—ওরা হেসেই নিক না—দুদিন বই তো নয়।

অতি বড় বেদনার ছায়ার উপরও স্বামীজী তাই হাসির আলো ছড়াতে চেয়েছেন। মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন খেতড়ির রাজার আকস্মিক মৃত্যুতে। স্বামীজীর এমন অনুগত শিষ্য-সেবক অল্পই হয়েছেন—তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হয়েছিল সেকেন্দ্রার প্রাসাদশীর্ষ থেকে পড়ে গিয়ে—স্বামীজী সেই প্রসঙ্গে মেরী হেলকে যে-কথা লিখেছিলেন তার মধ্যে ছিল বেদনারক্তিম পরিহাসের বিষণ্ণ সন্ধ্যাকিরণ। স্বামীজী লিখেছিলেন :

“সম্প্রতি কোন মনোহারী বন্ধু আমার জোটেনি। আর পুরনো যাঁদের কথা তুমি জানো, তাঁরা প্রায় সবাই ইহজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন—এমন-কি খেতড়ির রাজাও। সেকেন্দ্রায় সম্রাট আকবরের সমাধির একটি উঁচু চূড়া থেকে পড়ে গিয়ে তিনি মারা গিয়েছেন। আগ্রার এই পুরাতন রমণীয় স্থাপত্যকীর্তিটি তিনি নিজ ব্যয়ে সংস্কার করছিলেন—তদারকির সময়ে একদিন পা পিছলে যায়—তার মানে কয়েক শত ফুট নীচে একেবারে। প্রত্নকীর্তির প্রতি অত্যুৎসাহের জন্য এইভাবেই আমাদের মাঝে-মাঝে দুঃখ পেতে হয়। মেরী, সাবধান, তোমার ভারতীয় প্রত্নুনিদর্শনটির জন্য বেশি উৎসাহী হয়ো না যেন।”

এই চিঠি ১৯০১-এর ৫ জুলাই তারিখে লেখা। মেরীর ‘ভারতীয় প্রত্নুনিদর্শন’ সহাস্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করবার জন্য আর মাত্র এক বছর সশরীরে পৃথিবীতে থাকবেন।

## 'জো বলে—কি মজা ! কি মজা !'

স্বামীজীর থেকে কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড নিজের বয়স গণনা করতেন স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের দিন থেকে। পূর্বে তিনি ছিলেন বিশিষ্ট, পরে হয়ে গেলেন চিরন্তনী।

স্বামীজীকে দর্শনের আগে মিস ম্যাকলাউড বিশিষ্ট ছিলেন নিঃসন্দেহে। অত্যন্ত সজীব গতিশীল এক পরিবারের কন্যা তিনি, যে-পরিবারের চারিত্রধর্ম 'ম্যাকলাউড-স্পিরিট' নামে চিহ্নিত ছিল : "যে-কোনো অবস্থাতেই স্ফূর্তির মেজাজ বজায় রাখা, যা আসে তাকে অম্লানভাবে গ্রহণ করা, নবাগত অপছন্দের ঘটনাগুলিকে পরবর্তী উল্লাসের উপাদানে রূপান্তরিত করা, এবং সমাদরের মনোভাব সর্বদা রক্ষা করা"—জোসেফিনের মধ্যে তারই চূড়ান্ত প্রকাশ। তরুণী মেয়েটি দিদির সঙ্গে ঘুরেছেন ইউরোপে, মোপাসাঁ-জোলা-অপেরা-হাসি-স্ফূর্তির প্যারিসে, ঝলমল করেছেন তিনি, ছড়িয়ে দিয়েছেন আলোকচূর্ণ, চারিদিকে গুঞ্জন তুলে জুটেছে লুব্ধ যুবকেরা—তাদের মধ্যে বরণীয় কে হতে পারে ?—ঐ বেলজিয়ান ছোকরাটি, গুয়াতেমালায় বাস কববে বলে যে স্থির করেছে, ওকে পছন্দ ? কদাপি নয়, অমন হিসেবী কেজো মানুষকে পছন্দ করা যায় কখনো ?—নাকি ঐ সুদর্শন ইংরেজ ভদ্রলোকটি, ঘোড়ার গাড়িতে যাবার সময়ে খুবই রোমান্টিকভাবে 'প্রস্তাব' করে বসেছিলেন, চেহারাটাও রোমান্টিক! —দূর দূব, কোনো ভবিষ্যৎ নেই লোকটির ; কিংবা ফরাসী যুবকটি, কালচারের চর্চা করছে ?—ছোঃ, কালচার! অত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি যার তার আবার কালচার! তাহলে ? না না, তোমরা অত ভয় পেয়ো না, তোমাদের জোসেফিন পছন্দের মানুষ পেয়ে গেছে—ঐ যে সরকারী কর্মচারীটি, মর্যদাসম্পন্ন, বুদ্ধিমান, দায়িত্বশীল, ভবিষ্যৎ আছে, ওর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা যায়—হাঁ, আমি মনস্থির করে ফেলেছি, আমি এনগেজড্।

জোসেফিন এনগেজমেন্ট ভেঙ্গে দিলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বাপ্‌রে, বেঁচে গেছি। ঐ লোকের সঙ্গে জীবন কাটাবো ? এনগেজমেন্ট হতে না হতেই যার অতখানি খবরদারি, কেবল চোখে-চোখে রাখার চেষ্টা, অত ঈর্ষা, অধিকার-প্রবণতা—

'না না, জোসিকে তোমরা বাঁধতে পারবে না—জোসিকে তোমরা ধরতে পারবে না—কদাপি নয়। ঈশ্বর করেছেন, আমি ধরা পড়িনি।'

সুতরাং জো ঘুরতে লাগলেন, ছুটতে লাগলেন—ধাও ধাও—সেই তোমার নিয়তি —না। জো অকস্মাৎ থেমে পড়েছেন—সামনে বিবেকানন্দ। 'অগ্নিশিখার মতো রেশমী পোষাকে আবৃত দেহ, অসাধারণ মহিমার আকার, প্রাণ-মন-হৃদয়কে ক্রীতদাস

করে রাখে, হলে আগুনের পাশে বসে আছেন, সঘন কৃষ্ণ গভীর আর্দ্র নয়ন ধীরে সরে যাচ্ছে এক থেকে অন্যের উপর দিয়ে; উদ্যানে পায়চারি করছেন, প্রত্যেক পদ-ক্ষেপে যেন প্রত্যাখ্যান করছেন পৃথিবীকে, যে পদপাতের কথা কবিরা বলেছেন তাঁদের কাব্যে।' 'স্বর্ণোজ্জ্বল দিবস, কোমল ভারাতুর রাত্রি, তারকাখচিত আকাশের নীচে শিশিরভেজা ঘাসের উপর দিয়ে খালিপায়ে পথ চলা, আর ঈশ্বরের কথা, মানবাত্মার কথা; তারপরে হলঘরে সে-রাত্রির মতো শেষ সমাবেশ, তখন দরজাগুলি খোলা আছে গ্রীষ্ম-রাত্রিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে, কণ্ঠ থেকে উৎসারিত ধ্বনিতরঙ্গ ঝিঁঝির সুরের সঙ্গে মিশে অখণ্ড-প্রবাহিত, কোনো প্রশ্নে প্রতিবাদে যাকে বিচলিত করতে কেউ সাহস করে না, তারপর নিঃশব্দে একে-একে সকলে প্রস্থান করে—'

জো থেমে পড়েছিলেন। তারপর আবার চলতে আরম্ভ করেছিলেন, কারণ বিবেকানন্দ তাঁকে দিয়েছিলেন 'মুক্তি'—যেমন তিনি নিবেদিতাকে দিয়েছিলেন 'ত্যাগ'—মিসেস সেভিয়ারকে 'অদ্বৈত।' জো এখনো চলিষ্ণু কিন্তু পরিবর্তিত আকারে, মন্দাকিনীতে তিনি অবগাহন করে নিয়েছেন। তাঁর দিদি ইংলণ্ডে, ইউরোপে, লর্ড ডিউক কাউন্টদের পার্টি দিচ্ছেন, জো তাতে উপস্থিত থাকেন, এই প্রশ্ন নিয়ে, 'অমুক বা তমুক ডিউক তোমার লাঞ্চের নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করলেন কি-না, ফরাসী দূতাবাসের বলনাচে তুমি আমন্ত্রিত হলে কি-না, তোমার আয়োজিত ডিনার-নাচ সিজনের সেরা সফল নাচ-পার্টি হয়ে দাঁড়াল কি-না—তার সঙ্গে তোমার আত্মার সম্পর্ক কি?' আত্মাই আসল কথা, বিবেকানন্দই আসল কথা, ভারতবর্ষই আসল কথা, যাকে বিবেকানন্দ ভালবাসতে বলে গেছেন। সুতরাং জো ভারতের অভিমুখে এবং অভ্যন্তরে সদা ভ্রাম্যমান। 'ট্রেনই ছিল তাঁর বিশ্রামাগার; ঠিকভাবে বলতে গেলে তিনি চাকার উপরে বিশ্রাম করতেন।' 'তাঁর একটি টুপি ছিল, ট্রেনে সেটি তাঁর বালিশের কাজ করত; ছিল একটি চামড়ার কোট, যার রূপ-রঙ কবে জ্বলে গেছে; একটি চামড়ার ব্যাগে থাকত অন্ততঃ হাজার ডলার পরিমাণের অর্থ, নানা-দেশীয় মুদ্রায় ভাঙানো, কারণ বলা তো যায় না কখন বেরিয়ে পড়তে হয়। আমে-রিকায় যখন থাকেন, তখন প্রতি শুক্রবারে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে রাখেন—শনি ও রবিবারে যে ব্যাঙ্ক বন্ধ!—অথচ যদি রবিবারেই ভারতযাত্রায় বেরিয়ে পড়তে হয়!' বিবেকানন্দের মিশনের জন্য প্রস্তুত থাকাই তো জো'র মহাদায়।

বিবেকানন্দ মিস ম্যাকলাউডের কাছে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাঁর বিষয়ে অনেক কিছু বলেও জো সব-কিছু বলতে পারেননি, কারণ ঈশ্বরদূতের কথা কে কবে শেষ করতে পেরেছে! স্বামীজীও অপরপক্ষে জো-র কথা কম বলেননি। একদা এমন-কি এই ব্যাপারে খ্রীস্টীয় ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ পর্যন্ত করে বলেছিলেন: 'যীশু তাঁর সারমন্ অন দি মাউন্ট-এর মধ্যে কেন বলেন নি যে, যারা সদা আনন্দময় ও

সাহায্যকারী তারা ধন্য, কারণ তারা ইতিমধ্যেই স্বর্গ-রাজ্য লাভ করেছে। যিনি হৃদয়ে বিশ্ববেদনা বহন করেছিলেন, যাঁর কাছে সাধুর হৃদয় শিশুর মতো, তিনি নিশ্চয় ওকথা বলেছিলেন, কিন্তু হায়, লিখে রাখা হয়নি!' সদা আনন্দময়, সদা সাহায্যকারী জো-এর কথা যীশু বলেন নি, হতে পারে কখনো?—স্বামীজী ভাবলেন।

স্বামীজী আরও অগ্রসর। জো-র স্তুতিতে তিনি কালিদাসের সংশোধন পর্যন্ত করতে চাইলেন। মনিয়ের উইলিয়মসের অনুবাদ-অনুযায়ী শকুন্তলায় আছে: 'মানবজাতির সর্বজ্ঞানী স্রষ্টাপুরুষ এমন নিখুঁত এক মূর্তিগঠনের ইচ্ছা করেছিলেন, যার অতুলনীয় রূপচ্ছন্দ পূর্বে-সৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুকেও বহুদূরে অতিক্রম করে যাবে; সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর মহাশক্তি প্রয়োগ করে নিজ অনন্ত মনোলোকে সকল সুন্দর বস্তুর জ্যোতির্ময় সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন; তারপর যেন চিত্রকরের তুলিকা ধরে ঐ সকল বস্তু দিয়ে আদর্শপ্রতিমা নির্মাণ করেছিলেন।' জো, বলাই বাহুল্য, ওহেন কালিদাসীয় কল্পনামূরতি। কিন্তু কালিদাসের রচনায় একটি ঘাটতি ছিল, যার জন্য বিবেকানন্দ অসুখী হতেই পারেন—মহত্ত্ব ও পবিত্রতা সেই বস্তু। সুতরাং স্বামীজী লিখলেন, 'আমি ওর সঙ্গে যোগ করে দেব, পূর্বোক্ত বিধাতাপুরুষ একই সঙ্গে সর্ববিধ পবিত্রতা, মহত্ত্ব ও অন্য গুণাবলী সংগ্রহ করেছিলেন—এবং জো নির্মিত হয়েছিল।'

কুমারী জো-ও বিধাতার ত্রুটি সংশোধনে তৎপর ছিলেন। 'সর্বাধুনিক প্যারিস-ফ্যাশানের পোষাক' অতএব তিনি অঙ্গে ধারণ করতেন এবং সর্বক্ষণ মাধুর্য বিকিরণ করতেন। এই মাধুর্য প্রসঙ্গেই স্বামীজী জো-র বোনঝি অ্যালবার্টাকে ( পরে লেডী স্যাণ্ডউইচ ) লিখেছিলেন:

"তোমার মাসিমা জো জো-কে তাঁর মধুরতার খেসারত দিতে হয়েছে। মশা-মাছিগুলো মুহূর্তের জন্যও তাঁর কাছছাড়া হয়নি। আমাকে অবশ্য তারা শতহস্ত দূরে রেখেছিল—গোঁড়া স্যাবাটারিয়ান ক্রীশ্চান মাছি-হিসাবে তারা আমার মতো হীদেনকে স্পর্শ করতে অনিচ্ছুক। তদুপরি পার্সিতে আমি একটু বেশি রকম সঙ্গীতাদি করেছিলুম—মনে হয়, তারা তাতে ভড়কে সরে পড়েছিল।"

স্বামীজীর শিষ্যা মারী লুইয়ের কচ্ছপটিও সরে পড়েছিল—তাও কি স্বামীজীর ভয়ে? নাকি তাঁর অভীঃমন্ত্রে উৎসাহিত হয়ে? মিসেস লেগেটকে স্বামীজী মিস ম্যাকলাউডের মক্ষিকাদংশন থেকে নিরাময়ের সংবাদ দেবার পরে লিখেছিলেন:

"মারী লুই নিউইয়র্ক থেকে একটি পোষা ছোট কচ্ছপ নিয়ে এসেছিল। এখানে এসে পোষা প্রাণীটি তার স্বাভাবিক পরিবেশ পেয়ে গেল। সুতরাং অতঃপর সে নাছোড় অধ্যবসায়ের সঙ্গে গুঁড়ি মেরে অগ্রসর হয়ে চলে গেল—মারী লুইয়ের আদর ভালবাসাকে বহু বহুদূর পিছনে ফেলে। মারী লুই প্রথমে কিছুটা দুঃখিত হয়েছিল, কিন্তু আমরা এমন প্রবলভাবে স্বাধীনতার জয়গান করতে লাগলুম যে,

অবিলম্বে সে ধাতস্থ হল এবং তাকেও আমাদের স্বাধীনতা-পার্টিতে যোগদান করতে হল।”

পরিহাসটি আরও পরিষ্কার হবে যদি জানিয়ে দিই—মারী লুই স্বাধীনতা ও সাম্যের উগ্র সমর্থক ছিলেন।

নিজের মাংসাহার বা মৎস্যাহার নিয়ে স্বামীজী খুবই হাসি-ঠাট্টা করতেন, যেহেতু পাশ্চাত্ত্যদেশেও ধার্মিক মানুষদের পক্ষে ওটা অ-সাত্ত্বিক আহার। গম্ভীরভাবে লিখলেন—‘আমি এখন ভয়ানক নিরামিষাশী।’ স্বামীজী জানতেন, তাঁর এই গাম্ভীর্য কতখানি আমোদজনক। তাঁর স্বাভাবিক কথা এইপ্রকার, যা মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন—‘সমুদ্রকে ভালবেসে ফেলেছি। মৎস্যাবতার আমার উপরে চড়ে আছেন—তিনি আমার মধ্যেই আছেন—নিতান্ত আছেন, নির্ঘাত আছেন—আমি আমি যে বাঙালী।’

তামাশা অবিরত। মিস ম্যাকলাউড মিঃ লেগেটের শ্যালিকা। মিঃ লেগেট প্রৌঢ়বয়সে মিস ম্যাকলাউডের দিদিকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি ঘোরতর ব্যবসায়ী, রসচর্চার মেজাজ একেবারে ছিল না। তবু, জো শ্যালিকা বলে কথা, কেবল ভারতীয় নয়, আন্তর্জাতিক মতেও ওটা বিশেষ রসের সম্পর্ক। স্বামীজী সুতরাং খোঁচা দিয়ে লিখলেন—

“মিঃ লেগেট বলেন—‘জো যা করতে বলে আমি সর্বদাই তা করি। উক্ত মহাশয়ের অন্তর্গহনে এতখানি গোপন কবিতার আস্তানা দেখে আমি খুবই আনন্দিত।”

মিসেস লেগেটের প্রথম পক্ষের পুত্র হলিস্টার, স্বামীজীর গলফ্‌ খেলার প্রসঙ্গে যার উল্লেখ আগে করেছি, খুবই আমুদে আর বেপরোয়া। স্বামীজীকে সে খুবই ভালবাসত। স্বামীজী রিজলি ম্যানরে থাকাকালে সে বারবার তাঁর কাছে ছুটে আসত, স্বামীজীর মুখে ধর্ম ঈশ্বর ইত্যাদির কথা খানিক শুনত, তারপর বাইরে ছুটে যেত অধিকতর মনোহারী খেলাধূলা ও হৈ-চৈ-এর টানে। হলিস্টার স্বামীজীর কথার প্রতিবাদ করতেও ছাড়ত না। বৈরাগ্যবাণীতে তার দারুণ আপত্তি।

হলিস্টার। না স্বামীজী, আমি সন্ন্যাসী হতে চাই না। আমি বিয়ে করব, আমার অনেক ছেলেপুলে হবে।

স্বামীজীর চোখে ঝিলিক খেলে গেল, মুখে অটল গাম্ভীর্য।

স্বামীজী। ঠিক আছে বৎস। তবে মনে রেখো, তুমি কঠিনতর পথকেই বাছলে।

মিস ম্যাকলাউড বিয়ে-থার জীবন ত্যাগ করেছিলেন, ধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহই অবশ্য তার কারণ—তাঁর সে আগ্রহ অনেক সময়ে বিচিত্র কৌতূহলের রূপ ধরত আর

স্বামীজী পরমানন্দে খোঁচাতেন। হনস্-বাবা কিংবা জনৈক অগ্নিউপাসক সম্পর্কে জো-র কৌতূহল নিয়ে স্বামীজীর তামাশাকে আগে দেখেছি, এখন আমেরিকা ও ভারতবর্ষে নানা আজগবি-ধর্মের বাজার সম্বন্ধে তাঁর সরস বিদ্রূপ দেখা যাক। মিস ম্যাকলাউডকে স্বামীজী লিখছেন:

"শুনলাম আধ-জাহাজ বোঝাই হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, বহুবিধ ভ্রাতৃসংঘ এবং কী-নয়-গণ আমেরিকায় হাজির হয়েছে; অপরদিকে এক পুরো জাহাজ-বোঝাই 'মহাত্মা'-সন্ধানী ও খ্রীস্টতত্ত্ব-প্রচারক ইত্যাদি ভারতে ঢুকে পড়েছে। ভারত ও আমেরিকা—এই দুই দেশ ধর্ম-লগ্নীর উর্বর ক্ষেত্র। সাবধান, জো, সাবধান! দূষিত হীদেন-সংস্পর্শ মারাত্মক। আজ রাস্তায় মাদাম স্টার্লিং-এর সঙ্গে দেখা। তিনি আর আমার বক্তৃতায় আসেন না—তাঁর পক্ষে অতীব মঙ্গল। দর্শনের বাড়াবাড়ি ভাল নয়'। সেই মহিলাটিকে তোমার মনে আছে তো যিনি প্রতিটি বক্তৃতায় এমন দেরীতে আসতেন যাতে একটি কথাও তাঁকে শুনতে না হয়—কিন্তু বক্তৃতা শেষ হওয়া মাত্র আমাকে গেঁথে ফেলে বকাতে শুরু করতেন, এক নাগাড়ে তা চলত, যতক্ষণ-না আমার পাকস্থলীতে ওয়াটার্লু-লড়াই বেধে যেত।"

প্রফেটদেরও খিদে পায়! তা যে পায়, বিবেকানন্দই তার প্রমাণ। তবে অন্য মানুষের সঙ্গে প্রফেটের পার্থক্য এইখানে—প্রথমোক্তদের ক্ষেত্রে মন্দির ও পাকশালা ভিন্ন জগৎ, দ্বিতীয়দের ক্ষেত্রে সে কৃত্রিম পার্থক্য নেই। পাঠকগণ, মিস ম্যাকলাউডের নিম্নের বিবরণ থেকে সেটা বুঝে নিন:

"স্বামীজীর…অসাধারণতম বক্তৃতা, আমি যা শুনেছি, সম্ভবতঃ তা (লস্ এঞ্জেলস্-এ প্রদত্ত) 'নাজারেথের যীশু।' যীশুর শক্তি ও মহিমার অপরূপ বিস্ময়ে তিনি এমনই আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর আপাদমস্তক যেন শুভ্র জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে গিয়েছিল, আর তা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল চতুর্দিকে। এই জ্যোতির উদ্ভাস এত স্পষ্ট ছিল যে, বক্তৃতাশেষে তিনি যখন ফিরছিলেন তখন আমি তাঁর সঙ্গে কোনো কথাই বলিনি, পাছে যে বিরাট চিন্তায় তিনি তখন মগ্ন, তা বিঘ্নিত হয়। সহসা তিনি আমাকে বললেন—'বুঝতে পেরেছি, কিভাবে ওটা হয়।' আমি বললাম—'কিভাবে কী হয়?' তিনি বললেন—'মুলীগাটানি স্যুপ। কিভাবে তা বানায় বুঝতে পেরেছি। ওর মধ্যে 'বে'-পাতা দিয়ে দেয়।'"

লস্ এঞ্জেলস্-এ স্বামীজী মিসেস ব্লজেটের বাড়িতে আতিথ্য নিয়েছিলেন। এই বৃদ্ধা মহিলা চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীকে বক্তৃতা দিতে দেখেছিলেন। বক্তৃতাশেষে যখন দলে-দলে মেয়েরা টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ ডিঙিয়ে পাগলের মতো তাঁর দিকে ছুটেছিল, তখন ইনি মনে-মনে বলেছিলেন, বৎস, যদি এই আক্রমণ ঠেকাতে পারো, তা হলে জানব তুমি ভগবান।

এখন মিসেস ব্লজেট উক্ত ভগবানকে অতিথিরূপে পেয়েছেন। এই ভগবানকে অবিরত বক্তৃতা করতে হয়, কথা বলতে হয়, ব্যস্ত থাকতে থাকতে হয়, পরিশ্রমের শেষ নেই—মিসেস ব্লজেট স্থির করেছিলেন, এঁর ভোগের উত্তম ব্যবস্থা করাই আশু কর্তব্য। স্বামীজীর বক্তৃতা শোনার চেয়ে তাঁকে খাওয়ানোর আনন্দ কম নয়। স্বামীজীর পেটের প্রফুল্লতার সঙ্গে বৃদ্ধা তাঁর মনের প্রফুল্লতার চেষ্টাও করতেন—খাওয়ার টেবিলে হাল্‌কা ছাড়া উচ্চ কথা বিশেষ তুলতে দিতেন না। স্নায়ুর উপর যাঁর অবিরাম উৎপীড়ন—হাসিয়ে তাঁর মন হাল্‌কা করা দরকার। মিসেস ব্লজেট ক্ষুরধার কথায় পারদর্শিনী। তার ফলে, স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার সময়ে মনে হত, টেবিলের কাঁটাচামচ-ছুরির চকমকানিকে ম্লান করে দিচ্ছে ধারালো উজ্জ্বল কথার ঝকমকানি। মিসেস ব্লজেট পুরুষজাতির বজ্জাতির কথা সবিস্তারে বলতেন, তার উত্তরে স্বামীজী নারীজাতির অধিকতর নষ্টামীর কথা ফাঁদতেন। মধুর বিসম্বাদে রমণীয় হয়ে উঠত খাওয়ার প্রহরটি। মিস ম্যাকলাউড এইকালে উপস্থিত থেকে বাদ-প্রতিবাদে রসান দিতেন। তাঁরা দেখতেন, 'দুষ্টামীর সময়ে তিনি বালক, সঙ্গীতের সময়ে শিল্পী, জ্ঞানরাজ্যে মহাপণ্ডিত এবং জীবনদৃষ্টিতে গভীর দার্শনিক।'

স্বামীজীব সময়জ্ঞান যথেষ্ট থাকলেও মাঝে-মাঝে তিনি ব্যস্ততাকে চিরন্তনের মধ্যে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করতে চাইতেন। কেউ ট্রাম-বাস ধরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লে তাদের থামিয়ে দিয়ে তিনি বলতেন—'হে মহাশয় ( বা হে মহাশয়া ), এইটাই কি জীবনের শেষ গাড়ি ?' একবার বক্তৃতা আরম্ভের নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেছে, স্বামীজীর দেখা নেই, ব্যবস্থাপক মিঃ অ্যালান ছটফট করছেন, বেশ খানিক পরে দেখা গেল, স্বামীজী ধীর লয়ে আসছেন ; না, মিঃ অ্যালানের উৎকণ্ঠা দেখেও তিনি নির্বিকার। ও কি সর্বনাশ! রাস্তার ধারে আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন জুতো পালিশ করাতে!! মিঃ অ্যালান আর পারলেন না, যথাসম্ভব ভক্তি রেখে ঈষৎ তীব্র স্বরে তাঁকে বলতে হল—'স্বামীজী, আপনি কি জানেন না, কত দেরী হয়ে গেছে ?' সযত্নে জুতোর ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্য করতে-করতে স্বামীজী বললেন, 'মিঃ অ্যালান, আমার কখনো দেরী হয় না। পৃথিবীতে যত সময় আছে সব আমার। সমস্ত কালই আমার কাল।' মিঃ অ্যালান দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন—'হায়, শ্রোতারা যদি একই কথা ভাবত!'

শ্রোতারা অবশ্য কালসমুদ্রের নুড়ি শুনতে-শুনতে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল। সেইদিনই, মিঃ অ্যালান তাঁর বিরক্তির পুরস্কার পেয়ে গেলেন। "আমি যখন বক্তৃতার আগে তাঁর পরিচয় দিচ্ছিলাম [ মিঃ অ্যালান লিখেছেন ], তখন হঠাৎ আমি অনুভব করলাম, আমি একটি নিতান্ত বামন আর উনি আকাশজোড়া বিশাল পুরুষ। তারপর থেকে আর আমি ওঁর সঙ্গে এক প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতে পারতাম না, প্ল্যাটফর্মের

তলায় দাঁড়িয়ে পরিচয় দেবার কাজটা সেরে নিতাম।”

মিসেস ব্লজেটের অনুরূপ নানা অভিজ্ঞতা হলেও তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধি ও রসবুদ্ধিতে নিজেকে সামলে নিতেন। এমনকি তিনি স্বামীজীর মুখে প্রয়োজনীয় ভাষাও জুগিয়ে দিতেন। একদিন স্বামীজী মিসেস ব্লজেটকে দেখাচ্ছিলেন, কিভাবে পাগড়ি বাঁধতে হয়। জড়িত-বিজড়িত ঐ ভারতীয় পাগড়ি-ব্যাপারটি বোঝাতে স্বতঃই অনেক সময় লাগছিল, ওধারে বক্তৃতাসভায় যাবার সময় হয়ে গিয়েছিল, সেজন্য মিস ম্যাকলাউড বিশেষ তাড়া লাগাচ্ছিলেন। ঠেলায় পড়ে স্বামীজীকে কালচক্র একটু দ্রুত ঘোরাবার চেষ্টা করতে হচ্ছিল, তখন মিসেস ব্লজেট তাঁকে আশ্বাস দিলেন—

“স্বামীজী! আপনার তাড়াতাড়ির কিছু নেই। আপনি মোটে ব্যস্ত হবেন না। আপনি হচ্ছেন সেই ফাঁসির আসামীর মতো, যার ফাঁসি দেখতে বিরাট জনতা জুটেছে, সবাই চাইছে ঠেলাঠেলি করে সামনে এগিয়ে যেতে, সেই দেখে সে হেঁকে বলেছিল—আরে বাপু, এতো হুটোপাটি, তাড়াহুড়া করছ কেন? আমি না যাওয়া পর্যন্ত তো ওখানে দেখবার কিচ্ছুটি নেই।”

নানা রূপী বিবেকানন্দ কখনো ফাঁসির আসামী, কখনো-বা ফাঁসি যে দেয় সেই মহারাজা। মিস ম্যাকলাউডদের পরিবারে তাঁকে রাজা মহারাজা রূপেই গণ্য করা হত। পরম অভিজাত মিসেস লেগেট মনে করতেন, জার্মান সম্রাট কাইজার এবং স্বামী বিবেকানন্দ—এই দুইজনই তাঁর দেখা সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন পুরুষ। মিসেস লেগেটের পরিচারক, যার রাজা-মহারাজা ঘাঁটা খুবই অভ্যাস ছিল, সে স্বামীজীকে সর্বদা ‘রাজা মহাশয়’ বলত। স্বামীজী প্রতিবাদ করলে সে বলত, ‘আপনি নিজেকে হিন্দুসন্ন্যাসী বলতে চান বলুন, কিন্তু রাজাদের নাড়াচাড়া করা আমার অভ্যাস আছে, আমি দেখলেই চিনতে পারি।’

বিব্রত বিবেকানন্দ একবার মিসেস লেগেটের কন্যা অ্যালবার্টাকে তাঁর খাস্‌কা রাজসম্মান সম্বন্ধে লিখেছিলেন: ‘জাহাজের খাজাঞ্চি খুব সদয় হয়ে আমার একার জন্য একটা গোটা ক্যাবিন দিয়েছে। এরা মনে করে, প্রত্যেক হিন্দুই রাজা।…অবশ্য তাদের এই মোহ ভেঙে যাবে যখন তারা জানবে যে, এই রাজা কপর্দকশূন্য॥’

রাজসম্মানকে স্বামীজী যখন চেষ্টা করেও এড়াতে পারতেন না—মহামহিম শ্রীল শ্রীমন্মহারাজ কথাগুলি এমনই তাঁর সর্বাঙ্গে লেখা ছিল—তখন তিনি গা-ঝাড়া দিয়ে বলতেন—‘না হে বাপু, আমি মানুষটার মধ্যে অত-কিছু মর্যাদা নেই—ওটা রয়েছে আমার হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে।’

স্বামীজী নেই। মিস ম্যাকলাউড পিছনের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন স্বামীজীর কথাগুলি—‘জীবন-গ্রন্থের পৃষ্ঠা ওল্টাতে থাকলেই দেখবে মজা শুরু হয়ে গেল।’ এই

মজা উপভোগের নিজস্ব ক্ষমতা মিস ম্যাকলাউডের আগে থেকেই ছিল, তা বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল স্বামীজীর সঙ্গগুণে। জীবনের মৌল মজা তিনি যখন উপভোগ করতেন, তখন তাঁর সে রূপ দেখে স্বামীজী ভারি খুশি—'জো যেমন হাততালি দিয়ে বলে—কি মজা! কি মজা!'

মজা! জীবনের মজা! সত্যই!

বহু বৎসর পরে মিস ম্যাকলাউড একদিন কলকাতার গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে নদী পার হবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তখনো পুরনো পৃথিবী মুছে যায়নি গঙ্গাতীর থেকে। নৌকা, মাঝি, স্নানার্থী, পূজার্থী, সাধু-সন্ন্যাসী। তারই মধ্যে এক ধ্যান-মগ্ন সাধু, রক্তগৈরিকে আবৃত, একেবারে সমাহিত, অসাধারণ সৌষ্ঠব আর পবিত্র সৌন্দর্য, যেন দান্তের জগতের একটি মানুষ!

মিস ম্যাকলাউড তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ চমকে ভাবলেন—আমি কে! আমি কোথায়!

"কী সুন্দর কাব্যিক এই প্রতীক্ষার অর্ধঘণ্টা। প্রদোষে আচ্ছন্ন, ইতস্ততঃ গতিশীল নৌকার লণ্ঠনের চকিত আলোকে রেখাঙ্কিত। এখানে কেউ আমাকে জানে না, আমিও তাদের জানি না।"

নিজের মনে মিস ম্যাকলাউড হেসে ফেরলেন:

"একটা লোক, রামকৃষ্ণ তার নাম, যাকে আমি কখনো চোখে দেখিনি, সে চুম্বকের মতো আমাকে ভারতে টেনে আনল, যেখানে থাকতে আমার এত ভাল লাগে!! কেন? কেন?"

মিস ম্যাকলাউড উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন। "বিবেকানন্দকে জানা সামান্য উত্তরা-ধিকার নয়।" "তাঁকে জানো, জেনে বাঁচো-বাঁচো। এসো, জীবনের নানা পরীক্ষা করে যাই, এসো শিখি, এসো একান্তে মিলিয়ে নিই আমাদের প্রাপ্তির হিসাব, এসো খেলি।"

"কখনো-কখনো মানুষকে ঘিরে ফেলে চিরন্তন। কেন—তার উত্তর নেই। শুধু আছে—শুধু আছি।"

মিস ম্যাকলাউড তাঁর পরম অস্তিবোধের আনন্দে হাততালি দিয়ে হেসে উঠলেন—

"কি মজা! কি মজা! কি মজা!"

## বন্ধুসঙ্গে—রসরঙ্গে

সর্বদা সর্বত্র প্রবাহিত যাঁর হাসির ধারা, তিনি যে বন্ধুসঙ্গে সর্বাধিক উচ্ছলিত, সহজেই তা ধরে নিতে পারি। সারা পৃথিবীতেই বিবেকানন্দের বন্ধু ছড়ানো ছিল, কিন্তু তাঁর প্রাণের বন্ধুরা সাধারণতঃ থাকতেন কলকাতা শহরে—যাঁরা তাঁর ধর্মবন্ধু বা গুরুভাই। ধর্মের জন্য বিবেকানন্দ ঘর ছেড়েছিলেন—একই উৎসের আকর্ষণে তেমন কাজ আরও যাঁরা করেছেন, বিবেকানন্দ স্বতঃই তাঁদের হাত ধরে বুকে টেনে নিয়েছিলেন।

গুরুভাইদের প্রতি বিবেকানন্দের অতুলনীয় ভালবাসা। উল্টোপক্ষে বিবেকানন্দের প্রতি গুরুভাইদের ভালবাসার পরিচয় দিতে একই শব্দ ব্যবহার করতে হবে। লৌকিক দৃষ্টিতে এক-এক সময়ে মনে হয়, স্বামীজীর প্রতি তাঁর সন্ন্যাসী-গুরুভাইদের ভালবাসা, ব্যাকরণ লঙ্ঘন করে, 'অতুলনীয়তর'। তারই স্বীকৃতিতে স্বামীজী একবার নিবেদিতাকে বলেছিলেন—'আজ যদি আমি মদ্যপ অসচ্চরিত্র হয়ে যাই, আমার শিষ্যরা আমাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে, কিন্তু এমন গুরুভাই আছে, যাদের কাছে আমি সেই একই নরেন থাকব। যখন এমন ভালবাসা দেখা দেয়, তখনি জন্ম নেয় নতুন ধর্ম।'

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে বরাহনগরে একটি বাড়িতে কয়েকটি গৃহত্যাগী ছোকরা-সন্ন্যাসী জুটেছিলেন—তাঁদের যৌথ তপস্যার সাক্ষী মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, "প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, এক ব্যক্তি নিজস্বভাবে কঠোর তপস্যা করিতেছে। কিন্তু একটা ভাঙ্গা-বাড়িতে থাকিয়া, অনাহার ও অনিদ্রার ভিতর এইরূপ সমষ্টিভাবে কঠোর তপস্যা করা জগতের ইতিহাসে অতি বিরল। একদিকে জগতের শক্তি পিষিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, অপরদিকে মনের শক্তি বা তপস্যার শক্তি বলিতেছে—জগতের সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জগৎকে পদানত করিব।"

অন্তরে জ্বলন্ত প্রেরণার অগ্নি, সেইসঙ্গে পরস্পরের প্রতি অপূর্ব ভালবাসা—এই ছিল তরুণ সন্ন্যাসীদের সহায় ও সম্পদ।—"গ্রন্থে আছে যে, যীশুর শিষ্যদের ভিতর পরস্পরের মধ্যে এইরূপ ভালবাসা ছিল। চৈতন্যের পারিষদদিগের মধ্যেও এইরূপ একটা প্রগাঢ় ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। এই সকল হইল গ্রন্থের কথা, চোখে দেখা যায়নি ও অনুভব করা যায়নি। কিন্তু বরাহনগর-মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আত্ম-গোষ্ঠীর ভিতর, ত্যাগী ও গৃহী উভয়ের ভিতর, এক আশ্চর্য রকমের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা দেখা গিয়াছিল। জীবন্ত ভালবাসাই ছিল বরাহনগর-মঠের প্রাণস্বরূপ।... শাস্ত্র-অধ্যয়ন, জপ-ধ্যান ও তপস্যা নিশ্চয়ই প্রশস্ত মার্গ ও উচ্চ অবস্থার বস্তু, কিন্তু এই

জীবন্ত ভালবাসা সম্ভবতঃ তপস্যারও উপর।...প্রত্যেকে যেন দেখিতেন যে, শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের শক্তি ও ভাব, অপরকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এইজন্য অপরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি দেখানো ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধাভক্তি করা একই জিনিস।...এই ভাবটি প্রবল থাকায় শারীরিক এত কষ্ট, এমন-কি লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও সকলে একত্রিত হইতে পারিয়াছিলেন। শরৎ-মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন, 'কিছুই তো হল না। কী-ই বা করলুম, কী-ই বা পেলুম। ভিক্ষে করে খাওয়া, পথে-পথে ঘোরা, মেঝেতে, রাস্তা-ঘাটে পড়ে থাকা—এই তো দেখছি ফল। কিছু পাব কিনা তাও তো বুঝতে পারছি না। সব অন্ধকার। তবে পরস্পরে একটা বড় ভালবাসা, সেইজন্য পড়ে থাকি।' "

সাধক-মাত্রের জীবনে আধ্যাত্মিক আনন্দের মতো আধ্যাত্মিক বিষাদের পর্যায় থাকে। সত্যকার সাধকের ক্ষেত্রে এই বিষাদ হল আনন্দের নিশা বিশ্রাম। এই বিষাদ-প্রহরে জাগ্রত থাকে প্রেম-প্রদীপ। সেই প্রেমজ্যোতির স্মরণে কী ব্যাকুলতা জাগত রামকৃষ্ণ-শিষ্যদের হৃদয়ে, তার এক দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন আমার কাছে বিখ্যাত বিপ্লবী-নেতা হরিকুমার চক্রবর্তী। যুবক হরিকুমার তাঁর বন্ধু নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে ( মানবেন্দ্রনাথ রায় ) সঙ্গে নিয়ে বেলুড়মঠে গিয়েছেন। সেখানে প্রেমানন্দ-স্বামী দুহাত বাড়িয়ে তাঁদের গ্রহণ করলেন। এঁরা তাঁর কাছে স্বামীজীর ভালবাসার কথা জানতে চাইলেন। 'স্বামীজীর ভালবাসা!'—কথা দুটি বলেই ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন প্রেমানন্দ। হরিকুমার আমাকে বলেছিলেন, 'সে এক পরম অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে। একজনের ভালবাসার কথা বহু বৎসর পরে স্মরণ করে অন্য একজন এমন করে ঝরঝরিয়ে কাঁদতে পারে!'

বিরহের এই কান্না। মিলনের দিনে তাহলে কত না হাসি ছিল। সকলেরই সর্বাঙ্গে হাসির কিরণ, কারণ রামকৃষ্ণ-সূর্য যে আনন্দে জ্যোতির্ময়। লাটু-মহারাজ এক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দকে তো দেখেছ? কি দেখেছ?' ভক্ত বললেন, 'তিনি আনন্দময় পুরুষ ছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে, দর্শন করে, তাঁর কথা শুনে, অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ পেয়েছি।' ভক্তের কথা শুনে লাটু-মহারাজের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, বললেন, 'খুব আনন্দময় পুরুষ ছিলেন, না? ঠাকুরকে মনে কর—ওর একশ-গুণ বেশি আনন্দময় পুরুষ। সে আনন্দের তুলনা নেই।' এই কথা বলেই লাটু-মহারাজ ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন—নিশ্চয় প্রস্থান করলেন স্মরণের আনন্দলোকে।

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি—শ্রীরামকৃষ্ণের অফুরন্ত হাসির কথা বলে শেষ করা সম্ভব নয়। এখানে বিশেষ করে কাশীপুর বাগানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থানের কথাই মনে পড়ছে—কারণ বরাহনগর-মঠ ও আলমবাজার-মঠের ঠিক আগে আছে

'কাশীপুর-মঠ।' কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসান হয় চরম যন্ত্রণাদায়ক ক্যানসার ব্যাধিতে। তবু হাসি—অপূর্ব হাসি—তাঁর রক্ত-বমনের ওষ্ঠেও। ও-বস্তু পৃথিবীতে রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রেই সম্ভব।

তারকনাথ ঘোষাল ( পরবর্তীকালে স্বামী শিবানন্দ ) অত্যন্ত আমুদে ছিলেন—অপরকে নকল করে হাসাতে বিশেষ পটু। অত হাসি-ঠাট্টা লাটু-মহারাজের ভাল লাগত না। তিনি অভিযোগ করে বলতেন, তোমরা এসব করবার জন্য কি বাড়ি-ঘর ছেড়ে এসেছে ?' লাটু-মহারাজ পরে বলেছেন, "হামার কথা শুনে রাখাল-ভাই বলত, 'ওরে, আমরা আর কি করছি ? উনি ( ঠাকুর ) যে আমাদের চেয়ে আমুদে ছিলেন। এক-একদিন এমন হাসাতেন যে, আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম হত ; আমি তাঁর পায়ে ধরে অনুবোধ করতুম, একটু থামুন, হাসতে-হাসতে আমার পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি সব ছিঁড়ে গেল যে। এক একদিন তো হাসতে-হাসতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ত।' রাখাল-ভায়ের কথা শুনে আমারও সেইসব কথা মনে পড়ত।"

লাটু-মহারাজের স্বতঃই সেসব কথা মনে পড়তে পারে। কাশীপুরের পরিবেশ, মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিতে এইরকম :

"নীচেকার হলঘরটিতে অনেকে বসিয়াছিলেন। সকাল হইয়াছে, রৌদ্র উঠিয়াছে গঙ্গাধর-মহারাজ, বর্তমান লেখককে পুকুরের পাড দেখাইয়া মুখ ধোয়াইয়া আনিলেন। হুটকো গোপাল তখন গেরুয়া কাপড পরিয়াছিল ; সে একটা বড় কেটলি করিয়া সকলের জন্য চা তৈয়ারি করিয়া আনিল এবং শশী-মহারাজ বরাহ-নগরের ফাগুর দোকান হইতে লুচি, গুটকে কচুরি, আলুছেঁচকি ও কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া আনিলেন। সকলে কিছু-কিছু খাইয়া কলিকাতার দিকে আসিবার উপক্রম করিলেন। ঘরটার ভিতরের হাওয়াটা গম্‌গম্‌ করিতেছিল। সকলেই যেন আনন্দিত ও উৎসাহিত। একটা জীবন্ত বায়ুতে যেন ঘরটি পরিপূর্ণ। প্রত্যেকই যেন দেবভাবে পূর্ণ। লাটুমহারাজ মেঝেতে একধারে বসিয়া মাঝে-মাঝে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে-ছিলেন এবং মাঝে-মাঝে তর্কবিতর্ক করিতেছিলেন। কথাটা হইতেছিল—কৌপীন-বন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।"

তর্কবিতর্কে, হাস্যপরিহাসে অবশ্য নরেন্দ্রই অগ্রণী। সর্বদাই তিনি বিজয়ী। কিন্তু বরাহনগর-মঠে একদিন এমন হল যে, কালী-বেদান্তী ( অভেদানন্দ ) তাঁকে তর্কে কোণঠাসা করে ফেললেন। সেদিনকার মতো তর্ক থামিয়ে নরেন্দ্রনাথ আবার পরদিন শুরু করে কালী-বেদান্তীকে ধরাশায়ী করে দিলেন। তাতে কালী-বেদান্তীর ছদ্ম দুঃখ—নরেনকে একদিনও হারাতে পারলুম না। পারা সম্ভব নয়, কারণ, "লোরেন-ভাই আমাদের লিডর"—লাটু বলেছেন। "একদিন লোরেন-ভাই দুপুরে আমাকে খুব ফায়ার করছে। তাই শুনে হামনে বললুম—'হাঁ ভাই লোরেন। তুমি

এমন ক'রে ফায়ার করতে শিখলে কেমন করে?' তখন লোরেন-ভাই বলে গেল, 'আরে আমি কি ফায়ার করতে জানি? উনি জানতেন। দ্যাখ না, এতগুলো ছেলেকে উনি এমন ফায়ার করে গেলেন যে, ঘরবাড়ি, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে, ভাল খাওয়া-পরা ছেড়ে, একেবারে বাউণ্ডুলে হয়ে পড়ল।"

শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দের ফায়ারের একটা বিবরণ বাবা প্রেমানন্দ ভারতীর কথায় পাওয়া যায়। তখন তিনি সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গিরিশ ঘোষের বন্ধু—সেই সময়কার ঘটনা বলেছেন :

"একদিন স্টার থিয়েটারে বসে অভিনয় দেখছি। অভিনয় শেষ হল। আমি, গিরিশ ঘোষ ও কৃষ্ণধন দত্ত তিনজনে মদ খেয়েছি। খেয়ে খেয়াল উঠল যে, দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস-মশাইকে দেখতে যাব। একটা গাড়ি ভাড়া করা গেল। রাত্রি দেড়টা-দুইটার সময় তিনজনে বেরুলুম এবং যথাসময়ে কালীবাড়ির ফটকের কাছে এলুম। ফটক বন্ধ, অর্ধেক রাত্রিরও বেশি হয়ে গেছে। দারোয়ানকে এক টাকা বকশিশ দেওয়াতে সে ফটকটা খুলে দিলে। আমরা তো তিনজনে ঢুকেই পরমহংস-মশায়ের ঘরের দরজায় চাপড় আর কিল মারতে শুরু করে দিলুম, আর মাঝে মাঝেই দানাই-চীৎকার করতে লাগলুম। পরমহংস-মশাই জেগে ছিলেন। তাড়াতাড়ি দোরটা খুলে দিলেন। আমরা তিনজনে ঢুকে পরমহংস-মশাইকে মাঝে ক'রে দানাই-নাচ শুরু করে দিলুম। কৃষ্ণধন শালা বেরসিক, মদ খেয়ে গান ধরলে, 'রাধে গোবিন্দ বলো।' মাতাল জাতের বদনাম ক'রে দিলে। এ-রকম নৃত্যকীর্তন ক'রে ভোর বেলাতে চলে এলুম। কৃষ্ণধন বললে, 'দ্যাখ, দক্ষিণেশ্বরের ঐ লোকটা—ওর মতো প্রাণের ইয়ার আর দেখিনি, ও খুব উঁচুদরের ইয়ার।"

ঘটনাটা দক্ষিণেশ্বরের। এই রকম ঘটনা আরও অনেকবার ঘটেছে গিরিশকে নিয়ে। এখানে একদিনের শ্রীরামকৃষ্ণকে পথে দেখা যাক।—

"পরমহংস-মশাই কলিকাতা হইতে একটি গাড়ি করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছিলেন, সঙ্গে তারকদাদা ও নিরঞ্জন-মহারাজ। গাড়িটা যখন কাশীপুরের শুঁড়িখানার দিকে আসিয়াছে, তখন পরমহংস-মশাই দেখিলেন, শুঁড়ির দোকানে জনকতক লোক মদ খাইয়া আনন্দ করিতেছে। দেখিবামাত্র পরমহংস-মশাই একেবারে সমাধিস্থ। একটা পা গাড়ি হইতে বাহির করিয়া পা-দানেতে দিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন—তারকদা ও নিরঞ্জন-মহারাজ তাঁহাকে হঠাৎ এইরূপে দেখিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। পরমহংস-মশাই সমাধিস্থ হবার আগে বারকতক মুখে বলেছিলেন—'আনন্দ করো। আনন্দ করো—আনন্দময়ী। আনন্দ করো।'

অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রথমদিন দক্ষিণেশ্বর গিয়ে দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কেশব সেনের জন্য বড় ব্যস্ত। কেবলই বলতে থাকেন, 'দ্যাখো দিকি, কেশব আসছে কিনা।"

"একজন একটু এগিয়ে ফিরে এসে বললেন, 'না।' আবার একটু শব্দ হতে বললেন, 'দ্যাখ, আবার দ্যাখ।' এবারও একজন দেখে এসে বললেন, 'না।' অমনি পরমহংসদেব হাসতে-হাসতে বললেন, 'পাতের উপর পড়ে পাত, রাই বলে— ঐ এল বুঝি প্রাণনাথ!' হাঁ, দ্যাখ, কেশবের চিরকালই কি এই রীতি? আসে আসে আসে না!"

অশ্বিনীকুমার তাঁর স্মৃতিকথায় আরও অনেক কথা বলেছেন। তাঁর শেষ সাক্ষাতের স্মৃতির অংশ—

"সমাধি ভঙ্গ হল। পায়চারি করতে লাগলেন। ধুতি যা পরা ছিল, তা দুই হাত দিয়ে টানতে-টানতে একেবারে কোমরের উপর তুলেছেন, এদিক দিয়ে খানিকটে মেঝে ঝেঁটিয়ে যাচ্ছে, ওদিক দিয়ে খানিকটে অমনি পড়েছে। আমি আর আমার সঙ্গী গা-টেপাটেপি করছি, আর চুপি-চুপি বলছি, 'ধুতিটা পরা হয়েছে ভাল।' একটু পরেই 'দূর শালার ধুতি' বলে ধুতিটা ফেলে দিলেন। দিয়ে দিগম্বর হয়ে পায়চারি করতে লাগলেন।...কিছুকাল পরে ঐভাবেই খাটের উত্তরপাশে পশ্চিম-মুখো হয়ে বসে পড়লেন। বসেই আমার জিজ্ঞাসা—'ওগো, আমায় কি অসভ্য মনে করছ?' আমি বললাম, 'না, আপনি খুব সভ্য। আবার এ জিজ্ঞাসা করছেন কেন?' ঠাকুর—'আরে, শিবনাথ-টিবনাথ অসভ্য মনে করে। ওরা এলে কোনরকমে একটা ধুতি-টুতি জড়িয়ে বসতে হয়'।"

পরম অসভ্য লোকটির দিব্যানন্দ-সঙ্গের কিছু পরিচয় দেবার পরে বাংলাদেশের সভ্যসমাজের প্রথম সারির মানুষ অশ্বিনীকুমার লিখেছেন :

"ঠাকুরের সঙ্গে মাত্র চার-পাঁচ দিনের দেখা। কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই এমন মনে হয়েছিল যে, তাঁকে মনে হত যেন এক ক্লাসে পড়েছি, কেমন বেয়াদবের মতো কথা বলেছি। সম্মুখ থেকে সরে এলেই মনে হত, ওরে বাপ্‌রে! কার কাছে গেছলাম! ঐ ক'দিনেই যা দেখেছি ও পেয়েছি, তাতে জীবন মধুময় ক'রে রেখেছে। সেই দিব্যামৃতবর্ষী হাসিটুকু, যতনে পেটরায় পুরে রেখে দিয়েছি। সে যে নিঃসম্বলের অফুরন্ত সম্বল গো।"

'অফুরন্ত সম্বল নিয়ে যাঁরা পথে নেমেছিলেন, তাঁদের একজন হরিনাথ (তুরীয়ানন্দ), কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের স্মৃতিকথা বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছেন?' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'বড় কষ্ট হচ্ছে, খেতে পারছি না, অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা।' শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ কাটিয়ে হরিনাথ অন্তরে বুঝলেন —'ঠাকুর আনন্দের সাগর, রোগ-যন্ত্রণার অতীত।' শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু আবার রোগ-যন্ত্রণার কথা তুললেন। হরিনাথ তাতে বললেন, 'আপনি যাই বলুন না কেন, আমি দেখছি আপনি অসীম আনন্দের সমুদ্র।' শ্রীরামকৃষ্ণ তখন মৃদুহাস্যে স্বগত বললেন,

'শালা ধরে ফেলেছে রে।'

বরাহনগর মঠ—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের সঙ্গে অপরিচিতদের জানানো যায়—একটি ভাঙা দোতালা বাড়ি, যাকে 'ভাঙা' বললে যথেষ্ট বলা হবে না—বস্তুতঃ তার তখন মৃত্যুদশা। এমন অবস্থা যে, চলা-ফেরা করলে সেটি থরথর করত! কালীকৃষ্ণের ( পরে স্বামী বিরজানন্দ ) ঘুমোবার আগে জোরে মাথা নাড়ানোর অভ্যাস ছিল। তার চোটে একবার বাড়ি এমন টলমল করে উঠল যে, সবাই ভূমিকম্প ভেবে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠেছিলেন।

বাড়ির এমন অবস্থা বলে ভাড়া ছিল খুব কম, আরো কম এইজন্য যে, ভূতের বাড়ি বলে দুর্নামও ছিল। এই দুর্নামের সুযোগে নামমাত্র ভাড়ায় বাড়িটিতে যাঁরা আস্তানা গাড়লেন, আশপাশের অনেকেই তাঁদের জ্যান্ত ভূতের বেশি কিছু মনে করতে রাজি ছিল না। "সাধারণ লোকের ভিতর কথা উঠিল, নরেনটা পাগল হয়ে গেছে, মাথাটা বিগড়ে গেছে, কি বকে তার মাথামুণ্ডু নেই, আবার বলে বেদান্ত।... কাজকর্ম করবার নাম নেই, এর বাড়ি ওর বাড়ি পেট ঠেসে আসে; কাজের মধ্যে কতকগুলো ছোঁড়াকে বকিয়েছে। সেগুলোকে নিয়ে একটি কর্মনাশার দল করেছে।"

শেষের কথাটা আবার কালী-বেদান্তীর বড় পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। কোনও নতুন লোক দেখা করতে এলে বলতেন, 'এ বাবা কর্মনাশার দল; এখানে এসো না, এখানে এলে হাতে খোলা, মালা।' 'কর্মনাশার দল' কথাটার মধ্যে গূঢ় অর্থ পেয়েছিলেন কালী-বেদান্তী; যারা কর্মপাশ ছেদন করতে বদ্ধপরিকর—এ তাদেরই দল। কথাটা তাঁর এত পছন্দ ছিল যে, ওটা বলেই তিনি খুশীতে হাসতেন।

হাসতেন কর্মনাশা-দলের পাণ্ডা নরেন্দ্রনাথ। তাঁর ও তাঁর বন্ধুদের চেহারা দাঁড়িয়েছে: "পায়ে জুতা নেই। শুধু পায়ে চলে-চলে পা-গুলো সব ফেটে গেছে। শরীর কৃশ, গায়ে ধূলা-কাদা লাগা। ডুব দিয়ে স্নান করেন, কিন্তু গা না-ঘষার জন্য গায়ে ময়লা ছ্যাবড়া-ছ্যাবড়া। নরেন্দ্রনাথের কোঁচার কাপড়টি গায়ে দেওয়া এবং শরৎ-মহারাজ ও যোগেন-মহারাজ গেরুয়া পরা। নরেন্দ্রনাথের মাথার চুল ঝাঁকড়া, ছাইভস্ম লাগানো বলে কটাপানা। নরেন্দ্রনাথ বর্তমান লেখককে ( মহেন্দ্রনাথ ) বললেন, ঠিকুজিখানা থাকে তো নিয়ে এসো। ঠিকুজিখানা এনে দিলে তা নিয়ে নরেন্দ্রনাথ পড়তে লাগলেন। পড়তে-পড়তে বলে উঠলেন, 'ওরে যোগে, দ্যাখ, কি লিখেছে! তাম্রবর্ণ কেশ হবে, ভস্মাচ্ছাদিত দেহ হবে, নিরাশ্রয়, দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করবে ও উন্মাদ হবে।' তারপর আবার পড়তে আরম্ভ করে বললেন, 'দেখি দেখি, পরে কি লিখেছে? ওরে—পরে যে ভাল লিখেছে রে! দ্যাখ শালা, ঠিকুজি হুবহু মিলছে—চুলগুলো তামাটে হয়ে গেছে, গায়ে সব ছাইভস্ম ময়লা, ঠিক পাগলই

হয়েছি, পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর এ-বাড়ি ও-বাড়ি খেয়ে বেড়াচ্ছি! যাঃ শালা, যা হবার হোক্‌গে। মরণের তো ভারি ভয়-ডর রাখি।' যোগেন-মহারাজ বললেন, 'ঠিক তো, সব মিলে গেছে। তবে পরের খবরটা মেলে কিনা যাচাই করে দেখতে হবে।' খানিকক্ষণ এইরকম হাসি-তামাসা করে সকলে চলে গেলেন।"

এমন অবস্থা যখন চলেছে—তখন তরুণ সন্ন্যাসীরা স্বতঃই বাইরের সঙ্গ বিশেষ চাইতেন না—নিজেদের মধ্যেই বুঁদ হয়ে থাকতেন। বিশেষতঃ মহিলাদের আগমন নিতান্তই অপছন্দের বস্তু। মোটেই প্রগতিপরায়ণ ব্যাপার নয়। অবলাবান্ধবেরা কাতর হবেন এই জেনে যে, মহিলা-সমাগম দেখলেই এঁরা পরস্পরকে সতর্ক করে দিতেন বিচিত্র ইংরাজীতে—'দি মাগীজ্‌ আর কামিং।' কথাটা মোটামুটি বোধগম্য। সুতরাং 'মাগীজ্‌' শব্দ বদলে 'মগীজ্‌' করা হল। এখন মগ্‌-রা থাকে ব্রহ্মদেশে বা বার্মায়। শেষপর্যন্ত তাই সাংকেতিক নির্দেশ দাঁড়াল—'দি বার্মীজ্‌ আর কামিং।'

নারীজাতির অপমানে বিচলিত শিভালরাস্‌ ব্যক্তিদের কিছু আশ্বস্ত করে বলা যায়—'নারী নরকের দ্বার'—এই মধ্যযুগীয় ধারণাতে এঁরা নারী থেকে সরে থাকতেন, তা নয়, এঁরা উপায়ান্তরহীন—দারিদ্র্য ও বৈরাগ্যের জন্য তখন এঁদের পরনে প্রায় জন্মদিনের পোশাক। সকলের জন্য কেবল একটি মিটিংকা কাপড়া ছিল, বহিরাগত কেউ এলে উদ্দিস্ট ব্যক্তি সেই সর্বজনীন বস্ত্রে অঙ্গ ঢেকে দর্শন দিতেন। এঁদের অবস্থাটা ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায় চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছিলেন। শীতকালে প্রায় না-বস্ত্রে এঁরা দরজা জানালা সম্পূর্ণ বন্ধ ক'রে জপ-ধ্যান করছেন—মতি-ডাক্তার ঘরে ঢুকে অবস্থা দেখে বলেছিলেন—'লেপ-কাঁথা গায়ে দেওয়া জানি, কিন্তু ঘর গায়ে দেওয়া কদাপি দেখিনি।'

কেবল ভজন, ভোজন নয়—শৌচ-ব্যবস্থাও একত্রে। সেখানেও চলত ধর্মপ্রসঙ্গ বা হাস্যপরিহাস। নরেন্দ্রনাথ এই আসরের যে নাম দিয়েছিলেন—তাতে শব্দশ্লেষ ছিল—Privy Council.

নারীদের থেকে তরুণ সন্ন্যাসীরা দূরে থাকতে চাইলেও ঐ বিষয়েই তাঁরা পল্লীর সন্দেহস্থল হয়ে উঠেছিলেন।

একদিন হঠাৎ মঠবাড়ির ভিতর থেকে বামাকণ্ঠের সঙ্গীত শোনা গেল। পল্লী-স্বাস্থ্যরক্ষীরা ভণ্ড সন্ন্যাসীদের সাজা দেবার জন্য পাঁচিল টপকে সঙ্গীতসভায় হাজির! কিন্তু বেচারারা অবিলম্বে লজ্জায় অধোবদন। দেখেন—গান গাইছেন এক জোয়ান সন্ন্যাসী—গলার স্বর কিন্তু একেবারে মেয়েলী। উক্ত সন্ন্যাসী আর কেউ নন—শরৎ-মহারাজ—পরবর্তীকালের বিখ্যাত স্বামী সারদানন্দ।

নারী-সংস্রব সম্বন্ধে অত্যধিক সতর্ক স্বামী যোগানন্দ ক্যাসাদেও পড়তেন এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি। দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরীবংশের সন্তান তিনি। কিন্তু

এখন সন্ন্যাসী, অর্থাৎ ভিখারী, তাই ভিক্ষা করতে বেরুতে হয়েছে। একদিনের ভিজ্ঞতার কথা সকৌতুকে তিনি প্রায়ই বর্ণনা করতেন :

"আলমবাজারের একটা খোড়ো বাড়িতে ভিক্ষা করতে গেলুম। সকালে একটি স্ত্রীলোক মেটে-দাওয়ার সামনে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল। গেরুয়াধারী জোয়ান ছেলে ভিক্ষে করতে এসেছে, মাথা নেড়া, শিখা নেই, কণ্ঠী নেই, কত্তাল বাজিয়ে হরিনাম করছে না—এ তো বৈরাগী বাবাজি নয়—তবে লোকটা কে? স্ত্রীলোকটি তো রেগে অগ্নিশর্মা। বললে, 'যা মিন্‌সে যা, এখানে ভিক্ষে পাবিনি। খেটে খেতে পাবিসনি? দিনের বেলায় ভিক্ষের ছল করে ঘরদোরের সন্ধান নিয়ে যাবি, আর রাত্তিরে সিঁদ কেটে চুরি করতে আসবি!' এই বলে স্ত্রীলোকটি রাগে গর্‌গর্‌ করে সামনের নারকেল গাছটার গোড়ায় সপ্‌সপ্‌ করে ঝাঁটা মারতে লাগল।"

মহেন্দ্রনাথ অতঃপর লিখেছেন : "যোগেন-মহারাজ যদিও জমিদারসন্তান এবং মহাকৌতুকপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ভিক্ষুক, হাসিবার উপায় নাই। অগত্যা স্থিরচিত্তে তথা হইতে চলিয়া আসিলেন এবং মঠে পদার্পণপূর্বক ব্যঙ্গচ্ছলে স্ত্রীলোকটির অভিনয় করিতে-করিতে বলিতে লাগিলেন, 'মাগীটার আছে কি? একখানা খোড়ো ঘর, দুখানা ছারপোকাওয়ালা ছেঁড়া কাঁথা, আর শতেক তাপ্পিমারা একটি তামার ঘটি। বলে কিনা চুরি করব!' "

যোগেন-মহারাজের আর একদিনের মজার অভিজ্ঞতা :

বরাহনগর-মঠ থেকে কিছু দূরে গঙ্গাতীরে এক অশ্বত্থমূলে বৈরাগ্যবশে তিনি বসে আছেন। চেহারা কৃশ মলিন হলেও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। বৃক্ষমূলে যুবক সন্ন্যাসীকে এ অবস্থায় বসে থাকতে দেখে পথচারী স্ত্রীলোকদের মনে স্বতঃই দয়া জাগল। তারা সন্ন্যাসীকে ঘিরে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল—'আহা, কার বাছা রে! কার ঘর অন্ধকার করে এসেছিস রে! আহা, কোনো দিন খেতে পাস, কোনো দিন পাস না, রোদ্দুরে হিমে বাইরে পড়ে থাকিস—তোর কষ্ট দেখে আমাদের বুকের ভেতর কেমন করছে রে। ওরে তোর মা যে, তোর জন্য ভাত মুখে দিতে পারছে না—বসে কাঁদছে রে!' এই বলতে-বলতে মেয়ের দল কান্নার রোল তুলল। যোগেন-মহারাজ দেখলেন ফ্যাসাদ। মেয়েদের তাড়াবার জন্য ভান করলেন—যেন বাংলা জানেন না; হিন্দীতে বললেন—'ক্যা মাঈ! তোম লাগ্‌ ক্যা কহ্‌তি হ্যায়?' শোনামাত্র মহিলাকুলের দয়াদাক্ষিণ্য উড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ একজন সুর পাল্টে তেতো গলায় বলল—'আ—মর্‌! মে-ড়ো—! মে-ড়ো—! চোখগুলো লাল-লাল দেখছিসনি? গাঁজা খায়। আধমটা মিন্‌সে। দিনের বেলা গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী সেজে বসে থাকে, আর রাত্তিরে চুরি করে। মুখে ঝ্যাঁটা—মারি, মিন্‌সে বদমাইসের ইষ্টি!' শুনে যোগেন-মহারাজের অবস্থা শোচনীয়।

বাংলা জানেন না, সুতরাং কিছু বুঝতে পারছেন না। অতিকষ্টে ঠোঁট কামড়ে হাসি সামলে সেযাত্রা রক্ষা পেলেন।

এর উল্টোদিকের কাহিনী :

পরিব্রজ্যায় বেরিয়ে যোগেন-মহারাজ বৈদ্যনাথ ধামে আছেন। অল্পদিনেই তাঁর উন্নত অবস্থার খ্যাতি ছড়িয়েছে। অনেকেই সাধুদর্শনে হাজির হয়। বাবুরাম-মহারাজের মা গেছেন বৈদ্যনাথে—তিনিও সাধুদর্শনে বেরিয়ে পড়লেন পাণ্ডাকে নিয়ে। "পাণ্ডা পথে ত্যাগী-বাবাজির অনেক গুণকীর্তন করিতে লাগিল। বাবুরাম-মহারাজের মাতা মনে করিলেন—না-জানি কি রকমই বা সাধু হইবে, কত বড়ই না তাহার জটা হইবে। তিনি যতই সাধুটির নিকটবর্তী হইতেছেন, পাণ্ডা ততই সাধুর গুণগান করিতেছে। অবশেষে যথাস্থানে পৌঁছিলে পাণ্ডাটি সাধু কোথায় বসিয়া থাকেন দেখাইয়া দিল। বাবুরাম-মহারাজের মাতা সাধুর কাছে গিয়াই সাধুকে চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ওগো, এ যে আমাদের যোগীন—এ আবার সাধু হবে কেন? এ যে আমাদের বাড়ির ছেলে! হাঁরে যোগীন, তুই বুঝি এখানে এসে সাধু হয়েছিস, আর মেড়োদের কাছে রুটি খাচ্ছিস? কোথায় আছিস খবর দিসনি কেন? বাড়ি চ, খাবি চ। ভাত না খেলে তোর আবার পেটের অসুখ হয়। চ, আর রোদ্দুরে সাধুগিরি করতে হবে না'।"

যোগেন-মহারাজের বিপর্যস্ত অবস্থার কথা না বললেও চলে।

এইসব গল্পগাছায় ভর্তি ছিল বরাহনগর-মঠ। যোগেন-মহারাজ নানা সরস বিদ্রূপভরা কাহিনী বলে সকলকে আমোদিত করতেন—সেই তাঁকেই একবার অনবদ্য বিদ্রূপে কাত করে দিয়েছিলেন বলরাম বসু।

"বলরামবাবুর যত্না বলে এক চাকর ছিল। যেমন চোর, তেমনি পাজি, সর্বগুণের শিরোমণি। সকলেই তার উপর বিরক্ত। সেটাকে বিদায় করে দেবার জন্য যোগেন-মহারাজ বলরামবাবুকে বিশেষ করে বলতেন। একদিন তেমন অনুরোধের পর বলরামবাবু বললেন, 'ও যোগেন, চাকরবাকর চুরি করেই থাকে। ওকে বিদায় করে দিলে ও কোথায় যাবে? এমন কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী চাকর কোথায় পাই বলো যে, চুরিও করবে না, অন্য দোষ থাকবে না, আবার কাজও করবে। একটা তেমন কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী চাকর এনে দাও না যোগেন।"

ঈশ্বরদর্শনের তীব্র ব্যাকুলতায় তরুণ সন্ন্যাসীরা ভরপুর থাকতেন—সেইজন্য তাঁরা বাইরের সঙ্গ পছন্দ করতেন না—বিশেষতঃ যদি সে সঙ্গ অহঙ্কারী, মাতব্বর বা ভণ্ডের হয়। একবার এক মাতব্বর গৃহী-ভক্তকে লাটু-মহারাজ যথেষ্ট সময় দিয়েছিলেন। উক্ত মুরুব্বি, যুবক-সন্ন্যাসীদের খোঁচা মেরে কথা বলছিলেন; কিন্তু তিনি প্রবীণ বলে সংকোচে কেউ প্রতিবাদ করছিলেন না। "শেষে লাটু-মহারাজের

কাছে আসিবা যেই তিনি বলিয়াছেন—'কিরে! পেটবৈরাগী হয়েছিস?' মহারাজ তখন কি মুডে ছিলেন জানিনা, অমনি তাঁহাকে বলিয়া ফেলিলেন—কিশুববাবুর কাছে ঠাকুর একটা গল্প বলেছিলেন—এখন দেখছি আপনারও সেই অবস্থা। আপনি ত্যাগের পথে না-এসে ত্যাগ-বৈরাগ্যের কি বুঝেছেন? জনক রাজার দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছেন, বাকী, জনকরাজা কি সবাই হতে পারে'?"

শ্রীরামকৃষ্ণের গল্পটি এই—

"একজন মেছুনি এক মালীর বাড়ীতে অতিথি হয়েছিল। মাছ বিক্রি করে আসছে, চুপড়ি হাতে আছে। তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়া হল। অনেক রাত পর্যন্ত ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না। বাড়ির গিন্নী সেই অবস্থা দেখে বললে, 'কি গো, ছট্‌পট্ করছিস কেন?' সে বললে, 'কে জানে বাবু, বুঝি এই ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না! আমার আঁসচুপড়িটা আনিয়ে দিতে পার? তাহলে বোধহয় ঘুম হতে পারে।' শেষে আঁসচুপড়ি আনাতে, জল ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেখে ভোঁস্-ভোঁস্ করে ঘুমোতে লাগল।"

পূর্বোক্ত-প্রকার ব্যক্তিদের নরেন্দ্রনাথ কিভাবে প্রয়োজনমতো শায়েস্তা করে দিতেন, তার একটি কাহিনী—

"এক সামান্য-শিক্ষিত ব্যক্তি দু'চারটি বোলচাল শিখিয়া বড় ফড়্‌ফড়্ করিতেছে এবং সকলকে বিরক্ত করিতেছে। লোকটি চপল-স্বভাব। তাহার মুখ খানিকক্ষণ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ শুরু করিলেন—'ঠিক বলেছিস—তোর বাপ পড়েছে দাতাকর্ণ, তুই পড়বি বোধোদয়—' এই বলিয়া আরম্ভ করিলেন। লোকটি কাটাকাটা বোল শুনিয়া চঞ্চল। সে যে-ভাবেরই কথা তুলিতে চায় অমনি তার কাটাকাটা জবাব। তখন লোকটি বুঝিল কামারশালের হাতুড়ি কেমন! এধারে নরেন্দ্রনাথের মুখে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় ও রঙ-বেরঙের বোলচাল শুনিয়া সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিতেছে। লোকটি অপ্রস্তুত হইয়া পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল—কিন্তু নরেন্দ্রনাথ পুরোমাত্রায় কৌতুক চালাইতে লাগিলেন।"

নরেন্দ্রনাথ সর্বদাই বেপরোয়া—হাসিতেও। হাসতে-হাসতেই তিনি নিজ স্বভাবের ব্যাখ্যা দিতেন—'আমাদের এত বুদ্ধি মেধা কেন জানিস? আমরা যে সুইসাইডের বংশ, আমাদের একটু পাগলামির-ছিট আছে; তাই এত বুদ্ধি! তোদের মতো কি হিসেবী রে—দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি নিয়ে ওজন করিছস তো করছিস। আমাদের পাগলাটে মাথা, হিসেব-ফিসেবের ধার ধারে না; যা করবার তা একটা করে দিলুম—লাগে তাক, না লাগে তুক।'

নরেন্দ্রনাথের প্রতিভার উৎস-সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা তাঁর বন্ধুরা মানতে তেমন রাজি ছিলেন না—তাঁরা নতুন ব্যাখ্যা দিলেন সকৌতুকে, যার মধ্যে বন্ধুর প্রতি অপূর্ব

ভালবাসা প্রকাশ পেল। 'নরেন্দ্রনাথের দোষটাও সতীর্থদের কাছে গুণ। নিরঞ্জন-মহারাজ মহেন্দ্রনাথকে বললেন, 'দ্যাখ, নরেনের এত বুদ্ধি কেন জানিস? নরেন খুব গুড়ুক ফুঁকতে পারে। আরে গুড়ুক না টানলে কি বুদ্ধি বেরোয়? তুই ছোঁড়া, চা ছেড়ে দে, তামাক খেতে শেখ—তখন দেখবি নরেনের মতো মাথ খুলে যাবে।'

বরাহনগর-মঠে এবং পরবর্তী আলমবাজার-মঠে তাই বলে সব বহিরাগতই অবাঞ্ছিত ছিলেন না। যোগেন-মহারাজের পিতা যখন আসতেন, আসর জমে উঠত অবিলম্বে। তাঁর ছদ্মকৌতুকময় কথাগুলি ছিল অতীব উপভোগ্য। "চৌধুরী মহাশয় ...দেখিতে দীর্ঘাকার, বর্ণ সাধারণ, শরীর দোহারা, পেট বসা, মেরুদণ্ড সম্মুখের দিকে কিছু বক্র; উভয় কর্ণ লোমযুক্ত, ভ্রূদ্বয় প্রশস্ত ও রোমশ। তাঁহার বামস্কন্ধে একখানি কোঁচানো চাদর, পরিধানে মলমলের থান, কোঁচার ডগা বাঁ দিকের কসিতে গোঁজা, বক্ষঃস্থলে যজ্ঞোপবীত, হাতে কখনও লাঠি, কখনও ছাতি। তিনি আলমবাজার-মঠে আসিলে যোগেন-মহারাজের পিতা বলিয়া সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। তিনি আসিয়াই শুরু করিতেন, 'আর বেঁচে সুখ নেই! বাপের নামে তো বেটার পরিচয় হয়, আর আমার বেলায় কিনা বেটার নামে বাপের পরিচয়। আমার নন্দ ঘোষের দশা। নন্দর বেটা কেউ তো বলে না, সকলে কেষ্টর বাপ নন্দ বলে থাকে। আমি যেখানে যাই সেখানে যোগের বাপ বলে সম্মান করে—আমার ব্যাটা যোগে, একথা কেউ বলে না। একেই বলে পোড়া কপাল।' তিনি গল্প বলিতে সুনিপুণ ছিলেন,...দুই-তিন ঘণ্টা গল্প বলিয়া যাইতে পারিতেন এবং শ্রোতাদেব মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন।"

গোপাল-কবিরাজকে নরেন্দ্রনাথ আবার ডেকে পাঠাতেন। কবিরাজ চিকিৎসা-শাস্ত্রে পারদর্শী এবং সংস্কৃতে পণ্ডিত। তার উপর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ ভক্ত এবং সুরসিক। তাঁর কথাবার্তার ধরন ছিল বড় মজাদার। এমন মানুষের সঙ্গ স্বভাবতঃই লোভনীয়। নরেন্দ্রনাথের মাতামহী রোগে মরমর। গোপাল-কবিরাজ দেখতে গেছেন, অতি মিষ্টবাক্যে নরেন্দ্রনাথের মাতাকে আশ্বস্ত করেছেন। কিন্তু তার আগে গাড়িতে আসার সময়ে তাঁর আমোদের শেষ ছিল না। 'এইবার বুড়ির ফায়ার-ওয়ার্ক হবে, লুচির খোলা চড়বে, আর আমি খোল বাজাব—' এই বলে তিনি অঙ্গভঙ্গি করে হাতে খোল বাজাতে লাগলেন। 'ফলে কোথায় লোকে শোক করিবে, না সকলে হাসিয়া লুটোপুটি। বাড়িতে আসিয়া নাড়ি দেখিয়া কৌতুকপ্রিয় গোপাল-কবিরাজ-মশাই বলিলেন, আরে সব ফাঁক, লুচির খোলাটাই মাঠে মারা গেল, বুড়ির তো মরবার নাড়ি নয়—বুড়ি যে বেঁচে উঠবে। হায় কপাল। কোথায় লুচি খাব, খোল বাজাব, তা নয়, বুড়ি ঝেড়ে উঠে পড়বে—অ্যাঁ।'

মৃত্যু নিয়ে হাসির অধিকার গোপাল-কবিরাজ নিয়েছিলেন বলে তিনি স্বয়ং যখন ১৮৮৯ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা-মহামারীর সময়ে রোগে পড়লেন তখন তাঁকে দেখতে গিয়ে বলরামবাবু বলেছিলেন—'ও কবরেজ, এইবার যে লুচির খোলা চড়ল।' এবারও কিন্তু কবিরাজেরই জয়। কবিরাজকে দেখে বাড়ি ফিরে বলরামবাবু নিজে ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়লেন, তার ফলে তাঁর দেহান্ত হল।

হৃদয় মুখুজ্জেকে নিয়ে মজা কম হত না। তিনি আলমবাজার-মঠে এলে সবাই পুরনো কথা শুনবার জন্য ঘিরে বসতেন। "শিবানন্দ-স্বামীর হাত থেকে হুঁকা নিয়ে হৃদু মুখুজ্জে বারকতক টানিলেন। শিবানন্দ-স্বামী বলিলেন, হ্যাঁ হে মুখুজ্জে, তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) যখন কেশববাবুর বাড়ি গিছলেন, তুমি তো সঙ্গে ছিলে, কি সব হয়েছিল একবার বল ত?' হৃদু মুখুজ্জে বলিতে লাগিলেন, 'একটা গাড়ি করে মামার সঙ্গে আমি ক্যাশববাবুর বাড়ি চললাম। গাড়িতে আমি মামাকে বলতে লাগলাম, 'ক্যাশববাবু বড় মানুষ, বড় লোক, তার বাড়িতে গিয়ে তুমি এমন বেফাঁস এলোমেলো কথা বলো কেন? তুমি বড—।' আমি এইরকম বলতে-বলতে গাড়িতে চললাম। মামা তখন একখানা লালপেড়ে ধুতি পরে আছেন। ক্যাশববাবুর বাড়িতে গাড়ি পৌঁছলে যত্ন করে তারা মামাকে ক্যাশববাবুর ঘরে লয়ে গেল। ক্যাশববাবু যত্ন করে অগ্রসর হয়ে মামাকে বসাতে গেলে মামা বলতে লাগলেন, 'ও ক্যাশব, আমি তোমায় কি বলেছি? হৃদু তাই পথে আমায় বকছিল আর আমায় এই বলে গাল দিচ্ছিল...।' ক্যাশববাবুর কাছে তখন জনকতক লোক বসেছিল। ক্যাশববাবু আহ্লাদ করে হাসতে-হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন—'হৃদু আপনাকে রাস্তায় কি বলে গাল দিয়েছে?' মামা আবার সেই কথাটি বললেন। তখন ক্যাশববাবু খুব উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগলেন। আবার একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হৃদু আপনাকে কি বলে গাল দিয়েছে?' মামা আবার সেই কথাটি বললেন। ক্যাশববাবু আরও উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগলেন। মামার কথা ক্যাশববাবুর কানে যেন অমৃতবর্ষণ করতে লাগল। আর সকলেও হাসতে লাগলেন। তখন ক্যাশববাবু আনন্দ ও কৌতুকচ্ছলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজকে কি মনে করে এসেছেন?' বললেন, 'ক্যাশবের মন ভোলাতে এই দূতীগিরি করব বলে এসেছি।' এই বলে পরনের লালপেড়ে কাপড়খানি মাথায় ঘোমটার মতো দিয়ে দূতী সাজলেন এবং ক্যাশববাবুর মুখের কাছে হাত নেড়ে দূতী-সংবাদ গাইতে লাগলেন। ক্যাশববাবু আনন্দে উল্লসিত হয়ে তাড়াতাড়ি খোল নিয়ে নিজেই বাজাতে লাগলেন, আর মামা নৃত্য করে দূতী-সংবাদ গাইতে লাগলেন। উপস্থিত সকলে তা শুনে আহ্লাদে টুপ্‌টুপ্‌ হয়ে উঠলেন।"

"এই কথা বলিতে বলিতে হৃদু মুখুজ্জের পূর্বস্মৃতি স্পষ্টভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিল। নিজের পরিধেয় বস্ত্রের কোঁচাটি মাথায় দিয়া স্বয়ং দূতী সাজিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের

দূতী-সংবাদ অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন। সেইরূপ ঘুরিয়া-ঘুরিয়া হাত নাড়িয়া দূতী-সংবাদ গাহিতে লাগিলেন। হুতু মুখুজ্জে সেই সময়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্পষ্ট ভাবটি জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেই মহা আনন্দিত হইয়া উঠিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সানন্দে বলতেন—'ভক্তের ভিতর ( ভাব ) একটানা নয় ; জোয়ার-ভাঁটা হয়। হাসে কাঁদে নাচে গায়। ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিলাস করতে ভালবাসে—কখনো সাঁতার দেয়, কখনো ডোবে, কখনো ওঠে—যেমন জলের ভিতর বরফ টাপুর-টুপুর টাপুর-টুপুর করে।' তাই তিনি মজার গল্প ভক্তদের দিয়ে বলিয়ে নিয়ে আনন্দ করতেন।—

"শ্রীরামকৃষ্ণ—( মণিলালকে )—তোমার সেই কথাটি এদের বল তো গা।

"মণিলাল ( সহাস্যে )—নৌকা করে কয়জন গঙ্গা পার হচ্ছিল। একজন পণ্ডিত বিদ্যার পরিচয় খুব দিচ্ছিল—'আমি নানা শাস্ত্র পড়েছি—বেদ-বেদান্ত, ষড়্দর্শন।' একজনকে জিজ্ঞাসা করলে—'বেদান্ত জানো?' সে বললে—'আজ্ঞা না।' 'তুমি সাংখ্য-পাতঞ্জল জানো?'—'আজ্ঞা না।' 'দর্শন-টর্শন কিছুই পড়ো নাই?'—'আজ্ঞা না।'

"পণ্ডিত সগর্বে কথা কইছেন ও লোকটি চুপ করে বসে আছে। এমন সময়ে ভয়ঙ্কর ঝড়—নৌকা ডুবতে লাগল। সে লোকটি বললে—'পণ্ডিতজী, আপনি সাঁতার জানেন?' পণ্ডিত বললেন—'না।' সে বললে—'আমি সাংখ্য-পাতঞ্জল জানি না, কিন্তু সাঁতার জানি।'"

স্ফূর্তির ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-শিষ্যদের বাছবিচার ছিল না। আলমবাজার-মঠে একবার এক ঘোর অদ্বৈতবাদী সাধু এসেছিলেন। তিনি জম্মুর লোক। তাঁকে রুটির সঙ্গে কুমড়ো, বড়ি ও কুচোচিংড়ি দিয়ে তৈরী করা অম্বল খেতে দেওয়া হয়েছিল। সাধু রুটি দিয়ে সেই অম্বল খান আর আনন্দে চিৎকার তোলেন—'কী উত্তম জিনিস—বাংলাদেশের কী উত্তম জিনিস!' অবশেষে সাধু চিংড়িমাছ দেখিয়ে যখন জিজ্ঞাসা করলেন—'এ কী ফল?' তখন একজন ঠাট্টা করে সামনের নারকেল গাছ দেখিয়ে বললেন—'ঐ গাছের ফল।' সাধু শুনে সোচ্ছ্বাসে বললেন, 'ধন্য বাংলাদেশ! ধন্য নারকেলগাছ! যাতে এমন ফল হয়!'

মানুষ নিয়ে আনন্দ—ভূত নিয়ে কম আনন্দ নয়। বরাহনগর-মঠবাড়ি এবং আলমবাজার-মঠবাড়ি—দুয়েরই ভূতের বাড়ি বলে দুর্নাম। অধিকতর দুর্নাম আলম-বাজার-বাড়িটির, কারণ এর নীচের তলায় একটি ঘরে একজন আত্মহত্যা করেছিল—তার অন্তিম বাণীও লেখা ছিল দেওয়ালে। এই বাড়িতে যাঁরা এসে হাজির হয়েছিলেন, তাঁদের একজন—স্বামী নিরঞ্জনানন্দ—তো শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে ভূত নামানোর মিডিয়াম ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, 'ভূত-ভূত

করলে তুই ভূত হয়ে যাবি, আর ভগবান-ভগবান করলে ভগবান হবি। কোনটা হতে চাস্।' নিরঞ্জন ভগবান হতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে ভূতরা তো দেশত্যাগী হতে পারে না! আলমবাজার-মঠে সেই ভূতরা নানারূপে বর্তমান ছিল। যথা বস্ত্ররূপে। মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানালার গরাদে পরনের সাদা কাপড় বেঁধে শুকোতে দিয়েছেন। জ্যোৎস্নারাত্রে সেই কাপড় ভূতরূপে দেখা দিল—পল্লীর লোকজনের কাছে। এক বৃদ্ধ সেই দোলায়িত ভূত-দর্শনের বিবরণ জানাতে বিকালে মঠে এলেন —এবং প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা দিতে-দিতে যখন সন্ধ্যা হয়ে গেল, তখন তিনি আর সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারলেন না; গুপ্ত-মহারাজ অগত্যা লণ্ঠন ধরে তাঁকে নামাতে লাগলেন—কিন্তু মাঝপথে ফস্ করে লণ্ঠন নিভিয়ে দুদ্দাড় করে উপরে পালিয়ে গেলেন। বৃদ্ধ ভূতের ভয়ে পরিত্রাহি চিৎকার শুরু করলেন—সিঁড়িতে বসে কাঁদতে লাগলেন—কিন্তু কেউ সাহায্যে এল না। তখন সিঁড়ি দিয়ে কোনক্রমে নেমে রাস্তায় পড়ে তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিলেন। বলাবহুল্য তাঁর পরবর্তী ভূত-কথা অধিকতর রোমাঞ্চকর হয়েছিল।

বিবেকানন্দ-শিষ্য গুপ্ত-মহারাজের (স্বামী সদানন্দ) আরও একটি ভৌতিক রসিকতার বিবরণ দিয়েছেন স্বামী অখণ্ডানন্দ।—

"(আলমবাজার-মঠে) ভিতরে পশ্চিম দিককার কুঠরিতে (সেদিন) বোধ হয় পাঁচজন ছিলেন। বাহিরে বড় ঘরে স্বামী সারদানন্দ ও সদানন্দ ছিলেন। গভীর রাত্রে ছাদের উপর গড়-গড় গড়-গড় শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দ শুনিয়া শুইয়া-শুইয়া সকলে বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'ওহে, এ যে সেই ভূতের ভাঁটা-খেলার মতো। ও দাদা! ও রামকৃষ্ণানন্দ, বলি ভাঁটার খেলা দেখাতে আনলে নাকি হে!' প্রেমানন্দ বলিলেন, 'ও দাদা! ও যোগেন!' ইত্যাদি। তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া একটা বড় লাঠি লইয়া 'তোর ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করছি' বলিয়া মার্-মার্ শব্দে দুপ-দুপ্ করিয়া একেবারে ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখেন, একজোড়া বড় ডাম্বেল আর একটা হারিকেন-লণ্ঠন জ্বলিতেছে। তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন, 'আরে, ভূতে হারিকেন নিয়ে ভাঁটা খেলে নাকি?' এই বলিয়াই তিনি সদর বাড়িতে সারদানন্দের ঘরে গিয়া তাঁহাদের ধরিলেন। অনর্থক ভয় পাইবার জন্য প্রেমানন্দ, শিবানন্দ, তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি অপ্রস্তুত হইলেন। সদানন্দ ও সারদানন্দের দুষ্টামি ধরা পড়ায় সবার মধ্যে হাসির রোল পড়িয়া গেল।"

বরাহনগর-মঠে গৃহী-ভক্তরা কেউ-কেউ যাতায়াত করতেন—তাঁদের মধ্যে আপসের বিবাদ হত। ভাবের দিক দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের দুটি দল—দানার দল ও সখীর দল। "দানার দল—তাঁরা বাহ্যিক কিছু বিধিনিয়ম মানিতে চান না কঠোর বৈরাগ্যভাবের লোক; নিজেদের ভিতর শক্তিসঞ্চয় করিয়া জগতের উপর

কি করিয়া সেই শক্তি বিকিরণ করিতে হয়, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন। …অপর শ্রেণী সখীর দল—যাঁহারা ভক্তিভাবে সাধন করেন, মৃদুভাবাপন্ন লোক।” সন্ন্যাসীদের মধ্যে দানাদের সংখ্যাধিক্য, গৃহীদের মধ্যে সখীর। গৃহী সুরেশ মিত্র কিন্তু দানার দলভুক্ত, সেজন্য সখীদলের বলরাম বসুর সঙ্গে তাঁর প্রেমকলহ—

“সুরেশ মিত্র ও বলরামবাবুতে দেখা হইলেই ব্যঙ্গচ্ছলে খুব হাসিতামাশা হইত। সুরেশ মিত্র বলিতেন, ‘বলরাম, তোদের রাধা-কৃষ্ণ একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পী-পী করে বাঁশি বাজায়, আর পা বেঁকিয়ে নাচে। আর আমার মা-কালী কি জানিস! হাতে খাঁড়া, জিব বার করা। লাক্ চড়াচড়্ লাক্ চড়াচড়্ ঢাক বাজছে। ঢাকের আওয়াজে তোর পী-পী বন্ধ হয়ে যাবে।’ এইরূপে দুজনে খুব হাসিতামাশা করিতেন এবং দুজনের ভক্তির ভাবটা খুব বাড়িয়া যাইত! ভক্তির নিয়ম হইতেছে, ঝগড়া না করিলে ভক্তিব আধিক্য বা উৎকর্য হয় না।…‘দানার দল’ ও ‘সখীর দল’ —এটা আপসে ঝগড়া করিবার জন্য। পরস্পর বসিয়া শুধু মিষ্টি কথা বলিলে ভালবাসাটা তত বাড়ে না—এইজন্য গায়ে পড়িয়া খুনসুড়ি করিয়া ঝগড়া করিত, আর খুব হাসিতামাশা হইত।”

সুতরাং অন্য কেউ নন, শান্ত অভিজাত যোগানন্দ পর্যন্ত গালাগালিকে মাধুর্যের পরিভাষা করে তুলেছিলেন। সে বিষয়ে মহেন্দ্রনাথের এই প্রকাব সাক্ষ্য :

“যোগেন-মহারাজের আনন্দ হইলেই গালি পাড়িতেন। কিন্তু গালিতে কোনো তীব্রতা বা দুষ্টভাব থাকিত না। এমন মিষ্ট ভালবাসাপূর্ণ ভাব ছিল যে, তাহা মুখে বলা যায় না—কেবল ভাষায় ছিল গালের ছন্দ। গাল একটু কমিলেই নিবন্ত প্রদীপকে উস্কাইয়া দিবার মতো আবার একটু ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইত, তাহলেই নানাবিধ ভাল প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যাইত—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশের মর্ম ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে থাকিতেন। হাসিতামাশা চলিতেছে আবার সঙ্গে-সঙ্গে উচ্চাঙ্গের সাধনভজনের কথাও হইতেছে।…একদিন বলরামবাবুর বাড়ির বারান্দাতে বিকালবেলা যোগেন-মহারাজ পায়চারি করিতে-করিতে বর্তমান লেখককে বলিলেন, ‘তুই শালা তো খুব বই পড়িস, বল দিকিনি বাইবেলের শ্রেষ্ঠ কথা কি? যীশু তাঁর শিষ্যদিগকে শেষ কথা কী বলেছিলেন?’ বর্তমান লেখক কথাটা ভালরকম বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। যোগেন-মহারাজ হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, ‘পরস্পরকে ভালবাস। Love each other। শালা, সব বাইবেলটা পড়াও যা, আর এই কথাটা বোঝবার চেষ্টা করাও তা’।”

পরস্পরের প্রতি ভালবাসাই আসল কথা—নরেন যোগেনের সম্পর্কের কথা ভাবলেই তা মনে হয়। রামকৃষ্ণপন্থী সন্ন্যাসীদের জন্য বিবেকানন্দ যে-সেবাধর্মের বিধান দিতে চেয়েছিলেন—যোগানন্দ তার ঔচিত্যকে কখনও সম্পূর্ণ মেনে নেন নি।

এবং বিবেকানন্দ যোগানন্দের কথায় আহত ও উচ্ছ্বসিত হতেন সবচেয়ে বেশি, কারণ যোগানন্দের উচ্চ অধিকারের বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। যোগানন্দের প্রতিবাদসূত্রে বিবেকানন্দের আত্ম-উন্মোচনের এক অবিস্মরণীয় কাহিনী রয়েছে স্বামী-শিষ্য-সংবাদে। আর একটি কাহিনী পাই স্বামী গম্ভীরানন্দের 'ভক্তমালিকা' গ্রন্থে। শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব নিয়ে কথা হচ্ছিল গুরুভাইদের মধ্যে। যোগানন্দ-প্রমুখ অভিযোগ করলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব প্রচার না করে স্বামীজী কার্যতঃ অকৃতজ্ঞতার কাজ করছেন—'ঠাকুরই তোমাকে বড় করেছেন।' উত্তরে স্বামীজী হাসতে-হাসতে বলেছিলেন, 'আমি যদি প্রচার না করতুম, তোদের ঠাকুরকে কে চিনত?' যোগানন্দ ঝটিতি উত্তর দিয়েছিলেন, 'তিনি না থাকলে তুমি বড় জোর একজন ডবলিউ সি ব্যানার্জি হতে।' তর্ক অতঃপর গভীর খাতে প্রবেশ করেছিল। বিবেকানন্দের বাহ্যিক কৌতুকপ্রবণতা সরে গিয়ে ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল হৃদয়াবেগ: 'শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার? ও তো সামান্য কথা; তিনি বেদমূর্তি'—স্বামীজী বলেছিলেন, এবং যোগানন্দ ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন।

সন্ন্যাসীদের মধ্যে ভালবাসার বিবাদ অবিরত। ঠাকুরঘর আর বৈষ্ণব ভাবালুতা নিয়েই বেশি খোঁচাখুঁচি হত। শশী-মহারাজ ঠাকুরঘরের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। ঠাকুরসেবায় কোনো অবহেলা তিনি হতে দেবেন না, এবং ঠাকুরঘর নিয়ে কোনো বিদ্রূপ তিনি সহ্য করবেন না। একবার মধ্য-জ্যৈষ্ঠে শশী গলদ্‌ঘর্ম হয়ে বরাহনগর থেকে হাঁটতে-হাঁটতে ঠাকুরের কাছে এসেছেন। উড়ানি জড়িয়ে বরফ এনেছেন—এত গরমেও সম্পূর্ণ গলেনি। ঠাকুর সানন্দে রহস্য করে বললেন—এই গরমে মানুষ মরে যায়, কিন্তু শশীর ভক্তি-হিমে বরফ গলেনি। আবার শশীর ভক্তির এমনই আগ্নেয় তেজ যে, বরাহনগর-মঠে একবার ঠাকুরঘর নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত তামাশার জন্য দলপতি নরেন্দ্রনাথকে পর্যন্ত তিনি চুল ধরে বার করে দিয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথ অবশ্য তাতে খুশিই হয়েছিলেন। লাটু-মহারাজের কথায় এমনি একটি বিবাদের বিবরণ:

"বরাহনগর-মঠে একদিন গুরুভাইদের মধ্যে ঠাকুরঘর নিয়ে বড় কথাকাটাকাটি হয়েছিল। সেদিন (গৃহী) ভক্তদের কে নাকি ঠাট্টা করে বলেছিল—'শালারা আর করবি কি? যেমন শীতলা-ঠাকুর বসায় তেমনি ঠাকুরের ছবি বসিয়ে ঘণ্টা বাজাবি আর পূজুরিগিরি করবি।' (গৃহী) ভক্তটির ঐ কথা শুনে শশীভাই বড্ড চটে উঠে বলেছিল, 'এমন যে-শালা বলে তার পয়সায় আমি মুতে দিই।' শশীভাইকে চটতে দেখলে লোরেনভাইয়ের বড় আমোদ লাগত। তাই হাসতে-হাসতে বললে, 'যাঃ শালা! ভিক্ষে করে তোর ঠাকুরকে খাওয়াগে যা।' লোরেনভাইকে ঐ কথা বলতে শুনে শশীভায়ের মনে বড্ড দুঃখু হল, বললে, 'বেশ। তোমাদের এক পয়সা চাই না, আমি ভিক্ষে করে ঠাকুরকে খাওয়াবো।' তাতে

লোরেনভাই হাসতে লাগল ; বললে, কি রে ! ভিক্ষে করে তোর ঠাকুরকে লুচিভোগ দিতে পারবি তো। শশীভাই (উত্তেজিত হইয়া) বললেন, 'হাঁ পারব ; সেই ভোগের লুচি আবার তোকে খেতে দেবো।' তখন স্বামীজী (উত্তেজনার ভান করিয়া) বললে, 'তা কখনই হতে পারে না ; আমরা শালা খেতে পাচ্ছি না, আর ঠাকুর লুচিভোগ খাবে ? ফেলে দেবো এমন ঠাকুরকে, জানিস ? তুই যদি ফেলতে না পারিস আমি নিজের হাতে সে ঠাকুরকে ফেলে দেবো।' এই বলে (কৃত্রিম রোষভরে যেন) লোরেনভাই তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরের দিকে যেতে লাগল। শশীভাইও লাফিয়ে উঠে ইংরেজীতে কি বললেন। হাসি-ঠাট্টার ব্যেপারে এমন তকবার হতে দেখে হামার মনে বড্ড দুঃখু হল। হামনে লোরেনভাইকে বললুম, 'কেনো ভাই, শশীর সাথে তুমি বাদ সাধছো ? তোমার মতে তুমি চলো, শশীভাইকে তার মতে চলতে দাও।' লোরেনভাই হামাকেও দাবড়ি দিয়ে উঠল। দাবড়ানি শুনে যেই একটা কড়া কথা বলতে গেছি, অমনি লোরেনভাই হেসে উঠল। এমন হাসলে যে শশীভাইও হেসে ফেললে। দু'মিনিটের মধ্যে সব গলাগলি বসে ঠাকুরপূজোর ব্যবস্থা করতে লেগে গেল।"

ঝগড়া কেবল ঠাকুরপূজো নিয়েই নয়—ঠাকুর কাকে বেশি ভালবাসেন—তা নিয়েও। "কেউ বলত—'ঠাকুর আমায় বেশি ভালবাসেন,' আর একজন অমনি বলত, 'না, আমায় বেশি।' এইরকম করতে-করতে শেষে তকরার হতে থাকত। ঠাকুর সকলকে এমনি ভালবাসতেন যে, সবাই মনে করত তাকেই বুঝি তিনি সবচেয়ে ভালবাসেন। একদিন এমনি তক্‌রার করতে দেখে বললুম, তিনি কুছু রেখে যাননি, তাতেও তোমাদের সব ঝগড়া হচ্ছে, আর যদি কুছু রেখে যেতেন, তাহলে তোমরা তো কোর্টে মোকর্দমা লড়তে যেতে।' হামার (লাটুর) কথা শুনে সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।"

ঠাকুরের ভালবাসার ভাগ নিয়ে লাটুরও কম দাবি ছিল না। একবার ঠাকুরের ভোগের কড়ায় রাত্রে ছোলাসেদ্ধ করে পরিষ্কার করে রাখেননি বলে সকালে শশী-মহারাজ লাটুকে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করেছিলেন। তা শুনে লাটু-মহারাজ বলেছিলেন, 'হামি মাকে পত্র দিব ; তোমার বাবা-মা আউর হামার বাবা-মা কি আলাদা আছে ?'

বৈষ্ণব ভাবালুতা নিয়ে নরেন্দ্রনাথের কৌতুকের কি বিচিত্র পরিণতি একবার হয়েছিল, তা দেখে নেওয়া যেতে পারে :

"বাবুরাম-মহারাজ বললেন, 'যোগে (যোগানন্দ) বৃন্দাবন থেকে ফিরে এল, আনলে কতকগুলো তুলসীর মালা, একটা মালার ঝুলি, আর তেলকমাটি। সকলের খাওয়া হলে প্রায় বারটা নাগাদ নরেন বললে, 'ওরে যোগে, তুই শালা তো বৃন্দাবনে

গেছলি, সে আমাকে বৈরাগী সাজিয়ে।' সকলে মিলে নরেন্দ্রনাথকে কপালে তেলক, গলায় কণ্ঠী, হাতে ঝুলি, আর তা থেকে জপ করবার জন্য আঙুল বার করে দিয়ে এক ঢঙ সাজিয়ে দিলে। নরেন প্রথমে খানিকক্ষণ ব্যঙ্গ করে যেন কতই মালা জপ করছে, আওয়াজ করে বলতে লাগল—আ—ধা—কে—ত্তো—আ—ধা—কে—ত্তো—আ—ধা—কে—ত্তো। তারপর একটা গান ধরলে, 'নিতাই নাম এনেছে রে। 'নাম' কথাটা না বলে অপর একটা কথা বলে যোগেনকে ভেঙচাতে লাগল। এইরকম কৌতুক-ব্যঙ্গ-হাসি চলছিল। অল্প পরে হঠাৎ নরেনের মুখভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল, সিংহগর্জনে বলতে লাগল, 'বোল, হরি বোল, হরি হরি বোল।' আগে সকলে এলোমেলো বসেছিল, কিন্তু নরেনের সিংহগর্জন শুনে সকলে ত্রস্ত হয়ে পড়ল। অবিলম্বে সকলে দাঁড়িয়ে উদ্দাম নৃত্য ও কীর্তন আরম্ভ হয়ে গেল।... হরিনামের রোল আর নাচে বাড়িখানি দুলতে লাগল—ভেঙে পড়ার উপক্রম।... নরেনের এবং অন্য সকলের চোখ থেকে অশ্রুধারা পড়ে মুখ বুক ভেসে যাচ্ছে।... কীর্তনের রোল বরাহনগর বাজার পর্যন্ত পৌঁছল। দোকানী-পসারীরা দোকান বন্ধ করে ছুটে আসতে লাগল। নীচেকার উঠান লোকে ভরে গেল, রাস্তায় লোক জমে গেল।"*

কেউ না মনে করে বসেন—স্বামীজী নিজের অপছন্দের ভাব নিয়ে কেবল তামাশা করতেন। না—পছন্দের জিনিস নিয়েও তিনি মজা করতে ছাড়তেন না। এক্ষেত্রে

* সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভাবপ্রেমে ভরপুর ছিলেন—কিন্তু কঠোরভাবে আত্মশাসন করতেন, কারণ প্রেমসাধনার নামে ইন্দ্রিয়বিলাস দেশের কি সর্বনাশ করেছে, সে বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। আমেরিকা থেকে ফেরার পরে স্বামীজী একদিন বাগবাজারে আছেন। বিকালের দিকে অনেক লোক জুটেছেন। "শ্রীচৈতন্যদেবের কথা হইতেছে। হাসি-তামাশাও চলিতেছে।" এইসব রঙ্গরসে বিরক্ত হয়ে একজন বলেছিলেন, 'মহাপ্রভুকে নিয়ে এত রঙ্গরসের কারণ কি? তিনি কি মহাপুরুষ ছিলেন না? তিনি কি জীবের মঙ্গলের জন্য কোনো কাজ করেননি?' স্বামীজী আহত ভক্তটির দিকে ফিরে সকৌতুকে বলেছিলেন, 'কে বাবা তুমি? কাকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে হবে। তোমাকে নিয়ে নাকি? মহাপ্রভুকে নিয়ে রঙ্গ-তামাশা কর টাই দেখছ বুঝি! তাঁর কাম-কাঞ্চন ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ নিয়ে এতদিন যে জীবনটা গড়বার ও লোকের মধ্যে সেই ভাবটা ঢোকাবার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেটা দেখতে পাচ্ছ না?' তারপর স্বামীজী বিস্তৃতভাবে চৈতন্যদেবের ত্যাগাদর্শের কথা বলেছিলেন, এবং সেই ত্যাগের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে কিভাবে রাধাপ্রেমের লৌকিক অনুকরণে বৈষ্ণবরা দেশের মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিয়েছে—সে কথাও বলেছিলেন। স্বামীজীর যথার্থ চৈতন্যভক্তি দেখে আহত ব্যক্তি সান্ত্বনালাভ করেছিলেন। স্বামীজী শেষে হাসতে-হাসতে বলেছিলেন, "দ্যাখো গালাগাল যদি দিতেই হয় তো ভগবানকে দেওয়াই ভাল। তুমি যদি আমাকে গাল দাও, আমি তেড়ে যাব। আমি তোমাকে গাল দিলে তুমিও তার শোধ তোলবার চেষ্টা করবে। ভগবান তো সে-সব করতে পারবেন না।"

স্বামীজীর গুরুভাইরাও পশ্চাদ্‌পদ নন।

"একদিন আলমবাজার মঠে বেলা আড়াইটে-তিনটের সময় এক ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত। গায়ে আলপাকার জামা, বুকে ঘড়ি ও চেন, হাতে একটি ছোট চামড়ার ব্যাগ। শিবানন্দ-স্বামী, গুপ্ত-মহারাজ ও আরও জনকয়েক কালা-বেদান্তীর ঘরের সম্মুখের বারান্দাতে বসিয়াছিলেন। ভদ্রলোকটি আসিয়া শিবানন্দ-স্বামীকে প্রণাম করিয়া অল্প কথাবার্তা কহিলেন এবং তৎসঙ্গে গুপ্ত-মহারাজের নাম শুনিয়া লইলেন। অনতিবিলম্বে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, 'গুপ্ত, আমার জামাটা ধরো. আমার সমাধি আসছে।' এই বলিয়া তাড়াতাড়ি জামাটা খুলিয়া গুপ্ত-মহারাজকে দিলেন এবং ঘড়ি ও চেন খুলিয়া দিলেন, হাতের ব্যাগটা ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়া সমাধিগ্রস্ত হইলেন। গুপ্ত-মহারাজও কৌতুক করিয়া হৃদু মুখুজ্যে যেমন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধির সময় পশ্চাতে দাঁড়াইত, তদ্রূপ করিয়া তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। ভদ্রলোকটি পরে সমাধিভঙ্গের অবস্থায় 'ব্রের্ বের্' করিয়া মুখে আওয়াজ করিতে লাগিলেন। সেই ব্যাপার দেখিয়া সকলে কষ্টে হাস্যসংবরণ করিয়া রহিলেন। অবশেষে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইলে তাড়াতাড়ি বলিলেন, 'গুপ্ত আমার চশমাটা দাও; আমার ঘড়ি, ঘড়ির চেন ও ব্যাগটা দাও।' চশমা ও চেনটি যথাস্থানে রাখিয়া ব্যাগটি খুলিয়া দেখিলেন—তাঁহার সমস্ত জিনিস যথাস্থানে আছে কিনা! তারপর ব্যস্ত হইয়া, একটা কাজ আছে বলিয়া চলিয়া গেলেন। লোকটি চলিয়া গেলে সকলেই হাস্যকৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'গুপ্ত, আমার চশমাটা ধরো, আমার ব্যাগটা ধরো, আমার সমাধি আসছে'।"

যাঁরা কৌতুক করছিলেন—তাঁরা যথার্থ সমাধির রূপ দেখেছেন। তাঁরা জানেন, ও-জিনিস রামকৃষ্ণ পরমহংসেই সম্ভব। ও-জিনিসকে পাবার দুষ্কর সাধনায় যখন এই রামকৃষ্ণের সন্তানেরা মেতেছিলেন, তখন তাঁরা পরবর্তী প্রাপ্তির অগ্রিম অনুকরণ করে অন্ততঃ হাস্যরসটা আদায় করে নিতে সচেষ্ট হতেন। যেমন—

"এইবার নরেন্দ্র বালকের ন্যায় রহস্য করিতেছেন। রসগোল্লা মুখে পুরিয়া একেবারে স্পন্দহীন। চক্ষু নিমেষশূন্য। নরেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া একজন ভক্ত ভান করিয়া তাঁহাকে ধারণ করিলেন—পাছে পড়িয়া যান।

"কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র (রসগোল্লা মুখে রহিয়াছে)—চোখ চাহিয়া বলিতেছেন 'আমি—ভাল—আছি।' (সকলের উচ্চহাস্য)।"

বলরাম-ভবন থেকে শিবরাত্রির দিনে ফল-মিষ্টান্নাদি এসেছে বরাহনগর-মঠে।

"রাখাল প্রভৃতি দু'একটি ভক্তসঙ্গে নরেন্দ্র ঘরে দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতেছেন। একটি-দুটি খাইয়াই আনন্দ করিতে-করিতে বলিতেছেন, 'ধন্য বলরাম! ধন্য বলরাম!' (সকলের হাস্য)।"

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার অনুকরণ—

"একজন ভাই শুইয়া-শুইয়া রহস্যভাবে বলিতেছেন—যেন ঈশ্বরের অদর্শনে কাতর হয়েছেন—'ওরে, আমাকে একখানা ছুরি এনে দে রে!—আর কাজ নাই!—আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না!'

"নরেন্দ্র ( গম্ভীরভাবে )—ঐখানেই আছে, হাত বাড়িয়ে নে। ( সকলের হাস্য )।"

সাধনা নিয়ে পুনশ্চ কৌতুক—

"নরেন্দ্র ছোট গোপালকে তামাক আনিতে বলিতেছেন। ছোট গোপাল একটু ধ্যান করিতেছিলেন।

"নরেন্দ্র ( গোপালের প্রতি )—ওরে তামাক সাজ। ধ্যান কি রে! আগে ঠাকুর ও সাধুসেবা করে প্রিপারেশন্ কর্, তারপর ধ্যান। আগে কর্ম, তারপর ধ্যান। ( সকলের হাস্য )।"

এবার গভীর রসের সঙ্গে মেশানো কৌতুকরস—

"মঠের একজন ভাই বুদ্ধচরিত ও চৈতন্যচরিত পড়িতেছেন। সুর করিয়া একটু ব্যঙ্গভাবে চৈতন্যচরিত পড়িতেছেন। নরেন্দ্র বইখানি কাড়িয়া লইলেন। বলিলেন, 'এইরকম করে ভাল জিনিসটা মাটি করে?' নরেন্দ্র নিজে চৈতন্যদেবের প্রেম-বিতরণ কথা পড়িতেছেন।

"মঠের ভাই—আমি বলি, কেউ কাউকে প্রেম দিতে পারে না।

"নরেন্দ্র—আমায় পরমহংস-মহাশয় প্রেম দিয়েছেন।

"মঠের ভাই—আচ্ছা তুমি কি তাই পেয়েছ?

"নরেন্দ্র—তুই কি বুঝবি? তুই সারভেণ্ট ক্লাস, ঈশ্বরের সেবকের থাক্। আমার সবাই পা টিপবে। শরতা মিত্তির আর দেশো পর্যন্ত ( সকলের হাস্য )। তুই মনে করেছিস বুঝি যে, সব তুই বুঝছিস? (হাস্য)। লে, তামাক সাজ। ( সকলের হাস্য )।

"মঠের ভাই—সাজ—বো—না—। ( সকলের হাস্য )।"

বাইরে কৌতুক করছেন কিন্তু সকলে অন্তরে জ্বলছেন। সাংসারিকতা সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের দারুণ বিরূপতা। দুপুরে তাঁরা গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন—সময় বৈশাখের শেষ—মাস্টার-মহাশয় সঙ্গে আছেন। ফেরার সময় সকলে রোদে ঝলসে যাচ্ছেন—মাস্টার-মহাশয় নরেন্দ্রকে বললেন—'সর্দিগর্মি হবার যোগাড়।' এই সহজ কথাটাকেও বিদ্রূপে বিঁধিয়ে নরেন্দ্রনাথ ফিরিয়ে দিলেন—'শরীরই আপনাদের বৈরাগ্যের প্রতিবন্ধক, না? আপনার—দেবেনবাবুর—?'

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—'তোর গান শুনলে এই বুকের ভিতর যিনি আছেন তিনি সাপের ন্যায় ফোঁস করে যেন ফণা ধরে স্থির হয়ে শুনতে

থাকেন।' মাস্টার-মহাশয়কে ব্যাকুল হয়ে নরেন্দ্রনাথ বললেন—'তিনি এত বললেন, কই আমার কি হল?' মাস্টার-মহাশয় তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন—'এখন শিব সেজেছ, পয়সা নেবার যো নেই। ঠাকুরের গল্প তো মনে আছে?' নরেন্দ্রনাথ গল্পটি শুনতে চাইলেন। মাস্টার-মহাশয় বললেন, 'বহুরূপী শিব সেজেছিল। যাদের বাড়ি গিছল, তারা একটা টাকা দিতে এসেছিল। সে নেয়নি। বাড়ি থেকে হাত-পা ধুয়ে এসে টাকা চাইলে। বাড়ির লোকেরা বললে—তখন যে নিলে না? সে বললে—তখন শিব সেজেছিলাম—সন্ন্যাসী—টাকা ছোঁবার যো নাই।' মাস্টার-মহাশয় যোগ করে দিলেন—'তুমি এখন রোজা সেজেছ। তোমার উপর সব ভার। মঠের ভাইদের মানুষ করবে।'

কথা শুনে নরেন্দ্রনাথ বোধহয় কিছু সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। 'নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন।'

•

বরাহনগর ও আলমবাজার-মঠের সাধারণ হাসির কথায় ফেরা যাক। দেখা যাবে, হাসির অধিকারে ঐসব স্থানে ছোট-বড় কেউই বঞ্চিত ছিলেন না। অল্পবয়স্ক মহেন্দ্রনাথ দত্ত পর্যন্ত সন্ন্যাসীদের ধর্মচর্যা নিয়ে কৌতুক করতে পারতেন। "একদিন গরমীকাল, বিকালবেলা; ঠাকুরের ভাঁড়ারের সম্মুখে, পূর্বদিকে খোলা ছাদের কোণটাতে শশী-মহারাজ একটা বঁটি নিয়ে কুটনো কুটছেন। সান্যাল-মহাশয়ও একটা বঁটি নিয়ে কি করছেন। আরও কয়েকজন কুটনোর ধামার কাছে বসে আছেন। খোলা ছাদে, ঠাকুরের ভাঁড়ারের দেওয়ালের কাছে বাবুরাম-মহারাজ একটা পিঁড়িতে আলপনা দিচ্ছেন। আমি (মহেন্দ্রনাথ) বললুম, 'হাঁ গা, পিঁড়িতে আলপনা দিচ্ছ কেন গা?' বাবুরাম-মহারাজ 'কি একটা পূজো হবে' বললেন। শশী-মহারাজ অনেক খুঁটিনাটি পূজা করতেন—অত মনে রাখা যায় না। আমি খোলা ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে দেখে বলতে লাগলুম—

'মিন্সেরা সব কুটনো কুটবি
বাটনা বাটবি—
পিঁড়েয় দিবি আলপনা,
মেয়েরা সব কলেজ যাবে,
Knowledge পাবে—
করবে সাধের বাবুয়ানা।'

"এই শুনে সকলেই হেসে উঠলেন। শশী-মহারাজ কুটনো কুটতে-কুটতে রেগে মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগলেন—'তুই ছোঁড়া বড় ঠাট্টা করিস। তোর ঠাট্টার চোটে অস্থির হই।' আমি হাসতে-হাসতে বারংবার ঐ কথাই বলতে লাগলুম। এইতে

সকলের ভিতর একটা হাসির ঝগড়া উঠল। শশী-মহারাজ বলতে লাগলেন, 'আমরা নিজেরা না করলে চলবে কেন? তুই ঠাট্টা করলে হবে কি!'

[ পরবর্তীকালে বেলুড়-মঠের একটি কাহিনী—ঘর ছেড়ে জ্ঞান-মহারাজ বেলুড়-মঠে এসে আছেন। তাঁর বাবা তাঁকে দেখতে এসে দেখেন—ছেলে কুমড়ো কুটছে। বাবা বড় দুঃখে বললেন—দোহাই তোমার, ঘরে ফিরে চলো। কত কুমড়ো কুটতে চাও বলো—আমি গাড়ি-গাড়ি কুমড়ো কিনে দেবো—মনের সাধে কুটবে। ]

পুনশ্চ, বরাহনগর-মঠের একটি আনন্দের ছবি—

"এই সময়ে গুপ্ত-মহারাজ একটা টাকা পাইয়াছিলেন। টাকাটা তাঁহার বিষম জঞ্জাল হইয়া উঠিল। টাকাটা লইয়া কি করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে স্থির ক'রলেন, চাচা ( মহেন্দ্রনাথ ) আসিলে স্বহস্তে মাংস রাঁধিয়া তাঁহাকে খাওয়াইবেন। শনিবার তিনটার সময় বর্তমান লেখক ( মহেন্দ্রনাথ ) উপস্থিত হইলে গুপ্ত-মহারাজ বালকের ন্যায় হাততালি দিয়া নৃত্য ও উল্লাসের ধ্বনি করিতে লাগিলেন, যেন কি-একটা ব্যাপার হইয়াছে, আনন্দ আর ধরে না। নিরঞ্জন-মহারাজ রহস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'হ্যাঁরে গুপ্ত, তুই না ত্যাগী? তোর পক্ষে টাকাটা ছোঁয়া ঠিক নয়, তুই টাকাটা আমাকে দে!' গুপ্ত-মহারাজ বালকের ন্যায় হাস্য করিয়া অর্ধ-নৃত্য করিতে-করিতে বলিতে লাগিলেন, 'নেহি দেগা, কিসিকো নেহি দেগা!' তুলসী-মহারাজও তাঁহাকে লইয়া এইরূপ কৌতুক করিতে লাগিলেন। একটা সামান্য উপলক্ষ করিয়া সকলেই আনন্দে মত্ত।"

পুনশ্চ একটি আনন্দচিত্র, যার মধ্যে নরেন্দ্রনাথের প্রতি গুরুভাইদের অসীম ভালবাসার স্বাক্ষর আছে—

"নরেন্দ্রনাথের পিতা একখানি মলিদা-চাদর ব্যবহার করিতেন। নরেন্দ্রনাথও পরে সেই মলিদা-চাদরখানি ব্যবহার করিতেন। গুজরাটে অবস্থানকালে তিনি নিজের চিহ্নস্বরূপ সেই জীর্ণ চাদরখানি সারদা-মহারাজকে ( স্বামী ত্রিগুণাতীত ) পরাইয়া দিলেন। সারদা-মহারাজ তাহা অমূল্যজ্ঞানে আলমবাজারে লইয়া আসিলেন।...সেখানি তিনি কখনো মাথায় দিয়া, কখনো বগলে লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেন। একদিন আলমবাজার-মঠের ভিতর-দিককার পূর্বদিকের খোলা ছাদে... সকলে সমবেত,...শশী-মহারাজ কৌতুক করিয়া বলিলেন, 'আরে সারদা, নরেন তোকে দেয় নাই; আমাকে সবচেয়ে ভালবাসে, তাই তোর হাত দিয়ে আমাকে দিয়েছে।' নিরঞ্জন-মহারাজ রহস্য করিয়া গম্ভীরভাবে সারদা-মহারাজকে বলিলেন, 'নরেন তোকে দেবে কেন? তুই বেঁটে, তিন তাল মোহনভোগ খাস—এ কি তোর উপযুক্ত? ও-চাদর তোকে দেয়নি, শশীকেও দেয়নি, নরেন আমাকে কত ভালবাসে ওটা আমাকে দিয়েছে।' এই বলে সকলে কাড়াকাড়ি করে বালকের মতো আনন্দে

নৃত্য করতে লাগলেন। জিনিসটি সামান্য হইলেও নরেন্দ্রনাথের ব্যবহৃত জিনিস বলিয়া সকলের অত আনন্দ।"

সাধন-ভজনের ফাঁকে বরাহনগর-মঠ ও আলমবাজার-মঠে আনন্দলহরী উথলে উঠত। এমন একটা হাসি-খুশির আবহাওয়া ছিল যে, সবাই মনের সুখে গল্প যোগান দিতেন। স্বামীজীর এক শিষ্য, দীন-মহারাজ, সংসারজীবনে যাঁর বহুল অভিজ্ঞতা-লাভ হয়েছিল, তিনিও মজার গল্প ফাঁদতেন। তাঁর বলা কিছু-কিছু গল্প মহেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন। তার মধ্যে নবাবী পানের গল্পটি উপভোগ্য। বড় রসিয়ে-রসিয়ে তিনি গল্পটি বলতেন। আগে কন্ট্রাকটারী করবার সময়ে তিনি এণ্টালীতে থাকতেন। সে সময়ে একদিন তাঁর বন্ধু, বড় উকিল, ব্রজলাল পালিতের কাছে বৈষয়িক প্রয়োজনে এসেছিলেন মেটেবুরুজের এক নবাব। নবাবের চাকর নবাবের পান-তামাকের সরঞ্জামও এনেছিল। তোলা উনুনে মুক্তো পুড়িয়ে ভস্ম করে তা দিয়ে পান সেজে সে নবাবকে খেতে দিয়েছিল। নবাব সে পান যখন চিবুতে লাগলেন, তখন উপস্থিত দীননাথ সেনকে ( দীন-মহারাজ ) নবাব-ভৃত্য এক খিলি ঐ পান উপহার দিয়েছিল। আশপাশের অন্য লোকে মুসলমানের পান খেতে গররাজি, কিন্তু দীন সেন ভাবলেন, নবাবী পান তো কপালে জুটবে না, জাত যায় যাক, পান নিয়ে নিই।

"ইতিমধ্যে নবাবী তামাকও প্রস্তুত। নবাব-সাহেব তা টানতে লাগলেন। আবে ভাই, [ দীন-মহারাজ বলতে লাগলেন ] সে কি সুগন্ধ, জন্মে অমন তামাক দেখিনি। আমার মনে হল—পান খেয়ে যদি অর্ধেক জাত গিয়ে থাকে তাহলে তামাক খেয়ে এবার পুরো জাতটাই যাক। দীন সেন, না-হয় দীন মহম্মদ হয়ে যাবো, তবু নবাবী তামাক ছাড়া হবে না। তামাক খাবার ইচ্ছা দেখে একজন ঘর থেকে একটা ছোট কলকে এনে দিলে ও কলকেতে তামাক সেজে আগুন দিয়ে আমাকে দিলে। আমি তো বিনা পয়সায় নবাব হয়ে নেব—এই ভেবে ভিতরে গিয়ে পানটা মুখে দিয়ে, বারকতক চিবিয়ে, বারতিনেক তামাক যেই টেনেছি—অমনি মাথার ভিতর ভোঁ হয়ে গেল, চোখে আর কিছু দেখতে পাইনা, মাথা ঘুরতে লাগল।"

অতঃপর কাণ্ড। নেশার ঘোরে ভাবী দীন মহম্মদের পাগলের অবস্থা। লোক জমে গেল। তারা এন্তার গাল পাড়তে লাগল। কলতলায় নিয়ে গিয়ে মাথায় তেল দিয়ে জল ঢালতে লাগল, 'জল থাবড়িয়ে দেবার ছুতো করে মাথায় চাঁটি মারতে লাগল।' লোকটি তখন 'বেওয়ারিশ মাল।' রবিবার, স্কুল-অফিস বন্ধ; পাড়ার লোক এসে তামাশা দেখতে লাগল; পাড়ায় হৈ চৈ পড়ে গেল। সেই নবাবী নেশা কাটল পুরো তিন দিন পরে।

গুলিখোরের হাতে তামাক খাওয়ার মজার গল্পও দীন-মহারাজ করতেন। যে-সময়ে তিনি এণ্টালীতে থাকেন সেই সময়েরই ঘটনা। পূর্বোক্ত উকিল বন্ধুর বাড়িতে

বসে তাস খেলছেন—এমন সময়ে তাঁর তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হল। দরজার গোড়ায় এক গুলিখোর ছিল, তাকে তামাক সাজতে বললেন। গুলিখোর সেকথা শুনে চলে গেল। তারপর তাস খেলতে-খেলতে এঁরা তামাকের কথা ভুলে গেছেন। খেলা-শেষে বাড়ি ফিরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমোচ্ছেন। মাঝ-রাত্তিরে দ্বারে কড়ানাড়া, করাঘাত, ডাকাডাকি। কী ব্যাপার? ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে দেখেন—সাজা কলকে ত দাঁড়িয়ে ফুঁ দিচ্ছে গুলিখোরটি।

সেই রাতে গুলিখোরের হাতের তামাক দান সেনকে খেতে হয়েছিল এবং দেরির কারণও শুনতে হয়েছিল। তামাক সেজে গুলিখোরটি আগুন খুঁজে পায়নি—যদিও ঘরে তিন-চার জায়গায় রেড়ির তেলের গেলাসে আগুন জ্বলছিল। সে রাস্তার গ্যাসের আলো থেকে টিকে ধরাতে চেষ্টা করল—কিন্তু আগুন সেখানে অনেক উঁচুতে বলে নাগাল পেল না। তখন হঠাৎ খেয়াল হল—আগুন অবশ্যই পাওয়া যায় এমন একটি জায়গা আছে—নিমতলার শ্মশান—সেখানে সারাক্ষণই মড়া পোড়ে। সুতরাং গুলিখোর এন্টালী থেকে নিমতলা পায়ে হেঁটে গিয়েছে, মড়ার আগুন থেকে টিকে ধরিয়েছে, তারপর পায়ে হেঁটে এন্টালী ফিরেছে। এহেন সাজা তামাক যদি বাবু না খান, তাহলে গুলিখোরের ইজ্জত থাকে কোথায়!

স্বামীজীর আমেরিকান-ভক্ত টার্নবুল-সাহেব স্বামীজী ভারতে ফেরার আগেই কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি আমেরিকায় স্বামীজীর আশ্চর্য সাফল্যের কাহিনী বলে আলমবাজার-মঠের ভক্তগণকে চমৎকৃত করেছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি সাধারণ কৌতুকগল্পও বলতেন। তেমন একটি গল্প—

"আমেরিকার দুই ভদ্রলোক তাহাদের ধনী বন্ধুর আহ্বানে লণ্ডনে বেড়াইতে আসে। বন্ধু তাহাদিগকে লইয়া প্রথমেই লণ্ডনের পার্লামেন্ট-হাউস দেখায়। তাহা দেখিয়া তাহারা বলিল, 'ওঃ, এর চেয়েও আমাদের ওয়াশিংটনের কংগ্রেস-হাউস অনেক বড় ও ভাল।' সেন্ট পলস্ গির্জা দেখিয়া তাহারা বলিল, 'এ আমাদের গির্জার কাছে দাঁড়াইতেই পারে না।' এরূপ যেখানে যায়, যাহা দেখে, কিছুতেই তাহারা আমেরিকার বড়াই করিতে ছাড়ে না। তখন লণ্ডনের ভদ্রলোক তাহাদিগকে ইটালিতে বেড়াইতে লইয়া গেলেন। সেখানে একরাত্রে সুমধুর সুরাপানে তাহারা বেহুঁশ, সেই অবস্থায় দুইখানি খাটিয়া করিয়া তাহাদিগকে লইয়া গিয়া এক নির্জন সমাধি-ভূমিতে রাখিয়া, একটু দূর হইতে তাহারা কি করে দেখিবার জন্য বিলাতী ভদ্রলোকটি বসিয়া রহিলেন। একটা টিম্‌টিমে আলোতে সমাধিভূমির বিজনতা পরিস্ফুট হইতেছিল। হুঁশ হইতেই দুজনে জাগিয়া চোখ রগড়াইতে-রগড়াইতে চারিদিক দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, Here is the Day of Judgement! Hurrah for the Stars and Stripes! America is the first to wake up! (অর্থাৎ,

এই তো মহাবিচারের দিন সমাগত! আমেরিকার জাতীয় পতাকা জয়যুক্ত হউক! আমেরিকাই সর্বপ্রথম জাগরিত হইল!) দেখিয়া শুনিয়া লণ্ডনের ভদ্রলোক হার মানিলেন।"

যে আসত সেই হাসিতে আনন্দে যোগ দিত, কারণ তাদের মর্মমূল নড়ে উঠত এখানকার মানুষগুলির সান্নিধ্যে। যোগানন্দ-স্বামী বাইবেলীয় ভাষাযোগে হুঙ্কার দিতেন—Some are born eunuch and some have made themselves eunuch for the Kingdom of Heaven. কতকগুলি লোক নপুংসক হয়ে জন্মায়, আর কতকগুলি লোক ভগবানলাভের জন্য নপুংসক রূপ নেয়। তিনি বলতেন—'শালা দেখবি, একবার যীশুর সময়ে কতকগুলি খোজা বেরিয়ে জগৎকে আলোড়িত করেছিল, এখন আর একবার কতকগুলি জগৎকে তোলপাড় করবে।' এঁদের কাছে আসতেন কৈলাস ঠাকুর্দা। তিনি পেনসন নিয়ে কাশীবাসী হয়েছিলেন। মঠে এসে একদিন তিনি রামকৃষ্ণানন্দকে বলেছিলেন, 'আরে ভায়া, তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়েছ, আর আমি মানুষ থেকে কেন্নো হয়েছি।' রামকৃষ্ণানন্দ বললেন, 'সেকি ঠাকুর্দা, আপনি ভাগ্যবান, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করে আপনি এ কী বলছেন?' ঠাকুর্দা তাতে বলেছিলেন, 'তবে শোনো ভায়া, কেমন করে কেন্নো হলুম! যখন একা ছিলুম, ছিল দু' পা। বে'র পর হল চার পা। নাতি নাতনীতে যখন ঘর ভরে গেল, আমারও তখন কেন্নোর মতো পা-গুলি আর গোনা যায় না। তারপর সারাদিন কাছারী করে, কাপড়-চোপড় ছেড়ে, আঙুলে পৈতে জড়িয়ে, কোষাকোষী নিয়ে ইষ্টদেবতার স্মরণ করতে বসলেই দুলাল নাতি এসে যখন 'দাদা' বলে গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ে, তখন আমার ভেতরটি ঠিক কেন্নোর মতোই কুঁকড়ে যায়।'

সংসারজীবনের এক চরম যন্ত্রণা নিয়ে কিশোরীমোহন রায় একদিন বরাহনগর-মঠে এসে হাজির। তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে—স্ত্রীকে দাহ করে এসেছেন—শুয়ে আছেন মঠের বড় ঘরটিতে একান্ত বেদনায় স্তব্ধ হয়ে—খানিক পরে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে লাফ দিয়ে উঠে বসলেন, তারপর বাড়ির পূর্বদিকের খোলাছাদে গিয়ে হাসি-ঠাট্টায় মেতে গেলেন। যেন শোকের ছায়া তাঁর মুখ থেকে সরে গেল।

গুরুভাইরা যদি কখনও একসঙ্গে কোথাও যাত্রা করেছেন, মনে হত যেন আনন্দতরঙ্গ বয়ে চলেছে। ১৮৮৬, ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি নরেন্দ্রনাথ স্থির করলেন, বাবুরাম-মহারাজকে নিয়ে আঁটপুর যাবেন। কথাটা শুনে ফেললেন শরৎ-মহারাজ ও শশী-মহারাজ। তাঁদের কাছ থেকে কথাটা আরও পাঁচ কানে ছড়াল। ফলে দেখা গেল, যাত্রার দিন যাত্রীহিসাবে হাজির নরেন্দ্রনাথ ও বাবুরাম ছাড়াও শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, সারদা, গঙ্গাধর। অগত্যা সবাই যাত্রী। "সকলে আনন্দ করিতে-করিতে বাঁয়া, তবলা, তানপুরা ও পোঁটলাপুঁটলি হাতে লইয়া হাওড়া-

স্টেশনে যাত্রা করিলেন। স্বামীজী রেলগাড়িতে বসিয়া গান ধরিলেন—শিব-শঙ্কর বোম্ বোম্ ভোলা! গুরুভ্রাতারা তাহাতে যোগ দিলেন। পথে গীতবাদ্য ও হাস্য-কৌতুক করিতে-করিতে আঁটপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন।"

কয়েকজন গুরুভাইয়ের রসিক প্রকৃতির কিছু বিশেষ পরিচয় দেবার চেষ্টা এবার করা যাক। দেখা যাবে, রসবোধে বা রসপ্রকাশে কেউই 'বঞ্চিত গোবিন্দদাস' নন। কালী-বেদান্তী বড়ই গম্ভীর, শাস্ত্রচর্চায় সদা-নিরত মানুষ—কিন্তু তিনিও কি হাসির গল্প কম বলতেন বা হাসির কাণ্ড কম করতেন! পরিব্রাজক-রূপে কাশীতে গিয়েছেন, সঙ্গে তুলসী-মহারাজ, দীন-মহারাজ। সেখানে এক ব্রাহ্মণের কথা শুনলেন যাঁর বয়স ৯০-এর বেশি, চোখ নেই, কেবল শ্বাস-প্রশ্বাস আছে, রোজ সকালে যাঁকে বাইরে রোদে বার করে পিঁড়িতে বসিয়ে দিয়ে আত্মীয়রা কাজে চলে যায়। এই কুলীন ব্রাহ্মণের পেশা—বিয়ে করা। প্রচুর বিয়ে করেছেন, পাছে ভুলে যান সেজন্য বউদের নাম খাতায় লিখে রাখতেন। যতদিন শক্তি ছিল ততদিন শ্বশুর-বাড়ি ঘুরে-ঘুরে তাঁর সুখে দিন কাটত। এখন কিছু কষ্টের অবস্থা। এই ঐতিহাসিক মাংসপিণ্ডকে দর্শন করবার ইচ্ছা হল কালীবেদান্তী প্রমুখের। বৃদ্ধের কাছে হাজির হয়ে সস্নেহে কালী-বেদান্তী জিজ্ঞাসা করলেন—'একটা বে করবে? ভাল সম্বন্ধ আছে।' বৃদ্ধ শুনতে পান না সহজে, কিন্তু বিয়ের কথা তাঁর কাছে আদি সঙ্গীত, শুনতে পেলেনই, ক্ষীণ অস্পষ্ট স্বরে বললেন—'কত দেবে?' তা শুনে সকলে সময়োপ-যোগী গালিগালাজ করে তাঁর কানে মুখ ঠেকিয়ে চীৎকার করে বললেন—'খাট দেবে, কাঠ দেবে, প্যাঁকাটি দেবে!' না, বৃদ্ধের কানে দ্বিতীয় কিছু ঢুকতে পারে না; তিনি বার-বার বলতে লাগলেন—'কত দেবে? কত দেবে?' এঁরাও বার-বার জানাতে লাগলেন, 'দেবে—অনেককিছু দেবে—খাট, কাঠ, প্যাঁকাটি, আগুন—।'

স্বামী অদ্বৈতানন্দ বা বুড়ো গোপাল শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়ে বয়সে বড় হলেও তাঁর শিষ্য। স্বামীজী মজা করে বলতেন, 'ঠাকুরের কাণ্ড দ্যাখো—বাপের বয়সী বুড়োকেও শিষ্য করেছেন।' অদ্বৈতানন্দের কাছে ছিল সকলের অবারিত দ্বার। মানুষটি বড় সরল সহজ। সবাই তাঁকে নিয়ে আমোদ করতেন—তিনিও সানন্দে তাতে যোগ দিতেন। বেলুড়-মঠে স্বামীজী একদিন দশ সের দুধে তাঁর অভিষেক করে বলেন, 'দাদা, আজ থেকে তুমি মোহন্ত হলে; সবার ভার তোমার উপর।' মঠে তিনি সবজীবাগানের দেখাশোনা করতেন, তার জন্য খাটতেন প্রচুর। ওধারে আছে ফুল-বাগান, সেখানে কাজ করছেন নতুন ব্রহ্মচারীরা—গোপালদা এধার থেকে ডাক দিয়ে বললেন, 'আহা, নতুন ছেলেরা এসেছে, ওদের অত খাটাতে নেই—ফুলবাগানে

মাটি বড় শক্ত। ওরে ছেলেরা, তোরা এখানে এসে কাজ কর্—এই মাটি নরম।' শুনে সবাই হেসে উঠত, কারণ ঠিক উল্টোটাই সত্য, সবজীবাগানের কাজে অশেষ পরিশ্রম।

গোপালদা খুবই চা-বিরোধী। অপরকে চা খেতে দেখলেই তাড়া লাগাতেন। প্রাচীনপন্থী মানুষেরা সেকালে চা-কে ভয়ানক ব্যাপার মনে করতেন। এবং গোপালদা প্রাচীনপন্থী হিসাবে আফিম খেতেন। এই নেশাটি বৃদ্ধ মানুষটির ছিল। আফিম যাঁরা খান, তাঁদের একটু দুধও খেতে হও। বরাহনগর-মঠে তাই গোপালদার জন্য অল্প দুধেরও ব্যবস্থা ছিল, যদিও দারিদ্র্যের জন্য অন্য সকলে রুক্ষ চা খেতেন। অল্পবয়সী অখণ্ডানন্দ বড়ই দুষ্ট, তাঁর খেয়াল হল বুড়ো দাদাকে নিয়ে রগড় করবেন। পরামর্শ করলেন নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে। তারপর বুড়ো গোপালের আফিমের কৌটো থেকে আফিমের গুলিগুলো বার করে নিয়ে সেই জায়গায় খয়ের আর কুইনিনের গুলি করে তাতে একটু আফিমের জল মাখিয়ে কৌটোয় রেখে দিলেন। বুড়োদাদা কিছুই জানেন না, তিনি এই অভিনব আফিম খেয়ে যেতে লাগলেন। অধিকন্তু তিনি দুধের জায়গায় কার্যতঃ সাদা রঙের জল খেলেন, কারণ, অখণ্ডানন্দ পেঁপের ডাঁটা দিয়ে দুধের কড়া থেকে দুধ টেনে খেয়ে নিয়ে একইভাবে সেখানে জল পুরে রাখ-ছিলেন। এইরকম তিনদিন চলল। বুড়োদাদা দিব্যি আছেন, শরীরে কোনও গ্লানি নেই। তিনদিন পরে অখণ্ডানন্দ হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন। শুনেই 'তবে রে শালারা' বলে বুড়োদাদা তেড়ে গেলেন। তারপর অবিলম্বে বৃদ্ধের হাই উঠতে লাগল, গা ম্যাজম্যাজ করতে আরম্ভ করল, শরীর যেন এলিয়ে পড়ল। আফিমের ডোজ ডবল করে তবে তিনি সেযাত্রা সামলালেন।

আর একবারের ঘটনা। এই গোছালো বৃদ্ধ মানুষটি রাত্রে নিজের বিছানা পেতে, মশারি গুঁজে, শৌচে গেছেন—ওধারে মটকা মেরে পড়েছিলেন অখণ্ডানন্দ—বুড়োদাদা বার হওয়ামাত্র তাঁর বালিশ সরিয়ে সে জায়গায় জুতো, ইঁট রেখে দিয়ে আবার পূর্ববৎ শুয়ে রইলেন। গোপালদাদা এসে মশারি তুলে দেখেন বালিশের জায়গায় জুতো, ইঁট। তখন তিনিও শোধ তুললেন আমোদে যোগ দিয়ে। হাসতে-হাসতে বললেন, 'গঙ্গা, এ নিশ্চয় তোর কাজ। তুই যখন এসব জিনিস রেখেছিস, তখন এই অমূল্য রতনগুলোকে মাথায় করে রাখব—এদের মাথায় দিয়ে শোবো।' গঙ্গাধর হার মানলেন। তাড়াতাড়ি উঠে ইঁট, জুতো সরিয়ে বুড়োদাদার হাতে-পায়ে ধরলেন। তারপর বললেন, 'বুড়ো সাধু হয়েছে বটে। রাগ অভিমান সব ত্যাগ করেছে।'

বৃদ্ধ একাশি বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন, তাও সহাস্যে। প্রেমানন্দ-স্বামী চিঠিতে লিখেছিলেন—"২৮শে ডিসেম্বর ( ১৯০৯ ) মঙ্গলবার বেলা ৪॥ ঘটিকার সময় গোপালদাদা স্বধামে গমন করেছেন। সামান্য জ্বর হয়েছিল মাত্র।...শেষ সময়ের

মুখকান্তি অতি সুন্দর।…সে সময়ে মতি-ডাক্তার উপস্থিত ছিল। লেবু-দুধ খেলেন। মতিবাবুকে নমস্কার ক'রে হাসিতে-হাসিতে দেহত্যাগ।"

বৃদ্ধ গোপালদাদার উল্টোদিকে বালক সুবোধের ছবি। সুবোধানন্দ রামকৃষ্ণ-সংঘে খোকা-মহারাজ নামে পরিচিত। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য, কিন্তু তুলনায় কমবয়সী বলে স্বামীজী প্রভৃতি এঁকে খুবই স্নেহদৃষ্টিতে দেখতেন। খোকা-মহারাজ তাঁর বালকভাব জীবনের শেষপর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি দীক্ষা দিতেন না, বলতেন, 'আমি কি জানি, আমি যে খোকা; তোমরা রাখাল-মহারাজ কিংবা মায়ের কাছে যাও।' শাস্ত্রীয় ধর্মতত্ত্ব কথা বলতে চাইতেন না, কারণ তিনি যে খোকা! তাঁর সান্নিধ্য অপরকে নির্মল আনন্দে পূর্ণ করে দিত। কেন—কি ভাবে? তিনি বলতেন—'আমি যা পেয়েছি, জেনেছি ও যাতে আনন্দে আছি, তাই তোমায় দিয়েছি।'

'সদা হাস্যময় ও সারল্যমণ্ডিত' এই মানুষটির মুখ—এঁকে বয়স্ক গুরুভাইরা কী স্নিগ্ধ স্নেহের সঙ্গে দেখতেন তা বোঝা যায় স্বামী শিবানন্দের কথা থেকে। শিবানন্দ তখন অসুস্থ, সুবোধানন্দও অসুস্থ। অসুস্থ শিবানন্দ সুবোধানন্দের অসুখের কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে ডাক্তারকে বললেন, 'ও ছোঁড়াকে দেখেছ, ও কেমন আছে?' সবাই অবাক, মহাপুরুষ কার কথা বলছেন? সকলকে নীরব দেখে মহাপুরুষ বললেন, 'ঐ যে পাশের ঘরে আছে, খোকা—ছোঁড়া! ও নেহাত খোকা। নিজের শরীরের যত্ন নিতে পারে না।' সবাই হেসে উঠল, কারণ বক্তার বয়স যদিও ৭৩, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি একেবারে বালক নন—তাঁর বয়স ৬১।

স্বামীজী খোকা-মহারাজকে সন্তানবৎ দেখতেন। সর্বদাই তাঁকে নিয়ে কৌতুক করতেন। সরল খোকা-মহারাজও স্বামীজীর সঙ্গে ব্যবহারে নিঃসঙ্কোচ ছিলেন। সেজন্য "স্বামীজীকে গম্ভীর, চিন্তান্বিত কিংবা বিরক্ত দেখিলে তাঁহার নিকট অপরে অগ্রসর হইতে না পারিলেও খোকা-মহারাজ নিঃসঙ্কোচে যাইতেন এবং স্নেহপাত্রের সন্দর্শনে স্বামীজীর ভাব সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইত। অতএব বয়োজ্যেষ্ঠরা অনেক ক্ষেত্রে 'খোকা'র সাহায্যে কার্যোদ্ধার করিতেন।"

খোকার আকাঙ্ক্ষাও খোকারই মতো। "একবার খোকা-মহারাজের সেবায় প্রসন্ন হইয়া স্বামীজী বর দিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, 'এমন বর দিন যাতে কোনোদিন আমার সকালে চা বাদ না পড়ে।'. স্বামীজী ইহাতে সহাস্যে কহিলেন, 'তাই হবে।' সে অমোঘ বর নিষ্ফল হয় নাই। চায়ের প্রতি তাঁহার একটা সহজাত প্রীতি ছিল—ইহা যেন ক্ষুদ্র শিশুর লজেন্স প্রভৃতির প্রতি আকর্ষণেরই অনুরূপ। আর এই ভালবাসা তাঁহার শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। চা ছিল তাঁহার দৃষ্টিতে সর্বরোগহর মহৌষধ।"

খোকা-মহারাজকে নিয়ে একটি অত্যন্ত কৌতুকজনক ঘটনা আছে। গুরুভাইরা যাতে সভাসমিতিতে বক্তৃতা করতে পারেন, সে বিষয়ে স্বামীজী সচেষ্ট ছিলেন। আমেরিকা থেকে ফেরার পরে আলমবাজার-মঠে তিনি প্রতি সপ্তাহে বক্তৃতা-শিক্ষার অধিবেশন বসাতেন। সেখানে স্বামীজীর তাগিদে বা দাবড়িতে সকলকে বক্তৃতা করতে হত, কারো অব্যাহতি ছিল না। নীলাম্বরবাবুর বাগানের মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এমনই এক পরিস্থিতিতে অদ্ভুত উপস্থিতবুদ্ধি দেখিয়ে অল্পে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। স্বামীজী প্রথমেই আহ্বান করেছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দকে। "ব্রহ্মানন্দ-স্বামী ফাঁপরে পড়লেন। ...কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়েই তিনি বললেন, 'সভাপতি-মহারাজের আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু আপনারা আমাকে মাফ করবেন, আমি আজ মোটেই প্রস্তুত হয়ে আসিনি।' বলেই বসে পড়লেন।"

কিন্তু বেচারা 'খোকা' সেইভাবে পার পাননি। তাঁকে অগত্যা বক্তৃতা করার চেষ্টা করতে হয়েছিল। "তিনি কম্পিত হৃদয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু এ কি! পদতলে ভূমি কম্পমান কেন? আর দূরে ঐ শঙ্খধ্বনিই বা কেন? ক্রমে পুষ্করিণীর জল তীর অতিক্রম করিয়া আছড়িয়া পড়িতে লাগিল। ততক্ষণে কাহারও বুঝিতে বাকি ছিল না যে, ইহা প্রচণ্ড ভূমিকম্প (১২ জুন, ১৮৯৭)। সভা ভাঙিয়া গেল, এবং খোকা-মহারাজ নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু ইহাতেও গুরুভ্রাতারা আনন্দ-উপভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন না। ভূমিকম্পান্তে স্বামীজী সহাস্যে বলিলেন, 'খোকার বক্তৃতায় পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল।' "

বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে যত আনন্দ। খোকা-মহারাজের শেষ সময়ের কথা। ডুবে আছেন অন্তরসাগরে। একদিন বললেন—"সেদিন ভোর-রাত্রে স্বপ্ন দেখছিলুম দেহটা ছেড়ে গেছি। রাখাল-মহারাজ, বাবুরাম-মহারাজ, যোগীন-মহারাজ—এঁদের সব দেখলুম। কেবল স্বামীজীকে দেখলুম না। ওঁরা বললেন—'বসো বসো।' আমি বললুম—না, আগে বলো স্বামীজী কোথায়? ওঁরা বললেন—'তিনি এখানে কোথায়? তিনি যে অনেক দূরে—তিনি ঈশ্বরে তন্ময় হয়ে আছেন।' 'তা হোক অনেক দূরে, আমি চললুম তাঁর কাছে'—এই বলে রওনা হলুম। সেখানে দেখলুম কেবল আনন্দ। আনন্দসাগরে তাঁরা বাস করছেন, মহা আনন্দে আছেন সব।"

হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, যিনি পরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ হন—খুবই গম্ভীর-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তিনি ছাত্রজীবনে কৃতী, কর্মজীবনেও সফল, ভারত-সরকারের অধীনে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন—কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শ এমনই অমোঘ যে, সব ছেড়ে তাঁকে সন্ন্যাসী হয়ে পড়তে হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার তাঁর সঙ্গে কুস্তি লড়েছিলেন। বলাই বাহুল্য জোয়ান যুবক হরিপ্রসন্ন জিতেছিলেন। পরাভূত

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বলেছিলেন—'কি রে, হারিয়েছিস তো!' অনেকদিন পরে এক ভক্ত এ-বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন—'ঠাকুরের সঙ্গে কুস্তিতে কে জিতেছিলেন—আপনি?' মহানন্দে বিজ্ঞানানন্দ বলেছিলেন—'কই আর জিতলাম? ঠাকুরই জিতলেন। নচেৎ তাঁর হয়ে গেলাম কেন? যে হারে, সে-ই তো যে হারায় তার হয়ে যায়!'

অবাক রামকৃষ্ণকে দেখে বিজ্ঞানানন্দ অবাক!—"ঠাকুরকে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যেত—তিনি যেন জগৎসংসারকে দেখে অবাক হয়ে রয়েছেন। জগতের লোকেরা কী ভুল বস্তু নিয়ে আছে—কী অনিত্য বস্তুকে নিয়ে আছে। তিনি আশ্চর্য এই দেখে যে—এমন মানুষ কি হয় যারা অনন্ত সুখ ছেড়ে ক্ষণস্থায়ী সুখে মত্ত হয়ে থাকতে পারে!"

অনন্ত সুখের ঐ মানুষটির কথা বলেছেন বিজ্ঞানানন্দ—

"তাঁর মুখের হাসি অপূর্ব। অমন হাসি কখনও দেখিনি। যখন হাসতেন তখন তাঁর মুখে-চোখে, এমন কি সর্বাঙ্গে যেন একটা আনন্দের ঢেউ খেলে যেত।"

ভিতরের আনন্দে বুঁদ হয়ে থাকতেন বলে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞানানন্দের থোড়াই-কেয়ার ভাব ছিল। বিচিত্র তাঁর পোশাক। একটা মস্ত ঢোলা আলখাল্লা পরতেন, যার ছোট-বড় অজস্র পকেট, দু'একটা এমন বড় যে, টেলিফোন-গাইড পর্যন্ত ঢুকে যায়; পায়ে একসঙ্গে গোটাতিনেক মোজা; একটা ঢাউস জুতো, তার আদি বর্ণ আবিষ্কার করতে গবেষণা করতে হয়; মাথায় কান-ঢাকা টুপি। এই পোশাকে, নড়বড়ে মস্ত চেহারা নিয়ে, বিজ্ঞানানন্দ যখন এলাহাবাদের পথে চলতেন (তিনি ওখানেই বেশি সময় থাকতেন), তখন রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে পড়ত। বিজ্ঞানানন্দ মহাখুশিতে আত্মপরিচয় দিতেন—'ক্যা দেখতে হো? হাম্ বন্দর হ্যায়—রামজীকা বন্দর!'

রাম-ভক্ত বিজ্ঞানানন্দ 'রাম' শব্দ নিয়ে খেলাও করতেন—'রাম মানে কি জানো? এক রকম মদ (রাম্)। না খেলে বোঝা যায় না।'

'ভূত' শব্দ নিয়েও খেলা ছিল। শিষ্যকে প্রশ্ন করলেন—'ভূত দেখেছ?' শিষ্য বললেন—'না।' বিজ্ঞানানন্দ—'আরে, তোমার শরীরেই আছে—একটা নয়, পাঁচটা—পঞ্চভূত। ভয় নেই, রামনাম করবে, ভূত পালিয়ে গিয়ে রাম এসে বসবেন।'

কি করে ভূত তাড়াতে হয় বিজ্ঞানানন্দ তা শিখিয়েছিলেন। গালাগালির ভূত কি করে তাড়াতে হয়, তাও শিখিয়েছিলেন বুদ্ধদেবের দৃষ্টান্ত দিয়ে। ঘটনাটিতে বুদ্ধদেবের বাস্তব বুদ্ধি এবং তীক্ষ্ণ রসবোধের পরিচয় আছে। এক ব্যক্তি বুদ্ধকে সামনে পেয়ে যাচ্ছেতাই গাল পাড়ছিল। বুদ্ধ সমস্ত কথা চুপ করে শুনলেন। লোকটির দম ফুরোল। বুদ্ধকে চুপ দেখে সে আরও চটে গিয়ে প্রশ্ন করল—কি হল, কোনও উত্তর নেই যে? তখন বুদ্ধদেব মৌনভঙ্গ করলেন।

বুদ্ধ—কেউ যদি কারও কাছে উপঢৌকন নিয়ে যায়, আর সে তা গ্রহণ না করে, তাহলে উপঢৌকনগুলি কোথায় যায় ?

লোকটি—যে নিয়ে এসেছিল, সে ফেরত নিয়ে যায়।

বুদ্ধ—আপনি আমাকে এতক্ষণ যা দিচ্ছিলেন, আমি তার কিছুই গ্রহণ করি'নি। আপনি সব ফেরত নিয়ে যান।

একদিনের একটি অপূর্ব ছবি : উপরে নির্মল আকাশ ; অগণিত নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। তার দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞানানন্দ বললেন—'ওরা আমার সব বন্ধু, কেমন ঝিক্‌মিক্ করছে।' একটু চুপ করে থেকে এক ভক্তকে বললেন—'একটা গল্প বলো।' ভক্ত বললেন—'আপনি বলুন!' বিজ্ঞানানন্দ বললেন—'আমি গল্প বলব ? আমি কি শেষকালে ঠাকুমা হয়ে গেলাম!...তা গল্প—হ্যাঁ হে!...সবই তো গল্প—বাস্তবিকই গল্প! পৃথিবীটাকে যদি গল্প মনে করে নেওয়া যায়, তাহলে কত আনন্দ! আর এটাকে সত্য মনে করলে কত কষ্ট।'

জীবনে কষ্ট আছে, বিজ্ঞানানন্দ অস্বীকার করেননি। এক গ্রীক দার্শনিকের কথা বলেছিলেন, যাঁর মত ছিল—এ-জগৎ স্বপ্ন! কয়েকজন দুষ্ট ছেলে তাঁকে রাস্তায় ফেলে, পায়ে দড়ি বেঁধে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। তাঁর শরীর যখন ক্ষত-বিক্ষত, রক্ত ঝরছে, তখন ছেলেগুলো জিজ্ঞাসা করল—'কি, এখনও জগৎটা স্বপ্ন নাকি ?' দার্শনিক বললেন—'হ্যাঁ, স্বপ্ন, তবে বড় কষ্টকর স্বপ্ন '

বিজ্ঞানানন্দের কাছে এ-জগৎটা আনন্দের স্বপ্ন। সকলের মধ্যেই তিনি আনন্দের অক্ষয় উৎস দেখেন। শিষ্য তাঁকে বললেন—'মহারাজ, আপনার কাছে এলে আনন্দ হয়, তাই আসি।' বিজ্ঞানানন্দ বললেন—'আপনাদের দেখলে আমারও আনন্দ হয়—তিনি তো আপনাদের ভেতর আছেন।'

বিবেকানন্দকে বিজ্ঞানানন্দ ভয় করতেন—তাঁর মহারুদ্র-রূপ প্রায়ই দেখেছেন। কিন্তু জানতেন—ঐ রুদ্র এখনি শিবরূপ ধারণ করবেন। তখন শুধু আনন্দ আর আনন্দ। শিবকণ্ঠে আছে রুদ্রাক্ষের মালা। বিজ্ঞানানন্দ বলেছিলেন—

"কৈলাসে মহাদেব ধ্যানস্থ। তাঁর নয়ন থেকে আনন্দাশ্রুপাত হচ্ছে। তার এক-একটি বিন্দু এক-একটি রুদ্রাক্ষের দানা।"

লম্বা ঢোলা জামা-পরা গম্ভীরপ্রকৃতি বিজ্ঞানানন্দকে বিবেকানন্দ স্নেহে কৌতুকে 'এলাহাবাদের বিশপ' বলতেন, আগেই দেখেছি। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের নাম নিয়ে স্বামীজীর কৌতুকের কথাও জেনেছি। ত্রিগুণাতীত মানুষটি বিচিত্র। আচরণে বিপরীতের সমষ্টি। স্থূল বিশাল চেহারা, মনে হত চলাফেরা করা তাঁর পক্ষে শক্ত, কিন্তু তিব্বত ঘুরে এসেছিলেন। খেতে পারতেন প্রচুর, এত বেশি যে, অলৌকিক

কাণ্ড বলে মনে হত, আবার না খেয়ে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারতেন। রক্তআমাশা হলে যখন বার্লির ব্যবস্থা হল—প্রচুর মিষ্টি খেয়ে ডাক্তারকে বললেন—সেরে গেছি—অনেক খেয়েই সারলুম। কম্পজ্বরকেও সারিয়ে দিলেন আচ্ছা করে স্নান করে ও প্রচুর খেয়ে! খাদ্যের ক্ষেত্রে বস্তুবিচার তিনি প্রায় ত্যাগ করেছিলেন। একবার স্নানান্তে কিছু না পেয়ে কচি ঘাস খেয়েই পিত্তিরক্ষা করেছিলেন!

কিংবা আর একবার—। শ্রীমা সারদাদেবী তাঁকে ঝাল লঙ্কা কিনতে দিয়েছেন। শ্রীমার আদেশ—সুতরাং আসল ঝাল লঙ্কা চাই। ত্রিগুণাতীত বাগবাজার থেকে লঙ্কা চাখতে-চাখতে এগোলেন—সরেশ ঝাল পেলেন বড়-বাজারে পৌঁছে—কিনলেন—ফিরে এলেন বাক্‌রুদ্ধ হয়ে, কারণ লঙ্কা চাখার চোটে জিভ গলা ফুলে ঢোল।

লোকটি বোকা? মোটে নয়! এঁর তিব্বতভ্রমণকাহিনী ছাপা হয়েছে ইণ্ডিয়ান মিরারে, উদ্ধৃত হয়েছে ভারতের নানা সংবাদপত্রে। উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ইনি—বুকের রক্ত দিয়ে পত্রিকাকে দাঁড় করিয়েছেন। সেখানে যেসব সম্পাদকীয় লিখেছেন, তার মধ্যে যথেষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। সানফ্রানসিসকোতে বেদান্ত-প্রচারের জন্য ইনি গিয়েছিলেন—সেখানকার হিন্দুমন্দির এঁর অক্ষয় কীর্তি। পাশ্চাত্ত্যে সেই প্রথম হিন্দু-মন্দির। ওখানেই তিনি মারা যান—এক উন্মাদের বোমার আঘাতে। যখন তিনি মুমূর্ষু তখন তাঁকে আততায়ীর বিরুদ্ধে বলবার জন্য বলা হয়েছিল—তিনি হেসেছিলেন।—হেসে ক্ষমা করেছিলেন। স্বামীজী তাঁকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করতেন। স্বামীজীর জন্য ত্রিগুণাতীতের এক অন্তিম হাসি ছিল—তিনি বলেছিলেন—বিবেকানন্দ-জন্মোৎসবের দিন দেহত্যাগ করবেন—তাই করেছিলেন—প্রাণপ্রিয় জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতার মজলিশে যোগদানের জন্য।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ যৌবনে 'উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, কোঁকড়ানো-কোঁকড়ানো দাড়ি, হস্ত ও অবয়ব দীর্ঘ, যেন কসরত-করা শরীর; কথাবার্তায় খুব পটু; মজলিশী, কিন্তু গম্ভীরস্বভাব ও খুব তেজস্বী।' নিরঞ্জনানন্দের বিষয়ে বেশী কাহিনী আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। অপরদিকে প্রেমানন্দের বিষয়ে যদিও অনেক কাহিনী আছে, সেগুলি কিন্তু প্রধানাংশে ভাবপ্রেমে ভরপুর। স্বামীজী প্রেমানন্দের ভাববিহ্বলতা নিয়ে কি ধরনের ঠাট্টাতামাশা করতেন, এবং প্রেমানন্দ কি রকম মধুর প্রতিশোধ নিয়েছেন—তার বিবরণ আগে দিয়ে এসেছি। খোল বাজিয়ে বলিদানের একটা মজার ঘটনা এখানে শুনে নেওয়া যায়। বরাহনগর-মঠে সন্ন্যাসীরা কালীপূজা করেন—তাতে নরেন্দ্রনাথের ইচ্ছায় পাঁঠাবলি হয়, যদিও ব্রহ্মানন্দ-প্রমুখ অনেকের মত ছিল না। নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আরে একটা পাঁঠা কি, যদি মানুষ বলি দিলে ভগবান পাওয়া যায়, তাই করতে রাজি আছি।' যাই হোক, যখন বলি হচ্ছে,

তখন প্রেমানন্দ তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরে গিয়ে খোল বার করে এনে বাজাতে লাগলেন। তাই দেখে নরেন্দ্রনাথ, নিরঞ্জনানন্দ, যোগানন্দ প্রভৃতি সকলে মিলে বাবুরামকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশার একশেষ করলেন : 'শালা, বৈরিগীর মত বিট্‌কেলমি, খোল বাজিয়ে বলি কবা!' বাবুরামকে এসব সহ্য করতে হত। মাঝে-মাঝে কষ্টবোধ করতেন না, তা নয়। একবার তো মতান্তরেব কারণে দুঃখে মঠ ছেড়ে যাচ্ছেন, সম্বল পরনের ধুতি এবং আর একটি ধুতি ও কাঁধে গামছা। কিন্তু যেই ফটকের বাইবে পা বাড়াতে যাচ্ছেন, অমনি গামছায় টান—দেখলেন, আর কেউ নন, ঠাকুর গামছা ধরে আছেন, বলছেন, 'যাচ্ছ কোথায় চাঁদ, আমাকে ফেলে যাবে কোথায়?'

ইয়ার্কি এখানেও।

স্বামীজীর ঠাট্টা-তামাশা থেকে মনে হতে পাবে, প্রেমানন্দ-স্বামী বুঝি নাকের জলে চোখের জলে কাদা-কাদা এক পদার্থ ছিলেন। মোটে নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, বাবুরামের ভাব হবে না, জ্ঞান হবে। ঐ জ্ঞানে-পোড়ানো প্রেমের চেহারা কি রকম, একটি ঘটনায় বোঝা যায়। মালদহে প্রেমানন্দ গেছেন উৎসব উপলক্ষে। সেখানে উপস্থিত সকলকে সেবা, কর্ম ইত্যাদির কথা বলছেন। তাতে ক্ষুণ্ণ হয়ে এক ভক্ত বললেন—মহারাজ, আমরা একটু প্রেম-ভক্তির কথা শুনতে এসেছিলুম। ভক্তটি কয়েকবার ঐ কথা বললেন। তখন ফিরে গর্জে উঠলেন প্রেমানন্দ। "কাকে বলব প্রেমভক্তির কথা? অধিকারী কোথায়? ঘটনা শুনুন! পসারী ডেকে ডেকে ফিরছিল—'প্রেম নেবে গো! প্রেম নেবে গো!' শুনে অনেকে এগিয়ে এল। তখন পসারী বললে, 'প্রেম নাও, বিনিময়ে দাও কাঁচা মাথা।' তখন সবাই ভয়ে পিছিয়ে গেল। হাঁ—সবাই মুখে প্রেমভক্তি চায়—প্রেম খুব সস্তা তো!"

প্রেমানন্দ একদিন ছেলেদের ভয়ানক বকাবকি করছিলেন। তারপর হঠাৎ থেমে গেলেন। হেসে ফেললেন নিজের রাগের চেহারা দেখে—'এ আবার কেমন প্রেমানন্দ —প্রেম-আনন্দ রে বাবা!'

রামকৃষ্ণানন্দ ভক্ত বটে কিন্তু বীরভক্ত। শরীরে ও মনে তাঁর দারুণ শক্তি। সাধারণভাবে হাসি-তামাসার লোক নন, কিন্তু ও-বস্তুকে এড়িয়েও চলতে পারতেন না। "শশী-মহারাজ যদিও খুব গম্ভীর ছিলেন, কিন্তু মাঝে-মাঝে তিনি বালকের ন্যায় আনন্দ ও গল্প করিতেন। এই গল্পটি বলিয়া তিনি বিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিতেন। এক গ্রামে দুটি ভাই ছিল। একটি ভাই এক বাবুর সহিত কলিকাতায় আসিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিল। তাহারা গরিব লোক, গ্রামের একটা কুটীরে থাকে। পূজার সময়ে বাবুরা বাড়ির ছেলেদের কাপড়জামা কলিকাতা হইতে তৈয়ারী করিয়া দিল এবং সেইসঙ্গে গরিব ছেলেটিকেও একটি পিরান তৈয়ারী

করিয়া দিল। ছেলেটি গ্রামে ফিরিয়া গিয়া তাহার ভাই ও সমবয়সী অনেক ছেলেকে 'কলিকাতা থেকে আমি একটা নূতন জিনিস এনেছি, তোদের দেখাব' বলিয়া ডাকিল। তাহার পর সে ঘরের ভিতর গিয়া দোরে খিল দিয়া পিরানটি বাহির করিয়া, বুকে বোতাম দিয়া পরিয়া বাহিরে আসিল। গ্রামের ছেলেরা দেখে অবাক যে, 'এর এতবড মাথা ছোট্ট গর্তের ভিতর দিয়ে কি করে বেরিয়ে এল?' তখন তাহারা সেই বালকটির চারিদিকে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া দরজা কোথায় দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা দরজা দেখিতে না পাইয়া বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁ ভাই, ওর তো দরজা নাই, তুই মাথা গলালি কি করে?' তখন সে, অপর সকল বালকের হার হইয়াছে দেখিয়া নাচিয়া-নাচিয়া হাততালি দিয়া বলিতে লাগিল, 'আমি ত বোল্‌বুনি, বোল্‌বুনি, বোল্‌বুনি।' শশী-মহারাজের কোনও কিছু আনন্দ হইলে প্রায় বলিতেন, 'আমি ত বোল্‌বুনি, বোল্‌বুনি, বোল্‌বুনি।' " তিনি মাঝে-মাঝে মার্ক টোয়েনের 'ইনোসেন্ট অ্যাট হোম' ও 'ইনোসেন্ট অ্যাব্রড্' পড়তেন অঙ্গভঙ্গি ক'রে—তাতে সবাই হেসে লুটোপুটি করত।

শশীর ঠাকুরঘরের সবচেয়ে বড 'শত্রু' নরেন্দ্রনাথের প্রতিই শশীর সর্বাধিক ভালবাসা। তারই জন্য শশী ও শরৎ সন্ন্যাস নেবার পরেও প্রস্তাব করেছিলেন, তাঁরা বালির একটা স্কুলে মাস্টারি করতে যাবেন, কেননা নরেন্দ্রনাথ পারিবারিক মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন, ফলে ভাণ্ডে ভবানী বিরাজিতা। বিচলিত হয়ে নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আরে শরৎ, আরে শশী, করিস কি? তোরা আমার জন্য প্রাণ দিতে পারিস তা জানি কিন্তু এখন ওসব করতে হবে না।'

শরৎ ও শশী বিবেকানন্দের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন—শুধু প্রাণ নয়—সেই সঙ্গে আরও কিছু। যে-শশী ঠাকুরঘর ছেড়ে পরিব্রজ্যাতেও যাননি—তিনিই দূর মাদ্রাজে একাকী গিয়েছিলেন, বিবেকানন্দের ইচ্ছায়, শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মবিস্তারে।* মাদ্রাজে রামকৃষ্ণানন্দের যাতনাময় সংগ্রামের ইতিহাস কোনদিন কেউ লিখে উঠতে পারবে না। লড়তে-লড়তে যখন ক্লান্ত হয়েছেন, ঝুঁকে পড়েছেন, তখন বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে অভিমানে পূর্ণ হয়েছে মন, রেগে চিৎকার করে বলেছেন, 'তুই কোথায়

* শশীর যে-সব বিবরণ দিয়েছি, তার থেকে মনে হতে পারে, তিনি বাড়াবাড়ি-রকম আনুষ্ঠানিক ছিলেন। তাঁর আনুষ্ঠানিকতার মূলে কি ছিল তা তিনি হেসে বুঝিয়েছিলেন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রকে। ১৯০৫ সালে রামকৃষ্ণানন্দ রেঙ্গুনে যান। সেখানে একদিন ঠাকুরের জন্য চাঁপাফুল যোগাড় করতে তিন-চার মাইল পথ হেঁটেছিলেন।—'এই বৃথা পরিশ্রম কেন?'—শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন। কবিতায় উত্তর দিয়েছিলেন শশী-মহারাজ—

'পূজা উপাসনা সকলই গো ফাঁকি,
শুধু এই সুযোগে তোমারেই ডাকি।'

আমায় পাঠিয়েছিস, তোর জন্ম আমার এই অবস্থা, খেটে-খেটে প্রাণটা গেল'—তারপরেই আছাড় খেয়ে প্রণিপাত করে বলেছেন, 'ভাই, না-বুঝে ওকথা বলেছি, ক্ষমা করো ; তুমি যা বলবে, তাই করব।' রামকৃষ্ণানন্দ যখন ঐ কথা বলেছেন, তখন বিবেকানন্দ সামনে ছিলেন না, ছিল তাঁর ছবি-মাত্র ! চিত্ররূপে বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণের সামনেও একই অভিমানের আর্তনাদ। "একদিন কার্যান্তে ঘর্মাক্তকলেবরে ( মাদ্রাজ- ) মঠে ফিরিয়া দেখিলেন, ঠাকুরকে ভোগ দিবার মতো কিছুই নাই। তখন গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া বদ্ধদ্বার গৃহে রুদ্ধ অভিমানে পুরুষসিংহ পাদচারণ করিতে-করিতে ঠাকুরকে বলিলেন, 'পরীক্ষা হচ্ছে ? আমি তোমায় সমুদ্রতীর থেকে বালি এনে ভোগ দেব এবং তাই প্রসাদ পাব। পেট নিতে না চায়, আঙুল দিয়ে ঠেলে সে প্রসাদ গলায় ঢোকাব।' "

শশীর যন্ত্রণায় বিবেকানন্দ হাসছিলেন না কাঁদছিলেন বলতে পারব না—একই যন্ত্রণা তিনিও পেয়েছেন। কিন্তু একথা নিশ্চয় বলতে পারব—যখন দেহত্যাগ করলেন, তখন প্রিয় ভাই শশীর উদ্দেশে মজার হাসি ছুঁড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। ঐ সময়ে শশী-মহারাজ মাদ্রাজে আছেন, রাত্রে হঠাৎ দেখলেন, স্বামীজী সামনে দাঁড়িয়ে হেসে বলছেন—'শশী, শশী, শরীরটাকে থু-থু করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।'

শশী-মহারাজের কি মনে পড়ছিল ঠাকুরের মহাসমাধি-দৃশ্যের কথা ? ঠাকুরের দেহান্তের পরে শশী-মহারাজ দেখলেন—'ঠাকুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর দিয়া আনন্দ-হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে—এত আনন্দোচ্ছ্বাস তিনি পূর্বে দেখেন নাই।'

সারদানন্দ-স্বামী জমিয়ে গল্প জুড়তেন। সে সময়ে তিনি নিজে হাসতেন না—শ্রোতারা হাসিতে ধৈর্যহারা হত। সব গল্পই কিন্তু নিছক কৌতুকের ছিল না। হাসির সুরে করুণ গল্পও বলতেন। যেমন মুটের আকাঙ্ক্ষার কাহিনীটি :

গ্রীষ্মকালে একটি মুটে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। বাতাসে আগুনের হলকা—রাস্তাও আগুন-গরম। মুটে দরদর ঘামছে। তার পা যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। একটু ছায়া দেখে মাথার মোট নামিয়ে সে হাঁপাতে লাগল—'আল্লা যদি দিন দেন তো রাস্তায় গদি বিছাইয়া মোট বইমু।'

গল্পটি হিউমারধর্মী। বিশুদ্ধ কৌতুক ছিল কলকাতায় নবাগত গাঁইয়া মানুষটির গল্পে। লোকটি ভয়ে বাড়ির বার হত না। জানলা দিয়ে দেখা যেত, সে অঝোরে কাঁদছে। কৌতূহলী হয়ে কেউ হয়ত তাকে জিজ্ঞাসা করল—'কি ব্যাপার ? বাপু এত কাঁদছ কেন ?' শুনে সে ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠত, আর বলত—'রাস্তা দিয়ে অত গাড়ি-ঘোড়া যাচ্ছে। ওরা যদি ছিটকে ঘরে ঢুকে পড়ে তাহলে আমার হাত-পা ভেঙে যাবে, আমি মারা যাব, আমার দেশে যাওয়া হবে না।'

আরও একটি কৌতুকের গল্প, গুলিখোরের। এ গল্প বাংলাদেশের সাধারণ সম্পত্তি।—

"দুই বন্ধু, একজন মাতাল ও একজন গুলিখোর, পথে যেতে-যেতে এক হালুইকরের দোকানে খাবার কিনল। হালুইকরের দোকানে তখন টাকা ভাঙানোর পয়সা ছিল না। তারা হালুইকরের দোকান থেকে ছয় আনার খাবার কিনল। তারপর হালুইকরকে একটি টাকা দিয়ে বাকী দশ আনা পরদিন নিয়ে যাবে স্থির করল। যাবার আগে ঠিক স্থানটি নির্ণয় করে যাওয়ার প্রয়োজন। তারা দেখল, দোকানের সামনে একটা ষাঁড় শুয়ে আছে। ঐ ষাঁড়টিকেই তারা চিহ্ন স্থির করল। পরদিন আবার নেশা করে তারা দশ আনা পয়সা আদায় করতে এল। ঘটনাচক্রে সেই ষাঁড়টি একটা লম্বা দাড়িওয়ালা দরজির দোকানের সামনে শুয়েছিল। গুলিখোর গিয়ে দাড়িওয়ালা দরজিকে বলল, পয়সা দাও। সে তো অবাক। খামকা পয়সা দেবে কেন? তখন গুলিখোর তম্বিতাম্বা শুরু করল। বলল, 'কি বাবা, দশ গণ্ডা পয়সা ফাঁকি দেবার জন্য একেবারে ভোল ফিরিয়ে বসে আছো? কাল ছিলে হালুই-কর, আর আজ হলে দরজি! আর বাবা রাতারাতি দাড়ি পর্যন্ত গজিয়ে ফেললে! এখনো সাক্ষী সাদা ষাঁড় শুয়ে আছে। গুলি খাই বলে মনে করোনা যে, আমার ভুল হয়েছে!"

পরিব্রাজক-জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনীও গল্পাকারে সারদানন্দ বলতেন। সারদানন্দ ভিক্ষা করতে গেছেন—তিনি আবার একটু ভারী চেহারার—'নারায়ণ হরি' বলে এক বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছেন—এক বয়স্কা রমণী বেরিয়ে এলেন, দেখেন যে ভদ্রলোকের ছেলে ভিক্ষায় এসেছে। অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে বললেন—'এমন গতর হয়েছে, ভিক্ষে করে খাচ্ছ কেন? ট্রামের কণ্ডাক্টরী করতে পারো না?'

হৃষীকেশের বৃদ্ধ সাধুর কাহিনী অতীব মনোহারী।—"সাধুটি আনন্দময় পুরুষ ও মহাত্যাগী। সকালে স্নান সেরে আসনে বসে গীতাখানি খুলে অনেকক্ষণ ঈশ্বরচিন্তা করতেন। তারপর পাশ থেকে একখানি লাঠি (গদকা) তুলে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে, তবে কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। শরৎ-মহারাজ সাধুর কাছে গীতাব্যাখ্যা শুনতে উৎসুক হন। সাধু তাতে সরলভাবে বললেন, তিনি মূর্খ, লেখাপড়া কিছু জানেন না, কেবল প্রথা অনুযায়ী গীতা খুলে বসেন। অতঃপর সাধু তাঁর পূর্বপরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছেন, স্ত্রী-পুত্র ছিল, তাদের ভরণপোষণের উপায় না দেখে ডাকাতি করতে আরম্ভ করেছিলেন। একদিন রাত্রে বেরিয়ে রাস্তায় এমন কোনো লোক পেলেন না, যাকে লুণ্ঠন করা যায়। ওধারে স্ত্রী-পুত্র ক্ষুধার্ত—কিছু নিয়ে গেলে তবে তারা খেতে পাবে। শেষে স্থির করলেন, ঐ যে কাছে শিব-মন্দির আছে, তার মধ্যে নিশ্চয় পূজার বাসনপত্র বা অন্য জিনিস পাওয়া সম্ভব।

শিবমন্দিরের দরজা ভেঙে ঢুকলেন, কিন্তু হায়, অন্ধকারে হাতড়ে কিছু পেলেন না। তখন মহারাগে হাতের লাঠি দিয়ে শিবমূর্তিকে পেটাতে লাগলেন। খানিক পরে মনে হল—তিনি এ কী করছেন! হিঁদুর ছেলে, তায় ব্রাহ্মণ—মন্দিরে চুরি করতে এসেছেন, আবার না পেয়ে বিগ্রহ ধ্বংস করছেন। তাঁর মনে ধিক্কার এল, সেইসঙ্গে বৈরাগ্য। তৎক্ষণাৎ হাতের লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, বাড়িঘরের কথা মনে রইল না, এক জায়গায় এক সাধুর কাছে সন্ন্যাস নিলেন, তারপর মহা আনন্দে আছেন। বৃদ্ধ সাধু শরৎ-মহারাজকে তারপব বললেন—আমার আসল গুরু কিন্তু এই লাঠিটি—এ-ই আমার চৈতন্য দিয়েছে—একে তাই নিত্য প্রণাম করি।"

শিবঠাকুরের প্রতি শরৎ-মহারাজেরও একটু বেশি ভালবাসা। শিব সকলের দেবতা—দীন দরিদ্র অন্ত্যজদেরও দেবতা। সারদানন্দ এই সবার দেবতার ভক্ত। আনুষ্ঠানিকতা তাঁর তত পছন্দের জিনিস নয়। তাঁর দেবতা-বিচার বেশ কৌতুকপূর্ণ হয়ে দাঁড়াত :

"শিব ছাড়া সব দেবতাই নিজে আলাদা থাকতে চাইছে। তাদেব বিশেষ পূজা-পদ্ধতি, বিশেষ পূজক, বিশেষ শ্রেণীর ভক্ত। এই বিষ্ণুব ব্যাপার দ্যাখো না! পূজার কত কড়াকড়ি নিয়ম, পদ্ধতি, অনুষ্ঠান; কয়েকজন পূজক ছাড়া কেউ তাঁকে ছুঁতে পারবে না। অপর কেউ ছুঁলে যেন ঠাকুর-বাবাজি অক্কা পেয়ে যাবেন, অন্ততঃ অশুচি হবেন। তখন তাঁকে আবার নাওয়াও রে, ধোয়াও রে। কত হাঙ্গামা বেরুবে। ঠাকুরটি যেন কায়ক্লেশে বেঁচে আছেন; ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে কোনোক্রমে জাতটি রেখেছেন। আবার উল্টোদিকে, যদি নিয়মমতো কেউ ফুল না ফেললে, মন্ত্র-কটা ঠিক মতো না আওড়ালে, ঠাকুরবাবাজি অমনি রেগে টং। তিনি আর পূজা নেবেন না, ভোগ নেবেন না। এই তো বিষ্ণু বাবাজির ব্যাপার।"

স্বামী সারদানন্দ কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে অতি গম্ভীর পুরুষ। সেইসঙ্গে তিনি বিশাল মনস্বী মানুষও। রোমা রোলাঁর মতে, সারদানন্দ ধর্মতত্ত্ব-বিদ্যায় উচ্চ অধিকারী। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গের তিনি সুবিখ্যাত গ্রন্থকার।

এবং স্বামী সারদানন্দ আমৃত্যু রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক। বহু বৎসর এই গুরুদায়িত্ব তিনি বহন করেছেন। মিশনের জন্ম থেকে তাকে তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, এবং বহু ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে তাকে বহন করে নিয়ে গেছেন। এই সমস্ত কিছু করেছেন, কারণ স্বামীজী এই কাজের ভার তাঁর উপর দিয়ে গিয়েছিলেন।

সারদানন্দ বিবেকানন্দের বন্ধু—তেমন অনুগত সেবক-বন্ধু কল্পনা করাও শক্ত। সারদানন্দের বন্ধুপ্রীতি ভাবোচ্ছ্বাসে প্রকাশ পেত না, অত্যন্ত ধীর-স্থির মানুষ ছিলেন, তাঁর ধারাবাহিক একনিষ্ঠ কর্মজীবনই ঐ বন্ধুপ্রীতির অব্যর্থ ঘোষণা। বিবেকানন্দ ও সারদানন্দের বন্ধুত্ব শ্রীরামকৃষ্ণই ঘটিয়ে দিয়েছিলেন, ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে। নিজ

কীর্তিতে পরিতৃপ্ত হয়ে বলেছিলেন—'গিন্নী জানে কোন্ হাঁড়ির মুখে কোন্ সরা রাখতে হয়।' হাঁড়ির মুখে সরা জোটাতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে কিছু নিষ্ঠুরতা দেখাতেও হয়েছিল। রামকৃষ্ণ সংঘের দুই স্তম্ভ—শশী ও শরৎ নিকট জ্ঞাতিভাই। শশী ও শরৎ দুজনের পিতাই আশা করেছিলেন, তাঁদের এই দুই উপযুক্ত পুত্র সংসারের ভার নেবে। কিন্তু তা হল না। শরৎ-মহারাজের পিতা দুঃখ করে বলতেন, 'যত ধর্মের ভার কি আমার উপর দড়ি ছিঁড়ে পড়ল ? ব্যাটা সন্নিসী হল, ভাইপো সন্নিসী হল, সংসারটা দেখবার কেউ রইল না।'

সারদানন্দকে নিয়ে স্বামীজী ভারতের পথে-পথে ঘুরেছেন। স্বামীজীকে সুগভীর-রূপে ক্ষণে-ক্ষণে তিনি দেখেছেন, উৎফুল্ল উজ্জ্বল রূপেও। দেখেছেন, বিবেকানন্দের নির্মম বৈরাগ্যকে, আবার একটি ব্যাপারে অন্ততঃ বৈরাগ্যের অভাবকে। বিবেকানন্দ ঘর ছেড়েছেন, কিন্তু তামাক ছাড়তে পারেননি। মহাকৌতুকের সঙ্গে সারদানন্দ মহেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, "তোমরা বাপু, বড় গুড়ুকখোরের বংশ। এক গল্প বলি শোনো। নরেন, আমি ও আর কয়েকজন মিলে পাহাড়ে ঘুরছি। মাধুকরী করে খাই আর যেখানে-সেখানে পড়ে থাকি। নরেন গুড়ুকখোর জেনে তার জন্য একটা ছোট হুঁকো, একটা কলকে, আর একটু তামাক নিয়ে ঘুরছি। একদিন নরেনের ভারি বৈরাগ্য এল। এই তো আমার উপর ভারি বকাবকি শুরু করল। বললে, 'সব ছাড়লুম, ভিখিরী হয়ে রাস্তায় ভিক্ষে করে খাচ্ছি, আর এই তুচ্ছ তামাক খাওয়া ছাড়তে পারব না। তুই শালাই যত নষ্টের গোড়া, সঙ্গে-সঙ্গে হুঁকো-কলকে নিয়ে বেড়াবি আর তামাক খাওয়াবি।' এই বলে হুঁকো আছড়ে ভেঙে ফেলে দিলে, কল্কে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। যা হোক, সেদিনটা একরকম কেটে গেল। আমার পা ফুলেছিল, সেজন্য দোক্তাপাতা দিয়ে বেঁধে রেখেছিলাম। রাতে পাতাগুলো ফেলে দিয়ে শুয়েছি। রাত-দুপুরে নরেন উঠে বসল, বলল, 'শরৎ একটু তামাক খাওয়া, ঘুম হচ্ছে না।' আমি বললুম, তামাক পাবো কোথা, তুমি তো সব ভেঙে ফেলে দিয়েছ। নরেন কিন্তু তামাক খাওয়ার জিদ ধরলে। শেষে বললে, 'তুই পায়ে দোক্তা বেঁধেছিলি সেগুলো কি করলি।' আমি বললুম, ছি-ছি, ওগুলো ছুঁতে নেই। নরেন বললে 'দূর শালা, সময়ে সব শুদ্ধ।' এই বলে হাতড়াতে লাগল। দোক্তা পাতাগুলো জোগাড় হল। তারপর আগুন করে, ভাঙা কলকেতে সেই দোক্তাপাতায় তামাক তৈরী করে, তা খেয়ে সে সুস্থ হল, তখন তার মুখে হাসি ফুটল। আমিও অবশ্য সেই তামাক টানলুম।"

ভারত থেকে স্বামীজী লণ্ডনে গেছেন, সেখানেও সারদানন্দকে ডেকে পাঠিয়েছেন—বেদান্তপ্রচারের জন্য। বিদেশের অজানা ভূমিতে তাঁর হাস্যকরুণ অবস্থায় ছবি, মহেন্দ্রনাথের লেখায় :

"রাত্রি নয়টার সময়ে সারদানন্দ-স্বামী ও বর্তমান লেখক [ লণ্ডনে ৬৩ সেণ্ট জর্জ রোডের ] চারতলার বড় ঘরটিতে শুইতে গেলেন।...সারদানন্দ-স্বামী গলার কলারটি খুলিয়া আলমারির উপর রাখিলেন।...জুতা মোজা ও ট্রাউজারস্ ইত্যাদি খুলিয়া স্লিপিং-সুট পরিলেন।...সারদানন্দ-স্বামী নিরিবিলি পাইয়া লম্বা করিয়া পা ছড়াইয়া আলমারির সুমুখের গালিচার উপরে বসিয়া বর্তমান লেখককে বলিলেন, 'ওহে একটু আরাম করে বসো। একটু হাত-পা ছড়িয়ে হাঁফ ছাড়ি।' তাহার পর ছ্যাকরা-গাড়ির ঘোড়া বিকেলবেলা গাড়ি হইতে মুক্ত হইয়া যেমন মাটিতে শুইয়া এদিক ওদিক গড়াগড়ি দেয়, সারদানন্দ-স্বামীও তদ্রূপ চিৎপটাং হইয়া গড়াইয়া রহিলেন এবং বর্তমান লেখককে বলিলেন, 'একবার গড়িয়ে নাও হে, দেখোনা কি আরাম।' খানিকক্ষণ পিঠে শুয়ে হাঁটুদুটি উঁচু করিলেন এবং ক্রীড়ারত বালকের ন্যায় অঙ্গভঙ্গি করিলেন, তারপর চ্যাপটানি খাইয়া বসিলেন। সারদানন্দ-স্বামী বলিতে লাগিলেন, 'বাবাঃ। চব্বিশ ঘণ্টা আটে-কাটে বন্ধ থাকা, একি আমার সাধ্যি। অষ্টবজ্রে বন্ধন করে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা। এ বাপু নরেনের সাধ্যি, নরেন করুক গে। নরেনের হাপরে পড়ে প্রাণটা গেল। কোথায় বাড়ি ছাডলুম—মাধুকরী করব, নিরিবিলিতে জপধ্যান করব—না, এক হাপরে ফেলে দিলে। না-জানি ইংরেজী, না-জানি আদব কায়দা, কথাবার্তা বলা—অথচ তাঁইশ হচ্ছে—লেকচার করো, লেকচার করো! আরে বাপু, আমার পেটে কি কিছু আছে। আবার নরেন যা রাগী হয়েছে, কোনদিন মেরে বসবে। তা চেষ্টা করব, দাঁড়িয়ে উঠে যা আসবে তাই বলব। যদি হয় তো ভালো, না-হয় চোঁ-চা মারব, একেবারে দেশে গিয়ে উঠব, সাধুগিরি করব, সে আমার ভালো। কি উপদ্রবেই পড়েছি। কি ঝকমারির কাজ। শুধু নরেনের অসুখ শুনে এলুম। নরেন আর গঙ্গাধরটা সারাদিন বকচে তো বকচেই। মুখের আর বিরাম নেই। নরেন উকিলের বেটা, গঙ্গাধর ভাটের বেটা। আচ্ছা ওদের কি মুখ ব্যথা করে না, মাথা ধরে না।"[2]

ভালবাসার ছবিটি। আসল কথা—নরেনের অসুখের কথা শোনা গেছে—তাই সন্ন্যাসী-ভ্রাতা তাঁর অভ্যস্ত ধর্মকর্ম ছেড়ে ছুটে এসেছেন কালাপানি পারে অপরিচিত দেশে। ঐ ভালবাসার তাগিদেই তিনি সবসময়ে নরেন্দ্রের নীচে নিজেকে বেঁধে রেখেছেন। মানুষটি কিন্তু মোটেই সামান্য ছিলেন না। এই 'পেটে কিছু নেই' সারদানন্দই এই সময়ে ইংরাজিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনচরিত লিখেছেন, যাকে যৎসামান্য পরিবর্তিত করে ম্যাক্সমূলার তাঁর গ্রন্থভুক্ত করেছিলেন। এবং 'মুখে যা আসবে তাই বলব' মানুষটি কিছুদিনের মধ্যে আমেরিকায় ধর্মবক্তা হিসাবে প্রচুর নাম করবেন। তবে লণ্ডনে থাকাকালে তিনি বেশি সময় জপধ্যানেই কাটাতেন। স্বামীজীর ইংরেজ শিষ্য গুডউইন তা নিয়ে মজাও করতেন। বলতেন, 'You Cooky Swami! তুমি

চোখ বুজে কেবল ধ্যান করবো, আর ভাবো যে, কখন খাবার ঘন্টা বাজবে।' সারদা-নন্দও-হাসতে হাসতে উপযুক্ত উত্তর দিতেন।

সারদানন্দের সরল নিরীহ কথাবার্তা কখনো-কখনো উৎকৃষ্ট রসিকতার সৃষ্টি করত —তার একটি চমৎকার নমুনা দেওয়া যায়। লণ্ডনে স্বামীজীর অন্যতম আশ্রয়দাত্রী বৃদ্ধা মিস মূলার। "মিস মূলার বুড়ি হইয়াছিলেন, এইজন্য সব সময় খিটখিটে। সারদানন্দ স্বামীর উপর তিনি এতদিন সন্তুষ্ট ছিলেন। একদিন দুপুরবেলা নীচেকার খাবার ঘরে আতশীখানার পার্শ্বে দুজন দুখানা চেয়ারে বসিয়াছিলেন। বর্তমান লেখকও [ মহেন্দ্রনাথ ] দেওয়ালের দিকে চেয়ারে বসিয়া আছেন। মিস মূলার কথা আরম্ভ করিলেন...'আমি ভারতবর্ষে অনেক স্থানে বেড়িয়েছি, দেখেছি যে, রোগা-রোগা গরু, রোগা-রোগা কুকুর, চারিদিকে সবাই রোগা। আমরা কিন্তু এমন হতে দিই না। যখন গরু বা ঘোড়া বুড়ো হয়, তখন তার জীবনটা একটা বোঝা। তখন তাদের বেঁচে থাকার দরকার কি? তাই আমরা বুড়ো গরু ঘোড়াকে মেরে ফেলি এবং তার মাংস লোকে খায়। বুড়ো হলে জীবন বড় কষ্টকর।' মিস মূলার এইসব কথা বলিতেছিলেন, আর প্রতি কথার মাত্রা দিতেছিলেন—We English, we are very kind people. সারদানন্দ-স্বামী নীরবে বোকাহাবার মতো গল্প শুনিতে-ছিলেন। শেষটা আর থাকিতে পারিলেন না; বলিয়া ফেলিলেন, 'বাবা-মা বুড়ো-বুড়ি হলে জীবন কষ্টদায়ক হয়। তাদের কেন তাহলে মেরে ফেলেন না?' শুনেই মিস মূলার অগ্নিশর্মা। তাঁহার অতি বৃদ্ধা মাতা তখনো জীবিত। রাগে চড়চড় করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।...তারপর মিস মূলার তিন দিন সারদানন্দ-স্বামীর সহিত কথা বলেন নাই। নমস্কার গ্রহণ করিতেন না, 'কেমন আছ' ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব দিতেন না। স্বামীজী একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁরে, পাগলী-বুড়ির সঙ্গে কি হয়েছে?' বর্তমান লেখক সমস্ত কথা বলিলেন। স্বামীজী বলিলেন, 'ও খ্যাপতান মাগী, জ্বালায় অস্থির করে তুলেছে। দ্যাখ শরৎ, এদেশে যে মাগীরা বে করে না, সেগুলো বুড়ি হলে দু'রকম হয়। কতকগুলো মাগী ফেটিয়ে যায় ( মোটা হয় )। সেগুলো ঠাণ্ডা ভালোমানুষ থাকে। কতকগুলো মাগী শুঁটকে পাকিয়ে যায়। সে মাগীরা খিটখিটে হয়। এই খ্যাপতান মাগীর সঙ্গে তোরা বাপু সাবধানে চলবি। ঘরে ঢুকলেই দাঁড়িয়ে উঠবি, কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করবি। প্যান্টালুনের পকেটে হাত রাখবি বুকে হাত রাখবি নি; বুড় যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ততক্ষণ তোরা বাপু বসিস নি। কোনোরকমে বুড়িকে সন্তুষ্ট করবি। আর পারিনা, সারাদিন লেকচার করতে হবে। ভিজিটরদের সঙ্গে দেখা করতে হবে, আবার বুড়িকেও সন্তুষ্ট করতে হবে।"

সারদানন্দকে বেশিদিন পাশ্চাত্যে থাকতে হয়নি। রামকৃষ্ণ মিশন গঠিত হবার পরে তার দায় বইবার জন্য স্বামীজী তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সারদানন্দ

বিদেশে গিয়েও সাহেব হতে পারেননি। কিন্তু যেহেতু তিনি বিলেতফেরত, তাই গুরুভাইদের মধ্যে তাঁর আখ্যা হয়ে গেল, ছোটসাহেব। বড়সাহেব অবশ্যই স্বামীজী। ছোটসাহেবকে অবিরত বড়সাহেবের ধমকানি খেতে হত। সারদানন্দ নির্বিকার। নরেনের দেওয়া প্রশংসা-নিন্দা সবই ভূষণ। সারদানন্দ কলকাতায় গেছেন জরুরী কাজে। সে কাজ সমাধা করা সম্ভব হয়নি। মঠে ফিরতে স্বামীজী রেগে মুখ ছোটালেন। শেষপর্যন্ত বিদ্রূপ করে এমনও বললেন, 'ঐ তো এক ছটাক বুদ্ধি—রেখে দে, সুদে-আসলে বাড়ুক, পরে কাজে লাগবে।' সারদানন্দ শুনে যাচ্ছেন। মুখে কথা নেই। এমন সময়ে চা এল। অম্লানমুখে সারদানন্দ চা খেতে বসলেন স্বামীজীর সঙ্গে। ব্যাপার দেখে স্বামীজী একেবারে হতাশ হয়ে বললেন, 'একে বকে কি করব? একেবারে বেলে-মাছের রক্ত—কিছুতেই তাতে না।'

অনুরূপ একটি উপভোগ্য ঘটনা:

"একদিন কী-একটা ব্যাপারে বেলুড়ে স্বামীজী শরৎ-মহারাজকে ভীষণ বকতে শুরু করলেন। সে বড় প্রচণ্ড রকমের বকুনি। শরৎ-মহারাজ শান্ত স্থির হয়ে সব কথা শুনে যেতে লাগলেন। এমন সময়ে কলকাতা থেকে ঠাকুরের এক ভক্ত এলেন। স্বামীজী সঙ্গে-সঙ্গে সামলে নিলেন। উক্ত ভক্তের সঙ্গে স্বামীজীর খানিকটা হাসাহাসি চলল। শরৎ-মহারাজও দিব্যি তাতে যোগ দিলেন। লোকটি চলে গেলে আবার স্থগিত বকুনির বাকি বম্বার্ডমেন্ট আরম্ভ হল। শরৎ-মহারাজ পূর্ববৎ স্থাণু। ব্র্যাকেটে যেন মাঝ থেকে দুজনের খানিকটা হাসাহাসি হয়ে গেল।"

সারদানন্দের ভাব—ঝড়-তুফান আছেই, তার জন্য বিচলিত হব কেন? ডাক্তার কাঞ্জিলালের সঙ্গে বাগবাজার থেকে নৌকায় বেলুড়ে ফিরছেন। এমন সময়ে ভীষণ ঝড় উঠল। নৌকা ডুবে যায় আর কি। সারদানন্দ আগে থেকেই তামাক খাচ্ছিলেন। এখনও তামাক টেনেই যেতে লাগলেন। সহযাত্রী ডাক্তার কাঞ্জিলালের আর সহ্য হল না। মহাক্রোধে ছিলিম তুলে নিয়ে জলে ছুঁড়ে দিলেন। চেঁচিয়ে বললেন, 'আপনি তো মশাই বেশ মজার লোক। নৌকা ডুবছে আর আপনি তামাক খাচ্ছেন!' সারদানন্দ হাসলেন। অবিচলিতভাবে বললেন, 'আরে নৌকা কি ডুবেছে? ডুববার আগেই হুঁকো ফেলে জলে ঝাঁপাবো?'

মহাপুরুষ-মহারাজ অর্থাৎ স্বামী শিবানন্দ মগ্ন হয়ে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন। এক মার্কিন-সাধু এলেন—তাঁকে মহাপুরুষ-মহারাজ বললেন, 'টেনে দ্যাখো, এর মধ্যে ব্যাঙ রয়েছে, সে সাড়া দেবে।' মার্কিন-সাধু তাঁর কথামতো টানলেন, কিন্তু ব্যাঙ সাড়া দিলে না। মহাপুরুষ বললেন, 'আরে, ব্যাঙ তোমাকে ভালবাসে না।—তোমার সঙ্গে কথা কইতে চায় না। এই দ্যাখো, আমার সঙ্গে কেমন কথা কয়!'

বলে তিনি পুনশ্চ গড়গড়া টেনে ব্যাঙ-বাণী শুনিয়ে দিলেন। মহাপুরুষের মধ্যবর্তিতায় ব্যাঙ অবশ্য পরে মার্কিন-সাধুর টানে সাড়া দিয়েছিল।

স্বামী শিবানন্দ নিছক কৌতুক করবার জন্য উক্ত মজার কাণ্ডটি করেননি—মার্কিন সাধুর সঙ্গে একই গড়গড়া টেনে তাঁকে জাতে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিছক রঙ্গ-রহস্যের জন্যও তিনি অনেক কিছু করতেন। অপরের নকল করতে খুব পটু ছিলেন, একথা আগেই বলা হয়েছে। বরাহনগর-মঠে যখন ছিলেন, নিরন্তর সাধন-ভজনে মন সর্বদা উচ্চস্তরে থাকত বলে তাকে নামাতে নানারকম হাসিতামাসা করতেন। "কখনো বা তিনি কাহারও সহিত খুনসুড়ি করিতেন, কখনো-বা কাহাকেও ব্যঙ্গ করিতেন, কখনো কাহারও হাত-মুখ নাড়া বা কথাভঙ্গির নকল করিয়া তাহার সঙ্গে ঝগড়া করিতেন। এইরূপ করিয়া নিজে খানিকটা হাসিয়া লইতেন এবং অপরেও হাসিত।...এই সময়ে তিনি কঠোর তপস্যা করিতেন, মন একেবারে উচ্চস্তরে থাকিত। সর্বদাই বিভোর হইয়া থাকিতেন। সেইজন্য মাঝে-মাঝে হাসি তামাসা ও ব্যঙ্গ করা ঔষধের ন্যায় আবশ্যক হইত।"

মহাপুরুষ-মহারাজ স্বামীজী প্রভৃতির তুলনায় কিছু অধিক-বয়স্ক। কিন্তু অব্যাহত বালকত্ব তাঁর স্বভাবে। জীবজন্তু খুব ভালবাসতেন। বরাহনগর-মঠে একটি শিয়াল তাঁর বড় প্রিয় ছিল। তার নাম দিয়েছিলেন ভোঁদা। তাকে খাইয়ে তিনি কত খুশি! ঐ মঠবাড়ির পাশে ছিল কেলো মালীর শশাক্ষেত। তার শশা চুরি করে তাঁর কী স্ফূর্তি! চুরিটা প্রায় প্রকাশ্যেই হত। কেলো-মালী এসে ছদ্ম-কান্না কাঁদবে, আর ক্ষতিপূরণ করতে তাকে রুটি খেতে দেওয়া হবে—সেই ছিল চুরির উদ্দেশ্য। বাল্যকালে গাজনের সময়ে গাজন-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ছড়ার লড়াই করতেন—তার স্মরণে বৃদ্ধবয়সেও কত আহ্লাদ! শিবানন্দ তিনি—শিবের মতোই আনন্দবিহ্বল। একটি নবাগত অপরিচিত ছোকরা কাশী অদ্বৈত-আশ্রম থেকে বাক্স ভেঙে টাকা চুরি করে পালিয়েছে; ঐ টাকা অদ্বৈত-আশ্রমের যথাসর্বস্ব; বাড়িওয়ালার পাওনা মেটাবার জন্য অনেক কষ্টে ওটা জোগাড় হয়েছিল; যথাসময়ে বাড়িভাড়া না দেওয়ায় বাড়িওয়ালার দরোয়ান শিবানন্দকে ধরে নিয়ে গিয়ে গদীতে আটকে রাখলে সারাদিন; লাঞ্ছনার সীমা রইল না; কিন্তু আনন্দের কমতি নেই—চোর ছেলেটির কী ধর্মবুদ্ধি! কয়েকটা পয়সা তো সে রেখে গেছে, যাতে দিব্যি ঠাকুরের ভোগ দেওয়া গেছে।

বরাহনগর-মঠে হাসির উপকরণ হিসাবে শব্দচর্চা যথেষ্ট হত। তারকনাথ (শিবানন্দ) গয়া থেকে অল্পদিন হল ফিরেছেন। সেই ভাবে মন পূর্ণ। নরেন্দ্রনাথের পাশে এসে বসলেন। বললেন, 'আমাকে চা দাও।' চা এলে বললেন, 'ওহে জল দিয়ে তো তর্পণ হয়, এখন আমি চা দিয়ে তর্পণ করব।' বলেই মন্ত্র শুরু করলেন, 'অনেন চায়েন।' শুনে উপস্থিত একজন বললেন, 'চা স্ত্রীলিঙ্গ সুতরাং অনয়া চায়য়া

হবে।' তারকনাথ সানন্দে সংশোধনী-প্রস্তাব মেনে নিলেন।

নরেন্দ্রনাথ মধুসূদনের বিশেষ ভক্ত। মেঘনাদবধ কাব্যের বিস্তারিত আলোচনা তিনি কয়েকদিন ধরে করেছেন। তারপর কোথায় যেন গেছেন। সকলের মাথায় মাইকেল মধুসূদন ভর করে আছেন। তারকনাথ সুতরাং বলতে আরম্ভ করলেন—"দ্যাখো, বাংলা ভাষাটা বড় জবড়জঙ। এতে একটা সর্বনাম, আর দুই-তিনটে শব্দ দিয়ে ক্রিয়াপদ হয়। 'নাউন' আলাদা, 'ভার্ব' আলাদা। কিন্তু তা করলে হবে না, 'নাউন'টাকেই 'ভার্ব' করতে হবে, নইলে ভাষায় জোর থাকবে না। কি রকম জানো—আলুর দম করো—একথা বলা চলবে না, আলুটা দমিয়ে দাও—এই রকম বলতে হবে। তা শুনে সান্ন্যাল-মশায় ফস করে বলে উঠলেন, 'লুচির বেলা কি হবে?' তারকদা বললেন, 'কেন, লুচিটা লুচ্চাইয়ে দাও!' বলেই বললেন, 'আরে, ছ্যা! এটা বড় বেফাঁস হয়; এটা চলবে না। তবে কি জানো, তামাকটা তাম্‌কাইয়ে দাও, এটা ঠিক হয়।'"

বাংলা ভাষার উপরে শব্দভেদী শর নিক্ষেপ করে শিবানন্দ-স্বামী ভারী খুশি হয়ে প্রায় নৃত্যগীত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আক্রমণ কেবল বাংলা ভাষাকেই নয়,—গুজরাটি ভাষাকে সঙ্গে নিয়ে আফগানিস্থানের পশ্‌তু ভাষাকে পর্যন্ত তিনি ধাওয়া করেছিলেন:

"একদিন শনিবার আড়াইটা বা তিনটার সময় কিশোরীদা (যাঁকে আবদুল দাদা বলা হত) অফিস-ফেরতা বরাহনগর-মঠের বাইরে বড় ঘরটিতে এসে বসলেন। কিশোরীদা ভারী নকুলে। তিনি কাবলী ভাষা অর্থাৎ পশ্‌তু ভাষা নকল করে (যাকে তিনি 'পোস্ত' ভাষা বলতেন) অবিকল লেকচার করে যেতে পারতেন। কিশোরীদা বড় ঘরের দরজায় এসেই পোস্ত ভাষায় লেকচার শুরু করলেন। তারকদাও অমনি গুজরাটি ভাষাতে (যাকে তামাশা করে 'কেঁইয়া' ভাষা বলা হত) হাত মাথা নেড়ে লেকচার দিতে লাগলেন। কিশোরীদাও পোস্ত ভাষা ছেড়ে কেঁইয়া ভাষা ধরলেন। এই দুজনের লেকচারের লড়াই চলল। সে লেকচারে কি ধমক। তাতে কত মুখ নাড়া, হাত-পা নাড়া! কী ভয়ানক রাগের প্রকাশ! সে এক ভীষণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। তারপর আমি [মহেন্দ্রনাথ] জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের এই লেকচারের অর্থ কি হল।' তারকদা হাসতে-হাসতে বললেন, 'আমি কিশোরীকে বললুম, এক ছিলিম তামাক খাইয়ে যা। ও তার উত্তর দিলে।'"

ইংরেজী শব্দচর্চাও সন্ন্যাসীরা কম করতেন না। এবং তাতে যোগ দিতেন, আর কেউ নন, যিনি অ আ পর্যন্ত শেখেননি, সেই লাটু-মহারাজ। নৌকায় সদলবলে সন্ন্যাসীরা যাচ্ছেন। "নৌকায় যেতে-যেতে নানা রঙ্গরস হচ্ছিল; 'fy' দিয়ে কে কত ইংরেজী শব্দ বলতে পারে তার প্রতিযোগিতাও। যার যেমন যোগালো, বলে

যেতে লাগলেন—Ramify, Verify, Justify, Clarify, Rarefy, Magnify, Glorify, Beautify, Codify, Vilify, Mummify, Simplify, Fructify, Classify, Modify, Startify, Solidify, Specify, Notify, Amplify, Purtify. সকলের বলা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু কেউ আশা করেননি যে, লাটু-মহারাজ কিছু বলবেন। সকলে থামলে তিনি হাসতে-হাসতে ঝট করে বলে উঠলেন—Stultify।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ আরও অগ্রসর। তিনি ইতর প্রাণীর ভাষাচর্চা পর্যন্ত করেছিলেন। অল্পবয়স্ক এক সন্ন্যাসীকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'শালিখ পাখীর বুলি জানিস?' বলাই বাহুল্য উক্ত সন্ন্যাসী তা জানতেন না। সুতরাং ব্রহ্মানন্দ শেখালেন—'বল্—রিবিরী, কটকটকট, পাপীচ পাপীচ, খেন্দিকির্কিচ্ কিদার্কিচ্, ইশনমিশন ট্যাপ্ ট্যাপ্, কিষ্টকিশোর কিষ্টকিশোর, ডুগডুগাডুগ্, প্লীং প্লাই।' তারপর তিনি কিভাবে ঐ বুলি আওড়াতে হবে—'প্লাং প্লাই' বলার সঙ্গে-সঙ্গে কিভাবে ভঙ্গী করে সরে পড়তে হবে—তার গোটা অভিনয়টি শিখিয়ে দিয়েছিলেন, এবং অপরকে দিয়ে সেটা করিয়েও নিয়েছিলেন—যা শুনে সকলে 'হাসিয়া খুন।'

লাটু-মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) নিঃসন্দেহে শ্রীরামকৃষ্ণের এক মিরাকল। স্বামীজী অন্ততঃ তাই বলতেন। তাঁর মতে, আপেক্ষিকভাবে তাঁদের মধ্যে লাটুর আধ্যাত্মিক উন্নতি সর্বাধিক।

উচ্চাঙ্গের রসিকতা করবার বা বুঝবার বিদ্যাবুদ্ধি লাটু-মহারাজের ছিল না। কিন্তু তাঁর কথাবার্তা বা আচরণ থেকে উচ্চ রসিকতা জন্ম নিত। তিনি নির্ভেজাল সত্য নিয়ে ঘর করতেন, তাই যা-কিছু অসত্য, অখাঁটি, মেকী—তাঁর কাছে ধরা পড়ে যেত। মানুষের কথা ও কাজের তফাত তিনি অবিলম্বে ধরে ফেলতেন, এবং যেহেতু তাঁর প্রয়োজন ছিল কম, ভঙ্গি ছিল বেপরোয়া ('হামকো দো পয়সা-কা চানা-ভাজামে হো যাহাহৈ—ক্যা পরোয়া') তাই যা দেখতেন—বলে ফেলতেন স্বচ্ছন্দে। তাতে অসঙ্গতি উদ্ঘাটিত হত, যা শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের উৎস।

অদ্ভুতানন্দের জীবন অদ্ভুত। সে জীবন—জীবনরসে পূর্ণ। তিনি বাঙালী নন। আসল নাম রাখতুরাম, লাটু যার অপভ্রংশ। তাঁর বাড়ি ছাপরা জেলায়। পিতা মেষপালক। পাঁচ বছর বয়সে লাটু পিতা-মাতাকে হারান, এবং পিতৃব্যের আশ্রয়ে গিয়ে পড়েন। বাড়ির বাইরেই বেশি সময় কাটত। 'হামি তো রাখালদের সঙ্গে থাকতাম—জানো। তারা ভারি সরল। তাদের মতো সরল না হলে আনন্দ মিলে না'—লাটু-মহারাজ বলেছিলেন। লাটু মাঠে-মাঠে গান গেয়ে ফিরতেন—'মনুয়ারে, সীতারাম ভজন কর্ লিজিয়ে।' অনেকদিন পরে, গঙ্গাতীরে একবার যখন ঐ কলিটি

প্রাণখুলে গাইছেন, তখন 'মৌন মুগ্ধ স্তব্ধতা' নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ 'ভক্তের সেই জীবনসঙ্গীত' শুনেছিলেন, তারপর বলেছিলেন—'ওরে! তোর এতেই হবে।'

সে অনেকদিন পরের কথা। তার আগে ছাপরা জেলার গণ্ডগ্রাম থেকে রাখতুরাম পিতৃব্যের সঙ্গে কলকাতায় চাকরির সন্ধানে আসবেন এবং রাম দত্তর বাড়িতে ভৃত্যের কাজে বহাল হবেন। "ঈষৎ খর্বাকৃতি, পুষ্টদেহ হিন্দুস্থানী ভৃত্যটির নাম লাটু।...লাটু সাধারণ ভৃত্যের ন্যায় গৃহের কাজকর্ম করিত; অবসব পাইলে দুখানা ইঁট পাতিয়া ডনবৈঠক দিত আর কতকগুলি ছোলা খাইত। মাহিনা হইতে কিছু জমাইয়া মাথার একটা বড় পাগড়ি কিনিয়াছিল।...আস্তিনওয়ালা পাঞ্জাবী পরিয়া, রঙিন পাগড়ি মাথায় দিয়া, হাতে একটা মোটা লাঠি লইয়া সে হেলিয়া-দুলিয়া রাস্তায় চলিত। হিন্দুস্থানী চাকরের ন্যায় তখন তাহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল—কুস্তীর পালোয়ান হইবে এবং বড়বাজারের প্রধান পালোয়ানদের সঙ্গে কুস্তী লড়িবে। কিন্তু এই যুবকটির ভিতর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতাম যে, সে সরল স্পষ্টভাষী, এবং প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিত। নিজে যে-বিষয়টি ঠিক বলিয়া বুঝিত, তাহার পক্ষে জিদ করিয়া কথা বলিত; এমন-কি মাথা নাড়িয়া, হাত নাড়িয়া, চীৎকার করিয়া কথা বলিত।...সে অতি উচ্চরবে হাসিত—মনিব-চাকর সম্পর্ক অনেক সময় ভুলিয়া যাইত।...আমরা তাহাকে 'মাথাপাগল চাকর-ছোঁড়া' বলিতাম।"

তাহলেও লাটু চাকর। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে একদিন মহেন্দ্রনাথ তাঁকে সম্পূর্ণ বিপরীত চেহারায় দেখলেন: "লাটুকে দেখিলাম যে, সকলের সঙ্গে বসিয়া আছে, সমানভাবে কথা বলিতেছে। আগে যেমন মনিবদিগকে 'বাবু' বলিয়া ডাকিত, যথা 'নরেনবাবু' ইত্যাদি, তখন দেখিলাম—সে ভাবটি নাই। 'হারে লোরেন', 'হারে সোরোট', 'হারে রাখাল'—এইরূপ কথা বলিতেছে। আমি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম লাটুর মুখ পূর্বের মতো নয়, দীনতা সঙ্কোচ ভয়—এসব ভাব নাই। মুখ খুব প্রফুল্ল। হৃদয়ে জোর আসিয়াছে। কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত। পূর্বের জীবন যেন চলিয়া গিয়াছে। নূতন প্রাণ, নূতন জীবন, নূতন লোক হইয়াছে।"

পাঠক বুঝতেই পারছেন, মধ্যবর্তীকালে ঐ কাণ্ডটি ঘটিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রথম সাক্ষাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্পর্শে লাটুর রূপান্তরের কাহিনী অপূর্ব—তাতে এখানে আমাদের প্রয়োজন নেই। তবে লাটু কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় বহাল হয়ে গেলেন, যার রসহাস্যমধুর একটি ছবি দিয়েছেন চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, তারই খানিক উপস্থিত করতে পারি। লাটু একাদিক্রমে তিন দিন দক্ষিণেশ্বরে আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে মনিববাড়ি ফিরবার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। লাটু গররাজি—'হামি ইখানকে থাকবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'সে কি রে। তুই রামের মাইনে খেয়ে এখানকে বসে থাকবি? এ তো হয় না বাপু!'

"এই সব কথা চলিতেছে, এমন সময় ভক্ত রামবাবু সস্ত্রীক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন। রামকে দেখিয়া ঠাকুর হাসিতে-হাসিতে বলিতে লাগিলেন, 'ওগো রাম! এ ছেলেটা কি রকম দ্যাখ বাপু! যত বলি, বাড়ী যা, ওরা কত ভাবছে, ছেলেটা কেবল ফিক্‌ফক্ করে হাসছে আর বলছে—এখানে থাকলে তো মনিবের গুঁসা হয় না। ইখান হোতে চলে যেতে হামার মন কেমন করে। হামি যাবে না। যত বলি, কলকাতায় যা—কিছুতেই এখান হতে নড়বে না! একি বাপু! কাজকর্ম ছেড়ে এখানে এত থাকা কেন? পারো তো তুমি ওকে বোঝাও!'

"ঠাকুরের কথার ভাবে ভক্ত রামচন্দ্র ব্যাপার বুঝিয়া লইলেন।...কৃত্রিম ক্রোধে লাটুকে বুঝাইতে বসিলেন—'হ্যাঁ রে! এখানে কিসের জন্য পড়ে আছিস বল্ তো বাড়ি যাবি না?'

"লাটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—কথার কোনো উত্তর দিল না। রামবাবু ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিলেন—'ভালবেসে ছেলেটার তো মাথা খেলেন, আর কেন আমায় এ বিড়ম্বনা ভোগ করানো?' "

সেবার অনেক অনুরোধে লাটু রামবাবুর বাড়ি ফিরেছিলেন। কিন্তু সেখানে যেন তাঁর দমবন্ধ হয়ে এল। রামবাবুর স্ত্রীকে লাটু মা বলতেন। তাঁর সঙ্গে লাটুর এই প্রকার কথাবার্তা হল ঃ

মা—কেন রে, তোর এখানে থাকতে কি কষ্ট হচ্ছে?

লাটু—( আবদারের সুরে ) উখানকে থাকতে হামার ভাল লাগে।

মা—ওখানে তোকে খাওয়াবে কে? কাপড়-চোপড় দেবে কে?

লাটু—কেনো, হামি ওনার সেবা করবে, প্রসাদ পাবে, আর অপুনারা হামাকে কাপুড়-চোপড় দিবেন।

মা—বাবু দিতে রাজি হবেন কেন?

লাটু—হামায় এত ভালবাসেন আর হামায় একখানা কাপড় দিবেন না?

বালকের 'নিবু'দ্ধিতায়' রামবাবুর পত্নী হেসে উঠেছিলেন, এবং উক্ত নিবু'দ্ধিতার জোরে তার অসম্ভবরকম পদোন্নতি হয়েছিল—মানুষের চাকর থেকে হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভগবানের চাকর।

চাকরটি পুনশ্চ 'নিবু'দ্ধিতা' দেখিয়ে আখের আরও গুছিয়ে নিয়েছিল। শ্রীরাম-কৃষ্ণকে ছেড়ে সে তপস্যা করতেও যাবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ তিরস্কার করলে সে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেছিল—'আপুনাকে ছাড়া হামার জীবন বিলকুল নষ্ট হোয়ে যাবে। আপুনি হামায় এমন কোরে দিন যাতে চিরকাল আপুনার সঙ্গে থাকতে পারি।'

এসব ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি শব্দই উচ্চারণ করতে পারতেন—'শালা।' "ঠাকুর হাসিতে-হাসিতে বলিলেন—শালার আবদার কত!"

আবদারের এখানেই শেষ নয়। চাকরটি দাবি করে বসল—'আপুনি যা পাবেন, হামনে তাই খাওয়া করবে! হামনি তো আপুনার প্রসাদ পাবে। বাকী আর কুছু পাবে না।' কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বললেন—'শালা।' "ঠাকুর, রামলাল দাদাকে হাসিতে-হাসিতে বলিয়াছিলেন—শালা কেমন চালাক দেখেছিস! আমি যা পাবো, শালা তাতেই ভাগ বসাতে চায়!"

লাটু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে থেকে গেলেন এবং শিখতে লাগলেন। সে শিক্ষা আলো বাতাস সূর্য অগ্নির কাছে শিক্ষার মতোই সহজ। পুঁথিগত শিক্ষা ভাগ্যে ছিল না। কোনক্রমে তিনি 'অ আ' যদিবা শিখতে পারলেন, 'ক খ' আর হয়ে উঠল না। স্বর্গলোকে দেবতারা পর্যন্ত হেসেছিলেন যখন 'মহাপণ্ডিত' গুরু রামকৃষ্ণ তাঁর হবু-মহাপণ্ডিত শিষ্য লেটোকে বর্ণপরিচয় করাচ্ছিলেন—

"শ্রীশ্রীপরমহংসদেব লাটুকে পড়াইতে বসিলেন। বর্ণপরিচয় খুলিয়া তিনি লাটুকে বলিলেন—বল্ 'অ।' লাটু বলে—'অ।' বল্—'আ।' লাটু বলে—'আ।'...তৃতীয় দিনে সে ব্যঞ্জনবর্ণ আরম্ভ করিয়া দিল। ঠাকুর বলিলেন—বল্ 'ক।' লাটু উচ্চারণ করে—'কা।' ঠাকুর যত বলেন—ওরে এটা 'ক'—লাটু ততবার বলে 'কা।'

"পার্শ্বস্থ রামলাল প্রভৃতি সেবকবৃন্দকে দেখাইয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—'শালা 'ক'-কে 'ক' বলতে পারে না, কেবল 'কা কা' করছে। আরে! এখানেই যদি 'ক' বলবি, ক-এ আকারে কি বলবি?' বিহারী-জিহ্বা 'ক'-এর ধ্বনিকে ঠিকমতো উচ্চারণ করিতে পারিতেছে না, বারে-বারে বিফল হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন যাঃ! আর তোর পড়ে দরকার নেই।"

বর্ণপরিচয় না করেও লাটু একেবারে সংস্কৃত শিখে ফেলেছিলেন, এবং তার জোরে অনেককে ব্যতিব্যস্ত করতেন। মঠে গোড়ার দিকে স্বামী অভেদানন্দ-রচিত একটি শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র সন্ধ্যারতিতে গাওয়া হত—নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং। ভক্তানু-কম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ॥ ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং। তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ॥ "লাটু মহারাজ এই শ্লোকটির মধ্যে 'ঈশাবতারং' এই পদটি শুনে মনে-মনে বিরক্ত হয়ে শ্রীশরৎ-মহারাজকে বলেন—এ শরোট্! তোমরা এরই মধ্যে তাঁকে (ঠাকুরকে) ভুলে গেলে দেখছি? ঈশাকে পূজা করছ? তোমরা সব কী হলে? অভেদানন্দকে কাছে পেয়েও তিনি চেপে ধরলেন—তুই শেষে ঠাকুরকে যীশুখৃষ্টের অবতার করে দিলি?"

লাটু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এত শিখেছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-পত্নী সারদাদেবীকে পর্যন্ত সংশিক্ষা দিতে ছাড়েননি। অপূর্ব সে কাহিনী। ১৯০৭ সালে দুর্গাপূজায় শ্রীমা

গিরিশের আমন্ত্রণে কলকাতায় এসেছেন, থাকবেন বলরামবাবুর বাড়িতে। নীচের ঘরে আছেন লাটু-মহারাজ। শ্রীমা গাড়ি থেকে নেমে বাড়ি ঢুকতে গিয়ে লাটুকে দেখলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বাবা লাটু! কেমন আছো?' খেয়ালী লাটু তৎক্ষণাৎ বললেন, 'তুমি ভদ্দরঘরের মেইয়া; সদরবাড়িতে হামার সঙ্গে কেনো দেখা করতে এসেছো! যাও, এখুনি ভিতরে যাও। এখানে হামনে তোমার সঙ্গে কথা কইবে না। হামাকে তো ডেকে পাঠালেই পারতেন। হামনে তো আপ্নার গোলাম আছে, যাইয়া দেখা করতুম।' লাটুর কথা শুনে মা হাসতে-হাসতে উপরে চলে গেলেন।

বলরাম-মন্দির থেকে শ্রীমা জয়রামবাটী চলে যাচ্ছেন—সবাই একে-একে প্রণাম করে গেলেন—কিন্তু লাটু এলেন না। "লাটু নিজের ঘরে পায়চারি করিতে-করিতে বলিতে লাগিল—'সন্ন্যাসীকো কোহ্ পিতা, কোহ্ মাতা, সন্ন্যাসী নির্মায়া।' মা যখন সিঁড়িতে তখনো লাটু আপন খেয়ালে উচ্চস্বরে ঐ কথাগুলি বলিতে লাগিল। দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া মা যেই বলিলেন—'বাবা লাটু! তোমার আমাকে মেনে কাজ নেই, বাবা'—অমনি লাটু তড়াং করিয়া এক লাফ মারিয়া মায়ের শ্রীচরণে আসিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিতে-করিতে লাটু ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেবকের কান্না দেখিয়া মায়ের চোখেও জল আসিয়া গেল। তখন লাটু নিজের উত্তরীয় দিয়া মায়ের চোখ মুছাইতে-মুছাইতে বলিতে লাগিল—বাপ-ঘরে যাচ্ছ মা। কাঁদতে কি আছে? আবার শরোট্ তোমায় শীগ্‌গির এখানে নিয়ে আসবে, কেঁদো না মা! যাবার সময় চোখের জল ফেলতে আছে কি?"

লাটু বালকত্ব ও পরমহংসত্ব—এই দুই পর্যায়ের মধ্যে স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করতেন। খুব বড় নেশায় তিনি ডুবেছিলেন। সেইজন্যই বোধহয় সকরুণ সহানুভূতিতে একবার এক মদ্যপকে লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। উক্ত মাতাল প্রমত্ত অবস্থায় এক ভক্তকে গালাগালি করায় ভক্তের সাঙ্গোপাঙ্গরা উত্তেজিত হয়ে মাতালকে মারতে উদ্যত—তখন লাটু-মহারাজ তাদের থামিয়ে বলেছিলেন, 'দেখো! ও মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গালাগালি করছে, আর তোমরা যে মদ না খেয়ে মাতাল হয়ে গালাগালি করছ। ওকে আর তোমরা কি মারবে, মদই ওকে মেরে রেখেছে!'

নিজের নেশা প্রসঙ্গে লাটু-মহারাজ বলেছেন—নেশা ঠাকুরই করতে শিখিয়েছেন। বিস্মিত শ্রোতাকে লাটু-মহারাজ বলেছিলেন—"আরে যে-সে নেশা নয়—একদম রাজা-নেশা করতে শিখালেন। তিনি হামাদের ভগবানের নেশা করিয়ে দিলেন। সংসারে লোক ছেলেদের কামিনীকাঞ্চনের নেশা করতে শিখায়, মদ-জুয়ার নেশা করতে শিখায়, আউর মান-ইজ্জতের নেশা করতে শিখায়। বাকী তিনি শিখাতেন—ব্রহ্মনেশা। এ নেশা ভারী জবর। এ নেশার কাছে অন্য সব নেশা ফিকা হয়ে যায়।"

এই নেশা করে লাটু-মহারাজ যখন বুঁদ হয়ে আছেন, তখন মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে যেতেন—এর মর্ম লোকে বুঝতে চায় না কেন? একটি বেকার যুবক সুযোগ-সুবিধার আশায় তাঁর কাছে এসেছিল। তিনি তাকে লক্ষ জপ করার কথা বলেছিলেন। শুনেই সে সরে পড়েছিল। ক্ষোভে বিস্ময়ে লাটু-মহারাজ বলেছিলেন, "তিনি (ঠাকুর) কি সাধে বলতেন, 'যার কেউ নেই সে একটা বিড়াল পুষবে, তবু ভগবানের নাম নিবে না।' বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখানে বসে জপ করত আর খেত, তা ভাল লাগল না। পাঁচ-জনের কাছে ভিক্ষা মাগবে, তবু নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস করবে না, এমনি মায়া।"

এইসব কাণ্ড দেখে লাটু-মহারাজ বিষয়জ্ঞানী হয়ে পড়তেন। সে জ্ঞান ছড়াতেন সংসারীদের কাছে নয়—একেবারে সন্ন্যাসীদের কাছেই। "শরৎ-মহারাজ লাটু-মহারাজের সহিত দেখা হইলে প্রায়ই বলিতেন—'সাধু! তোমার সেই মন্তরটা আওড়াওনা—টাকা ধর্ম, টাকা কর্ম, টাকা হি পরমন্তপঃ। যস্য গৃহে টাকা নাস্তি, তস্য গৃহে কুছু নেই, শুধু ঠক্ ঠক্ ঠক্।' লাটু-মহারাজ উত্তরে বলিতেন, 'সংসারীর পক্ষে টাকা রোজগারই তো ধর্ম।...হাভাতে গরীব সংসারী হওয়া ভাল কি?' এইরূপ (কথাবার্তার) ঘটনা প্রায়ই হইত।"

গিরিশবাবুর বাড়িতে একদিন শরৎ-মহারাজ গেছেন। গিরিশবাবু, লাটু-মহারাজ উপস্থিত। শরৎ-মহারাজ দুঃখকথা জানালেন—মায়ের মন্দির (উদ্বোধন) করতে অনেক টাকা ধার হয়েছে, টাকাকড়ি একদম নেই—সুদের টাকা দেবার সঙ্গতিও নেই—লোকের কাছে বুঝি আর সত্যরক্ষা করা গেল না।

লাটু-মহারাজ (সগৌরবে)—দেখছো তো শরোট্! হামার মন্তরের কেমন শক্তি? তোমার মতো সাধুকেও ভাবাচ্ছে! এখন বলো, হামার মন্তর মানো কি না?

শরৎ-মহারাজ (রহস্যভরে)—তোমার মন্তর মানলে টাকা আসবে বলতে পারো!

লাটু-মহারাজ—মন্তরকে মেনে নাও, নিশ্চয় আসবে।

শরৎ-মহারাজ—দেখো সাধু! তোমার কথার খেলাপ হবে না তো?

লাটু-মহারাজ—না রে শরোট্! হবে না, দেখে নিস্।

শরৎ-মহারাজ গিরিশবাবুকে সাক্ষী মানলেন—সাধু কি বলছে শুনলেন তো? আপনি সাক্ষী রইলেন।

গিরিশবাবু—(ট্যাঁক থেকে টাকা বের করতে-করতে)—আবার সাক্ষী-সাবুদ কেন? সাধুর কথাটা সফল করে দিই।

সংসারী গিরিশ ঘোষ সাধুর সত্যরক্ষা করেছিলেন। সুতরাং সাধুরও দায়িত্ব

সংসারীর সত্যরক্ষা করা। একবার গিরিশবাবুর বাড়িতে দুই পণ্ডিত-ব্যক্তি সত্য সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। তাঁদের একজন উত্তেজনায় বলে ফেললেন—'শালা, বাক্যরক্ষা করতে না পারলে সত্যরক্ষা করা হয় না!' অবিলম্বে লাটু-মহারাজ বললেন, 'আর কেনো! ওকে শালা বলে ফেলেছেন—ওর বোনকে বিয়ে করে সত্য রক্ষা করে ফেলুন।'

এবং 'সাধুর' আতঙ্কিত সত্যদর্শনের ক্ষুদ্র সংবাদও এখানে দেওয়া যায়:

বলরাম-মন্দিরে লাটু-মহারাজের তিন ডাক্তার-ভক্ত—ডাঃ চুনীলাল বসু, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল ও ডাঃ নিতাই হালদার—এসেছেন। তিনজনই পশার-ওয়ালা যশস্বী ডাক্তার। তাঁদের সমবেত অভ্যুদয়ে লাটু-মহারাজ চমকিত।

লাটু-মহারাজ—আপনারা তিনজন একসঙ্গে? এখন কি চিত্রগুপ্তের ছুটি না কি?

ডাঃ কাঞ্জিলাল (সদুঃখে)—এখন কলকাতার সিজন ভাল—অসুখ-বিসুখ কম।

লাটু-মহারাজ—তাই বুঝি তিনে মিলে হামাদের আশীর্বাদ নিতে এসেছেন? বাকী, হামনে এতে আশীর্বাদ দিবে না।

লাটু-মহারাজ একটি অপণ্ডিত ডাঃ জনসন—তত্ত্বকথা শুনলেই তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে পরীক্ষা করতেন, এবং সবচেয়ে আমোদ পেতেন এক্ষেত্রে গুরুভাইদের খুঁচিয়ে। গিরিশবাবুর বাড়িতে রাখাল-মহারাজ একদিন বললেন—'দেহধারণ করলেই রোগে-শোকে ভুগতে হয়—এগুলো যেন শরীরধারণের ট্যাক্স, না দিয়ে নিস্তার নেই।' কিছুক্ষণ পরেই একটা বোলতা এসে রাখাল-মহারাজের কানে কামড়ে দিল। ব্যাপারটা যথেষ্ট যন্ত্রণার কারণ হল। গিরিশবাবু পানের ডিবে থেকে চুন নিয়ে সেখানে লাগিয়ে দিতে যন্ত্রণা কমল। লাটু-মহারাজ খুশীসে বললেন —'রাখাল! ট্যাকস্ (ট্যাক্স) লিচ্চে রে, তোর ট্যাকস্ লিচ্চে রে।'

'সুপণ্ডিত' গুরুর কাছ থেকে এবং নিজ চেষ্টাতেও লাটু-মহারাজ অনেক ইংরেজী শব্দ শিখেছিলেন—ট্যাকস্, কুশ্চিন, লস্করী (লাক্সারি) ইত্যাদি। এইসব শব্দকে তিনি সগর্বে ব্যবহার করিতেন। আবার বাংলা শব্দ নিয়েও খেলা করতে ছাড়তেন না। জনৈক ভক্ত তাঁকে 'মুক্ত পুরুষ' বলেছিলেন, তাতে তিনি বলেন—'শালারা সব মুক্ত পুরুষ দেখছে। মুক্ত পুরুষ! হাঁ, মুক্ত পুরুষ! বাকী, কোন্ মুক্তো বলো তো —বোম্বাই মুক্তো, না আস্‌লি মুক্তো?'

শব্দখেলায় গণ্ডগোল যে হতনা তাও নয়। সন্ন্যাসীরা বসে আছেন বরাহনগর-মঠে। শিবানন্দ-স্বামী দুই ব্যক্তির সম্বন্ধে কৌতুক-কটাক্ষ করে মন্তব্য করছেন—তাতে সায় দিয়ে লাটু-মহারাজ উত্তেজিত হয়ে বললেন—'দেখো শরোট। হামি তো আগেই বলেছি, শালারা মাসতুতোয় মাসতুতোয় চোরে ভাই।'

সকলে হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। লাটু-মহারাজও তাতে যোগ দিলেন।

হাসিকে শ্রীরামকৃষ্ণ আবশ্যিক করে গিয়েছিলেন। তাঁর মহাসমাধির ঠিক পূর্বদিনের কথা; দুপুরে বাজপড়ার মতো আওয়াজ হয়েছে; প্রচণ্ড শব্দ শুনে শ্রীমা ও লক্ষ্মীদিদি ঠাকুরের ঘরে ছুটে এলেন; লক্ষ্মীদিদি বড় ভয় পেয়েছিলেন; তাঁর ভয়ার্ত মুখ দেখে ঠাকুর তাঁর অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যেও বলেছিলেন—'আমি গোমড়া মুখ দেখতে ভালবাসি না।' লক্ষ্মীদিদি তখন হেসে উঠেছিলেন।

সকল গুরুভাইয়ের সঙ্গেই লাটুর ভালবাসা—কিন্তু 'লোরেন-ভাইয়ে'র সঙ্গেই সর্বাধিক। লোরেন ভাই—রূপে, বিদ্যায়, ব্যক্তিত্বে, সব দিকে এগিয়ে আছে—লাটু ঠিক করলেন, একটি জায়গা আছে যেখানে তাকে ধরবার চেষ্টা করা যেতে পারে। সেই সাধনার ক্ষেত্রেও কিন্তু লাটু দেখলেন, লোরেন-ভাইকে ধরা যায় না। তখন লাটুর ভালবাসার সঙ্গে যুক্ত হল ভক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ লাটুর লোরেন-ভক্তিতে ইন্ধন দিতেন। "ওরে। আর সবাইকে দেখি—কেউ পিদ্দিম, কেউ একটা বড় বাতি, বড়জোর কেউ একটা বড় তারা। বাকী নরেন আমার সূর্য। ওর কাছে সবাই ম্লান হয়ে যায়"—শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন।

সেই নরেনের ভালবাসায় লাটু কেনা। হুঁকো হাতে করে লোরেন-ভাই লাটুকে কত 'ফায়ার করত', 'লিকচার দিত'—লাটু তাতে একেবারে মুগ্ধ। লাটু স্বপ্ন দেখতেন, স্বপ্নের কথা নরেন্দ্রকে বলতেনও—'দ্যাখ্ ভাই লোরেন, কিশুববাবু টাউন-হলে কিমন লিকচার কোরে। তুই ভাই ইসব কুরবি, আর হামি তুর জন্য এক কুজু জোল লুয়ে বসে থাকব।' লাটুর সে স্বপ্ন সফল হল যখন স্বামীজী আমেরিকায় বক্তৃতা করে বেড়াতে লাগলেন, যদিও সেখানে 'এক কুজু জোল লুয়ে' বসে থাকবার উপায় লাটুর ছিল না। কিন্তু আনন্দের মহাপ্লাবনে লাটু ভাসতে লাগলেন যখন নরেন্দ্রের গৌরবসংবাদ ক্রমান্বয়ে আসতে লাগল। গিরিশবাবু বলেছিলেন, 'লাটু এখানে এসে ঠিক বালকের মতো উদ্‌গ্রীব হয়ে স্বামীজীর জয়যাত্রার কথা শুনত।' লোরেন-ভাই অতঃপর দেশে ফিরলেন, লাটু কিন্তু সামনে গেলেন না, তাঁর আশঙ্কা হল—যে-মানুষটি গিয়েছিল, সেই একই মানুষ যদি ফিরে এসে না থাকে। সাহেব শিষ্য হওয়ায় যদি, লোরেনের অভিমান হয়ে থাকে! স্বামীজী তাঁকে খুঁজে বার করলেন, জানতে চাইলেন—লাটু পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন? লাটুর উত্তর শুনে স্বামীজী তাঁর হাত ধরে বললেন, 'তুই আমার সেই লাটু-ভাই, আর আমি তোর সেই লোরেন-ভাই।' লাটু তারপর আরও দেখলেন, লোরেন-ভাই সর্বত্র সমান। লোরেনের সার্কাসওয়ালা বাল্যবন্ধু মতিলাল যখন সংকোচে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই, তোমায় এখন কি বলে ডাকব?' স্বামীজী বললেন, 'হ্যাঁরে মতি, তুই পাগল হয়েছিস নাকি? আরে আমি সেই নরেন, আর তুই সেই মতি।' লাটু দেখলেন, বিলেত থেকে ফেরার পরে স্বামীজী 'সাহেবী-পোষাক ছেড়ে সেই ২৲ টাকা দামের চাদর আর ২॥০ টাকা দামের

জুতো পরতে লাগল।' সুতরাং লাটু জানলেন, তাঁর লোরেন-ভাই আচার-আচরণে একই আছেন, যদিও অধিকন্তু দেখলেন, স্বামীজীর ফায়ার করবার শক্তি বেড়ে গেছে ; কথা শুনতে-শুনতে লোকগুলোর দিল যেন বেড়ে যাচ্ছে।' এবং আশ্চর্য, স্বামীজীর পুরনো দুষ্টবুদ্ধি একটুও কমেনি। সরলপ্রাণ লাটু গোড়ার দিকে ও-বস্তু ধরতে পারতেন না। স্বামীজী বললেন, 'লাটু তোকে আমেরিকায় নিয়ে যাব।' লাটু বোঝাতে চাইলেন, তিনি মুখ্যু মানুষ, সেখানে গিয়ে কি করবেন। স্বামীজী নাছোড —লাটুও অস্বীকারে অস্থির। ব্রহ্মানন্দ কৌতুকে যোগ দিলেন, বললেন, 'ওরা তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।' তখন লাটু মহাবিষণ্ণ। সেটা কাটল সকলের হো-হো হাসিতে। স্বামীজী অবশ্য তাঁর লাটু-ভাইকে পুরো অব্যাহতি দেননি—ভারতে ফেরার পরে উত্তর ভারত সফরের সময়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। লাহোরের একটি ঘটনা—লাটু-মহারাজের কাছ থেকে স্বামী বিজয়ানন্দ শুনেছিলেন—(স্বামী চেতনানন্দের সৌজন্যে সেটি আমি জেনেছি)—লাটু-মহারাজের জবানীতে তা এই :

"স্বামীজী হামাকে ডেকে বললেন, 'লেটো, আজ বক্তৃতা আছে, তুই আমার সঙ্গে যাবি।' হামি বললুম—'লোরেন-ভাই, হামি যাবে না। তুমি তো আংরেজিতে বলবে, ও হামি বুঝতে পারবে না।' স্বামীজী বললেন, 'না তোকে যেতেই হবে। লেটো, তুই আমার ভাই কি-না বল্ ?' আমি বললুম, 'জরুর! হামি তোমার ভাই আছি।' লেকিন আমার স্বামীজীকে বললুম, 'না ভাই, হামি তোমার সঙ্গে যাবে না।' স্বামীজী বললেন, 'কেন রে ? এই-যে বললি তুই আমার ভাই!' হামি বললুম, 'ও তো ঠিক আছে, লেকিন হামার তো সিলিকেন (সিল্‌কেন) আলখাল্লা নেহি।'

"স্বামীজী তো তাঁর একটা সিলিকেন আলখাল্লা হামাকে পরিয়ে দিলেন। তা স্বামীজী হামার চেয়ে অনেক লম্বা, ও আলখাল্লা তো হামার পা থেকে নীচে বেরিয়ে গেল। স্বামীজী খানিকটা তুলে হামার কোমরে বেঁধে দিলেন। তখন হামি বললুম, 'দ্যাখো লোরেন-ভাই, হামার তো পগুড়ি নেই।' তখন স্বামীজী তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে পগুড়ি বেঁধে দিলেন। তারপর স্বামীজী বললেন, 'লেটো, এবার গিয়ে আয়নার সামনে নিজের চেহারাটা দেখে নে।' হামি দেখলুম, লেটো নেই, দোসরা আদমী দাঁড়িয়ে আছে।

"হামি কিন্তু স্বামীজীকে বললুম, 'ভাই হামি কোচোয়ানের কাছে বসবে।' স্বামীজী বললেন, 'কেনো ?' হামি বললুম, 'ভাই তোমার সঙ্গে সাহেব যাবে, হামি তোমার সঙ্গে যাবে না।' স্বামীজী তখন বললেন, 'লেটো, এই যে একটু আগে বললি, তুই আমার ভাই।' হামি তখন বললুম, 'জরুর। আচ্ছা ভাই, হামি তোমার কাছে বসবে।'

"স্বামীজী তো বক্তৃতা শুরু করলেন। একবার এদিকে যাচ্ছেন, আর বলছেন—আবার ওদিকে যাচ্ছেন, আর বলছেন। তারপর স্বামীজী একটা ঘুষি লাগিয়ে দিলেন টেবিলের উপর। টেবিলের উপর থেকে ফুলদানি পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

"স্বামীজী তারপরে হামাকে তাঁর ঘরে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'লেটো, আজ বক্তৃতা বুঝেছিস?' হামি বললুম, 'হাঁ, ঠিক বুঝেছি। তুমি তো ভাই সব ঠাকুরের কথা বলেছ।' তখন স্বামীজী বললেন, 'লেটো, আমার বক্তৃতার আসল কথা কেবল তুইই বুঝেছিস।'"

লাটুকে স্বামীজী কাশ্মীরে নিয়ে গেছেন; হাউসবোটে উঠেছেন। সেই বোটের একপাশে মাঝি থাকে পরিবারবর্গ নিয়ে। সুতরাং লাটু সে বোটে থাকবেন না—'হামি মেইয়া-মানুষের সঙ্গে এক বোটে থাকবে না।' ব্যাপারটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল যখন স্বামীজী মজা করবার জন্য মাঝির মেয়েকে একটা পান দিয়ে বললেন, 'দ্যাখ্ এই পানটি ওধারে যে সাধু বসে আছে তার হাতে দিয়ে আয়।' মেয়েটি পান দিতে গেলে লাটু মহা ক্রুদ্ধ। মেয়েটি যখন জোর করতে লাগল, তখন লাটু তাঁর লোরেন-ভাইয়ের কারসাজির প্রতিবাদে সোজা জলে ঝাঁপ দিলেন। স্বামীজী রসিকতার এইরকম সিক্ত পরিণতি দেখে তাড়াতাড়ি অন্তরাল থেকে উদিত হয়ে অনেক বুঝিয়ে লাটুকে পাড়ে তুললেন।

লাটুকে স্বামীজী নাড়া দিতেন; সুযোগ পেলে লাটুও ফেরত দিতে ছাড়তেন না। কাশ্মীরে একটি মন্দির দেখে স্বামীজী বললেন, মন্দিরটি দু'তিন হাজার বছরের পুরনো। লাটু-মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—'কি করে তা বুঝলে? ওখানে কি সেকথা লিখা ছিল?' শুনে স্বামীজী হেসে বললেন, 'তুই যদি লেখাপড়া শিখতিস তাহলে তোকে বোঝাতে চেষ্টা করতুম।' স্বামীজীর কথায় লাটু-মহারাজ আরও উচ্চহাসি হাসলেন—'ওঃ বুঝেছি। তুমি এমন বিদ্বান যে, হামার মতন গণ্ডমুখ্যুকে বুঝাতে পারো না।'

এর আগে স্বামীজী একবার লাটুর সহজ প্রজ্ঞায় চমকে গিয়েছিলেন। স্বামীজী গুরুভাইদের সঙ্গে বসে পৃথিবীর নানা দেশের পূজার কথা বলছিলেন। কথার মাঝখানে লাটু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাঁ ভাই, তুমি তো এত দেশ ঘুরেছ—কত দেখেছ, কত শুনেছ, বাকী কোথাও কি পৃথিবী-পূজোর কথা শুনেছ?' স্বামীজী ঈষৎ বিস্মিত হয়ে এই প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। লাটু-মহারাজ বললেন, 'কি জানো ভাই! হামি তো দেখছি যে, এই মাটি থেকে যা-কুছু সব হয়েছে; ইখানকার এত ঐশ্বর্য—সবই তো মাটির বুক চিরে বের করে নেওয়া হচ্ছে; ইখানকার জিনিস নিজের ঘরে তুলে সবাই নিজেকে বড় ভাবছে। তাই জিজ্ঞেস করছি—যেখান থেকে লোকেরা এত পাচ্ছে, সেই পৃথিবীকে তারা পূজো করে কি না।' লাটুর কথা

শুনে স্বামীজী অধিকতর বিস্ময়ে এবং আনন্দে শরৎ-মহারাজকে বলেছিলেন, 'দেখেছিস, লেটো প্লেটোর মতো কথা বলছে !'

লাটুর মতো ধাবমান অগ্নি কখনো কোনো-একটি আধারের বন্ধন স্বীকার করতে পারে না। লোরেন-ভাইয়ের মঠেও লাটু থাকতে গররাজি। স্বামীজী মঠে নানা নিয়ম চালু করেছেন ! এক গুরুভাই সেই নিয়ম ভাঙায় অন্য গুরুভাই বরাদ্দ শাস্তি নিতে এগিয়ে এলেন—দেখে লাটু বিহ্বল—কী ভালবাসা ! কী ভালবাসা স্বামীজীর ! আমেরিকা থেকে ফিরেই তিনি লাটুর কাছে গিয়ে ভিক্ষে করে খেলেন। তবু লাটু স্বামীজীর পদ্ধতি মানতে পারলেন না। সন্ন্যাসীরা ডাম্বেল ভাঁজবেন স্বাস্থ্যগঠন করবার জন্য—স্বামীজীর ইচ্ছা। লাটু স্বামীজীকে বললেন—'এ আবার কি-একটা মত চালিয়ে দিলে ভাই। এ বয়সে হামাদের ডাম্বেল ভাঁজতে হবে নাকি ?' স্বামীজী শুনে হাসতে লাগলেন। কিন্তু ঈষৎ বিরক্ত হলেন, যখন লাটু-মহারাজ, ঘণ্টা-ধরে 'ধ্যেনে বসতে' রাজি হলেন না। 'হামার মন এখনও এমন ঘড়ি-ধরা হয়নি যে, তুমি ঘণ্টা বাজাবে আর আমার মন অমনি ধ্যেনে বসে যাবে। তোমার যদি হয়ে থাকে ভালই।' সুতরাং লাটু-মহারাজ গামছা কাপড় নিয়ে মঠ থেকে চললেন। স্বামীজী গোড়ায় বললেন 'তবে তুই যা।' পরে বললেন, 'তোকে নিয়ম মানতে হবে না, তুই যেমন ইচ্ছে থাকবি।'

লাটু কিন্তু অনিকেত। ঘুরে-ঘুরে বেড়াতেন। দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য থেকে ফিরে স্বামীজী তা শুনলেন। লাটুকে পাকড়ে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে তোর চলত কি করে ?' লাটু বললেন, 'কেনো ? ওপেন-ঠাকুর [ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ] সাহায্য করত। যেদিন কুছু জুটত না সেদিন তার দোকানের সামনে দাঁড়ালেই সে বুঝতে পারত, সিকিটা দুয়ানিটা দিয়ে দিত।' এই কথা শুনে স্বামীজী ঊর্ধ্বমুখে বলেছিলেন, 'ঠাকুর, উপেনের কল্যাণ করুন।'

সেই স্বামীজী চলে গেলেন। অতবড় দুঃসংবাদ পেয়েও লাটু-মহারাজ মঠে গেলেন না। কেন এই বিচিত্র ব্যবহার ? সকরুণস্বরে লাটু-মহারাজ বললেন—'বিবেকানন্দ-ভাই আমাকে কত ভালবাসতো ! এমন ভালবাসা হারালুম। তাঁর ( ঠাকুরের ) পর যাওবা বিবেকানন্দ-ভায়ের ভালবাসা পেলুম, সেও চলে গেল।'

লাটু-মহারাজ নিশ্চয় তখন প্রাণপণে জপ করবার চেষ্টা করছিলেন—সন্ন্যাসীর কেই-বা পিতা—কেই-বা মাতা—কেই বা ভ্রাতা—

বিবেকানন্দের প্রিয়তম বন্ধু ব্রহ্মানন্দ কিন্তু মঠ ত্যাগ করে যাবার উদাসীন বৈরাগ্য অবলম্বন করতে পারেননি—বন্ধু কর্তৃক ন্যস্ত দায়িত্বের কথা মনে রেখেই। ভ্রাতা-বিবেকানন্দ পিতা-রামকৃষ্ণকে মঠে বসিয়ে রেখেছেন—ঠাকুরের মানসপুত্র ব্রহ্মানন্দ

সেই মঠের ন্যাসরক্ষক হয়ে রইলেন স্বতঃই। বিশাল মহান আনন্দময় অস্তিত্ব তাঁর। রামকৃষ্ণ-শিষ্যদের সবাই রসিক, কিন্তু এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের পরবর্তী স্থান নিঃসন্দেহে ব্রহ্মানন্দের। অথচ ব্রহ্মানন্দই আবার সর্বাধিক গভীর ও গম্ভীর। 'রাখালের স্পিরিচুয়ালিটি আঁকড়ে পাওয়া যায় না'—স্বামীজী বলতেন। সদাই অন্তর্মুখ তিনি, কিন্তু ভিতরের আনন্দ জ্যোতির্ময় করে রাখত সর্বাঙ্গে তাঁকে। মাঝে-মাঝে এই হিমালয়ের শিখরে প্রভাতরশ্মি ঝলমল করে উঠত—ব্রহ্মানন্দ হাসিতে-কৌতুকে, রসে-রহস্যে তখন সকলকে মাতিয়ে দিতেন।

ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গ দীর্ঘ হবার কথা। সুতরাং কিছু আত্মশাসন করতে হবে।

ব্রহ্মানন্দ বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু। তিনি জমিদার সন্তান; কৈশোর-যৌবনের অনেকখানি সময় স্বামীজীদের বাড়িতে কাটিয়েছেন। তখন তাঁকে নিকট থেকে দেখেছেন মহেন্দ্রনাথ। রাখাল ( ব্রহ্মানন্দ ) তখনো সুরসিক। পড়াশুনায় বিশেষ মন ছিল না। তিন রকম পড়া করতেন—বসে পড়া, শুয়ে পড়া ও ঘুমিয়ে পড়া। নাক ডাকত ভয়ানক; তাঁর সঙ্গে একঘরে শোয়া আর চিড়িয়াখানায় বাঘের সঙ্গে শোয়া একই কথা, বন্ধুরা মনে করতেন। শরীরচর্চায় আগ্রহ ছিল—অম্বু গুহর আখড়ায় কুস্তী করতেন। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কিরকম ঊর্ধ্বপদ-ভ্রমণের প্রতিযোগিতা করতেন, সেকথা আগে বলে এসেছি। স্বভাব ছিল মিষ্ট, কিন্তু দুষ্টুমী বা কৌতুকের আনন্দে নিজেকে বঞ্চিত রাখতেন না। মহেন্দ্রনাথ একে 'হাস্যপূর্ণ দুষ্টামী' বা 'Witty mischief' বলেছেন। বাড়ির উড়িয়া চাকরকে ভূত দেখিয়ে, ভণ্ড সাধুর সাপখেলাকে স্প্রিং-এর সাপের খেলা বলে প্রমাণ করে, এবং আরও নানা কাণ্ড অবিরত ঘটিয়ে, নিজের প্রাণশক্তি প্রমাণ করতেন। এই সমস্ত কাণ্ড-কারখানার মধ্যে জগৎরসের রসিক, সকরুণ সহানুভূতিপূর্ণ একটি হৃদয় বর্তমান ছিল। গ্রাম্য দরিদ্র মানুষরা ধনী মানুষের দেওয়া খাবার নিয়ে কী ফ্যাসাদে পড়ে, সে গল্প মজা ক'রে তিনি বলতেন। মাছের পোলাও খেতে দেওয়া হলে গাঁয়ের লোক হৈ-চৈ ক'রে চেঁচিয়ে বলেছিল, 'মা গো! কি গন্ধি ভাত! পচা হলুদ দিয়ে রেঁধেছে, আবার তাতে মাছ দিয়েছে! আরে ছি! ভাতে কখনো তেল দেয়?' কলকাতার সন্দেশ পাতে পড়তেও তারা চেঁচামেচি শুরু করেছিল—'আরে রাম! ময়রা ঠকিয়েছে, সন্দেশে মিষ্টি দিতে ভুলে গেছে!' তারা সন্দেশে গুড় মেখে খেয়েছিল। রাখালের এই মজার কাহিনীর পিছনে আর একটি কাহিনী ছিল, যার দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছিল—'গন্ধি ভাত' ইত্যাদির আসল যোগানদার কারা ছিল। রাখালের জ্যাঠামশায়ের মাতৃশ্রাদ্ধ। তিনি প্রতাপশালী জমিদার। গ্রামের প্রজাদের কাছে আদেশ গেছে—দই, ক্ষীর জোগাতে হবে। গরীব প্রজারা ভারে-ভারে দই, ক্ষীর আনছে—কিভাবে আনছে রাখাল তা জানেন। সকলের সামনেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'জ্যাঠামশাই! এ আপনার

মার শ্রাদ্ধ হচ্ছে, না গয়লাদের শ্রাদ্ধ হচ্ছে!'

রাখাল হাজির হয়েছিলেন তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে 'রাজা' করে দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের। স্বামীজী তা মেনে নিয়ে রাখালকে 'রাজা' বলে ডাকতেন। তারপর একদিন রামকৃষ্ণ নামক অকিঞ্চন সম্রাট চলে গেলেন, আর সর্বস্ব হারিয়ে 'রাজপুত্র' পথে নামলেন—সর্বস্ব ফিরে পাবার সংগ্রামে। "সিমলায় থাকিবার সময়ে রাখালের চাপল্যভাব ছিল। সে হাসিতামাশা, ভূতের ভয় দেখানো, আষাঢ়ে-চাষাড়ে গল্প বলা, এবং চোখ-টিপ্‌টিপ্‌ করিয়া নানারূপ মুখভঙ্গি করিয়া কৌতুকাদি করিত।...কিন্তু বরাহনগর-মঠে সাধু হওয়া হইতে তাহার মনের ভাব একেবারে বদলাইয়া গেল।...ধীর গম্ভীর অবস্থা—কণ্ঠস্বর করুণাপূর্ণ—সর্বদাই জপ করিতেছে।...বাহিরের ছোট ঘরটিতে একটি বালন্দার (গোলার মতো জিনিসে তৈরা একপ্রকার মাদুর) উপর পড়িয়া থাকিত।...কখনো স্থির হইয়া বসিয়া আছে—নির্বাক, নিশ্চল, চক্ষু অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ। অনেক সময় দেখিতাম যে, চক্ষের কোণে জল। কখনো-বা শুইয়া রহিয়াছে, কখনো-বা কনুই পাতিয়া হাতে মাথা রাখিয়া নিস্পন্দ হইয়া আছে। তাহার প্রাণের ভিতর কি-যেন আকুলি-বিকুলি ভাব, মুখে কিন্তু একটি কথাও নাই। এইসময় তাহার মুখের দিকে চাহিলে বুক যেন ফাটিয়া যাইত।...বড়মানুষ জমিদারের বড়ছেলে, স্বচ্ছল অবস্থা; সব ত্যাগ করিয়া এখন পথের ভিখারী। একটা ছেঁড়া মাদুরে শয়ন, মুষ্টিভিক্ষার অন্ন কাপড়ে ঢালিয়া লঙ্কার ঝোল দিয়া খাইতেছেন।...(পত্নী) বিশ্বেশ্বরী অনবরত চিঠি লিখিতেছে...মিনতি করিয়া বাড়ি ফিরিতে অনুরোধ করিতেছে, অন্ততঃ একটিবারও দেখা করিতে চাহিতেছে, বাপ অনুনয় করিতেছেন।...মানুষের স্বাভাবিক টান সন্তানের উপর, তাহাও যেন ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে...।"

নরেন্দ্রনাথ এই সময়ে একদিন রাখালের শ্যালক মনোমোহনকে বললেন—'তোমাদের রাখাল মরে গেছে।' সেইসঙ্গে যোগ করে দিলেন, 'আমাদের রাখাল বেঁচে আছে।' পিতা আনন্দমোহনকে রাখাল বললেন, 'আশীর্বাদ করুন, আপনাদের যেন ভুলে যাই।' রাখালের সেই ব্রহ্মানন্দ-জীবন—আশ্চর্য জীবন—তার সমুদ্রগভীরতাকে ফোটানো আমার সাধ্যে নেই, কেবল রসসিন্ধুর কয়েক বিন্দু আনন্দরস সঞ্চয় করে দিতে চাইছি। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন, বাল্যের কৌতুকপরায়ণ স্বভাব পরিণত বয়সে ব্রহ্মানন্দের মধ্যে আবার ফিরে এসেছিল, যখন ব্রহ্মানন্দের মধ্যে রামকৃষ্ণের দিব্য অধিষ্ঠান।

"বৈরাগ্যকে ঠাকুর আনন্দমণ্ডিত করিয়াছিলেন। সেই সদানন্দ পুরুষ তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগকে আনন্দময় মূর্তিরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।...রাখাল এই আনন্দময় ভাবের এক পূর্ণ মূর্তিরূপে বর্তমান ছিলেন।...উত্তরকালে তিনি হাস্য-কৌতুকাদির

মধ্যে ভগবৎ-তত্ত্ব ও সাধনার ইঙ্গিত দিয়া আগন্তুকদিগের চিত্তে অনৈসর্গিক আনন্দের আস্বাদ দিতেন।"

রাখাল-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কৌতুকচ্ছবি—

রাখাল বৃন্দাবনে তীর্থ করতে গেছেন। বৃন্দাবন তাঁকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেলেছে। ভাবোচ্ছ্বাসের সঙ্গে শ্রীম'কে চিঠিতে লিখেছেন—"এ বড় উত্তম স্থান। আপনি আসবেন। ময়ূর-ময়ূরী সব নৃত্য করছে—নৃত্য গীত—সর্বদাই আনন্দ।"

রাখালের চিঠি শ্রীরামকৃষ্ণকে শোনানো হল। তিনি রহস্য করে বললেন—"রাখাল এঁকে লিখেছে—এ বেশ জায়গা—ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য করছে। এখন ময়ূর-ময়ূরী—বড়ই মুশকিল!"

রাখাল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ধর্মজ্ঞান এবং লোকচরিত্রজ্ঞান উভয়ই লাভ করেছিলেন। তাঁর লোকচরিত্রজ্ঞানের একটি শিক্ষাপ্রদ উপাদেয় ঘটনা বলে নেওয়া যায়। প্রেমানন্দ-স্বামী কোমলহৃদয়—লোকের অনুনয় এড়াতে পারতেন না। এক ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র ছেলে মারা গেছে—তিনি দুঃখে ও বৈরাগ্যে অধীর হয়ে মঠে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দিতে চান। ব্রহ্মানন্দ কিন্তু বুঝেছেন, এই শোকবৈরাগ্যের ঢেউ অল্পদিনেই নেমে যাবে। ভদ্রলোকের তাগিদে প্রেমানন্দ এসেছেন দরবার করতে। ব্রহ্মানন্দ হাতজোড় করে বললেন—'বাবুরাম দা, সাধুসঙ্গ করে লোকটির মনে বৈরাগ্য এল, আর তার সঙ্গ করে আমাদের বিষয়বুদ্ধি আসবে?'

তাই বলে সাধারণ মানুষের প্রতি কোনো অবজ্ঞা অশ্রদ্ধা নয়—তাদের প্রতি ভালবাসায় ভরপুর তাঁর প্রাণ। একটি সদ্য-পত্নীহারা যুবক এসেছে ভুবনেশ্বর-মঠে। তার অবস্থা দেখে মহারাজের করুণা হয়েছে। দিনের পর দিন তাকে নানা মজার কাহিনী শুনিয়েছেন। "তিনি পায়চারি করিতে-করিতে বলিতেন, আর গোপাল হাসিয়া গড়াগড়ি দিত। 'এত হাসলে বলি কি করে'—মহারাজ বলিতেন। সে বলিত, 'না, আপনি বলুন, আমি হাসব না'—কিন্তু কিছুতেই হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিত না, হাসিয়া লুটোপুটি খাইত। পত্নীশোক সে ভুলিয়া গেল। মঠ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাহিত না।"

যিনি অপরের পত্নীবিচ্ছেদ-বেদনা ভুলিয়া দিতে পারেন, তিনি কী না পারেন! একটি আনন্দধৌত কাহিনী এই প্রকার।—

নির্বন্ধে পড়ে মহারাজ শাঁখারিটোলায় এক ভক্তবাড়িতে গিয়েছেন—দিন তিনেক থাকবেন। সেই একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারে সুতরাং আনন্দযজ্ঞ। দুদিন মহানন্দে কাটল—তৃতীয় দিনে আনন্দের সঙ্গে বিষাদ—পরদিন মহারাজ চলে যাবেন। রাত্রিবেলা সকলে বিষণ্ণ। কাঁদতে-কাঁদতে একটি ছোট মেয়ে মহারাজের সেবককে শুধালো, 'আজকের রাত যদি না কাটে তাহলে মহারাজ তো এখানেই থাকবেন?'

সবাই তাঁকে রাখবার জন্য সচেষ্ট, কিন্তু উপায় নেই, মঠে মিটিং আছে। পরদিন বিকালে যখন গাড়ি এল, সকলের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। মহারাজ তখন গল্প জুড়ে দিলেন। সে এমন গল্প যে সকলে হো-হো করে হাসতে লাগল। "মুখে হাসি, আর দুই গণ্ডে বহমান অশ্রুর ধারা—এক অপূর্ব দৃশ্য। এক বুড়ী তো হাসিয়া গড়াগড়ি। সেই অবসরে গড়গড়া ইত্যাদি জিনিসপত্র গাড়িতে তুলিয়া দিতে সেবককে মহারাজ ইঙ্গিত করিলেন। তারপরে গল্প কবিতে-করিতেই সকলের সঙ্গে তেতলা হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। যখন তিনি গাড়িতে উঠিয়া পড়িলেন, গল্পটি বলাও শেষ হইল, আর তিনি যে চলিয়া যাইতেছেন, এই সম্বিতও ফিরিয়া আসিল। তখন সকলে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।"

বৃদ্ধ সুগম্ভীর সন্ন্যাসীর প্রতি শিশু বা বালক-বালিকারা বিচিত্র আকর্ষণ বোধ করত, কারণ তিনি তাদের কাছে নিজের চিরবালকত্ব খুলে দিতেন, এবং তাদের ক্ষেপিয়ে অস্থির করতেন। বালিকা চিন্ময়ী এসেছে অদ্বৈত-আশ্রমে—তার মা খাবার তৈরী ক'রে পাঠিয়েছেন তার হাত দিয়ে। চিন্ময়ীর ডাক নাম চিনি। সে আসতেই মহারাজ বলে উঠলেন, 'এক গ্লাস সরবৎ খাবো।' অমনি উপস্থিত অন্য সাধুরা বলতে লাগলেন, 'হাঁ হাঁ, চিনি এসেছে; ওকে ধরে জলের ড্রামে ফেলে দাও, সবারই এক-এক গ্লাস হয়ে যাবে।' চিনি চটে অস্থির। বলল, 'আমি আর কখনো আপনার খাবার আনব না।' মহারাজ সঙ্গে-সঙ্গে কাঁচু-মাচু হয়ে বললেন, 'না না না, আমি আর ব-ল-বো না! আমি আর ব-ল-বো না!'

ছোটদের সঙ্গে খেলতেন, গল্প করতেন পরমানন্দে। এক গয়লানীর গল্প জুড়লেন। ঘি-দই-দুধ বেচে গয়লানি অনেক টাকা করেছে; তা দিয়ে গয়না করেছে; দুটি হাত গয়নায় ভর্তি। গয়লানী, খদ্দের এলে, গয়না দেখানো ও জিনিসবেচার কাজ একসঙ্গে সারার জন্য দুহাত উপরে তুলে তালে-তালে পা ফেলে বলে, 'ঘি নিবি কি দই নিবি, ঘি নিবি কি দই নিবি?' গয়লানীর ভাবভঙ্গি মহারাজ অভিনয় করে দেখিয়ে দিলেন—ছেলেমেয়েরা হেসে লুটোপুটি!

কিন্তু আতঙ্কে তাদের হাসি থেমে যেত যখন মুখোস পরে হঠাৎ তাদের মধ্যে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এর চূড়ান্ত হয়েছিল একবার যখন আস্ত একটা ভালুকের চামড়া পরে বলরাম বসুর বাড়ীর একটি প্রায়-অন্ধকার ঘরে তিনি সমবেত ছেলে-মেয়েদের সামনে হাজির হয়েছিলেন। বিকটাকার বিরাট ভালুক—দাঁত বার ক'রে হাত নাড়ছে—দেখে বড়দেরই হৃৎকম্প, ছোটরা তো 'বাবাগো মাগো' বলে ছুটে পালালো। একটি ছোট ছেলে কিন্তু মহারাজকে হারিয়ে দিল। তাকে মহারাজ খুব স্নেহ করতেন। সে খুব ভয় পেয়েছে—চোখ দিয়ে জল পড়ছে—কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল—বলতে লাগল, 'আমি জানি তুমি মহারাজ!'—এই বলে দু'হাত বাড়িয়ে তাঁর দিকে

অগ্রসর হল। তখন মহারাজ ভালুকের সাজ খুলে ছেলেটিকে বুকে তুলে নিলেন।

ব্রহ্মানন্দ তাঁর বালকভাবে খুশি ছিলেন। ঘরে টাঙানো নিজের একটি ছবি দেখিয়ে হয়ত বললেন, 'দ্যাখ্ দেখি, কেমন বীরের মতো বসে আছি!' কিংবা মোটরে করে পথে যেতে-যেতে একটি স্কুল-বালকের সঙ্গে দেখা—তাকে পরদিন বললেন, 'কিরে, কাল কেমন মোটরগাড় চড়ে আসছিলুম, দেখলি তো!'

বড়দের সঙ্গে একই ব্যবহার। যাঁরা তার গাম্ভীর্যের জন্য কাছে ঘেঁষতে পারতেন না, সেই সাধু ব্রহ্মচারীদেরও মাঝে-মাঝে স্বচ্ছন্দ ক'রে দিতেন হাসির মজায়। তাঁদেরই একজন দরজা ভেজিয়ে পড়াশোনা করছেন, বাইরে থেকে কে কড়া নাড়ল। নিশ্চয় বজ্জাত চাকরটা। সুতরাং ধমক। তাতেও কড়ানাড়া থামল না। তখন গালিগালাজ। তাতেও যখন থামল না তখন উপযুক্ত শিক্ষা দিতে তিনি উঠলেন, কিন্তু দরজা খোলে না, বাইরে থেকে চাকরটা কড়া টেনে আছে। তখন মহারাগে উক্ত ব্রহ্মচারী সর্বশক্তি দিয়ে হ্যাঁচকা টান দিলেন দরজায়, আর বাইরে থেকে চাকরটি কড়া ছেড়ে দিল, সুতরাং ইনি চিৎপটাং। যথেষ্ট লাগল, তবু উঠে তাকে ধরতে গিয়ে দেখেন—স্বয়ং মহারাজ পিছন ফিরে চলে যাচ্ছেন। সর্বনাশ! তাহলে মহারাজকেই গাল দিয়েছেন। অবিলম্বে ভয়ে দরজা বন্ধ ক'রে খানিক অপেক্ষা করলেন, যাতে মহারাজ নিজের ঘরে পৌঁছে যেতে পারেন। তারপর আবার উঁকি দিয়ে দেখার জন্য যেই দরজা খুলেছেন—দেখা গেল মহারাজের সহাস্য মুখ। তিনি বললেন, 'কেমন হয়েছে! আর গাল দেবে!'

স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের মজার দুষ্টুমির অন্ত ছিল না। মুর্শিদাবাদ থেকে অখণ্ডানন্দ এলে তিনি কিছুতে তাঁকে যেতে দেবেন না, অথচ তাঁর যাওয়ার জরুরী প্রয়োজন। তাঁকে আটকাবার জন্য কোনোদিন হয়ত যতগুলি অযাত্রা সম্ভব—কাঁকড়া, কচ্ছপ, কিংবা কানা চোখ দেখানো—সব-কিছুর আয়োজন করলেন। দ্বিতীয় দিনে নতুন ফন্দী। ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে দিয়েছেন—গাড়ির দরজা বন্ধ। ঘন্টা দেড়েক চলে যখন গাড়ি থামল, অখণ্ডানন্দ স্টেশনে নামবার জন্য দরজা খুলেছেন—দেখেন যে, তাঁকে অভ্যর্থনা করতে মঠের গেটে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং মহারাজ!

ভক্তদের নিয়েও কত আনন্দ! কি করে ঘটকালি করতে হবে ঘটককে তা শেখাচ্ছেন ভক্তদের সামনে—তাঁরা হেসে লুটোপুটি। কোনো ভক্তকে পার্শেল করে উপহার পাঠিয়েছেন—প্যাকেট খোলামাত্র গিরগিটি লাফিয়ে উঠল—অবশ্যই স্প্রিং-এর গিরগিটি। ললিত চাটুজ্যে, ডাক নাম কাইজার (বিশাল জার্মান-গোঁপের জন্য), থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, (তাঁদের মধ্যে নরীসুন্দরী ইত্যাদিও আছেন)—তিনি মহারাজকে পদ্যে-লেখা চিঠিতে কাতর আবেদন

জানিয়েছেন—তাঁর মতো লোকের উদ্ধারের সহজ পথ বাতলে দেবার জন্য। তিনি উত্তর পেলেন পদ্যেই—প্রথম লাইনেই আছে মূল উত্তর—তোমাকে আ-মি উদ্ধার করব ?—'কত নরী পরী আদি মহাপাপী উদ্ধারিলে তুমি ?'

আরও ঘটনা :

"মহারাজ তাঁহার শিষ্যা রানুর মাতুলালয়ে আসিয়াছেন তাঁহাদের আমন্ত্রণে। রানুর মা অনুযোগ করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! আপনার মেয়েটি বড্ড রাগী, একটুতেই রেগে যায়।' মহারাজ কহিলেন, 'রাগ? রাগ থাকা ভাল। (রানুর দিকে তাকাইয়া) তবে রানু, একটু 'অনু' যোগ করে দিও।' রানুর মা ও দিদিমা-দুজনে হাসিয়া গড়াগড়ি।"

অধ্যাপক গোকুলদাস দে লিখেছেন—"হাস্যরসসৃষ্টিতে তাঁহার মতো আর কাহাকেও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি আনন্দময় জগতের রাজ-রাজেশ্বর —সেই আনন্দের কণা মর্ত্যবাসীর নিকট ছড়াইয়া দেওয়া বিচিত্র কি।"

আর মহারাজ বলছেন তাঁর এক গায়ক শিষ্যকে—"কী বল পুলিন, ভবসাগরটা তো তরতে হবে—অনায়াসে—হেসে খেলে—হেসে খেলে—মহানন্দে—"

বিবেকানন্দ জানতেন ব্রহ্মানন্দ কী। জানতেন এবং ভুলতেন। কেবল জানা নয়, ভোলাও লীলার অন্তর্গত। জানা ও ভোলার আলোছায়াপথে দুই বন্ধু হাত-ধরাধরি করে পথ হেঁটেছিলেন। সেই পথে অন্য গুরুভাইরাও চলতেন। যদি কেউ সরে যেতে চাইতেন—ব্রহ্মানন্দ তাঁদের টেনে আনতেন, কারণ বিবেকানন্দের চেয়েও তিনি বিবেকানন্দকে বেশী জানতেন। বরাহনগর-মঠে নরেন্দ্রনাথ আছেন, কোনো এক গুরুভাই পরিব্রজ্যায় যাবেন—ব্রহ্মানন্দ বাধা দিয়ে বললেন, 'ওরে যাবি কোথায়! এখানে নরেনের মতো লোকের সঙ্গ—ছেড়ে যাবি কোথায়!' বিবেকানন্দ কিন্তু বন্ধুদের ছেড়ে বিদেশে চলে গেলেন। তারপর যখন ফিরে এলেন—হাজার-হাজার মানুষ শোভাযাত্রা করে তাঁকে নিয়ে চলল কলকাতার পথে—বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়িতে পৌঁছলেন। তারপর ?—

"পুষ্পসজ্জিত বিরাট তোরণ। ফটকের সামনে পশুপতি বসু প্রভৃতি স্বামীজীকে প্রণাম করে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছিলেন—সেই সময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্বামীজীর গলায় পুষ্পমালা পরিয়ে দিলেন। স্বামীজী দু'জনকেই প্রণাম করলেন, বললেন, 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।' মহারাজও [ ব্রহ্মানন্দ ] উত্তর দিলেন, 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা।' মাস্টার-মশাই এসে প্রণাম করতেই স্বামীজী হেসে বললেন, 'সখি রে!' তারপর নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু প্রণাম করতেই 'এ যে বিন্দে-দূতী দেখছি' বলে তাঁদের সঙ্গে নানারকম রহস্যালাপ করতে লাগলেন। নীচে

এক পাশে এক বেঞ্চিতে হুটকো গোপাল বসেছিলেন। স্বামীজী তাঁকে দেখে বললেন, 'ওরে হুটকো, আমি সেই নরেনই আছি। ওখানে লুকিয়ে আছিস কেন, এদিকে আয়। বাংলা বুলি ভুলিনি।'...পশুপতি বসু প্রভৃতি তারপর স্বামীজীকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। উপরে উঠতেই গিরিশচন্দ্র স্বামীজীর গলায় একটা মালা পরিয়ে দিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিলেন, স্বামীজী গিরিশবাবুর হাত ধরে ফেলে বললেন, 'ও কি জি-সি, এতে যে আমার অকল্যাণ হবে। তোমার রামকৃষ্ণকে 'জয় রাম' করে সাগর পার করে দিয়েছি'।"

বেলুড়-মঠ হ'ল। স্বামীজী একদিন ষোডশ উপচারে ভোগের আয়োজন করলেন—ব্রহ্মানন্দকে তা খাইয়ে যুক্তকরে বললেন—'রাজা তোর আদর তিনিই জানতেন, আমরা আর তোর আদর কী করব!' এবং স্বামীজী একদিন অত্যন্ত অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কোনোক্রমে বাইরের ঘরে গিয়ে বসলেন; সবাই সন্ত্রস্ত; গিরিশবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'স্বামীজী, তুমি নিচে এলে যে! তোমার এত অসুখ!' স্বামীজী বললেন, 'কি করি বলো? শুয়ে-শুয়ে যতবার চোখ মেলেছি— দেখি, রাজা প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে আছে। তার মুখের ভাব দেখে আর শুয়ে থাকতে পারলুম না। এখন হাঁটছি, বেড়াচ্ছি দেখে যদি রাজার মুখে হাসি বেরোয়।' তারপর ছদ্মকোপে বললেন—'শালা রাজা আমাকে রোগী করে রাখতে চায়।'

স্বামীজী বলেছিলেন, 'রাজা—সত্যি আমাদের রাজা। সেই রাজাকে কতবার আঘাত করেছেন তিনি। রোগযন্ত্রণায় এবং মঠপরিচালনার দুশ্চিন্তায় তাঁর মাথা ঠিক থাকত না। নিষ্ঠুরভাবে ব্রহ্মানন্দকে তিরস্কার করেছেন, গালিগালাজ করেছেন, তারপর ক্ষমা চেয়েছেন অকুণ্ঠে। মিষ্টি কিনে এনে হাজির হয়েছেন বন্ধুর কাছে, তাকে খাইয়ে ভোলাতে। ব্রহ্মানন্দ কিন্তু রাগেননি কদাপি। বেদনা পেয়েছেন অবশ্যই। কিন্তু সব ভুলেছেন, যখন ভেবেছেন, যে বকেছে তার হৃদয়টা কি! বিশেষ সতর্ক থেকেছেন, স্বামীজী যাতে কোনোরকম উত্তেজনাবোধ না করেন; তাতে তাঁর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। তবু কখনো-কখনো এত বেশি আহত হয়েছেন যে, মঠ ছেড়ে চলে যাবার কথা ভেবেছেন, কিন্তু ফটকের কাছে গিয়ে থেমে গেছেন—এই মঠ, এই সংঘ ঠাকুরের—তিনি স্বয়ং এখানে আছেন—একে ফেলে যাবো কোথায়। নরেন বকেছে—বকেছে তো হয়েছে কি।

ব্রহ্মানন্দ বিবেকানন্দকে জানতেন বলেই জানতেন যে, তাঁকে বোঝা কত কঠিন। একটা সামান্য ঘটনার কথাই ধরা যাক। একবার এক মাতাল এসেছে বেলুড়-মঠে। সে 'নিচে গিয়ে হাসি-তামাশা করে, আসর জমিয়ে ঘন্টাখানেক বাদে বিদায় হল।' তাকে কিছু প্রসাদ খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বামীজী আসরে ছিলেন না। উপরে

কাজ করছিলেন। কিন্তু সব-কিছু তাঁর কানে যাচ্ছিল। মাতাল যেতেই উপর থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাঁারে তাকে কি দিলি—এতক্ষণ আনন্দ দিয়ে গেল! মাত্র প্রসাদ দেওয়া হয়েছে শুনে রাগ করে বললেন—'অ্যাঁ! লোকটার লাখ টাকার আমোদের বদলে একটু বাতাসা হাতে! যা—এখনি এই দুটো টাকা ওকে দিয়ে আয়। এই টাকায় বেশ আনন্দ করে খেতে বলিস!'

বিহ্বল বালকটিকেও ব্রহ্মানন্দ জানতেন। বিজ্ঞানানন্দের কাছে স্বামীজী প্রাচীন ঋষিদের বিষয়ে কি-একটা মন্তব্য করেছেন, বিজ্ঞানানন্দ চডা উত্তর দিয়েছেন—'আপনি কি তাঁদের চাইতে বড? তাঁদের তুলনায় আপনি নগণ্য।' শুনেই স্বামীজী উত্তেজিত. ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়ে বারবার বলতে লাগলেন, 'শোনো রাজা, পেসন কি বললে শোনো! বলে, আমি কিছু বুঝি না, আমি নগণ্য!' ব্রহ্মানন্দ অগত্যা সান্ত্বনা দিলেন, 'আরে পেসনের কথা শোনো কেন? ও ছেলেমানুষ, ওর কথা কি ধর্তব্যের মধ্যে? কি বলতে কি বলে ফেলেছে!' তৎক্ষণাৎ স্বামীজী ভারি খুশি হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন।

অনেক পরে—একদিন ব্রহ্মানন্দের বুকের ভিতর কেমন করে উঠল—বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বললেন, 'তোমরা আমাকে দেখেই এত আহ্লাদ করছ! যদি স্বামীজীর দেখা পেতে, মোহিত হয়ে যেতে, চোখ ফেরাতে পারতে না।'

বিবেকানন্দের জন্য ব্রহ্মানন্দ সব-কিছু করতে প্রস্তুত। বিবেকানন্দ মনে করেন, মাধুকরীর অন্ন পবিত্র, তাই ব্রহ্মানন্দ ভিক্ষা করে এনে স্বামীজীকে খাওয়ালেন। বিবেকানন্দ মঠে দুর্গোৎসব করেছেন—বিজয়ার দিন ব্রহ্মানন্দ প্রতিমার সঙ্গে নৌকায় উঠে ভাবে বিভোর হয়ে বাজনার তালে-তালে মধুর নৃত্য করতে লাগলেন—দূরে মঠের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অসুস্থ স্বামীজী অপলক মুগ্ধচোখে তা দেখতে লাগলেন।

ব্রহ্মানন্দও দেখতে লাগলেন, স্বামীজী তাঁর পোষা জীবজন্তুগুলির সঙ্গে খেলছেন, ছুটছেন—

কিন্তু ওকি, স্বামীজীর মটরু-ছাগলটা যে আমার বাগানে এসে ফুলগাছ খেয়ে গেল—কী অন্যায়। কিছুতে সহ্য করা যায় না! অসহ্য। অসহ্য। নরেন, শেষ-বারের মতো বলে দিচ্ছি, তোমার বজ্জাত ছাগলটাকে সামলাবে।

—ইস্‌, ভারি তো ফুলগাছ। রাখাল, তোর ঐ বাজে ফুলগাছ গেলেই বা কি, থাকলেই বা কি! ও খেতে গিয়ে মটরুর যে মুখে কাঁটা ফুটে রক্ত পড়ছে—

লীলা! লীলা।

লীলা শেষ। বন্ধু-ভাই-নরেন-বিবেক-বিবেকানন্দ—আমার বিবেকানন্দ—আর চোখ মেলে তাকাবে না—

বিবেকানন্দের গতপ্রাণ দেহের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে হু-হু করে কাঁদতে লাগলেন ব্রহ্মানন্দ।

স্বামীজী নেই! এ জীবনের কি মূল্য! অখণ্ডানন্দ উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাঁটছেন—আত্মহত্যা করবেন—এই অভিপ্রায়। স্বামীজী দেখা দিয়ে তাঁর সে অভিপ্রায় নিবারণ করেছিলেন। স্বামীজী তাঁর প্রিয় ভাইটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, কারণ তাকে দিয়ে মানবমঙ্গলের বহু কাজ তিনি করাবেন। অখণ্ডানন্দই বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সেবা-ধর্মের প্রথম সিদ্ধপুরুষ।

অখণ্ডানন্দ রামকৃষ্ণের শিষ্য। বিবেকানন্দ তাঁর গুরু নন, কিন্তু দ্বিতীয় গুরু। অখণ্ডানন্দ বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ, সজীব আকার, নির্মল চরিত্রজ্যোতিতে দীপ্যমান—তাঁর মধ্যে সর্বদাই একটা অম্লান কৈশোর জাগ্রত ছিল। সবাই তাঁকে ছেলে-মানুষ ভাবত। ১৫/১৬ বছরের গঙ্গাধর (অখণ্ডানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম সাক্ষাতে বলেছিলেন, 'আপনাকে একেবারে খুব ছেলে-বেলায় দীন বোসের বাড়ীতে দেখে-ছিলাম।' শুনে ঠাকুর হাসিতে উচ্ছ্বসিত—'ওরে শোন্ শোন্! এ বলছে কিনা খুব ছেলেবেলায় দেখেছিল! উঃ, এর আবার ছেলেবেলায়!' শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের কাছে গঙ্গাধরকে ঠেলে দিয়েছিলেন: 'দ্যাখ! নরেন ১০০-টা পান খায়, যা পায় তাই খায়, এত বড় চোখ—ভেতর দিকে টান—কলকাতার রাস্তা দিয়ে যায় আর বাড়ি, ঘরদোর, ঘোড়া, গাড়ি, সব নারায়ণময় দেখে—সিমলেয় বাড়ি—তুই তার কাছে যাস্।'

গঙ্গাধর সেই-যে নরেন্দ্রের কাছে গেলেন আর ফিরতে পারলেন না। নরেন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে লোফালুফি খেলতে লাগলেন। অখণ্ডানন্দ সানন্দে খেলার সামগ্রী হয়ে গেলেন।

লোফালুফির একটি 'বাস্তব' ঘটনার কথা বলে নেওয়া যায়। ১৮৮৬-র ডিসেম্বর মাসের শেষে রামকৃষ্ণ-শিষ্যরা যেবার সদলবলে আঁটপুরে গিয়ে সন্ন্যাস নেবার সংকল্প করেছিলেন, সেই সময়ের কথা। কথাপ্রসঙ্গে সেরভানতেস্-এর 'ডন কুইকসট' গ্রন্থের কথা উঠেছিল; "ডন কুইকসটের এক ভৃত্য ছিল, তাহার নাম সাঙ্কোপাঞ্জা। সাঙ্কো-পাঞ্জা এক পান্থশালায় আহারের মূল্য না দেওয়ায় পান্থশালার সকলে সাঙ্কোপাঞ্জাকে একখানি কম্বলে শোয়াইয়া কম্বলের চারিটি খুঁট ধরিয়া লুফিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিও গঙ্গাধর-মহারাজকে এক কম্বলে ফেলিয়া কম্বলের চারি খুঁট ধরিয়া তদ্রূপ লুফিতে লাগিলেন। কৌতুকপ্রিয় গঙ্গাধর-মহারাজও সাঙ্কোপাঞ্জার মতো হস্তপদাদি প্রসারণ ও মুখভঙ্গি করিয়া অভিনয় করিতে লাগিলেন এবং তাহা দেখিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।"

গঙ্গাধর সরল এবং অভিমানী। নানা জায়গা পর্যটন করে আলমবাজার-মঠে ফিরেছেন। কেবলই বক্‌বক্ করে ভ্রমণকথা শোনাচ্ছেন। সকলের কান ঝালাপালা। সবাই ঠাট্টা-তামাসা শুরু করলেন। গঙ্গাধরের রাগ হয়ে গেল, উঠে চলে গেলেন। তখন সবাই গেলেন ছোট ভাইয়ের রাগ ভাঙাতে। গঙ্গাধর বড ঘরের এক কোণে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বসে আছেন—সবাই সেখানে হাজির হলে তিনি বললেন, 'না ভাই, আমি আব এখানে থাকব না। আর তো নরেন নেই যে, আমাকে ভালবাসবে। যে ভালবাসতো সে চলে গেছে, আমিও চলে যাব— ।' অতঃপর সবাই আদর করে, মিষ্টি কথা বলে, তাঁর অভিমান ভাঙালেন।

নরেন না থাকলে গঙ্গাধরের কিছুই ভালো লাগে না। নরেনের বকুনিতেও মধু ঝরে। অখণ্ডানন্দ স্মৃতিচারণ করছেন ঃ

"বেলুড়ে স্বামীজী একদিন ভ্রমণকালেব গল্প করছেন, মাঝে-মাঝে আমি স্বামীজীর কথায় ভুলে-যাওয়া ঘটনাগুলি ধরিয়ে দিচ্ছি, তাই আমাকে বকছেন—'বড় বক্‌বক্ করছিস, চুপ করে বসে ধ্যান কর।' তাই করছি—তাও স্বামীজীর অসহ্য। তখন হিমালয়-প্রসঙ্গে মহাশোল মাছের কথা উঠেছে। আমায় জিজ্ঞাসা করছেন, 'হাঁ রে, সেই মাছটা কত বড ছিল রে? আমি [কান খাডা করে?] ধ্যানমগ্ন—সেই অবস্থাতেই দুটো হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলাম—'এ্যাতো বড।' আবার ধ্যানমগ্ন। তখন সকলে খুব হাসাহাসি।"

সেই যে হাসি গঙ্গাধরের জীবনে প্রবেশ করে গেল, সে আব কখনো বিদায় নেয়নি। হাসির ভিয়ানে তিনি কখনই জলাঞ্জলি দেননি। অত্যন্ত বার্ধক্যেও যুবকদের বলতেন, তোমাদের চেয়েও তরুণ আমি। কেবল আমার শরীরটা তেমন নড়তে-চডতে পারে না, কিন্তু প্রাণটা লাফিয়ে-লাফিয়ে বেড়ায়। সুতরাং তিনি, আর এক বৃদ্ধ বিজ্ঞানানন্দের ঝোলা থেকে ফাউন্টেন পেন হাতাবার চেষ্টায় কাড়াকাড়ি করেন। অন্যসময় তরুণ সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্য করে সবিস্ময়ে বলেন, "আমরা কত বছর ধ্যান-তপস্যা করে তবে 'মহারাজ' (সাধুদের 'মহারাজ' বলে সম্বোধন করা হয়) হয়েছি, আর দুধের শিশু তোমরা, তোমরাও মহারাজ? না না, এ চলতে পারে না। তোমাদের জন্য অন্য শব্দ চাই।" সকলের অট্টহাসির মধ্যে এক ভক্ত শব্দ জুগিয়ে দেন—"তাহলে যুবরাজ।" তাই বলে ভক্তরা তাঁকে রসিকতায় হারাতে পারতেন, তা নয়। তাঁর পুরো দু'পাটি দাঁত বাঁধিয়ে এসেছে। উপস্থিত ডাক্তারকে বলছেন, "এবার দাঁত দিয়ে রক্ত পড়লে দেখে নেবো আপনাকে।" ডাক্তার যথারীতি সান্ত্বনা দিলেন, "না না, আর রক্ত পড়বে না, পড়লে আবার ঠিক করে দেব।" বৃদ্ধ খিলখিলিয়ে হেসে বললেন, "বেশ বুদ্ধি, বাঁধানো দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে বুঝি?" রামকৃষ্ণের ভঙ্গিতেই এই রামকৃষ্ণ-শিষ্য সংসাররহস্য ব্যাখ্যা করেছেন: "মা বউয়ের

নামে নালিশ করে, আবার বউ মায়ের নামে নালিশ করে। ছেলে, বউকে নিয়ে ঘরে খিল দিয়ে পাশ বালিশটাকে গুম্‌-গুম্‌ করে কিল মারে, আর খুব জোরে-জোরে বকে ; বউকে শিখিয়ে দেয়—তুমি খুব কাঁদো, মা ভাববেন—আমি তোমায় শাসন করছি।” এই কথায় অল্পবয়সীরা খুব হাসলেও বড়দের মুখের হাসি আটকে গিয়েছিল। কিন্তু অখণ্ডানন্দের গুরুভক্তির একটি বিশেষ প্রকাশ তাঁদের সকলকে না-হাসিয়ে পারেনি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, সওদা করলেই ফাউ চেয়ে নেবে, ভক্ত হবি কিন্তু বোকা হবি কেন? তদনুযায়ী অখণ্ডানন্দ কী করেছিলেন, নিজেই বলেছেন।—“কাশ্মীরে শাল কিনছি। বললাম—ফাউ দেবে তো নেব, নইলে নয়। তারা বলে—এ আবার কি কথা? শালের আবার কি ফাউ দেব? আমি বললাম—কেন, কম্ফর্টার? তারা বলে—ওর দামও ৩/৪ টাকা। তখন বলি—বেশ তবে রইল ; গুরুকা হুকুম—ফাউ নিতে হবে। শেষে দিল একটা কম্ফর্টার।

গঙ্গাধর তরুণ বয়সে ছিলেন দারুণ দুঃসাহসী। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যেই হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে, তিব্বত পর্যন্ত, তাঁর গতায়াত। ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলও জেনে ফেলেছেন। হিমালয়-ভ্রমণকালে বয়ঃকনিষ্ঠ গঙ্গাধরকেই তাই স্বামীজী দিশারী করেন। মাতাঠাকুরাণী কনিষ্ঠের হাতে জ্যেষ্ঠকে সমর্পণ করে বলেন, 'বাবা গঙ্গাধর, তোমার কাছে আমাদের সর্বস্ব সঁপে দিলুম।' তাঁরা পথে চলেন, কত বিচিত্র মানুষ ও দৃশ্য দেখেন। দেখেন অসাধারণ সাধুদের, আবার ধ্যানের নাম করে মুড়ি দিয়ে ঘুমোনা সাধুকেও। স্বামীজী বলেন, 'ওর কাঁধে লাঙ্গল জুড়ে দিলে যদি ওর কিছু গতি হয়।' তারপর স্বামীজী প্রিয় গঙ্গাধরকেও বিদায় দেন—'তোমাকে সমধিক ভালবাসি ; তোমার মায়াও কাটাতে হবে।' গঙ্গাধর কিন্তু স্বামীজীকে ছাড়তে রাজি নন—বিদায় দিলেও বিদায় নেবেন না। সুতরাং গঙ্গাধর পরিব্রাজক-বিবেকানন্দের সন্ধানে ভারতের পথে-পথে ঘুরে বেড়ান—'তোমাকে খুঁজে না পাই তো আমার নাম গঙ্গাধর নয় ; অমরনাথ দর্শনের আগেই নরেন্দ্রনাথ দর্শন করব।' প্রতিজ্ঞা সফল করেছিলেন তিনি। তারপর স্বামীজী যখন বিদেশে, স্বামীজীর নির্দেশে নিঃস্ব মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, ফলে বিচিত্র নাম পেয়েছিলেন নিবেদিতার কাছে —'ফেমিন স্বামী।' যখন মানুষের সেবা করতেন তখন নরের মধ্যে সত্যই নারায়ণ দেখতেন, কিন্তু নারায়ণের মধ্যে নারায়ণকে দেখার লোভে বারবার ছুটে আসতেন স্বামীজীর কাছে, দেখতেন জীবজন্তুর মধ্যে স্বামীজী ঘুরছেন ফিরছেন, একদৃষ্টে সস্নেহে তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন—ঠিক মনে হত, শ্রীকৃষ্ণ যেন গোধন নিয়ে খেলা করছেন—

সেই স্বামীজী চলে গেলেন—তারপর আরও পঁয়ত্রিশ বছর বেঁচে রইলেন অখণ্ডানন্দ, স্বামীজীর ধ্যান আর স্বপ্ন নিয়ে। স্বামীজীকে তাঁর বোধহয় নিত্য দর্শন। তারপর

অখণ্ডানন্দের নিজের যাবার দিন যখন ঘনিয়ে এসেছে—রাত্রে সেবক তাঁকে ডাকছেন —মহারাজ উঠুন, খাবার প্রস্তুত—অখণ্ডানন্দ ব্যথিত হয়ে বললেন—'কী খাওয়াবি তুই ? স্বর্গে গিয়েছিলাম, স্বামীজীর সঙ্গে বেড়াচ্ছিলাম, সেখানে তিনি কত ভাল-ভাল জিনিস খাওয়ালেন, সব খিদে মিটে গেছে।'

স্বামীজী অখণ্ডানন্দের জন্য সদাই প্রস্তুত। একদা বেলুড়ে, ভোর রাতে অখণ্ডানন্দের হঠাৎ ইচ্ছা হল স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করে আসি। স্বামীজীর ঘরের দরজা বন্ধ। দ্বারে আস্তে টোকা দিলেন। তখনই ঘরের ভিতর থেকে গানের সুর ভেসে এল :

দ্বারে করাঘাত করছ কে গো—কে তুমি ?
এই তো আছি তোমার তরে—ভাই আমি।

## আত্মপরিহাস

তিনিই শ্রেষ্ঠ রসিক যিনি আত্মপরিহাসে সমর্থ। নিজেকে নির্লিপ্ত করে রসিক মানুষ অপরকে দেখে ও হাসে। এই 'অপরের' মধ্যে স্বয়ং তিনিও আছেন। বিবেকানন্দ নিজের লৌকিক সত্তাকে সেইভাবে দেখে হাসতেন—কাঁদতেনও কখনো-কখনো।

স্বামীজীর অনেক আত্মপরিহাসের কথা ইতিমধ্যে বলে এসেছি। নিজের চেহারা নিয়ে, বিশেষতঃ তার গুরুত্ব নিয়ে, তাঁর হাসাহাসির কথা পাঠক জেনেছেন। 'চেহার যা দাঁড়িয়েছে,' ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেন, 'তাতে দরজা কাটতে হতে পারে। নিজের স্ফীত উদরের তারিফ করে বললেন, 'আমি চিরকালই ফরোয়ার্ড মানুষ এখন তা চেহারায় প্রমাণ করছি।' পরিব্রাজক-জীবনে শরীরের মেদকে তিনি 'ফেমিন ইনসিওরেন্স ফাণ্ড'-রূপে গণ্য করতেন, যা অনশনের দিনে তাঁর দেহরক্ষ করবে। আগেই জানিয়েছি, কিরকম স্ফূর্তির সঙ্গে বলতেন, 'মোটা মানুষের আধ্যাত্মিক হয়,' কিংবা অধিকতর স্ফূর্তির সঙ্গে বলেছেন, 'দারুণ মোটা বলেই আমাকে ভারতীয় কুমীর প্রত্যাখ্যান করেছিল।' ক্রিকেটার রণজিৎ সিংজী এবং আই-সি-এস পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী অতুল চ্যাটার্জির সংবর্ধনার জন্য লণ্ডনে আহূত ভোজসভায় সন্ন্যাসী তিনি, তাঁকে কেন আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সানন্দে তার কারণ আবিষ্কার করেছিলেন: 'এখানে আমাকে ডাকা হয়েছে সম্ভবতঃ এইজন্য যে. আমি ভারতের জাতীয় প্রাণীর (শ্রীহস্তীর) প্রতিনিধিত্ব করছি।' বরাহনগর-মঠে থাকাকালে নিজের ছন্নছাড়া চেহারা নিয়ে তাঁকে পরিহাস করতে দেখেছি, এবং এখন দেখে নিতে পারি, এই অতি দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষটি কিভাবে নিজ অন্যায়ের সমর্থন করতে পারেন সহাস্যে। যথা—

"বলরামবাবুর বৈঠকখানা-ঘরটি খুব সুন্দর করিয়া রঙ করা হইয়াছে। নরেন্দ্র-নাথের সর্বদা থুতু-ফেলা অভ্যাস ছিল। এটি তাঁর বংশের একটি দোষ! নরেন্দ্রনাথের প্রপিতামহের পাড়ার নাম ছিল 'থুতু-ফেলা রামমোহন দত্ত।' নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্তেরও এই দোষটি ছিল, এবং নরেন্দ্রনাথের অপর দুই ভাই মহেন্দ্র ও ভূপেন্দ্রেরও এই দোষটি ছিল। নরেন্দ্রনাথ যেখানে-সেখানে থুতু ফেলিতেন—অনেক সময়ে বলরামবাবুর দেওয়ালে থুতু গিয়া পড়িত। বলরামবাবুর নরেন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভক্তি, তিনি নরেন্দ্রনাথের নিকট একটি ডাবর হাতে লইয়া থাকিতেন। নানাপ্রকার আলোচনা করিতে-করিতে নরেন্দ্রনাথ যখন খুব উত্তেজিত, থুতু ফেলিবার উপক্রম করিতেছেন, তখনই সতর্ক বলরামবাবু ডাবরটি হাতে লইয়া কখনো-বা সম্মুখ থেকে, কখনো-বা পিছন থেকে বলিতেন, 'নরেনবাবু দয়া করে এই

ডাবরটির ভেতর থুতু ফেলুন, দেওয়ালের গায়ে ফেলবেন না।' নরেন্দ্রনাথ অগত্যা ডাবরে থুতু ফেলিতে-ফেলিতে বলিতেন, 'বলরামবাবু, তোমার দেওয়ালের পেন্টিং-এর উপর পাকা পেন্টিং হয়ে যেত, তা নয়—।' "

দেওয়াল-পেন্টিং ব্যাপারটা আরও উত্তম বোঝা যাবে যদি স্মরণ করি, নরেন্দ্রনাথ এইকালে যথেচ্ছ পান খেতেন।

কিছু তিক্ত আত্মপরিহাসও আছে। তাঁর তরুণ সুন্দর চেহারার জন্য কিভাবে মিশনারীদের ঈর্ষাপূর্ণ কুৎসাপ্রচারের হেতু হয়েছিলেন, তাও আগে দেখেছি, যখন তিনি পাকা দাড়ির জয়ঘোষণা করেছিলেন অত্যুৎসাহে। কালো চেহারার জন্যও তাঁকে কম ভুগতে হয়নি। সে বিষয়েও পাঠক কিছু-কিছু জেনেছেন। আমেরিকার তুলনায় ইংলণ্ডে প্রকাশ্য বর্ণবিদ্বেষ তখনকার দিনে কিছু কম ছিল। ইংলণ্ড থেকে স্বামীজী এক চিঠিতে লিখেছেন :

"কিছু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাড়া এখানে কালাআদমীকে কেউ ঘৃণা করে না। এমনকি রাস্তায় আমাকে লক্ষ্য করে কেউ ব্যঙ্গরব তোলে না। মাঝে-মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবি, তাহলে কি আমার মুখের রঙ সাদা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু হায়, আরশিতে সত্য ধরা পড়ে।"

আরশিতে কিন্তু অনেকে নিজের চেহারা দেখতে পান না। স্বামীজীর কালে এঁরা অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজের তল্পীবাহক সংস্কারমুক্ত ভারতীয়ের দল। বর্ণগুণে এঁদের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে স্বামীজী জ্বালাময় আত্মবিদ্রূপ করছেন :

"আমাদের দেশে শুনি, আমাদের ভেতর অমুক ভদ্রজাতি, অমুক ছোটজাত। সরকারের কাছে সব নেটিভ।...ধন্য ইংরেজ সরকার।...তোমার কৃপায় সব নেটিভের সঙ্গে সমত্ববোধ করলেম। এখন সকল জাতির মুখে শুনছি, তাঁরা নাকি পাকা আর্য। তবে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে—কেউ চার-পো আর্য, কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ কাঁচ্চা।...আর শুনি, ওঁরা আর ইংরাজরা নাকি এক জাত, মাসতুতো ভাই।...কেবল রোদ্দুরে বেড়িয়ে কালো...। এখন...সরকার বলছেন—সব নেটিভ। ধন্য ইংরাজরাজ।...দিশি সাহেবিত্ব লুভিয়েছিল আর কি।...দিশি কাপড় ছাড়লেই, দিশি চাল ছাড়লেই, ইংরাজরাজা মাথায় করে নাকি নাচবে শুনেছিলুম, করতেও যাই আর কি, এমন সময় গোরা-পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ্—পালা, পালা, সাহেবিতে কাজ নেই, নেটিভ কব্‌লা। 'সাধ করে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত।'...আর যা-কিছু সাহেব হবার সাধ ছিল, মিটিয়ে দিলে মার্কিন-ঠাকুর। দাড়ির জ্বালায় অস্থির, কিন্তু নাপিতের দোকানে ঢোকবা-মাত্রই বললে, 'ও চেহারা এখানে চলবে না।' মনে করলুম বুঝি পাগড়ি মাথায়, গেরুয়ারঙের বিচিত্র ধোকড়া গায়, অপরূপ দেখে,

নাপিতের পছন্দ হল না। তা একটা ইংরাজী কোট আর টোপা কিনে আনি—আনি আর কি—ভাগ্যিস একটি ভদ্র মার্কিনের সঙ্গে দেখা; সে বুঝিয়ে দিলে যে, বরং ধোকড়া আছে ভাল, ভদ্রলোকে কিছু বলবে না, কিন্তু ইউরোপী পোষাক পরলেই মুশকিল, সকলেই তাড়া দেবে। আরও দু'একটা নাপিত ঐ প্রকার রাস্তা দেখিয়ে দিলে। তখন নিজের হাতে কামাতে ধরলুম। খিদেয় পেট জ্বলে যায়। খাবার দোকানে গেলুম—'অমুক জিনিসটা দাও!' বললে—'নেই।' 'ঐ যে রয়েছে!' 'ওহে বাপু, সাদা ভাষা হচ্ছে, তোমার এখানে বসে খাবার জায়গা নেই।' 'কেন হে বাপু?' 'তোমার সঙ্গে যে খাবে তার জাত যাবে।' তখন মার্কিন-মুলুককে অনেকটা দেশের মতো ভাল লাগতে লাগল।"

ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হবার আগে আমেরিকায় উপস্থিত এক অপরিচিত ভারতীয়—বিবেকানন্দ—নিজের ছবি এঁকেছেন এইভাবে ঃ

"এখানকার লোক বিদেশীদের খুব যত্ন করে থাকে, কেবল অপরকে তামাশা দেখাবার জন্য।... আমি এখন বস্টনের এক গ্রামে এক বৃদ্ধা মহিলার অতিথি। রেলগাড়িতে এঁর সঙ্গে হঠাৎ আলাপ। ইনি আমাকে নিমন্ত্রণ করে কাছে রেখেছেন। এখানে থাকায় আমার সুবিধে—রোজ এক পাউণ্ড করে যে খরচ হচ্ছিল তা বেঁচে যাচ্ছে, আর তাঁর লাভ—তিনি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে ভারতের এক অদ্ভুত জীব দেখাতে পারছেন!!...আমার মহিলাবন্ধুর এক জ্ঞাতিভাই আজ আমাকে দেখতে আসবেন।"

স্বামীজী যখন সকলকে হাসাচ্ছিলেন, সকলে যখন হেসে লুটোপুটি হচ্ছিল, তখন নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি কী ভাবছিলেন?

"দুর্ভাগ্যক্রমে মাঝে-মাঝে আমার নিজেকে সার্কাসের ক্লাউন বলে মনে হয়, যে অন্যকে হাসায়, কিন্তু তার নিজের দশা সকরুণ।"

কোনো এক মিস বেল ধর্মোপদেশ দেবার সময়ে বলেছিলেন—'এ পৃথিবী একটা স্কুলের মতো, এখানে আমরা আমাদের পাঠ নিতে এসেছি।'

স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন—'কে তোমাকে বলেছে পৃথিবীটা স্কুলের মতো?' মিস বেল চুপ করে রইলেন।

স্বামীজী বললেন—'পৃথিবীটা সার্কাস, আমরা সবাই ক্লাউন, ডিগবাজি খাবার জন্য এসেছি।'

'ডিগবাজি খাই কেন?'

'কারণ তা খেতে আমরা ভালবাসি। যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি, মঞ্চ ছেড়ে চলে যাই।'

স্বামীজী বললেন, 'ওরা অনন্ত স্বর্গ চায়! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, একমাত্র তিনি ছাড়া

অনন্ত কিছু নয়। একমাত্র তিনিই অনন্তকে বহন করতে পারেন—অনন্ত অসারত্ব।'

সুতরাং ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া ভিন্ন মানুষের গত্যন্তর নেই। সেকথা বলে স্বামীজী মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য।

'কিন্তু স্বামীজী, যদি ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই, তাহলে আমাদের ব্যক্তিত্বের কি হবে?'

স্বামীজী হেসে ফেললেন। 'ব্যক্তিত্ব' কথাটা নিয়ে খেলা শুরু করলেন। 'এদেশে তোমরা বড্ডই ভীত তোমাদের ব্য-ক্তি-ত্ব হারাতে!' শব্দটাকে ব্যঙ্গভরে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন, তারপরে বিদ্যুৎ ঝলসালো—'তোমাদের আবার ব্যক্তিত্ব! তোমরা ব্যক্তিই হয়ে ওঠনি। ঈশ্বরকে না-জেনে, নিজের স্বরূপ না-জেনে, কে কবে ব্যক্তি হয়েছে?'

কিন্তু স্বরূপকে জানতে চায় কে? 'তুষারাহত মানুষ কেবল ঘুমোতেই চায়। টেনে তুলতে চাইলে সে বলে, আমাকে ঘুমোতে দাও, বরফে ঘুমোতে বড আরাম।' সবাই ঘুমোতে চায়। শিখতে কে চায়? তবু শেখে। 'বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে অভিজ্ঞতা বাড়ে। কিন্তু হায়, এ-জগতে লব্ধ জ্ঞানকে আমরা কাজে লাগাতে পারি না। যে-মুহূর্তে মনে হয় কিছু শিখেছি, তখনই রঙ্গমঞ্চ থেকে দ্রুত বিদায় নিতে হয়।'

এই বিবেকানন্দ কেবল অভিনয়ের দর্শক নন, জগৎ-মঞ্চে স্বয়ং অভিনেতা, অভিনয় না করেও। বিবেকানন্দের মতো মানুষের দেহ তাঁদের সত্তার উপরে সামান্যমাত্র আবরণ: সুতরাং ক্ষণে-ক্ষণে স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি—যার তুলা-কিছু অতিবড় অভিনেতাও আনতে সমর্থ নন। অনেক সময়ে তদুপরি, বিবেকানন্দ অভিব্যক্তির কিছু সজ্ঞান সন্নিবেশনও করেছেন প্রফুল্ল নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য। দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

আমেরিকায় স্বামীজীকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হল—'আপনি ভগবানকে দেখেছেন?'

শুনেই স্বামীজী হাসিতে উচ্ছল। নিজের শরীরের দিকে ঘুরে-ফিরে তাকাতে লাগলেন,—'বা-রে! আমাকে দেখে তাই মনে হয় বুঝি! আমার মতো প্রকাণ্ড মোটা মানুষ ভগবানকে দেখতে পারে কখনো?'

মোটা মানুষটির বয়স কত?—সকলের কৌতূহল। মুখ শিশুর মতো স্বচ্ছ অথচ দেহধারী চিরন্তন সভ্যতা। স্বামীজী নিজেই একদিন নিজের বয়স সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন—সকলে ঔৎসুক্যে খাড়া—'আমার বয়স—' কৌতূহলে সকলে দমবন্ধ—

'খুব বেশি নয়।'

দুষ্ট উত্তরে হতাশ হয়ে সবাই হেসে ফেলে।

আমেরিকাতেই আর একদিন স্বামীজী এক সমাবেশে খুব সিরিয়াস হয়ে ফিস-ফিসিয়ে বললেন—'আমি এখানে প্রলোভনে ধরা দিয়েছি।'

কার? কার? কার? সে কে? কে? কে?—'তপোভঙ্গ'-কবিতারসিক মহিলাগণের কণ্ঠে-কণ্ঠে কৌতূহল খেলে গেল।

স্বামীজী আরও গম্ভীর হলেন। খুব গোপন সংবাদ জানানোর ভঙ্গিতে চুপি-চুপি বললেন—'আমার প্র-লো-ভ-ন……অ-র-গা-না-ই-জে-শ-ন।'

রসভঙ্গে উচ্চহাসি উঠল।

না, স্বামীজী এখন কিছুই করছেন না, শুধু সকৌতুকে মুখভঙ্গি করে তাকিয়ে আছেন—তাতেই সকলে আমোদিত। ঘটনা এই—স্বামীজী তাঁর একটি বিস্ফোরক ভাষণ দিচ্ছিলেন, যার মধ্যে আমেরিকার ধর্মবিশ্বাসকে প্রচণ্ড নাড়া দেওয়া হয়েছে। সবাই স্তম্ভিত এবং বাকরুদ্ধ—কেবল একটি বৃদ্ধ নন। তিনি মহা বিরক্তিতে উঠে দাঁড়ালেন, ঘৃণায় পিছন ফিরলেন, ঘড-ঘড করে গলার কফ পরিষ্কার করলেন, তারপর নিতান্ত অবজ্ঞার সঙ্গে লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর উক্ত প্রতিবাদ, সুস্পষ্ট বিরক্তি, লাঠির ঠক্‌ঠক্ যতক্ষণ চলল স্বামীজী ততক্ষণ বক্তৃতা থামিয়ে, তারিফ করার মুখভঙ্গি করে সেদিকে চেয়ে রইলেন। শ্রোতারা তখন একবার সেই বৃদ্ধের দিকে তাকায়, তারপর তাকায় স্বামীজীর দিকে এবং স্বামীজীর সহায়তায় উপভোগ করে পরিস্থিতিটা।

গার্হস্থ্যজীবন ও সন্ন্যাসজীবন সম্পর্কে স্বামীজী বক্তৃতা করছেন—

" 'আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করে, আমি বিয়ে করেছি কি না?'—বলে স্বামীজী একটু থামলেন, হাসি-হাসি মুখে শ্রোতাদের দিকে তাকালেন, সমস্ত হলে কলগুঞ্জন—স্বামীজীর মুখের হাসি হঠাৎ সরে গিয়ে সেখানে ভয়ানক আতঙ্কের ছায়া—'আমি বিয়ে করব? কদাপি না—শয়তানের ফাঁদে পড়ব?' এবার একটু থামলেন, যাতে কথাগুলোর প্রতিক্রিয়া ভালভাবে হতে পারে; তারপরে সমর্থনের যে-কিছু গুঞ্জন উঠেছিল, তাকে হাত তুলে থামালেন—দেহের প্রত্যেক রেখায় এখন কঠোরতম গাম্ভীর্য—'তবে, সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে আমার একটা বিশেষ আপত্তি আছে—তা হল'—স্বামীজী আবার থামলেন, সকলে প্রতীক্ষায় ঘনীভূত—'সন্ন্যাস সমাজের সেরা মানুষগুলিকে সরিয়ে নেয়।' "

অট্টহাসিতে হল্ ফেটে পড়ল।

স্বামীজীর আর একটি নাটকীয় রসিকতার বিবরণ:

"রেডইণ্ডিয়ানদের গল্প স্বামীজী অবিরত শুনতে চাইতেন। একটি ঘটনা তাঁকে বিশেষ রকম আনন্দ দিয়েছিল। এক রেডইণ্ডিয়ানের স্ত্রী সদ্য মারা গেছে। কফিনের পেরেক কিনতে সে গেল পাদরীর বাড়ীতে—অপেক্ষা করার সময়ে বাড়ির রাঁধুনী-মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে বসল—সে তাকে বিয়ে করতে রাজি কি না? স্বভাবতঃই রাঁধুনী-মেয়েটি ভয়ানক চটে গিয়ে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। লোকটি শুধু

বলেছিল—'ঠিক আছে, দেখা যাবে।'

"পরের রবিবার সেই রেডইণ্ডিয়ানটিকে দেখে আমরা হেসে অস্থির। লোকটি এসে গেটের ধারে একটি রকের উপর বসে আছে। বেশ পরিপাটি একটি পালক গুঁজে রেখেছে টুপিতে, মাথায় মেখেছে প্রচুর তেল, গাল বেয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ছে। ঘটনাচক্রে স্বামীজী ঐদিন তাঁর পোর্‌ট্রেটের সিটিং দিতে স্টুডিওতে গেলেন। ছবি কতদূর এগিয়েছে দেখার জন্য আমরা পরে সেখানে গেলাম। যেইমাত্র স্টুডিওতে ঢুকেছি, ঠিক তখনি এক ফোঁটা তেল স্বামীজীর পোর্‌ট্রেটের উপর গড়িয়ে পড়ল, আর তা দেখেই স্বামীজী বলে উঠলেন—'রাঁধুনীকে বিয়ের জন্য প্রস্তুত।' "

রেডইণ্ডিয়ান সূত্রেই স্বামীজীর আর একটি হাসি—যার মধ্যে নিজের রঙ নিয়ে ঈষৎ কৌতুকও আছে। স্বামীজী তখন ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যাম্প টেলর-এ আছেন। সেখানে মজুরের কাজ করছিল একটি রেডইণ্ডিয়ান ছোকরা। সে আক্ষেপের সঙ্গে লক্ষ্য করল—কতকগুলো মেয়ে-পুরুষ সকালে প্রাতরাশ করছে, কিন্তু তাকে ডাকছে না। দলে একটা কালো লোকও রয়েছে, কি বিচিত্র। কালো লোকটি তার সঙ্গে যখন আলাপ জুড়লেন, সে ক্ষোভের সঙ্গে জানাল—তাকে কফি খেতে দেওয়া হয়নি।—'সাদা লোক কফি ভালবাসে; কালো লোক কফি ভালবাসে; লাল লোক কফি ভালবাসে'—সে বলল। শুনে স্বামীজী বড় মজা পেলেন। সত্যি কি অন্যায়—তিনি কালো লোক হয়ে কফি পাচ্ছেন, আর ঐ ছোকরাটি লাল লোক হয়েও পাচ্ছে না! ছেলেটির কফি খাওয়ার ব্যবস্থা তিনি অবশ্যই করলেন, এবং সারাদিন হাসতে-হাসতে বলতে লাগলেন—'সাদা লোক কফি ভালবাসে, কালো লোক কফি ভালবাসে, লাল লোক কফি ভালবাসে।'

স্বামীজী জাহাজে যাচ্ছেন। যেখানে লেখা আছে 'ধূমপান নিষিদ্ধ'—সেখানে বসে চুরুট টানছেন। উপস্থিত বন্ধুজনেরা ত্রস্ত হয়ে বলেন, 'স্বামীজী করছেন কি—নোটিশ দেখছেন না?' স্বামীজীর কেয়ারই নেই। তাঁরা আবার তাঁকে নিষেধ করেন, নিয়মভাঙার ঝঞ্ঝাট বা লাঞ্ছনার কথা বিশেষভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন। স্বামীজী তাঁদের ভাবে বুঝিয়ে দিলেন, আরে আমি হলুম ভারতীয় যোগী, ইচ্ছামতো অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারি—তোমার অফিসারের সাধ্য নেই আমাকে কিছু করে। 'কিন্তু সর্বনাশ! অফিসার যে এসে গেল—ঐ আসছে।'—'আসতে দাও! অপেক্ষা করে দ্যাখো, আমি কি করি।' স্বামীজীর ক্ষমতার সন্দিগ্ধ বিশ্বাস, ততোধিক অস্বস্তি নিয়ে তাঁরা অফিসারের আগমন লক্ষ্য করতে লাগলেন—স্বামীজী চুরুট টেনেই যাচ্ছেন—অফিসার আরো কাছে—আর বুঝি মানমর্যাদা থাকে না—স্বামীজী এবার দীর্ঘ একটান দিয়ে চুরুটটা সমুদ্রের জলে ফেলে দিলেন—আর অফিসার মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে গেলেন। স্বামীজী উচ্চহাস্য করলেন, 'দেখলে ভারতীয় যোগীর ক্ষমতা?'

ধূমপানসূত্রে আর একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী।—

স্বামীজী লস্ এঞ্জেলস্-এর 'হোম অব ট্রুথ' নামক প্রতিষ্ঠানভুক্ত এক ভদ্র-মহিলার দ্বারা ডিনারে আমন্ত্রিত হয়েছেন। এই মহিলা এবং আমন্ত্রিত অন্যান্য ব্যক্তিগণ কঠোরভাবে ধূমপান-বিরোধী। স্বামীজী সম্ভবতঃ তা জানতেন না। তিনি পাইপ ধরিয়েছেন—বাকি সকলে গভীর বিতৃষ্ণার সঙ্গে তা লক্ষ্য করছেন, কিন্তু ভদ্রতাবশে কিছু বলতে পারছেন না। এমন সময়ে আমন্ত্রণকর্ত্রী ঘরে ঢুকলেন। কাণ্ড দেখে তিনি কিন্তু সামলাতে পারলেন না। রাগে অস্থির হয়ে বললেন—

'স্বামীজী! যদি ভগবান চাইতেন মানুষ ধূমপান করুক, তাহলে তিনি অবশ্যই মানুষের মাথায় একটা চিমনি জুড়ে দিতেন ধোঁয়া বের হবার জন্য।'

স্বামীজী হাসলেন। অবিচলিত কণ্ঠে বললেন—'কিন্তু মহাশয়া, ভগবান মানুষকে পাইপ উদ্ভাবন করবার মতো বুদ্ধি দিয়েছেন।'

সবাই এমনই হেসে ফেললেন যে, স্বামীজীর ধূমপান আর্য-আচরণ বলে স্বীকৃত হয়ে গেল।

নিজেকে নিয়ে তামাশায় স্বামীজীর অফুরন্ত উৎসাহ। এক সাংবাদিক-মহিলা তাঁকে ইন্টারভিউ করছেন। সাক্ষাৎ-শেষে তিনি স্বামীজীর একটি ছবি চাইলেন, যেটি ইন্টারভিউ-বিবরণের সঙ্গে ছাপা যেতে পারে। স্বামীজী তাঁকে একটি ছবি দিলেন—যা তাঁর বক্তৃতা-বিজ্ঞাপনে বহুব্যবহৃত। ছবিটি পেয়ে ভদ্রমহিলা খুশি হলেন না। স্বামীজীকে ইতিমধ্যে তিনি ভালভাবেই দেখেছেন—প্রাচ্যমন্দিরের দেবতার মতো তাঁর আকার—পদক্ষেপে সুমহৎ মর্যাদা এবং আননে সুদূর রহস্যের নিগূঢ় ব্যঞ্জনা—ছবিটিতে তার কোনো প্রকাশই নেই। ভদ্রমহিলা তাই প্রতিবাদ করতে চাইলেন।—

সাংবাদিক-মহিলা—এটা কিন্তু আপনার মতো দেখাচ্ছে না।

স্বামীজী (সহাস্যে)—না। এটা দেখলে মনে হয়, আমি যেন কাউকে খুন করতে চাইছি। যেন যেন—কার মতো যেন—

সাংবাদিক-মহিলা—(দ্রুত, বেপরোয়াভাবে)—ওথেলোর মতো।

স্বামীজী (অট্টহাস্যে)—হাঁ—ঠিক তাই—।

স্বামীজী হেসে আকুল—প্রহসনটি দেখতে-দেখতে। 'কোনো মানুষকে ঐ রকম প্রচণ্ড হাসতে আমি দেখিনি'—স্বামীজীর পরিচিত এক অধ্যাপক বলেছেন।

প্রহসনটি স্বামীজীকে নিয়েই রচিত। মিসেস বার্ক (যাঁর গ্রন্থে এই সংবাদ রয়েছে) ঈষৎ সংশোধন করে বলেছেন—ঠিকভাবে বলতে গেলে স্বামীজীকে নিয়ে নয়—নিউইয়র্কের অভিজাতসমাজে স্বামীজীর প্রভাবকে নিয়ে ওটি রচিত। এটি তৈরী হয় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে, নাম—'ভারতাগত আমার বন্ধুবর!' আমেরিকা ও ইংলণ্ডে

প্রহসনটি এমন জনপ্রিয় হয় যে, বলা হয়েছিল—'এই শতাব্দীর সবচেয়ে সফল ফার্স-কমেডি।' নিউইয়র্কের বাছাই অভিজাত সমাজে গেরুয়াধারী ভারতীয়ের বুদ্ধিহীন সমাদর এই প্রহসনের বিষয়বস্তু। ক্যানসাস শহরের এক ধনী ভদ্রলোক নিউইয়র্কের আভিজাত্যদুর্গে প্রবেশ করতে বিশেষ চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হয়েছিলেন; অবশেষে স্থির করেছিলেন, এক নাপিতকে ভারত-আগত মিস্টিক-সাধু সাজিয়ে তারই সাহায্যে তিনি রুদ্ধদ্বার খোলাবেন। তাঁর এই পরিকল্পনা নানা বিচিত্র উদ্ভট হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল।

প্রহসনটি স্বামীজী দেখেন ১৮৯৯-এর শেষভাগে ক্যালিফোনিয়ায় থাকা-কালে। দেখে তাঁর স্ফূর্তির সীমা ছিল না। আমোদজনক বলেই এটিকে তিনি উপভোগ করেছিলেন, তাই নয়—অধিকন্তু তিনি তাঁর অনেক বিরক্তি ও বিদ্রূপের সমর্থন এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন। অভিজাতসমাজের ভুঁইফোড়দের ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের কথা আমরা জানি, ওনারা ধর্মকে মাত্র কৌতূহলের ও প্রদর্শনীর বিষয় বলেই ভাবেন, যে-দুর্বলতার সুযোগে ওঁদের আতিথ্য ও অর্থের মধ্যে সিঁদ কেটে ঢুকে পড়ে ভণ্ডের দল। স্বামীজী এই ভেবে আরও হাসছিলেন—আমাকে এরা যখন অভ্যর্থনা জানায় তখন আমার সম্বন্ধে এদের কী ধারণা! তিনি ধর্মের শর্টকাট-পথ দেখাতে আসেননি বলা সত্ত্বেও সেই সন্ধানেই অনেকে তাঁর কাছে হাজির হত। থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে যখন তিনি যোগশিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন আতঙ্কে আবিষ্কার করেন—এক অভিনেত্রী সেখানে হাজির, যোগশিক্ষা করতে, যার দ্বারা তিনি তাঁর পলায়মান সৌন্দর্যকে বেঁধে রাখতে পারবেন!! সুতরাং শর্টকাট বা মেড-ইজি-অভিলাষী মহিলাদের তিনি তির্যক ব্যঙ্গের সঙ্গে বলেছিলেন—আপনারা বাড়ি ফিরে যান। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করুন—পুরো একমাস আপনারা অবিচলিত থাকবেন—চাকরানী আপনাদের সেরা চীনে-বাসন ভেঙে ফেললেও!!

স্বামীজী তাই রীতিনীতি এটিকেট ইত্যাদির ব্যাপারে অনেক সময়েই বেপরোয়া উদাসীন। বাড়িতে থাকাকালে পোষাকী আদবকায়দাকে তুচ্ছ করেন। বিব্রত হয়ে কেউ কিছু বললে তিনি বলেন—'আমার কি দায়! আমি তো বিয়ে করতে চাইছি না।' কিংবা বৈঠকখানায় কথাবার্তার সময়ে কখনো এমন অখণ্ড মৌন থাকেন যে, প্রস্থানকালে বহিরাগত মহিলা সন্দিগ্ধ বিরক্তির সঙ্গে বলেন—'ঐ ভদ্রলোকটি ইংরেজি জানেন তো!' আর স্বামীজী হেসে গড়িয়ে পড়েন অতঃপর।

আঙুলে আচার লেগে গিয়েছিল—স্বামীজী প্রকাশ্যে আঙুল চাটতে লাগলেন—জঘন্য অনাচার। কিন্তু শিশুর মতো হাসছিলেন, সবভোলানো যে বিহ্বলতা। 'তাঁর এক নিঃশ্বাসে তামাশা, অন্য নিঃশ্বাসে গীতা। তিনি আঙুল চাটেন শিশুর মতো, আর পথ হাঁটেন রাজার মতো।'

এবং তিনি হাসেন—হাসেনই নিজেকে নিয়ে। "কাশীধামে ( ১৯০২ খ্রী ) একদিন অপরাহ্নে স্বামীজী এক পর্যঙ্কে বসিয়া আছেন, এবং শিবানন্দ-স্বামী আর এক পর্যঙ্কে বসিয়া আছেন। কক্ষমধ্যে অপর কয়েকটি লোকও আছেন। উভয়ের মধ্যে হাসি-তামাসা অনেকক্ষণ পর্যন্ত হইতেছিল। স্বামীজীর মুখ হাসিতে পরিপূর্ণ, চোখমুখ দিয়া হাসি যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। অল্পবয়স্ক বালক নূতন কৌতুক শুনিলে যেমন অধীর হইয়া হাস্য করে, স্বামীজীও ঠিক তদ্রূপ করিতেছেন। স্বামীজী বলিতেছেন—'কি বলেন মহাপুরুষ, আমি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য—অঁ্যা—অঁ্যা—ঠিক কিনা?' বলিয়া আরও উচ্চৈঃস্বরে হাসিতেছেন এবং নানাপ্রকার মুখভঙ্গি করিতেছেন। স্বামীজীর নেত্রের একটি সূক্ষ্ম স্নায়ু নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাঁহার দৃষ্টি কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল, এবং শুক্রাচার্য যেমন দৈত্যগুরু ছিলেন স্বামীজীও তদ্রূপ বিদেশীয়দিগের গুরু হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত নিজেকে একচক্ষু শুক্রাচার্যের সহিত তুলনা করিয়া নানারূপ ব্যঙ্গ ও কৌতুক করিতেছিলেন। শিবানন্দ-স্বামীও মাঝে মাঝে 'আজ্ঞে তা-তো বটেই, আজ্ঞে তা-তো বটেই' বলিয়া হাস্য করিতেছিলেন। স্ফূর্তি, আনন্দ, হাস্য ও পরিহাসের 'দ্যায়োড়' উড়িতেছিল। হাসি যেন মুখ হইতে ছড়াইয়া মেঝের উপর গড়াইতেছিল এবং লোকের গায়ে মাখামাখি হইতেছিল।"

বিবেকানন্দের হাসি একটা চ্যালেঞ্জ বা চ্যালেঞ্জের উত্তর। জগতের এত দুঃখ. নিজের জীবনে এত দুঃখ—এর মধ্যেও কি বিবেকানন্দ হাসতে পারেন? পুঞ্জীভূত দুঃখের সামনে দাঁড়িয়ে ধার্মিকেরা বিমর্ষ হয়ে পড়েন, পৃথিবীর মুগ্ধ মায়ার সম্বন্ধে বিতৃষ্ণায় ভরে যায় তাঁদের মন, একটু আবরণ সরালেই দেখেন শুধু অতল অশ্রু—তাঁরা তখন বুক চাপড়ান, পৃথিবীর অঙ্গার গায়ে মেখে হাজির হন মানুষের কাছে, বেদনার দীক্ষা দিতে চান মানুষকে। বিবেকানন্দ যে বলেন, মানুষ অমৃতের সন্তান, তাই সে আনন্দে থাকবে, হাসবে—বিবেকানন্দ নিজে দুঃখের গভীরতাকে কতখানি স্পর্শ করেছেন?

স্বামীজী শুনে আরও হাসবেন। তুরীয়ানন্দ দেখেছিলেন, নির্জন ছাতে পায়চারি করতে-করতে স্বামীজী আপনমনে বলছেন—ওরে আমার দুঃখ কেউ বোঝে না—তারপর আলসেয় মাথা রেখে কাঁদছেন, জগতের জন্য অশ্রুর রক্তনিষেক করছেন—সেই বিবেকানন্দই, অপূর্ব এই—হাসির আলো মাখিয়ে তাঁর বেদনাবিন্দুগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। অথচ দুঃখ কী নিদারুণ বাস্তব বিবেকানন্দের জীবনে! স্নেহের বোন মেরী হেলের পিতার মৃত্যুতে স্বামীজী মেরীকে সান্ত্বনা দিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন—পত্রসাহিত্যের সম্পদ সেই চিঠিখানি কয়েকছত্রে গভীরতম বেদনাকে ধারণ করেছে—তাতে ছিল—"তোমার শোকে কী যে গভীর দুঃখ পেয়েছি, তা কি

বলব—আমি সন্ন্যাসী—তবু!—I am sorry because inspite of monastic training the heart lives on. মেরী, তোমার জীবনে এই তো প্রথম দুঃখ—কিন্তু আমার জীবন!—কতজনকে হারিয়েছি, কত সহ্য করেছি! সবচেয়ে বিচিত্র যাতনা কিসে জানো?—যখন কেউ চলে যেত, আমার মনে হত, আমি তার যোগ্য ছিলাম না! বাবা যখন মারা গেলেন, মাসের পর মাস মনের দংশন—আমি তাঁর কথা শুনিনি।"

স্বামীজী তারপর লিখেছেন—"মেরী, তোমার সঠিক জীবন এই সবে শুরু হল—এই দুঃখের মধ্যে, অভিজ্ঞতার মধ্যে—We learn through smiles and tears we learn. মেরী, তুমি আচ্ছাদনের তলায় কাটিয়েছ, আর আমি বাইরে দাঁড়িয়ে জ্বলেছি, পুড়েছি—দারিদ্র্যে, অন্যের বিশ্বাসঘাতকতায়, আর নিজের নির্বুদ্ধিতায়।"

সবশেষে অপরূপ করুণা ঝরেছে—"আমার যদি আনন্দভরা মন থাকত, তাহলে মেরী, নিশ্চয় জেনো, সে মন তোমার সঙ্গে বিনিময় করে নিতাম! কিন্তু হায়!"

"If it were possible to exchange grief and I had a cheerful mind, I would exchange mine for your grief ever and always."

তবু বিবেকানন্দ হাসবেন, কারণ প্রকৃতিকে আমাদের জয় করতেই হবে। নিজের প্রকৃতি বিবেকানন্দ জেনেছেন। বাইরে তিনি পুরুষসিংহ, কিন্তু ভিতরে?—

"আমার প্রকৃতিতে পুরুষের চেয়ে মেয়ে-গুণ বেশি।···আমি সবসময়েই অন্যের দুঃখবেদনা শুধু-শুধু নিজের উপর টেনে নিই,···ঠিক যেমন মেয়েদের সন্তান না হলে একটা বেড়াল পুষে তার উপর ভালবাসা ঢেলে দেয়।"

"পৃথিবীতে যদি কাউকে ভালবাসতে না হত বেঁচে যেতাম—যদি বাল্যেই আত্মীয়হীন অনাথ বালক হতাম। আমার আত্মীয়রাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখের কারণ—আমার ভাই, বোন, মা। আত্মীয়রা মানুষের গতির পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক বাধা। কি বিচিত্র! মানুষ তবু বন্ধন বাড়াতে ছোটে বিয়ের দ্বারা!!!"

প্রকৃতি বলবে কাঁদো, আর আমরা তার নির্দেশ মেনে নিয়ে কাঁদতে শুরু করে দেব? মেনে নেব আত্মশক্তির এত বড় পরাজয়?—বিবেকানন্দ প্রশ্ন করলেন। উপায় নেই, মানতেই হয়—গভীর বিষাদের সঙ্গে তিনি ভাবলেন।

তাহলেও উদ্যত প্রকৃতির চ্যালেঞ্জ তিনি গ্রহণ করেছিলেন—যেভাবে করেছিলেন তা একজন অদ্বৈত-বেদান্তীর পক্ষেই করা সম্ভব। সাধারণ মায়াবাদীর মতো 'নেতি'র বালিতে মুখ গুঁজে থাকেন নি, রুখে দাঁড়িয়ে তৃতীয় নয়নের আগুনে প্রকৃতিমায়াকে ভস্মীভূত করেছেন, তারপর তিন নয়নে হেসেছেন—জ্ঞানের এক নয়ন আর প্রেমের দুই নয়ন একসঙ্গে ঝলমল করে উঠেছে।

আবার বলছি, সর্বোচ্চ হিউমার—জীবনবোধ, জীবন্মুক্তি ও জিনিয়াসের সমন্বয়ে

গঠিত। বিবেকানন্দের মধ্যে তিন বস্তুই ছিল। তাঁর জিনিয়াস তাঁকে বস্তুসত্যের গভীরে নিয়ে গেছে, সেখানে দেখেছেন বস্তুসম্পর্কের রহস্য, আর বহিঃপ্রকাশে দেখেছেন অগণ্য অসঙ্গতি ; তাঁর জীবনবোধ অসঙ্গতিসত মানবসম্পর্ককে পরম প্রেমে আলিঙ্গন করতে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে ; এবং তারপর তাঁর জীবন্মুক্তি—জীবন্মুক্ত মানুষটি দেখেছেন—ঐ আলিঙ্গনের আবেগজড়িত চেহারা, আর হেসে উঠেছেন। এখানেই বিবেকানন্দের আত্মপরিহাস।

পৃথিবীর রঙ্গস্থলকে তিনি দেখছেন ঃ

"এই খেলার জগৎ কোথায় থাকত, আর খেলাই বা কেমন করে চলত যদি এই খেলার মর্ম আমাদের আগে থেকে জানা থাকত। চোখ বেঁধে আমাদের খেলা। এ খেলায় আমাদের মধ্যে কেউ শয়তানের ভূমিকায়, কেউ পুণ্যবান বীরের ভূমিকায়—কিন্তু জেনো সবই খেলা, নিছক খেলা। রঙ্গমঞ্চে সিংহ-ব্যাঘ্র, দৈত্য-দানব এবং আরও কত না জীব আছে, কিন্তু সকলেরই মুখে জালবাঁধা, তারা তীব্র শব্দ করে কিন্তু কামড়াতে পারে না।"

'এ খেলায় আমি খেলি বা কেন ?' সকল লীলাবাদীর সঙ্গে একত্রে বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন—খেলি, কারণ ঈশ্বর এই খেলার জগৎ সাজিয়েছেন, আর সে খেলায় আমাদের সাথী করে নিয়েছেন। ভগবান অনন্তকালের খেলুড়ে। কেমন সুন্দর খেলা তিনি খেলছেন! যেই খেলা সাঙ্গ, যুগও শেষ। তারপর তাঁর কিছু বিশ্রাম, তারপর আবার খেলা শুরু—আবার জগতের সৃষ্টি।...প্রতি অণুতে তিনি খেলছেন।' 'আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁর ক্রীড়াসহায়ক। আহা কি আনন্দ—আমরা তাঁর ক্রীড়াসহায়ক—কি আনন্দ।' 'এই জগতের কাণ্ডকারকাখানার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না—সব তাঁর খেয়াল, তাঁর খেলা। জগতের নাট্যমঞ্চে তিনি হাসি নিয়ে খেলছেন, কান্না নিয়ে খেলছেন।' নিজেকে দেখছেন স্বামীজী ঃ 'জগতের খেলার মাঠে আমাদের যেন একদল স্কুলের ছেলের মতো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—আমরা সকলে চেঁচামেচি করে, হৈ চৈ করে, খেলে যাচ্ছি—কি বলো ?'

খেলা শেষের সময় যতই হয়ে আসছিল ততই বেশি করে ডুবে যাচ্ছিলেন খেলার রসে। তখন রাজা-মহারাজার দূতও ফিরে যাচ্ছে তাঁর দেখা না পেয়ে, কারণ সাঁওতাল কেষ্টার সঙ্গে তাঁর প্রাণের আলাপ চলেছে। ছেলেবেলায় তাঁর অনেক পোষা প্রাণী ছিল—তারা আবার দলবেঁধে এসে জুটল। বিবেকানন্দ এখন আচার্যবেশ ফেলে দিয়ে আবার 'রামকৃষ্ণের বালক' হতে চাইছেন। "যতই যা হোক আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী শুনত আর বিভোর হতে যেত। ঐ বালক ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি।"

এই বালকেরই একটা ছবি :

"বেলুড়-মঠ স্থাপন হইলে স্বামীজী অনেক জন্তু-জানোয়ার পুষিয়াছিলেন এবং নিজে দাঁড়াইয়া সব জানোয়ারদেব খাবার খাওয়াইতেন। কতকগুলি চীনে রাজহাঁস পাতিহাঁস একদিকে, ছাগল ভেড়া একদিকে, পায়রা অন্যদিকে, এবং গরু আর একদিকে থাকিত। হাঁস ছাগল ভেড়াগুলিকে ছোট-ছোট গামলা করিয়া খাবার দেওয়া হইত। গরুগুলিকে সম্মুখে খাবার দেওয়া হইত। পায়রাদেরও সেইরূপ দানা দেওয়া হইত। আর স্বামীজী কৌপীন পরিয়া একটা লম্বা লাঠিতে চিবুক রাখিয়া সেই জন্তু-জানোয়ারদের খাওয়াইতেন। স্বামীজীর এক ভক্ত একটি বড় সুন্দর কথা বলিতেন। তিনি বলিতেন, শ্রীকৃষ্ণ রাখাল-বালকদের নিয়ে মাঠে গরু চরাতেন। তাতে যে কি আমোদ এত, তা বুঝতে পারতুম না। কিন্তু মঠে স্বামীজী যখন কপ্‌নি পরে লাঠিতে দাড়ি দিয়ে মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্তু-জানোয়ারদের খাওয়া দেখতেন, সে রূপ দেখে বুঝলুম, শ্রীকৃষ্ণ কোন্ ভাবে রাখালভাব ধারণ করেছিলেন, এবং তাতে কোন্ আনন্দ পেতেন।' "

এই বিশ্বরাখাল কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাঁর রসিকতা ছাড়তে পারেন না। জন্তু-জানোয়ারগুলো দারুণ ক্যাঁচ্‌ম্যাচ্‌ করত—স্বামীজী চুপ করে শুনতেন—তারপর বলতেন—" 'গাওয়ত জীব-জন্তু আজি যে আছো যেখানে'—এই ব্রহ্মসঙ্গীত যদি কোনোদিন সত্য হয়, তাহলে ভগবান স্বর্গ ছেড়ে ছুটে পালাবে। বাপ্‌রে, এখানে গোটাকতক-মাত্র আছে, তাদেরই চীৎকারে কান ঝালাপালা।"

তাহলেও জন্তু-জানোয়ারদের নিয়ে স্বামীজীর স্ফূর্তির অভাব ছিল না। নিজের চিড়িয়াখানার সংবাদ দিচ্ছেন একটি চিঠিতে—"আমার সেই বিশালকায় সারসটি এবং হংস-হংসীগুলি খুব স্ফূর্তিতে আছে। আমার পোষা কৃষ্ণসার হরিণটি মঠ থেকে পালিয়েছিল ; তাকে খুঁজে বের করতে আমাদের দিন-কতক বেশ উদ্বেগে কাটাতে হয়েছে। একটি হংসী দুর্ভাগ্যক্রমে মারা গেছে।...একটি রাজহংসীর পালক খসে যাচ্ছিল।"

হংসীটি মারা গিয়েছিল ঠাণ্ডা লেগে। দুঃখ সামলে স্বামীজী এখানেও হাসির সুযোগ নিলেন : "প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। আমাদের একজন সুরসিক বৃদ্ধ সাধু বললেন, মশায়, এই কলিযুগে যখন জল-বৃষ্টিতে হাঁসেরও সর্দি লাগে, আর ব্যাঙও হাঁচতে শুরু করে, তখন আর বেঁচে লাভ নেই।"

হাসি কিন্তু থেমেও যায়। আকাশে অকস্মাৎ ছায়াপাত হয়। স্বামীজী বিষণ্ণ হয়ে ভাবেন, আমি যাদের ভালবাসি তারা বাঁচে না কেন ? ছোট একটা ছাগল-ছানাকে তিনি মট্‌রু বলে ডাকতেন। তার গলায় ঘুঙুর পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা আদর পেয়ে তাঁর পায়ে-পায়ে ঘুরত, তার সঙ্গে স্বামীজী 'পাঁচবছরের বালকের মতো

দৌড়াদৌড়ি করে খেলা করতেন।'

মট্‌রু মরে গেল। বিষাদে ভরে গেল স্বামীজীর মন। 'আমি যেটাকেই একটু আদর করতে যাই, সেটাই মরে যায়।'

অর্থাৎ বিবেকানন্দ পুনশ্চ দুর্বল হলেন। প্রকৃতির বশ্যতা স্বীকার করলেন? না, কদাপি নয়। 'স্বপ্ন—আহা স্বপ্ন!' এই স্বপ্নের ইন্দ্রজালই জীবনের কারণ, আবার এই স্বপ্নই জীবনের মুক্তির কারণও বটে।—'স্বপ্ন!—স্বপ্ন দিয়ে স্বপ্ন ভাঙো।'—স্বামীজী বললেন—'যখন স্বপ্ন ভেঙে যাবে, এবং আমরা রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যাবো, তখন আমরা এসব বিষয়ে প্রাণখুলে হাসব।'

বিবেকানন্দ আর এখন লীলাবাদী নন। লীলাবাদীকে সরিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবাদী বললেন, পৃথিবী চন্দ্র সূর্য তারকা যদি ঈশ্বরের খেলার সামগ্রী হয়, মানুষেরও তা খেলার সামগ্রী—সকলেই সকলের খেলার সামগ্রী—যদি সে চৈতন্য লাভ করে। বিবেকানন্দের কথা শুনতে-শুনতে নিবেদিতার মনে হল—"অপরূপ বাক্যগুলি, তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়ছে, তারই বেগে আমরা উত্থিত হয়েছি অনন্তে, সাধারণ মানুষ আমরা, হয়ে গিয়েছি আশ্চর্য শিশুর মতো, যে-শিশু আকাশের চন্দ্র-সূর্য-তারকার দিকে হাত বাড়িয়ে আছে, সেগুলিকে শিশুর খেলনা ভেবে।"

সুতরাং মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ হাসছেন। সারাজীবন তিনি জগতের জন্য খেটেছেন, সে জগৎ 'দেহের খাবলা মাংস তুলে না নিয়ে এক টুকরো রুটিও ছুঁড়ে দেয়নি'—সেই বড় যত্নের দেহবস্ত্রটিকে ত্যাগ করার কালে মৃত্যুমুকুরে নিজের নগ্ন-সত্তাকে দেখে অলজ্জ আনন্দে বিবেকানন্দ বলছেন—

"তুমি আমার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ো না; রোগটা আরও দু'তিন বছর আমাকে টেনে নিয়ে যাবে।...কাজটাকে গুছিয়ে নেবার জন্য সর্বক্ষণ কঠোর পরিশ্রম করছি—শুধু এইজন্য যে, যখন আমি রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যাব, তখন যেন যন্ত্রটা সামনের দিকে এগিয়ে চলে। বহুদিন আগে যেদিন সংসার ছেড়েছি, সেদিনই মৃত্যুকে জয় করেছি।"

আবার—

"হ্যাঁ সুদীর্ঘকাল তুমি আমাকে চিঠি লেখোনি। এ চিঠি তোমার প্রাপ্য নয়। কিন্তু দেখছ, আমি কত ভালমানুষ, কারো সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না, বিশেষ করে মৃত্যু যখন দ্বারে।"

মৃত্যু নিয়ে এমন করে কেউ হাসে!

মৃত্যু বড় রঙ্গের। মৃত্যুকে নিয়ে যে ঘর করতে পেরেছে, সেই জীবনকে সবচেয়ে ভালবাসতেও পেরেছে। সন্ন্যাসী তা পারে। বিবেকানন্দের ভাষায়, সন্ন্যাসের

অর্থ—মৃত্যুকে ভালবাসা।

হাতরাসের স্টেশনমাস্টার শরৎ গুপ্ত সমবয়সী এক সন্ন্যাসীকে ডেকে এনেছেন বাড়িতে। সন্ন্যাসীর কথাবার্তায় তিনি মুগ্ধ—তাঁর সঙ্গ করতে শরৎ গুপ্তের বাসনা। তরুণ সন্ন্যাসী রঙ্গ করে গান ধরলেন—'চাঁদমুখে মাখো ছাই—'

শরৎ গুপ্ত সত্যই মুখে ছাই মেখে হাজির।

শরৎ গুপ্তকে ছাই মাখিয়ে সন্ন্যাসী সংসার ছাড়ালেন, কিন্তু হাজির করলেন বড় ভালবাসার শ্মশানে।

সন্ন্যাসীর নাম সচ্চিদানন্দ।* স্বতঃই তাঁর শিষ্যের নাম হল সদানন্দ। সচ্চিদানন্দ ও সদানন্দ পথে চলেছেন—সদানন্দ নিজের বোঝা বইতে পারছেন না, সচ্চিদানন্দ সে বোঝা মাথায় তুলে নিলেন—বোঝায় সদানন্দের জুতোও ছিল।

সদানন্দ তাই আকুল হয়ে কেঁদেছিলেন 'সদানন্দের কুকুরদের' কাছে, মৃত্যুর পূর্বে। কতকগুলি ছেলে সদানন্দকে এত ভালবাসত যে, সগৌরবে বলত—আমরা 'সদানন্দের কুকুর।' তাদের সদানন্দ বলেছিলেন—বলতে-বলতে অঝোরে অশ্রু ঝরেছিল—"তোরা আমায় আর কি ভালবাসিস! জানিস, আমার গুরু আমার জুতো বয়েছিল মাথায় করে।"

সদানন্দ বলেছিলেন—"বিবেকানন্দকে আমার ভয় করে। ঐ বিরাট মানুষকে আমি চিনি না। আমি নরেন দত্তকে চিনি, যে আমার জুতো বয়েছিল মাথায় করে—।"

কিন্তু বিবেকানন্দ কোনদিন নরেন দত্তকে বিদায় দেননি। ২রা জুলাই, ১৯০২, শিষ্যা নিবেদিতাকে তিনি নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। খাওয়া-শেষে নিবেদিতার হাতে জল ঢেলে, পরে হাত মুছিয়ে দিলেন।

সন্ত্রস্ত নিবেদিতা বললেন—'এ কী করছেন?'

বিবেকানন্দ বললেন—'যীশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।'

নিবেদিতা আতঙ্কে ভাবলেন, সে তো শেষ ক্ষণে!

বিবেকানন্দ সহাস্য, বিবেকানন্দ প্রশান্ত। গুরুর কাজ তিনি করেছেন—

হাত ধুইয়ে দেওয়া, জুতো বয়ে নিয়ে যাওয়া—

যিনি বিশ্বগুরু, তিনি সারা পৃথিবীর পাদুকা বহন করেন।

বিবেকানন্দ গুরুগিরি করতে চাননি, কিন্তু—

* স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজকজীবনে প্রধানতঃ সচ্চিদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ক্রুশ-কাঠটিকে চাপিয়ে দিলেন পুত্রের ঘাড়ে। তারপর দিব্য নিষ্ঠুরতায়, নিষ্ঠুর প্রসন্নতায় তাঁর মুখ স্নিগ্ধোজ্জ্বল হয়ে উঠল।

রক্তাক্ত দেহে পুত্র সেই ক্রুশ বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন, কষ্টে কাঁদছেন, বলছেন, পিতা, এ কী করলে, আমাকে ত্যাগ করলে কেন?—হঠাৎ খ্রীস্ট দেখলেন, পথের ধারে জুডাস দাঁড়িয়ে—

জুডাস—। বিশ্বাসঘাতক—

এ কি—বিশ্বাসঘাতক জুডাস কোথায়! জুডাসের মধ্যে হাসছে আমার স্বর্গস্থ পিতা!!—পিতা, আমার পিতা—যে পিতার সঙ্গে আমি এক!!! I and my father are one!

বিবেকানন্দ অট্টহাস্য করতে লাগলেন—'হাঃ হাঃ হাঃ…আমি জুডাস…আমিই জিসাস…দুই-ই আমার মজা, আমার খেলা…আমি এখন খাঁটি বিবেকানন্দ হয়ে পড়েছি…'

'Ha! ha! You silly girl, all is good! Nonsense! I enjoy good and I enjoy the evil. I was Jesus and I was Judas Iscariot; both my play, my fun.'

'Now I am going to be truly Vivekananda.'

অদ্বৈত বেদান্তের এই হল শ্রেষ্ঠ নাটকীয় রূপ, আর এখানেই হিউমারের চরম।

# গ্রন্থপঞ্জী


বাণী ও রচনা ( ১০ খণ্ড )—[ বাংলায় স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী ]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ( ৫ খণ্ড )—শ্রীম [ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ ( ৫ খণ্ড )—স্বামী সারদানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ-স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী ( ৩ খণ্ড )—মহেন্দ্রনাথ দত্ত

লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ ( ৩ খণ্ড )— ঐ

কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ— ঐ

স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী— ঐ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান— ঐ

অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ-মহারাজের অনুধ্যান— ঐ

মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ-মহারাজের অনুধ্যান— ঐ

শ্রীমৎ সারদানন্দ-স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী— ঐ

তাপস লাটু-মহারাজের অনুধ্যান— ঐ

দীন-মহারাজ ( স্বামী সচ্চিদানন্দ )— ঐ

শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান— ঐ

গুপ্ত মহারাজ ( স্বামী সদানন্দ )— ঐ

স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষিপ্র লিপিকার জে জে গুডউইন— ঐ

স্বামী শিষ্য-সংবাদ ( ২ খণ্ড )—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

স্বামীজীর স্মৃতি-সঞ্চয়ন—স্বামী নির্লেপানন্দ

স্বামীজীর কথা—[ স্বামী শুদ্ধানন্দ, প্রিয়নাথ সিংহ ও হরিপদ মিত্রের বিবেকানন্দ-স্মৃতি। উদ্বোধন-প্রকাশিত ]

বিবেকানন্দের জীবন—রোমা রোলাঁ [ ঋষি দাস অনূদিত ]

রামকৃষ্ণের জীবন— ঐ [ ঐ ]

যুগনায়ক বিবেকানন্দ ( ৩ খণ্ড )—স্বামী গম্ভীরানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ ( ২ খণ্ড )—প্রমথনাথ বসু

বিবেকানন্দ চরিত—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

বিশ্ববিবেক—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শংকর সম্পাদিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা ( ২ খণ্ড )—স্বামী গম্ভীরানন্দ

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—[ উদ্বোধন-প্রকাশিত ]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত—বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল

ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য
শ্রীশ্রীসারদানন্দ প্রসঙ্গ— ঐ
সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ
স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ— ঐ
স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ
স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ
আমার জীবনকথা—স্বামী অভেদানন্দ
অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ—স্বামী সিদ্ধানন্দ
শ্রীশ্রীলাটু-মহারাজের স্মৃতিকথা—চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়
শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্মপ্রসঙ্গ—স্বামী ওঁকারানন্দ
নিবেদিতা—লিজেল রেঁম ( নারায়ণী দেবী অনূদিত )
গৌরী মা—( সারদেশ্বরী আশ্রম-প্রকাশিত )
শ্রুতি-স্মৃতি—মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
পূর্ণকুম্ভ—রাণী চন্দ
আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়—পরিমল গোস্বামী
বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস—ডঃ অজিত দত্ত
বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ
*Complete Works of Swami Vivekananda* (8 vols.)
*The Life of Swami Vivekananda*—[By his] Eastern and Western Disciples
*The Master as I saw Him*—Sister Nivedita
*Notes of some Wanderings with the Swami Vivekananda*—Siste Nivedita
*Reminiscences of Swami Vivekananda*—[By his] Eastern an Western Admirers
*Swami Vivekananda in America:* New Discoveries—Mar Louise Burke
*Swami Vivekananda: His Second Visit to the West: Nev Discoveries*—Marie Louise Burke
*Vedanta for the Western World*—Ed. Christopher Isherwood
*Late and Soon*—Francis Leggett